বঙ্গ-বাণী।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

আলেকজেণ্ড্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীসেখ আবছুলগণি প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৯১৫

The History of a nation's Poetry is the essence of its History, Political, economic, Scientific, religious: with all these the complete Historian of a national Poetry will be familiar; the national Physiognomy, in its finest traits, and through its successive stages of growth will be clear to him; he will discern the grand spiritual Tendency of each Period, what is the highest Aim and Enthusiasm of mankind in each, and how one epoch naturally evolved itself from the other. He has to record the Highest Aim of a nation, in its successive directions and developments: for by this the Poetry of the nation modulates itself; this is the Poetry of the nation.

THOMAS CARLYLE.

বঙ্গ-বাণী ।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ বহু পূর্ব্বে 'ভারতী' ও 'চৈতন্য লাইব্রেরী' কর্ত্তৃক আহুত প্রতিযোগিতায় রচিত হয়। প্রবন্ধদ্বয় পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধকে লক্ষ্য করিয়া 'সাহিত্য-সংহিতা' বলিয়াছিলেন, "শশাঙ্কমোহনের 'বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা' গত সনের সাময়িক পত্রিকার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।" 'বাঙ্গলা ছন্দঃ' নামক প্রবন্ধকে লক্ষ্য করিয়া ১৩২১ সনের শ্রাবন সংখ্যার 'মানসী' বলিয়াছেন "শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাঙ্গলা ছন্দ' এ সংখ্যা প্রবাসীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। মোট কথা বাঙ্গলা ছন্দের এরূপ ইতিহাস বোধ হয় বঙ্গভাষায় এই প্রথম বাহির হইল।"

বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থের অন্তর্গত সমস্ত প্রবন্ধই প্রকাশের পর সাময়িক পত্রমহলে আশাতীত প্রশংসা লাভ করিয়াছে; উহাদের বিষয়-বস্তু, সবিশেষ উহাদের রচনারীতি আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বসম্মত বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে, বঙ্গসাহিত্যের বিষয়ে একটি সুসম্পূর্ণ ধারণা উপস্থাপন পূর্ব্বক এই সাহিত্যের লেখক এবং পাঠক উভয়ের সমাদর লাভ করিবে বিশ্বাসে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

আমরা এই গ্রন্থকে সাধারণের হৃদ্য এবং পাঠোপযোগী করিয়া উপস্থিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সমগ্র গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর একটি সুসম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট দেওয়াগিয়াছে। তবে, লেখক মহাশয় আমাদের নিকট হইতে দূরবাসী হওয়ায়, নানা অসুবিধা গতিকে গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ থাকিয়াগিয়াছে। ঐ সমস্ত অপরিহার্য্য স্থলে শুদ্ধিপত্রে সন্নিবিষ্ট হইল।

উৎসর্গ।

বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাধনার নায়ক

বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃৎ

পণ্ডিতবর

মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এম এ বি এল ; এল এল ডি

মহাশয়ের করকমলে

বঙ্গীয় বাণীসেবক কর্ত্তৃক

বঙ্গসাহিত্যের অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তার

এই অকিঞ্চন

শ্রদ্ধা-উপহার।

ভূমিকা।

বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন ভাব-ধারা এবং কতিপয় বিশেষলক্ষণের দিকে লেখক ও পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। স্থল বিশেষে, এই সাহিত্যের অতীত এবং বর্ত্তমান চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেও দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চেষ্টা হইয়াছে।

বিভিন্ন লেখকসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি যেই বিশ্বাস-আদর্শে রচিত, এ স্থলে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত মনে করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃত সাহিত্য কেবল সাহিত্য-সেবকগণের বুদ্ধি কিংবা মস্তিষ্কশক্তির 'আমদানী' নহে। বাস্তবিক জীবন ব্যতীত 'সাহিত্য' হয় না; এবং প্রকৃত 'কাব্য' মাত্রেই কবির জীবনতরুর ফল। সাহিত্যে কোন কবির যাহা প্রকৃত দুর্ল্লভ কিম্বা বিশিষ্টতাজ্ঞাপক উপার্জ্জন, তাহা কেবল অন্য হইতে প্রতিবিম্বিত অথবা আগন্তুক পদার্থ মাত্র নহে; উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কবির অন্তরাত্মার, এমন কি, সমগ্র জীবনব্যাপ্ত সাধনার সম্পত্তি! বলিতে গেলে, কল্পনার ক্ষেত্রেও, মানুষ আপনাকে অতিক্রম করিতে পারে না! সুতরাং, অসামান্য প্রবেশ-শক্তিশালী অন্তরাত্মা, অসাধারণ আত্মনিষ্ঠা, এবং জীবন-চর্য্যার মধ্যেই যেমন অসামান্য কাব্য-উপার্জ্জনের, তেমন কবি-কল্পনার নিয়তিভূমি পর্য্যন্ত নির্ভর করে; কাব্যের প্রাণ-কেন্দ্র টুকুও নিহিত থাকে! এই কারণে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কবির-আত্মা এবং কবি-জীবন লাভ করা, জগৎ-তত্ত্বের বিশেষরস লাভ করাই কবির পক্ষে প্রথম, এবং প্রধান কথা। কবির জীবন সংসার হইতে যেই 'বিশিষ্ট রস' আকর্ষণ করিবে, কেবল তন্মধ্যেই তাঁহার কাব্যের মৌলিক বিশিষ্টতার উপার্জ্জন টুকু দাঁড়াইতে পারে; উহাই তিনি বাস্তবিক হৃদ্য এবং মনোরম্য ভাবে সাহিত্যজগতে উপস্থিত করিতে

পারেন। সুতরাং, সাহিত্য-সাধকের পক্ষে এই 'জীবন-সাধনা'ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কথা; বলিতে কি, সকল মনুষ্যের পক্ষেই নিজ নিজ অধিকার-দেশে উহাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা! প্রাণের মধ্যে স্বয়ং 'রস' লাভ না করিয়া, কেবল লেখনী সাহায্যে মস্যাধার এবং মস্তিষ্ক হইতে উহা'ক বিশ্বের জন্য পরিবেশন করিতে যাওয়া, বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ রচনা কখনও প্রকৃত প্রাণ লাভ করিতে, কিংবা পরের প্রাণেও আসন লাভ করিতে পারে না। সাহিত্যে প্রকৃতের অনুভব-সম্পর্কবিহীন কোনরূপ মায়িক ভাব কদাচ অন্তর্দৃষ্টিশালী বিচারকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে; একদিন না একদিন ধরা না পড়িয়াও যায় না। অন্যদিকে, সাহিত্যে সত্য উপার্জ্জন মাত্রেই কবি-জীবনের ফল বলিয়া, উক্ত ফলের মধ্যেই পুনশ্চ কবিজীবনের মূল প্রকৃতি বীজভাবে নিহিত থাকে; এবং চিরকাল জীবিত থাকিয়াই মনুষ্য সমাজে কার্য্য করিতে থাকে! সুতরাং, সমাজ সম্বন্ধেও কবির দায়িত্ব অপরিসীম। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা রচনার মধ্যে অভিব্যক্তিশীল ব্যক্তিত্বটিই ঐসমস্ত প্রবন্ধে যথাসাধ্য ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কাব্যের অন্তরঙ্গীর আত্মাটুকুর দর্শন, ও কাব্যের মধ্যে ক্রমবিকাশমান কবিজীবন এবং কবি-আত্মার সমালোচনাটুকুই লক্ষ্য করিয়াছি। কবি-জীবনের বাহ্যিক ঘটনা অথবা আড়ম্বরের দিকে দৃষ্টি করাও সবিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি নাই।

ঐরূপে, 'জাতীয় সাহিত্য'ও জাতিবিশেষের অন্তরঙ্গীয় জ্ঞানকর্ম্ম-ভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি—সমাজস্থ মনুষ্য মনের নিভৃত মতিগতির সাক্ষী! আবার এই 'জাতীয় সাহিত্যের' মধ্যেই সমগ্র জাতি-বিকাশের বীজ অথবা ভবিষ্যৎ আশার বীজ নিহিত থাকে। এইরূপ বিশ্বাস-আদর্শের বশীভূত হইয়াই বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং বিকাশ চিন্তা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যে কারণে এই গ্রন্থ-চেষ্টার উৎপত্তি, এস্থলে তাহা প্রকাশ করাও আবশ্যকীয় মনে করি। আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে এমন কয়েকটি বৎসর আসিয়াছিল, যখন প্রাচীন বঙ্গের কিংবা আধুনিক কালের পূজনীয় 'পূর্ব্ব শূরি'গণের প্রতি একটি নিদারুণ অবজ্ঞার ভাবেই যেন বঙ্গসাহিত্যের বাতাস দূষিত করিয়া দেয়। পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যেন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত কিছুই করিয়া যান নাই, তাঁহারা যেন বাঙ্গলা ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই—এইরূপ একটি ভাব অনেকের মুখেই প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছিলাম! ঐ ঘটনা হইতেই বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আমাদের সবিচার দৃষ্টি জাগরিত হয়। স্বয়ং সাহিত্য-সেবায় পিপাসিত বলিয়া, এই সাহিত্যের পূর্ব্বাপর প্রবৃত্তির পরিজ্ঞানও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। উহার ফল বর্ত্তমান গ্রন্থ। সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন সাহিত্য-চিন্তা আমাদের লক্ষ্য নহে; বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে এখন সে সময়ও নহে। এই গ্রন্থে একজন সাহিত্য সেবক, কেবল বিশিষ্ট লেখকগণের এবং তাঁহাদের সাহিত্য-কর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে, বিশেষতঃ নিজের অনুভূতি সমূহ স্পষ্টভাবে লিপি বদ্ধ করিয়া পাঠকের সহানুভূতি ও সতর্ক দৃষ্টি জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, মাত্র। বলা বাহুল্য, এই 'স্বরূপ নির্ণয়' বা প্রকৃতের যথাযথ পরিজ্ঞান টুকুই সাহিত্য-সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্য দিকে, পাঠকের পক্ষেও, ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট লেখকের আত্মার সহিত সহানুভূতি লাভ করা—বহুমুখিতা এবং বহুপ্রাণতা সাধন করাই প্রধান দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য। উহার নামই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'সাহিত্য-আচার'। বঙ্গদেশের কোনও লোক স্বপ্নেও 'সাহিত্য-আচার' ভ্রষ্ট হইবে কেন, অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিবে কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বলিতে হইলে, কেবল সুসম্পূর্ণ শিক্ষাদীক্ষার অভাব, এবং আপাতমুগ্ধ ভাবোন্মত্ততা ব্যতীত উহার অন্য

কোন স্থায়ী কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। শক্তিপূজক বাঙ্গালীর পক্ষে, একতার অন্তর্বর্ত্তী অনন্ত বহুত্বের উপাসক বাঙ্গালীর পক্ষে, কলালক্ষ্মীর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপবিকাশে সহানুভূতি অর্জ্জন করার পথে, ধর্ম্মের কিংবা সমাজের দিক হইতে কোন অপরিহার্য্য bias বা অন্তরায় আছে কি? যে দেশের হৃদয় লক্ষ্মীসরস্বতী দুর্গা বা উমা হৈমবতী কিংবা রাধিকার স্বরূপ ধারণাকরিতে পারে, দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন মানসী মূর্ত্তির পূজা করিতে পারে, অন্যদিকে উর্ব্বশীমেনকা কিংবা রম্ভার বিশেষবিশেষ স্বরূপ ধারণাকরাও যাহার পক্ষে সহজ; যাহার কাব্যজগতে সীতাসাবিত্রী অরুন্ধতীঅনসূয়া লীলা শ্রমনা বা মদালসা আছেন, অন্যদিকে শকুন্তলা ও শৈব্যা, দ্রৌপদী ও মন্থরা, খুল্লনারঞ্জাবতী ও বেহুলা আছেন, পদ্মিনী কর্ম্মদেবী লক্ষ্মীবাই ও মীরাবাই আছেন, তাহার নিকটে, শিল্পলক্ষ্মীও যে কতরূপে নিজের মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিতে পারে উহা বুঝাইতে যাওয়ার আবশ্যক কারিবে কেন? যে দেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, রাম কৃষ্ণ, বিশ্বামিত্র বশিষ্ট ও জনক, ভীষ্ম লক্ষ্মণ এবং মহাবীরের আদর্শ, চাঁদ সাগরের আদর্শও পরস্পর হিংসা না করিয়া অবস্থান করিতেছে, বাল্মীকি ব্যাস শূদ্রক বা কালিদাসভবভূতি ও অমরুর কবি-আত্মা যে দেশে অব্যাহতভাবে পূজা লাভ করিতেছে, সে দেশে কেন বুঝাইতে হইবে যে কবির আত্মা কতমতে কতরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্যরস এবং অমরতা-উপার্জ্জন সিদ্ধি করিতে পারে! আবার, সম্প্রতি ইংরাজী সাহিত্যের বিশ্বমুখ আদর্শ যাহার সমক্ষে অবারিত হইয়াছে, যে স্পেন্সার সেক্সপীয়র মিল্‌টন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ শেলী বা কীট্‌স্‌, টেনিসন-ব্রাউনীং চিনিয়াছে, হুগো গ্যেঠে শীলার মলিয়ার বা স্কট্‌ চিনিয়াছে, অন্যদিকে আধুনিক জর্জ এলিয়ট, ফ্লোবার্ট, মুলার, মোঁপাসা, টার্গোনীভ্‌ বা এনাটোল ফ্রান্স্‌ চিনিয়াছে, ঈব্‌সেন টলষ্টয় কিংবা জোলাকেও চিনিয়াছে, তাহাকে কেন বলিতে হইবে যে কবির আত্মা

কতদিকে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, এবং বিশ্বজগতের অনন্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে আরও কত শত পথে বিকাশ লাভ করিতে পারে।(নিজের চক্ষুর দ্বারা জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করার রহস্য যাহার সহজ হইয়াছে, যে নিজের হৃদয়কে অবারিত করার জন্য ভাষা পাইয়াছে (এবং সাহিত্যজগতে এ দু'টাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা) সে-ই দেখাইয়াছে, বিশ্বক্ষেত্রে পরের গায়ে না-লাগিয়াও অগ্রসর হওয়া কত সোজা !) দেখা যাইবে, এই সোজা কথা বুঝিয়া লওয়াই আমাদের পক্ষে যেন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন !

ভূমিকা রচনার সময়ে মনীষী কর্লাইলপ্রণীত গ্রন্থাবলীর একস্থানে কতিপয় পংক্তির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে ! উহাই এ গ্রন্থের শিরো-মন্ত্র রূপে মুদ্রিত হইল। পংক্তিগুলি উদ্ধার করিতে গিয়া, লেখনী যে ভয়বিকম্পিত হয় নাই, তাহা নহে। গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া, উহার বিচার-বধাস্ত্রটিও পাঠকের হস্তে তুলিয়া দেওয়া সামান্য অবিবেচনার কর্ম্ম নহে। কিন্তু, অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে, নিজের কোন দোষ গোপনকরা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ প্রসঙ্গে মধুসূদন প্রভৃতি কবিগণের বিষয় অল্প কথায় শেষ করিয়া, রবীন্দ্র নাথ কিংবা পরবর্ত্তী লেখকগণের বিষয়ে তদনুপাতে অধিক স্থান ব্যয়িত হইয়াছে—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিবেন। উহার কারণ, মধুসূদন প্রভৃতির জীবন এবং কবি-কর্ম্মের ঘনফল এ সাহিত্যে নানাদিকে নির্দ্ধারিত হইয়া, ন্যূনাধিক সুস্থির সীমা-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ; সুতরাং ঐ সমস্তকে প্রসঙ্গসূত্রে নানাদিকে অল্পকথায় সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু, রবীন্দ্র প্রভৃতির জীবন এবং কার্য্যসূত্র যেই বৃত্ত অঙ্কিত করিতেছে, তাহা এখনও সম্পূর্ণ নহে, এবং উহার প্রবৃত্তি ও বর্ত্তমানের হিসাবে সমধিক ফলাবহ ; উপরন্তু, নিশ্চিত নির্দ্ধারণার বহির্ভূত। মুখ্যভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, এবং অবান্তরভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশবৎসর পর্য্যন্তই বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশ এবং ক্রম-প্রবৃত্তি অনুচিন্তিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের লেখকও বঙ্গের সাহিত্যরঙ্গে স্বয়ং একজন অভিনয়ী বলিয়া, হয়ত পরবর্ত্তীর হস্তে নিজের বিচারটির দিকে গুপ্ত দৃষ্টি

রাখিয়াই বিশ্বাস করেন যে, গুণগ্রাহী আলোচনাই লেখকমাত্রের—বিশেষতঃ, জীবিত লেখকমাত্রের প্রধান দাবী। উক্তরূপ আদর্শেই, বর্ত্তমান আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন যে, নির্দ্দয় ভাবে দোষের পাশাপাশি স্থাপনব্যতীত হয়ত গুণের মর্য্যাদা এবং লেখকের ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদাও সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। এই আলোচনা সেরূপ সম্পূর্ণতার প্রত্যাশা করে না। তথাপি, এই আলোচনাতেই অপরিহার্য্য স্থলে, অন্ততঃ বিশিষ্ট লেখকগণের দোষদর্শনেও কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও লেখক বিশ্বাস করেন যে, গুণী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির 'সাহিত্যের আসামীর বাক্সে'ও দাঁড়াইবার স্বত্ব নাই; অমর-যোনি ব্যতীত অন্যকোন লেখকের দোষ-স্থানে বিচার-অস্ত্রাঘাত করিলে, ন্যায্য-বিচারককেও অকর্ম্ম-চাণ্ডালের এবং অবিধি-কৃত খুনের অপরাধী হইতে হয়। তবে, এই আলোচনায় যখন যাহা দোষ বলিয়া উল্লিখিত, বলিয়া রাখি, আমরা উক্ত সমস্ত দোষ সর্ব্বাগ্রে নিজের মধ্যেই অনুভব করিয়াছি বলিয়াই হয়ত উহা চোখে ঠেকিয়াছে, এবং তৎপ্রতি স্থানে স্থানে অতিরিক্ত কঠোরতাও প্রকাশ পাইয়াছে! উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই স্বীকৃত সমালোচক-কর্ত্তব্য এবং কঠিন দায়িত্ব সম্পাদনে আমরা নিজের সংকীর্ণ চরিত্ররুচি এবং সংস্কারের স্পর্শ পরিহার করিয়া চলিতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তৎসত্ত্বেও যদি এ গ্রন্থে কোনস্থানে ব্যক্তিগত রসনা-রুচির দুর্ব্বলতা অথবা সংকীর্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে উহাকে অসমর্থ লেখকের অসাধ্য মনে করিয়াই সহৃদয় পাঠক সদয়ভাবে দর্শন করিবেন। বরেণ্যা বঙ্গভাষা ও প্রিয়তম বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ-গতি এবং উন্নতি-নিয়তির বিষয়টী এতদ্দেশের প্রত্যেক লেখক এবং পাঠকের অভিনিবিষ্ট চিন্তা এবং গবেষণা লাভ করুক, এবং এই যৎসামান্য ও অসমর্থ চেষ্টাকে অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহারা স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সদরঘাট
২৫।৫।১৫

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন

সূচী।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম খণ্ড।

বঙ্গ বাণী।

বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ।*

বস্তু সংক্ষেপ

১। বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব—ভাষা ও সাহিত্য-উন্নতির মূল—জাতিপ্রীতি ও দেশ-প্রীতি—সাহিত্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—বুদ্ধদেব ও মানব সভ্যতা—বঙ্গদেশে বুদ্ধের প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে শৈব প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে শৈব প্রভাবের স্বল্পতা—বাঙ্গালার হৃদয় ও শৈব বৈরাগ্য—বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত প্রভাব—বাঙ্গালী ও শাক্ত তন্ত্র—গ্রাম্যকবি মুকুন্দ রাম—নাগরিক কবি ভারত চন্দ্র—গায়ক কবি রামপ্রসাদ—বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব—বাঙ্গালীর জাতীয়তা ও বৈষ্ণব পন্থা—বঙ্গে গীতি কবিতা—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—বঙ্গে শ্রীচৈতন্য—সাহিত্যের বিশ্বমুখ আদর্শ।

২। বঙ্গসাহিত্যে আর্য্য-আদর্শের প্রভাব ও রামায়ণ মহাভারত—বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজের প্রভাব—বঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্য-আদর্শ—স্বকীয় ও পরকীয় শক্তি।

৩। নব্যবঙ্গসাহিত্যের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—নবসাহিত্য—আদর্শে রামমোহন রায়—নব-জাগরণ ও বহুমুখী সাহিত্য-চেষ্টা—প্রসারিত আদর্শ-সাধনা ও লেখক সম্প্রদায়—বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এবং বঙ্গীয় সাধু-ভাষার উদ্ধার—আধুনিক ভাষাসমূহে গদ্যের আবিষ্কার এবং উহার ভবিষ্যৎ—বঙ্গভাষা কর্ত্তৃক কৌলিণ্য লাভ—বিস্তার এবং মাহাত্ম্য লাভ।

৪। বঙ্গীয় শব্দ শাস্ত্রের প্রধান সমস্যা—সাধু বাঙ্গালার আদর্শ—বিস্তারিত সাহিত্য আদর্শ ও সাধক সংপ্রদায়—উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য লক্ষণ—সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শ—সারস্বত ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশেষত্ব—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ—প্রকৃত মাহাত্ম্যের সংখ্যা-স্বল্পতা—উপসংহার, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী আদর্শ।

---

* এই প্রবন্ধ ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গভাষা অর্ব্বাচীন পদার্থ নহে। আধুনিক ইয়োরোপের কোন ভাষা হইতেই বঙ্গভাষা নবীন বা অল্পজীবী নহে; উহা বঙ্গদেশজাত এবঞ্চ নানা ভাষার সঙ্গতি সংসর্গে পরিপুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গবাসী আদিম অসভ্যগণের কথিত দেশজ ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া, উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের ভাষা-প্রকৃতিই অক্ষুণ্ণভাবে এবং ক্রমপরিণতি লাভে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বেও বালক বুদ্ধদেবকে বঙ্গলিপি শিক্ষা করিতেছেন, দেখিতে পাই। তৎকালে, পশ্চিমদেশ হইতে প্রত্যাগত আর্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশীয় প্রকৃতিসংসর্গে নানারূপ কথিত ভাষার—প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের এই কথিত ভাষাই তখন গৌড়প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত, এবং গৌড়-প্রাকৃতই বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব।

এই বঙ্গভাষা খ্রীষ্টোত্তর দ্বাদশ শতাব্দীতে দণ্ডাচার্য্যের ব্যাকরণ মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে। ওই সময়ে বঙ্গদেশে সংস্কৃতই সাধুভাষা, পুঁথির ভাষা, পণ্ডিতপুরোহিত ও সমাজের উপরিস্থগণের প্রশংশিতভাষা ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী-মনের যাহা বিশিষ্ট অর্জ্জন, জীবনপথে এই জাতির যাহা প্রশংশিত হৃদয়ভাব ও চিন্তা, তৎসমস্ত সংস্কৃত দ্বারাই প্রকটিত হইতেছিল।*

আমরা জানি, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি চিরকাল সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। যে জাতির জনসাধারণ জাগে নাই, কিংবা যে জাতির হৃদয় কোন বিশেষ দিকে জ্ঞানভাবের প্ররোচনা

* বিগত ১৩১৮ সনের ভাদ্র মাসে, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে শাখা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ উপস্থিত সভ্যসমক্ষে বঙ্গসাহিত্যের অতীত পরিচয় প্রসঙ্গে পঠিত।

প্রাপ্ত হয় নাই, এবং ঐ প্ররোচনা যাহাকে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী করিয়া তোলেনাই, সেই জাতিরমধ্যে কষ্ট-শিক্ষিত ভাষার বাক্যপ্রকারে ধর্ম্মদর্শন কিংবা পৌরোহিত্য-প্রকৃতির গ্রন্থ সুবহু রচিত হইতে পারে; কিন্তু উহার প্রকৃত সাহিত্য হয় না। প্রকৃত সাহিত্য চিরকাল মাতৃভাষার সম্পত্তি। মনুষ্যমধ্যে সাহিত্যোন্নতির মূল কারণ, তাহার সাধারণের জাগরণ; এবং উক্ত সাধারণের মধ্যে জীবনে ও জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—অর্থাৎ জাতীয় হৃদয়ে মনুষ্যত্ব আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

ভাষা ও সাহিত্যোন্নতির মূল।

অন্যদিকে, জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ জাতিপ্রীতি বা দেশপ্রীতি। এই জাতিপ্রীতি বিশ্বজনীনতার হিসাবে সঙ্কীর্ণ হইতে পারে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, উহাই জগতে জাতিপ্রতিষ্ঠার মূল সহায়। আবার, স্বদেশ বা মাতৃভূমি বলিতে ভিতরে ভিতরে মাতৃভাষা এবং সাহিত্যকেও বুঝায়। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে যে জ্ঞানভাব চিন্তা পরিদৃষ্ট প্রকাশিত এবং নির্ব্বর্ণিত হইয়া গিয়াছে, মাতৃ-ভাষী প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্যপ্রবাহ হইতে বাণীভাণ্ডারধৃত সেই সঞ্চিত সম্পত্তিই দেশপ্রীতির প্রধান ভিত্তি। যে দেশে মনন-জীবী বা নিঃস্বার্থ জ্ঞানকর্ম্ম ভাবজীবী কবি, পণ্ডিত, দার্শনিকের বা কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হয় নাই, যাহার ভাষা ঐরূপ মহাজন-সংসর্গের প্রভাব গ্রহণ করে নাই, সে দেশের মনুষ্যের দেশপ্রীতি জাতিপ্রীতি বা জাতীয়তার কিংবা মনুষ্যত্ব সাধনার কিছুমাত্র অবলম্বন এবং মূলধন (nucleus) নাই। যে দেশের মনুষ্য পূর্ব্বরিক্থ ভোগে কিংবা পৈত্রিক সম্পর্কে বলশালী হইতে পারে না, যাহার মাতৃভাষার সাহিত্যস্তম্ভে কিছুমাত্র সার নাই, সেই দেশের মনুষ্য চিরকাল শৈশব অবস্থায় থাকিতে বাধ্য। জগতের অন্য জাতি তাহাকে ন্যায্যমতেই উপেক্ষিত নির্জ্জিত ও

জাতিপ্রীতি ও দেশপ্রীতি।

পদদলিত করিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে, ইহপরকালের মাহাত্ম্য অর্জ্জন করে। ভাষা ও সাহিত্যের সহিত মনুষ্যত্বের এবং দেশপ্রীতির এক অপরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য।

প্রাচীন সংস্কৃতের তন্ত্র পুরাণাদিতে, ভিষক্ এবং সাহিত্য-শাস্ত্রে স্থানে স্থানে বাঙ্গালীর হাত দেখিতে পাইতেছি—বঙ্গদেশজাত মনুষ্যের গন্ধ পাইতেছি; কিন্তু তাহার কোন নামধাম ঠিকানা নাই। সমস্তই কোন না কোন নামস্থ ঋষির, বা দেব দেবতার নাম কর্ত্তৃকতায় প্রচলিত। ইহার প্রধান হেতু সাম্প্রদায়িকতা। সাধারণ যতকাল জাগে না, আপনার ভাবে জগৎকে বুঝিয়া প্রকাশ করা কিম্বা জগতের চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করা তাহার পক্ষে যতকাল অপরিহার্য্য হইয়া উঠে না, ততকাল মানুষ ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতার এবঞ্চ মৃতভাষার শ্মশানভস্মে অন্তরাত্মাকে পবিত্রপঙ্কাপ্লুত করিয়া নিস্তব্ধ ও নিদ্রিত থাকে। সাধারণের অভ্যুত্থান এবং ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থ-মাহাত্ম্য ও স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষেই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি। বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য ঐ নিয়মবশেই জাগিয়া, প্রাণধারণ করিয়া এবং উন্নতিলাভ করিয়া আসিয়াছে।

বুদ্ধদেব ও মানব সভ্যতা।

জগতের ইতিহাসে—মনুষ্যের উন্নতি ইতিহাসে বুদ্ধদেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। বুদ্ধদেব একভাবে মানব সভ্যতার আদি পুরোহিত ও সাধারণ-তন্ত্রের আদিম দ্রষ্টা; মানুষের পরমস্বত্বের ও মনুষ্যত্বের আদি উপদেষ্টা; শঙ্কিত ভীত মুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যের নেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক। ভারতবর্ষের যজ্ঞতন্ত্র-পীড়িত এবং দেবভীতিক্লিষ্ট মনুষ্যমন সর্ব্বপ্রথম এই সূর্য্যালোক প্রভাবেই জাগিয়াছিল। ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব, বুদ্ধাবতারের পূর্ব্বে মানবজগৎ যেন

এক অপরূপ আতঙ্কে জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছিল। পূজা-বলি *ভিন্ন যে দেবপ্রীতি সাধিত হয় না, এবং দেবপ্রীতি ব্যতিরিক্ত* জীবনে যে ধর্ম্মার্থও সিদ্ধ হয় না, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র মনুষ্যাত্মা এইরূপ বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, বিমুগ্ধ এবং ব্যামোহিত হইয়াই চলিতেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম ষষ্ঠ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে নানা বিষয়ে অপূর্ব্ব পদার্থ। ওই সময়েই মানবাত্মার প্রধান জাগরণ—মনুষ্যমনের প্রথম বিপ্লব—মানুষের ধর্ম্মে ও কর্ম্মের আদর্শে নবজীবনের সূত্রপাত—ভারতীয় ইতিহাসে উপনিষদযুগের শেষ অধ্যায়। জগতের ইতিহাসেও এই সময়ে বুদ্ধাত্মারই প্রকট কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বদেশের কংফুশী ও পশ্চিমের ইহুদী প্রফেটগণ একদিকে এই বুদ্ধাত্মারই প্রকাশ। মানুষের আত্মাই বিশ্বপ্রভু, এবং মনুষ্যত্বই সকল ধর্ম্মসাধনের মূল লক্ষ্য, জগতে বুদ্ধাত্মার ইহাই প্রধান শিক্ষা। এই অবির্ভাবের পর হইতে মানবজগতে যে ধর্ম্মতন্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, তাহাই নানাদিকে, সেশ্বর এবং নিরীশ্বর পন্থায় এখন যাবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই দুই শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধাত্মার বা শাক্যসিংহের শীর্ষস্থান।

বঙ্গদেশে বুদ্ধের প্রভাব।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ এক সময়ে বৌদ্ধ-পতাকার আশ্রয় লইয়াছিল; তাহার প্রভাবেই প্রাচীনকালে বেদ ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মের স্থিতি এই দেশে এত বিচলিত হইয়া গিয়াছিল যে পরিশেষে বেদপন্থী ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার যুগে, নবম শতাব্দীতে, কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমদানী করার আবশ্যক পড়িয়াছিল।

বঙ্গদেশে বৈদিক ঋষির বা পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইয়া সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সাধারণের

হৃদয় মধ্য হইতে আর একটী যুগোপযোগী মহাশক্তির আবির্ভাব হইতেছিল, তাহা—**বঙ্গভাষা**।

বুদ্ধদেবই সর্ব্ব প্রথম সাধারণের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনে, ও সংস্কৃতের প্রধান্য অস্বীকারে, তৎকালের দেশ-বিস্তৃত ভাষার মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেন। বুদ্ধদেবের এই আদেশ গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও দুরদৃষ্টির পরিচায়ক। উহার গৌণ-মুখ্য ফলেই, যেমন একদিকে শ্রুতিগত বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সাহিত্যের লিপিরীতি সুপ্রচলিত হইয়াছিল; তেমনই অন্যদিকে, সাধারণের হৃদয়ঙ্গম মাতৃভাষা উন্নতিপথে প্রবল প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহার ফলেই, দেশের পৈশাচী বা পালীর প্রকৃতি হইতে বঙ্গভাষা সমুদিত হইয়া দেশের হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মের যুগোচিত মুখ্যকার্য্য, জীবনে জগতে দেবদেবতার পূজা প্রভাবের অস্বীকার, ব্যক্তিগত চরিত্র-মাহাত্ম্যের আদর্শ স্থাপন, ও জনসাধারণের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। উহার ফলেই বঙ্গের জন মন জাগিয়া উঠিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিয়া, বঙ্গভাষাকে স্বতন্ত্র ঐশ্বর্য্যময়ী করিয়া তুলিতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; এবং সংস্কৃতের বশ্যতা পরিহার করিয়া, উহাকে দেশবাসীর হৃদয়াবেগময়ী লিখিত ভাষায় পরিণত করিতে পারিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতেই ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা নির্জ্জিত হইতে থাকে; এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গলিপি প্রভৃতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়; ভারতের সর্ব্বত্র বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবাহ মধ্যেও পৌরাণিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে ভারতীয় আর্য্যমন সর্ব্বত্র দেশপ্রচলিত বুদ্ধপূজা এবং বৌদ্ধতন্ত্র পদ্ধতিকে হিন্দুতন্ত্রে এবং পৌরাণিকতার মধ্যে আত্মস্থ করিতে নিযুক্ত ছিল। পূর্ব্বতন তন্ত্র ও পুরাণের অনেক গুলি এবং বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যের

প্রায় সমস্ত শাস্ত্রই, এরূপে তৃতীয় শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী মধ্যে পরিবর্ত্তিত, বিপরিণত বা নূতন সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণব পূজা পদ্ধতি নানাদিকে বৌদ্ধপূজা পদ্ধতিকে নির্জ্জিত এবং কবলিত করিতেছিল। পরিশেষে, বৌদ্ধ পালরাজগণের রাজত্ব লোপ ও সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ আশা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

লিঙ্গমূর্ত্তি বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি যে এই দেশে আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্ব হইতেই দ্রাবিড় ও কোলেরীয় জাতির পূজা মধ্যে প্রচলিত ছিল' তাহাতে সন্দেহ হয় মা। বিজয়ী আর্য্যগণ ক্রমে রফারফিয়ত করিয়া, বেদোপনিষৎ দর্শনের সহিত সঙ্গত করিয়া, এই সমস্তকে মহেশ্বর ও বিষ্ণু প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই দেশে পূর্ব্বকালের দানব দস্যু নাগ ও রাক্ষসগণ সকলেই শিলালিঙ্গপূজক ছিলেন। পুরাণাদিতে নবাগত আর্য্য এবং দেশীয় উপাসনার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও মিলনপদ্ধতি সুপ্রকট হইয়াছে। বৈদিক ব্রহ্মশক্তি বা উপনিষদের মায়া, অবিদ্যা কিংবা 'উমা হৈমবতী' যে সাংখ্য পাতঞ্জলের ছায়ায় কালী দুর্গা প্রভৃতি উপাস্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষীয় আর্য্য দ্বিজগণ অত্যুন্নত ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মদর্শন হইতেই ক্রমে কল্পিত মূর্ত্তি পূজায় অবতরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের এই অবতরণ বিশেষভাবে অনুধাবন করার যোগ্য। জগতের অন্য প্রাচীন ধর্ম্মে, মানুষ মূর্ত্তি-পূজা ও বহু-পূজা হইতেই নিরাকারবাদে এবং একেশ্বরবাদে উপনীত হইয়াছে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি-উপাসনা বা প্রতীক উপাসনা সমুন্নত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সমক্ষে, এবং উহার সাহায্য-ছায়াতেই সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। এই উপাসনা-পদ্ধতি বেদোপনিষদের এবং ষড় দর্শনের পরবর্ত্তীকালে, ব্রহ্মবাদিগণের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াই প্রবর্ত্তিত

হইয়াছে। উহার দোষ গুণ এই স্থলে বিচার্য্য নহে; কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা। যে রূপেই হউক, উহা ঐতিহাসিকের চক্ষে সাধারণের জয় ঘোষণা—বিজয়ীর উপরে বিজিতের জয় ঘোষণা। দেশস্থ ঘৃণ্য, নিপীড়িত জনসাধারণের জয়ধ্বজা এই ক্ষেত্রে, স্মরণাতীত যুগেই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। অনার্য্যগণ বাহুবলে বিজিত হইয়া থাকিলেও, আর্য্যগণকে পুনর্ব্বার হৃদয়-বলেই তাহাদিগকে আপনার করিতে হইয়াছিল—ইহাই আমরা দেখিতেছি।

ন্যূনাধিক সকল প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায়, ধর্ম্মের বা পূজা পদ্ধতিরা প্রভাবই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে বঙ্গদেশের হৃদয় মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চিন্তা করিতে দেশস্থ ধর্ম্মের প্রভাবই চিন্তা করিতে হয়। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবই প্রবল হইয়া ক্রমান্বয়ে দেশের সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; সর্ব্বদিকে সাধারণ জাগিতেছিল। ফলে ধর্ম্মভাবের প্রেরণা হইতেই সাহিত্যশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল; ইহাই আমরা এই প্রসঙ্গে স্থূলতঃ পরিদর্শন করিব।

বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের প্রভাব।

বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রাচীন সাহিত্য-রেখা আমরা পাইতেছি—একাদশ শতাব্দীর মাণিকচাঁদের গানে ও রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে। এই দুই নিবন্ধই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্ব প্রাচীন বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। এই বৌদ্ধভাব-ধারাই বঙ্গসাহিত্যে পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ময়ূর ভট্ট; তাঁহার পশ্চাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, সীতারামের গৌড়মঙ্গল, সপ্তদশ শতাব্দীতে রামদাসের অনাদিমঙ্গল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে

বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাব।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে, বৌদ্ধভাবধারা ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া হিন্দুত্ব-স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে; বঙ্গদেশে স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এখন আর বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নাই; কিন্তু সাধারণের মুখে 'ধর্ম্মের দোহাই' রহিয়া গিয়াছে, এবং এই কিংবদন্তীগত বৌদ্ধধর্ম্মই সংস্কৃতের পদাশ্রয় হইতে বঙ্গসাহিত্যকে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাকে স্ব:তন্ত্র পথে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্য এবং জাতি-জন্মগত মাহাত্ম্যের প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব আদর্শকে স্বাধীন চরিত্রগৌরবের বিমানতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই সমস্ত বৌদ্ধ কাব্যের নায়ক উপনায়ক কে? "প্রখ্যাত বংশোরাজর্ষি ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্" নহেন! লাউসেন, গোপীচন্দ্র, হরিচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, কুবদত্ত, হাড়িপা, কাণিপা প্রভৃতি। ইঁহারা ভক্তবীর, চরিত্রবীর; এবং দেখা যায়, অসংস্কৃত নামরূপ-জাতি ধারণ করিয়াও চরিত্র গুণেই, পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও নমস্ত হইয়া গিয়াছেন। কত বড় 'বুকের পাটা' এইসমস্ত বাঙ্গালী কবির! মহিমান্বিত বেদ পুরাণাদির সমক্ষে, রামায়ণ মহাভারতের হিমাদ্রি পাদদেশে, ক্ষীণ জঘন্য 'পৈশাচী ভাষায়' বল্মীকস্তুপ নির্ম্মাণ করিবার কত বড় সাহস, ঐকান্তিকতা এবং আত্মনিষ্ঠা! এখন দেখিতেছি, ঐ সাহস দুঃসাহস হয় নাই। হিমালয়-নিঃসৃত প্রবল ভাবজাহ্নবী-ধারাও তাহাকে ভাসাইয়া লইতে—গলাইয়া ফেলিতে পারে নাই। কারণ, বঙ্গদেশের হৃদয়ের উপরেই যে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল! উহার অবলম্বনেই দেশদেশান্তর হইতে প্রবহমান ভাবের পলিমৃত্তিকা পড়িয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-নবদ্বীপ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

বঙ্গদেশে এই বৌদ্ধ প্রভাবকে নিরস্ত এবং নিয়ন্ত্র করিয়াছে, শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণব। প্রাচীন বেদ পুরাণ হইতে এই ত্রিধারাই

দেশ-প্রকৃতি-সঙ্গতে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া বৌদ্ধ-সৌভাগ্য হরণ করিয়াছে; এবং এইদেশকে আচ্ছন্ন ও অধিকার করিয়া লইয়াছে। প্রাচীন কিংবা মনুপ্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ভেদ. সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, সত্য; কিন্তু বঙ্গদেশের, উপরন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দুত্বের লক্ষণও স্থির করিয়া গিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে শৈব প্রভাব।

শৈব মতাবলম্বী সেনরাজগণই বৌদ্ধ পালরাজগণকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গ অধিকার করেন। সেই সঙ্গে শৈবধর্ম্মই বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাবকে পরাজিত, নিরস্ত এবং আত্মস্থ করার সুবিধা লাভ করে। ভারতবর্ষে অল্লাধিক সর্ব্বত্র এই শৈব সম্প্রদায় কর্ত্তৃকই বৌদ্ধসম্প্রদায় পরাজিত ও কবলিত হইয়াছে।

শৈবধর্ম্ম নানাদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মীয় ও সহোদর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সমধর্ম্মা বলিয়াই শৈব আদর্শ সহজে বৌদ্ধ শ্রামণ্যকে পরাজিত ও কবলিত করিতে পারিয়াছিল। বৈরাগ্যগুরু বুদ্ধচরিত্রের পীঠ-স্থলে পরম সন্ন্যাসী শিবচরিত্রের প্রতিষ্ঠা করা কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নাই; মহাশূন্য এবং নিরঞ্জন ধর্ম্মমূর্ত্তির স্থলে লিঙ্গোপাধিক এবং নির্গুণ শিবসংজ্ঞা অনায়াসে জুড়িয়া বসিয়াছে। শ্রমণগণের হরিদ্রাবসন সামান্য প্রলেপেই গৈরিকবর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। মুণ্ডিত-শির পরমহংসাবস্থায় রক্ষিত হইতে বা ইচ্ছামাত্রেই জটাজালে আবৃত হইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষের ৭ম হইতে ১২শ শতাব্দীর ধর্ম্মেতিহাস এইরূপে শৈবকর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাসের ইতিহাস বই নহে। মুসলমানের আক্রমণ অবশিষ্টটুকু হিন্দুর সাপক্ষে উপরন্তু নিজের সাপক্ষেও সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল। সহৃদয়-সংসর্গী মুসলমান, হিন্দুগণের অগ্রগামী হইয়া সহজেই নিরীশ্বর বৌদ্ধকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন; ভারতে সর্ব্বত্র মুসলমান সংখ্যা এই ত্রিশঙ্কুদশায় অবস্থিত বৌদ্ধগণের দ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

কিন্তু শৈবধর্ম্ম বৈরাগ্যনিষ্ঠ। নির্ব্বাণ-মুক্তিবাদীর চক্ষে প্রকৃত-প্রস্তাবে, সাহিত্যের বা লোকস্থিতির কিছুমাত্র গৌরব কিংবা আকর্ষণ নাই। নির্ব্বাণবাদী বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায় ভারতবর্ষের প্রকৃত সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। বঙ্গসাহিত্য-ভূমেও ইহারই প্রমাণ পাই। এই দেশেও পরম দার্শনিক শৈবধর্ম্ম কেবল বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরস্ত করিয়াই বিরত হইয়াছে; উহার সাহিত্যে কোন বিশেষ প্রতিভাচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। শিবমহেশ্বর বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণকে পরমা মুক্তি পুরস্কার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের ভবজীবনের বা হৃদয়গতির কোন নিদর্শন পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে অনুমতি অথবা অবসর দেন নাই। শৈবগণের উদ্দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্মৃতিঋণ সামান্য—অবশ্য তাঁহারাও তাদৃশ লৌকিকতার প্রত্যাশা রাখেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যে শৈব-প্রভাবের স্বল্পতা।

বঙ্গসাহিত্যে শৈবগণের কার্য্যরেখা দেশস্থ বর্ত্তমান শৈবপ্রভাবের অনুপাতেও পর্য্যাপ্ত নহে। যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহারাও রসবৈচিত্র্যহীন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবি-কৃতিকে পাদপীঠ করিয়া এবং আচ্ছন্ন করিয়াই দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে, রামকৃষ্ণ দাসের শিবায়ন, রামরায়ের মৃগব্যাধ সংবাদ, রতিদেবের মৃগলুব্ধ, হরিহরের বৈদ্যনাথ-মঙ্গল (১৭শ শতাব্দী) ও রামেশ্বরকৃত আধুনিক শিবায়নমাত্র উল্লেখ-যোগ্য।

বঙ্গসাহিত্যে শৈবপ্রভাব এত যৎসামান্য হইবার প্রধান কারণ কি? শৈবগণের অসামাজিক মতিরতি ও সংসার বিদ্বেষী আদর্শ। অধিকন্তু শিবঠাকুর যে স্থলেই শক্তিসহযোগে উপস্থিত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে; বাঙ্গালী তাঁহার রজতগিরি গাত্রে কলঙ্ক-কালিমা অর্পণ করিতেও ছাড়ে নাই; তাঁহার মাহাত্ম্য যে বাঙ্গালী

বাঙ্গালীর হৃদয় ও শৈব বৈরাগ্য।

কবির আন্তরিকী প্রীতিভক্তি কিংবা সম্মান আকর্ষণ করে নাই, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। "ধান ভানতে শিবের গীত" যেমন নিষিদ্ধ, 'বাসর ঘরেও শিবের গীত' নিষিদ্ধ হইয়াছে, সংসারের গৃহচ্ছায়াতেও শিবের গীত নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিবের গীত কেবল সন্ন্যাসীর গাজনতলায় নতুবা শ্মশানে। পূর্ব্বদেশে আগত হইয়া বেদের রুদ্রদেব ভোলানাথ এবং ভাঙ্গড় হইয়া, শ্মশানমশান-বাসী হইয়াই ঘুরিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী এই শিবনিগ্রহের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, শক্তির চরণে—চণ্ডীর, অন্নপূর্ণার, উমার চরণে। ভাগীরথীর অমৃতস্তন্য পরিপুষ্ট বাঙ্গালী জগতে একটী কথা বিশেষভাবে চিনিয়াছে—'মা'! ভারতের কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয় সীতা-রাম', কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয় হর হর শম্ভো'. বাঙ্গালী চিনিয়াছে 'মা'! মাতৃভাবের উপাসনায়, উদ্দীপনায় এত কাব্য-কবিতা কিংবা হৃদয়গাথা অন্য কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কিনা জানি না। রোমান কেথলিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যুগে ইয়োরোপে—বিশেষতঃ ইটালীতে, মাতৃভাবের অবলম্বনে রাফেল প্রভৃতি কয়েকখানি জগৎ-প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন; ম্যারী মাতাকে অবলম্বন করিয়া ইয়োরোপের মধ্যযুগে কিছু কিছু ভক্তিসাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার তুলনায় তাহা সামান্য।

জগৎপ্রকটিতা ঈশ্বরী শক্তিকে জগদীশ্বর হইতে অভিন্ন জ্ঞান পূর্ব্বক মাতৃভাবে উপাসনা করাই শাক্ত উপাসনার প্রধান লক্ষণ। এই শক্তি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক; শক্তি বিশ্বমাতা। বাঙ্গালীর ভক্তি রতি এবং সারস্বতী প্রতিভা এই মাতৃভাবে বিশেষ খেলিয়াছে, বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয়ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম বলিলে অযুক্ত হইবে না। আবার, বেদের আর্য্যগণ জগৎটাকে পুংদেবে পরিপূর্ণ

বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত প্রভাব।

করিয়াছিলেন ; উপনিষদের দার্শনিকগণ এই দেবতাকেই এক এবং "ন সৎ, নাসৎ" নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "অশোষ্য মদাহ্বং" ইত্যাদি মতে ক্লীবযোনিত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং বিশ্বজগৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবেই পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহাকেই "অনন্ত জগদাধারা শক্তিভূতা সনাতনী"—জগদ্রূপিনী চিন্ময়ী, উপরন্তু মৃণ্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমগ্র জাতিটার অধ্যাত্মচরিত্রের পরিচয় প্রকট হইয়াছে। "এক মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"কে জ্ঞাতসারেই বহুভাবে দর্শন এবং আরাধনা সমগ্র হিন্দুজাতির বিশেষত্ব ; পুনশ্চ, উঁহাকে মাতৃভাবে এবঞ্চ তনয়ার ভাবে দর্শন এবং উপাসনা বিশ্বধর্ম্মের মধ্যে কেবল বাঙ্গালীরই বিশেষত্ব। 'মা' নাম অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ অথবা মধুমৎ শব্দপদ বঙ্গভাষায় নাই। জগতের অন্য-ভাষায় আছে বলিলে বাঙ্গালী তাহা বিশ্বাস করিবে না। তাহার ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে ও দেশে—ইহকাল ও পরকালে এই মাতৃভাবের এবং মাতৃপূজার অক্ষুণ্ণ রাজত্ব : সর্ব্ব দেবতার মধ্যে এই মাতৃমূর্ত্তিই একেশ্বরী। *শাক্তগণ বলিবেন, যেমন বেদের ঊষা নিশা দ্যাবা-পৃথিবী অদিতি, সূর্য্য সোম ইন্দ্র মিত্র অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি, তেমন কালী দুর্গা, দশমহাবিদ্যা,* লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, শীতলা মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি সেই একই অদ্যাশক্তির নাম-রূপান্তর ; ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের উপাস্যা। এইরূপ দর্শনেই বৈদিক শক্তিবাদের সহিত পৌরাণিক তথা আধুনিক শক্তিবাদের সামঞ্জস্য। শক্তিমাতার উদ্দেশে বঙ্গে শত শত কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে —অনেক গ্রন্থ ভাষা এবং ভাবের মাহাত্ম্যে, এই দেশে এখন যাবৎ সমাদৃত এবং পঠিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে এই পর্য্যন্ত ৫ খানি শীতলা-মঙ্গলের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে দৈবকী নন্দনের শীতলামঙ্গলই সর্ব্ব প্রাচীন। সাকার

শীতলা পূজার পদ্ধতি বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের সৃষ্টি ; এবং, এই পূজা এখন যাবৎ পূর্ব্ব-বৌদ্ধ ডোম-পণ্ডিতগণেরই নিজস্ব। বঙ্গসমাজে ধর্ম্ম-দেবতার মাহাত্ম্য ক্রমে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে ; শীতলার মাহাত্ম্য এখনও বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধ পূজা অপ্রতিষ্ঠ হইয়া গেলে, শীতলা দেবীকে আত্ম মাহাত্ম্য রক্ষণে এবং পূজা প্রচার বিষয়ে চিন্তিতা হইতে দেখা যায়। ক্রমে ব্রাহ্মণ যাজকেরাও শীতলা পূজা অধিকার করিয়া পৌরোহিত্য ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

বিষধর সর্প-সঙ্কুল বঙ্গভূমির মহামান্যা দেবী বিষহরী ; শীতলার ন্যায় তিনিও শিবদুহিতা। এই স্থলেও আর্য্য দ্রাবিড়ের সম্মিলন ; দেশস্থ জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের সহিত বিজয়ী আর্য্যগণের অকপট সন্ধি। এইরূপ সন্ধির গতিকে আর্য্যমহিমা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য নির্ব্বিশেষে মিলিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে ; জাতীয় জীবনের এবং দেশভাষার সূত্রপাত হইয়াছে। মনসামঙ্গলে সর্ব্বত্র শিবভক্তের সঙ্গেই মনসা দেবীর সংগ্রাম, তৎপর সন্ধি। চাঁদসদাগর পরম শৈব ও বঙ্গ সাহিত্যের নিজস্ব সৃষ্টি। শিব নিজের ভক্তকে নিগৃহীত করিয়াও, নিজের আধিপত্য খর্ব্ব করিয়াও, দুহিতার আব্দার রক্ষা করিয়াছেন—মর্ত্ত্যলোকে মনসার পূজা প্রচলনে সাহায্য করিয়াছেন ; ইহাই মনসামঙ্গলের বক্তব্য। মনসামঙ্গলের আদি কবি কায়স্থ 'কাণা হরি দত্ত' ; (১৪শ শতাব্দী) তাঁহারই পন্থায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। মনসার মাহাত্ম্য ঘোষণা এবং পূজা প্রচার করিয়া শতাধিক কবি (প্রায় বঙ্গের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে) কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দেবতার প্রতি অহেতুকী প্রীতি ভক্তি কিংবা নির্ব্বাণ মুক্তির উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া কবিসংঘ এইরূপ কাব্য কোলাহল উত্থাপিত করেন

নাই। উহার প্রধান উদ্দীপক কারণ, মাতা বিষহরীর অনুচরগণের ভয়—এবং এই ধর্ম্ম-ভীরুতার উদ্রেকই এই সমস্ত কাব্যের মুখ্য অবলম্বন। জীবনটা নিতান্ত তুচ্ছ নহে, সুতরাং ভক্তি মুক্তি-প্রদাতা হরিহর দেবতাগণকে একপার্শ্বে রাখিয়া, আপাততঃ পুত্রপৌত্র এবং আত্মার রক্ষা কল্পে, মনসা দেবীর শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছিত; বাঙ্গালী কবি অম্লান মুখে এইরূপ হিতবাদের আশ্রয় লইয়াছেন; এবং আসরে নামিবার পর, অকৃত্রিম ভাবাবিষ্ট হইয়া সময় সময় প্রকৃত কবিত্বের ডিগ্রি-সীমাও স্পর্শ করিয়াছেন। বঙ্গে বৌদ্ধবিজয়ী এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যবাদী শৈব-ধর্ম্মের সঙ্গেই মনসার পূজারীগণকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল—তাঁহারা এই ক্ষেত্রে রফা করিয়াই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছেন।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের শাক্ততন্ত্রগুলি বিশেষভাবে বাঙ্গালীর—প্রায় সর্ব্বত্রই বঙ্গদেশবাসীর কররেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালী প্রাচীন শাক্ত এবং বৈষ্ণব পন্থাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া—বিশেষ ভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। মনসা-কাব্য তাহার নিজস্ব—চণ্ডীকাব্য ও তাহার নিজস্ব। চণ্ডীপূজা প্রাচীনকালে সুবচনী ও মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথায়, ক্ষুদ্র ২ 'পাঁচালী'-কথায় প্রচলিত ছিল, বঙ্গবাসী কবি উহাকে সুবৃহৎ চণ্ডীকাব্যে ও জাগরণে পরিণত করিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ জাগরণ বঙ্গসমাজে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাগরণের আদি কবি বলরাম। তৎপর ষোড়শ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্য ও ভবানী-শঙ্কর পূর্ব্ব-গুরুপন্থায় নূতন জাগরণ রচনা করেন। উভয়ের ছায়ায় বসিয়া মুকুন্দরাম বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী ও শাক্ততন্ত্র।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল বাঙ্গালীর নিজস্ব, বলিয়াছি। উহারা সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশজাত এবং উহাদের সংস্কৃত সম্পর্কও সামান্য। প্রাচীন

বঙ্গদেশের সমাজ এবং পরিবারের রীতি নীতি এই সকল কাব্যে নানা-দিকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে"। আবার এই সকল কাব্য নাগরিক জীবনের কিংবা রাজ সভার সৃষ্টিও নহে। "গ্রাম্যদেশে

গ্রাম্যকবি মুকুন্দরাম।

প্রাত্যহিক জীবনের ছায়ায় বসিয়া, মানবজীবনের সুখ দুঃখ রসে গভীর গাহী, সবল সুস্থদেহ বাঙ্গালী কবি আপনার হৃদয় মধ্য হইতে এই স্বভাব-সঙ্গীত উৎসারিত করিয়াছেন। নারায়ণ দেব বিশেষতঃ মুকুন্দরাম প্রাচীন বঙ্গভূমির অমূল্য সম্পত্তি। কালকেতু ও চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও খুলনা প্রস্তরখোদিত জীবন্ত ভাস্কর্য্যমূর্ত্তি। বিশেষতঃ কালকেতু! ভাবিয়া দেখুন, ঐ চরিত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছুমাত্র প্রভাব নাই; বঙ্গসমাজের প্রত্যন্ত-বাসী ঘৃণিত অস্পৃশ্য ব্যাধযুবকের প্রতি কোন্ ব্রাহ্মণ সদয় দৃষ্টি করিবে? তবু দেখুন:—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন সুখ হেতু।
নাক, মুখ, চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমান
দুই বাহু লোহার শাবল।
রূপ, গুণ, শীলগড়া বাড়ে যেন হাতী কড়া
যেন শ্যাম চামর কুন্তল
দুইচক্ষু জিনি নাটা, খেলে ডাণ্ডা গুলি ভাঁটা
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধানে রাঙ্গা ধড়া, মস্তকে জালের দড়া
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।"

এই অপরূপ বর্ণনার রসে এবং ছন্দে যেন একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের—সৌরভের আভাস পাইতেছি; উহা কাহার?—কবি হৃদয়ের। মনুষ্য

জীবনের প্রতি, এই সুখ দুঃখের প্রাণোল্লাসময় মানব জন্মের প্রতি পরম সহানুভূতি না থাকিলে, এবং কবি-হৃদয় অকপট ভাবে ব্যক্ত হইতে না পারিলে এই সৌরভ, এই সঙ্গীত উঠিত না। বিশ্বজগৎ জীবনানন্দে পরিপূর্ণ; জীবনের এই ভূত রঙ্গভূমে উপনীত হইয়া মানবাত্মা শিশুভাবেই ক্রীড়া করিতেছে। ব্যাধেই হউক কিংবা ব্রাহ্মণেই হউক, জীবজগতের অধ্যাত্ম-লোকবাসী এই শিশু মূর্ত্তির সহিত সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত কবিত্ব শক্তির জন্ম হয় না। চিন্তা করুন, বঙ্গসাহিত্যের সেই অর্দ্ধজাগরণের উষাযুগে, এই মুকুন্দরাম বাঙ্গালার পল্লীপথে আনন্দোন্মিষ্ঠনেত্রে চারিদিক পরিদর্শন করিয়া, আচণ্ডাল মনুষ্যহৃদয়ের সঙ্গে নিজের হৃদয়কে সহানুভাবক করিয়া চলিয়াছেন; চারিদিক অন্যকে দেখাইয়া চলিবার শক্তিও তাঁহার জন্মিয়াছে। ভাষার বস্তুব্যঞ্জনাশক্তি—পরিস্ফোটনী শক্তি, কবিত্বের আদিম এবং প্রধান লক্ষণ; এই কবির হৃদয়ে তাহারই অকপট প্রকাশ দেখিতেছি!

দীনহীন ব্যাধের জীর্ণকুটীরে মোহিনী ঐশ্বর্য্যসৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে ভগবতীর আবির্ভাব-চিত্র এবং ফুল্লরার চরিত্র—বঙ্গসাহিত্যে এখনও অতুলনীয়। এই অদ্ভুত কল্পনা-রসানন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে কাহার? কবির নেত্রে এই ঘটনা কিসে এত অপরূপ প্রগল্‌ভতা ও মহিমা লাভ করিতে পারিয়াছে? এই প্রগল্‌ভতাও স্বয়ং কবিহৃদয়ের নহে কি? দারিদ্র্য পূর্ণ পর্ণ কুটীরবাসী গ্রাম্যকবি হৃদ্‌পদ্ম-বিলাসিনী মহাশক্তির অধিষ্ঠানে প্রগল্‌ভ এবং বিশ্ববিস্মৃত হইতে না পারিলে এই অপূর্ব্বতা সম্ভব হইত না। কবির নিসর্গ-সহানুভূতিও অসাধারণ; আর একটী দৃশ্য দেখুন—বিরহিনী খুল্লনার চিত্র—

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন।
কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কানন
কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ।

হতভাগিনী যুবতী আবার এই নির্জ্জীব অশোক এবং কিংশুক পুষ্পকে কেন আলিঙ্গন করিতেছে! এই কোমল উজ্জ্বল অথচ, রক্তরাগ-ভাস্বর পুষ্প পদার্থের বিষয়ে বিরহিণীর এই সৌহার্দ্দভাব কেন? বিরহিণীর এই মতিরতি এবং কবিহৃদয়ের এই গহন মর্ম্মগতি কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? মনুষ্যের দুঃখের মধ্যে বিশেষতঃ প্রেমের বিরহ-দুঃখের মধ্যেই একটা অতর্কিত আনন্দ আছে কি?

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি জীবনে অনেক দুঃখদৈন্য ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি হইবে? তিনি যে স্বকীয় তত্ত্বের নিগূঢ়তম আনন্দ-মন্দিরে অবস্থিত থাকিয়া নিজের জীবনের, অধিকন্তু জগতের সকল সুখদুঃখ দৃশ্যের দর্শকমাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। নিজের উপরন্তু জীবরঙ্গভূমির সুখ দুঃখকে ভিতর হইতে আনন্দসহকারে—*ন্যূনাধিক নির্লিপ্তভাবে*—তামাসার ভাবে দেখিতে না জানিলে কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে কবি হইতে পারেন না। (সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের নামও আনন্দ। কবির হৃদয় মধ্যে সাংসারিক সুখ দুঃখ আনন্দ মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে না পারিলে সাহিত্য জন্মলাভ করিত না। কবিত্বের প্রধান উপাদান জীবনপথে আনন্দসিদ্ধি। এই গ্রাম্য কবি জীবনের পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন।)

বঙ্গসাহিত্য কি ভাবে জাগিয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কবি কঙ্কণ সম্পর্কে এইমাত্র বলিয়া বিরত হইব। সাহিত্য-শক্তির প্রধান উপাদান কবির আনন্দসিদ্ধি এবং সত্যোদৃষ্টি বা সহানুভূতি; সর্ব্বোপরি, হৃদয়ভাবের নামরূপ-প্রদায়িনী সৃষ্টিশক্তি। প্রাচীন বঙ্গের ক্ষেত্রে দুই একস্থলে ভারতচন্দ্র ব্যতীত, সকলদিকে কবিকঙ্কণের সমজাতীয় বা সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিশ্বনাথ বা লোচনদাস

হয়ত আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতায় ইঁহাকে স্থল বিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন; কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস সমুন্নত আর্য্য আদর্শের সহানুভূতি ক্ষেত্রেও ইঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন, স্বীকার করিব। কিন্তু মানব জীবনের—প্রকৃত বাঙ্গালী জীবনের মধ্যক্ষেত্রে 'আসর গাড়িয়া' সাধারণের মধ্য হইতেই অসাধারণতার ভাব উজ্জ্বলিত করিয়া, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণের সুদৃঢ় ভিত্তি পত্তন করিতে কবিকঙ্কণের এই ভাষা, এই হৃদয়গতি, এই দৃষ্টি এবং সৃষ্টিশক্তি পরম মহার্ঘ বিবেচিত হইবে।

নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র।

শীতলা, মনসা. সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বহু পরিমাণে সংস্কৃত সম্পর্কহীন ও বঙ্গদেশের নিজস্ব, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই সমস্ত ভাবমূর্ত্তি এবং কাব্যাদর্শ বঙ্গীয় সাধারণের জাগরণ ও জয় ঘোষণা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কালী বা দুর্গা বিষয়ে স্বতন্ত্র সাহিত্যও সংস্কৃত প্রভাবে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কালী দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন দ্বৈতবাদী ঋষির 'প্রকৃতি পুরুষের' একতমা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন দেশজ বা দ্রাবিড়ভাব-সামঞ্জস্যে আর্য্য পৌরাণিকগণ জগদ্ব্যাপার মধ্যে কালী ও দুর্গা মূর্ত্তির দর্শন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতির ছায়ায় বহু বাঙ্গালী কবি কালী ও দুর্গাবিষয়ক 'মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী) মধুসূদন কবীন্দ্র (১৭শ) রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্রই (১৮শ) শ্রেষ্ঠ। রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সুমার্জ্জিত শব্দমন্ত্র এবং ছন্দোবন্দের ঐশ্বর্য্যে বঙ্গীয় কবি সমাজে চিরকালের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এই কালেও তাঁহার কাব্য পাঠক ও রসানুভাবক ব্যক্তির অভাব নাই। প্রাচীন বঙ্গের রাজসভায় উপস্থিত হইতে, বঙ্গসরস্বতীকে আপন ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া যতদূর সালঙ্কার,

সংযত, সংবৃত ও সংস্কৃত হওয়া সম্ভব ছিল, এই কবির গ্রন্থে তাহারই পরিচয় পাই। ভারতচন্দ্রের বাক্য-কৌশল অসাধারণ, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

এই সকল ব্যতিরিক্ত, মাতৃভাবুক ও মাতৃ পূজক বাঙ্গালীর হৃদয়ে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক শক্তি-দেবতা পূজালাভ করিয়াছেন। ষষ্ঠী গৃহস্থ রমণীর সন্তানরক্ষিণী দেবতা; লক্ষ্মী ধনধান্যের দেবতা; সরস্বতী বাক্‌দেবতা। শতাধিক কবি ইঁহাদের স্তুতি পূজা করিয়াছেন; কিন্তু এই সমস্ত পন্থায় বাঙ্গালী কবির শক্তি যেন বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, উল্লেখযোগ্য সাহিত্য বস্তুরূপে প্রকটিত হয় নাই।

পৌরাণিক ঋষি হৃদয়পদ্মাসনে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীর, বাণীর, এবং সর্ব্ব সমন্বয়ী মহাশক্তির যে কমনীয় অতুলনীয় মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কবিহৃদয় চিরকাল তাহাদের চরণে ভক্তি প্রীতিমমতায় নত হইয়া আসিতেছে। বৈদিক দেবদেবীগণের মধ্যে যেমন উষা কবিহৃদয়ের চিরানন্দভাগিনী, পৌরাণিক দেবদেবীগণের মধ্যে তেমন এই শ্রীঃ, সরস্বতী ও চণ্ডী। এই তিনটীই ক্রমে পৌরাণিক-দৃষ্ট 'কার্য্যব্রহ্মের'—বিষ্ণু ব্রহ্মা মহেশ্বরের শক্তি। এই ক্ষেত্রে ভাবতত্ত্বের প্রকট নিরূপণে ও নির্ব্বর্ণনে (idealization, symbolization) পৌরাণিক ঋষি-কবির হৃদয় অপরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এই লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রাচীন বঙ্গকবির হৃদয়ে অনুরূপ পূজা লাভ করিতে পারেন নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রী ও বাণীর ভক্ত হইতে হইলে হৃদয়ে জীবনে যে পরিমাণ নিষ্কাম মাহাত্ম্য ও ভাবতন্ময়তা সিদ্ধি করিতে হয়, উহা তৎকালের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ছায়ায় অসম্ভব ছিল, বলিতে হইবে।

যা'হোক, এই শক্তিভাবের ছায়ায়—কালী ও দুর্গাভক্তির পন্থায় এক অপূর্ব্বরসাল সঙ্গীত কবিতার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গের গীতি

কবিতাক্ষেত্রে, মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস ক্ষেত্রে, রাম প্রসাদ সেনের ও দাশরথি রায় প্রভৃতির সঙ্গীত পরম বিশিষ্ট-তত্ত্বরসে উজ্জ্বল। রামপ্রসাদকে কেবল প্রভৃতির মধ্যে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। রামপ্রসাদ বঙ্গদেশীয় শাক্তহৃদয়ের, সমগ্র বাঙ্গালী মাতৃপূজকের অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস। তাঁহার সঙ্গীত হয়ত আধুনিক সাহিত্যাদর্শকে সর্ব্বদিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; কিন্তু যাঁহারা হৃদয় লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, পৃথিবীর সাহিত্যেও বুঝি এইরূপ নির্ম্মল মাতৃভাবমুগ্ধ স্বভাব শিশু আর দ্বিতীয়টী জন্মগ্রহণ করে নাই। রামপ্রসাদের আন্তরিকতাও অসাধারণ। অভিনিবেশ করিলেই বুঝিবেন, এই লোকটী কেবল সাধারণভাবের, প্রচলিত সাহিত্যাধিকারের কবি নহেন; তাঁহার কথার মধ্যে সাধারণ সাহিত্য-রসের বহিঃক্ষেত্রীয় এমন একটা কিছু আছে, কেবল বাক্যশক্তি যাহাকে আয়ত্ত করিতে বা সঙ্কেত করিতেও পারে না।

গায়ক কবি রাম-প্রসাদ।

বঙ্গসাহিত্যে শাক্তপ্রভাবের পর প্রধানতঃ বৈষ্ণব প্রভাবই চিন্তনীয়। আমরা জানি, বেদের সহস্র-শীর্ষা বিরাট, বা উপনিষদ বেদান্তের কার্য্যব্রহ্মই পুরাণাদিতে বিষ্ণুনামে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণ ব্রহ্মকে প্রেমপবিত্রতাময়, কল্যাণ-করুণাময় জানিয়া, ধ্যানসম্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাহ্যপূজার আশ্রয় লইয়াছেন; অবতার-বাদ বা নরনারায়ণ-বাদও অবলম্বন করিয়াছেন; শাক্তের সকামপূজা বা শৈবের বৈরাগ্য-সন্ন্যাস পরিহার পূর্ব্বক, ভগবানের বিষয়ে পরম প্রীতিরসে এক-নিষ্ঠ উপাসনা-প্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন। বিষ্ণূপাসনা প্রচার প্রচলনের আবশ্যক করে নাই; প্রথম হইতেই, বিশেষতঃ রামানুজ প্রভৃতির কার্য্যফলে, সমগ্র হিন্দুসমাজ বিষ্ণুপূজা অপরিহার্য্য বলিয়া মানিয়া

বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব প্রভাব।

লইয়াছে। বাঙ্গালী নিজের হৃদয়তন্ত্রতার গতিকেই, সংস্কৃত কিংবা আর্য্য-প্রভাব হইতে নিজকে ন্যূনাধিক স্বাধীন করিয়া, বঙ্গদেশে এক স্বতন্ত্র ভাব-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে ; মানুষের মধ্যেই দেবত্বের উদ্দেশ এবং উপলব্ধি করিয়া উহাকে পরম ভক্তিভরে পূজা করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্ববিস্মারক রসানন্দে পরিচালিত হইয়া বৈষ্ণবগণ শান্তদাস্যসখ্য-বাৎসল্য ও মধুরভাবে, ভগবানকে আপনার প্রিয়তম-নিকটতম করিয়া উপাসনা করিয়াছেন। উপাস্যের আদর্শসংসর্গে বৈষ্ণব উপাসকের প্রকৃতি যেরূপ সরল, কোমল, মধুর ও উজ্জ্বল হয়, জগতের অন্য কোন উপাসনা প্রণালীতে তাহার তুলনা নাই। কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই যে বৈষ্ণবের এই কোমলতা তাহাও নহে। বৈষ্ণব বিশ্বজগতের সম্পর্কেও এই কোমলতার *ও মধুরতার সাধনা করেন।* {*শৈবধর্ম্ম দার্শনিকের, শাক্তধর্ম্ম বীর ও* কর্ম্মীর, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষভাবে কবির। কবিত্বের প্রধান কারণ বুদ্ধির দ্রুতি ও প্রকাশ শক্তি, হৃদয়ের সলীলগতি ও নমনীয়তা ; শ্রেষ্ঠ শিল্পীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, মহামতি রাস্কিন যাহাকে infinite tenderness বলিয়াছেন ; জুবেয়ার যাহাকে delicacy, ও সেক্ষপীয়র যাহাকে fine frenzy বলিয়াছেন।} *অন্তস্তত্ত্বে বৈষ্ণবী প্রথার এই মধুর সরলতা,* ও সর্ব্ব-সত্যগ্রাহী এবং রসভাবগ্রাহী কোমলকঠোর নমনীয়তা, এই উজ্জ্বলতা এবং গম্ভীরতা সিদ্ধি না করিয়া কেহই কবিত্ব লাভ করিতে পারেন না। প্রাচীন আলঙ্কারিকের মতে, কবিবাক্যের তথা কবি-হৃদয়ের এই গুণসমবায়ের নাম দ্রুতি, দীপ্তি ও প্রসাদ। সুতরাং কবিহৃদয় মানব আত্মার জ্ঞানকর্ম্মভাবের সমঞ্জসিত প্রকাশরূপে পরম মহার্ঘ ও গরিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সকল কবিই অধ্যাত্মতঃ বৈষ্ণব। এই দেশে যেমন নিরাকার উপাসক ভানুসিংহকে, তেমন শৈবদীক্ষা-প্রাপ্ত নবীনচন্দ্রকেও আপন তত্ত্ব-প্রেরণায় বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব হইতে হইয়াছিল।

বৈষ্ণবী প্রথা যে কবির পক্ষে অপরিহার্য্য, এই দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকারতঃ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব; প্রত্যেক বাঙ্গালীকে—সাধকমাত্রকেই অন্তঃকরণে এই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের সামঞ্জস্য সিদ্ধি করিতে হয়। এইরূপ সামঞ্জস্যই তাহার চক্ষে মনুষ্যত্বের আদর্শ। জাতির মধ্যে এই ত্রিসাধকের অভ্যুদয় সমধিক বা যথেষ্ট না হইলে, কোন জাতিই জগতে মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। বাঙ্গালী তাহা যে পরিমাণে পারে নাই, সেই পরিমাণেই নীচে পড়িয়া আছে।

বাঙ্গালীর জাতীয়তার—উহার জন সাধারণের প্রথম জাগরণের যুগে, এই ত্রিপন্থা তাহার নেত্রপথে প্রমূর্ত্ত হইয়াছিল, আমরা দেখিতেছি।

বাঙ্গালীর জাতীয়তায় বৈষ্ণব পন্থা।

বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীজাতির সেই প্রাথমিক হৃদয়স্পন্দন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আমরা শৈব ও শাক্ত ভাবের সাহিত্য দেখিয়া আসিয়াছি, এখন বৈষ্ণব সাহিত্য চিন্তা করিব। এই বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রাচীন বঙ্গের অমুল্য-সম্পত্তি; পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ পথে গিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতেছি।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাগবতাদিতে বৈষ্ণবপন্থা পরিস্ফুট হইয়াছিল; বাঙ্গালী সেই পন্থায় চলিয়া তাহার নিজের ভাবে নিজের ভাষায়, পরমরসাল কাব্যকথার ও গীতিসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্যের রাধা এবং কৃষ্ণ ও বাঙ্গালীর নিজস্ব। প্রাচীন আর্য্যদার্শনিকের পুরুষ ও প্রকৃতি মানবতত্ত্বের চিরকালের পুরুষ ও স্ত্রী, এই বৈষ্ণব সাহিত্যে পরস্পর মধুররসে—রাসরসে বিহার করিয়াছে। উভয়ের পূর্ব্বরাগ মিলনবিরহ মান অভিসার, রাসলীলা ও সম্ভোগ বৈষ্ণব-কবি অতুলনীয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন। (সুতরাং এই কবিতা মনুষ্যহৃদয়ের চিরকালের কবিতা। এই ক্ষেত্রে ধর্ম্মও কবিতা, কবি ও ভক্ত পরস্পরের তত্ত্বে

ওতপ্রোত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরূপ রসানন্দে বিলসিত হইয়াছে। আদর্শের ভাবে এই বৈষ্ণবগণ প্রত্যেকেই রাধা; বিশেষতঃ তাঁহারা পূজা প্রচার প্রভৃতি লৌকিক বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াই গান করিয়াছেন; সুতরাং এই সঙ্গীতে ধর্ম্মশাস্ত্র বা নীতি নির্দ্দেশের লক্ষণ মুখ্য হইতে পারে নাই; এবং উহা সাহিত্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গীতি কবিতার মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম নীতিধর্ম্ম-শাস্ত্রের কবল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মল সাহিত্য লোকে উপনীত হইতে পারিয়াছিল; বৈষ্ণব পদাবলী তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী প্রেমতত্ত্বের, প্রিয়তম তত্ত্বের উপনিষদ গাহিয়াছিল; তাহার হৃদয়মধ্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া বঙ্গ-ভাষার ভিতরদিয়া অনাবিলভাবে এই উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির বৈষ্ণব-সঙ্গীত ও রামপ্রসাদ প্রভৃতির শাক্ত-সঙ্গীত ইহার প্রমাণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বৈষ্ণবসঙ্গীতের আদি কবি—বলিতে গেলে তাঁহারাই বঙ্গভাষার আদি কবি এবং প্রেমতত্ত্বের আদিম ও প্রধান কবি। বাঙ্গালীহৃদয় মধুরভাবের যত রকম উচ্ছ্বাস গ্রহণ করিতে ও বহন করিতে পারে, সংসার এবং সমাজ বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা *উহাই উপলব্ধি পূর্ব্বক প্রকাশ* করিয়া গিয়াছেন; হৃদয়ের প্রত্যক্ষ-রক্ত *সম্পর্কে* তপ্ত দীপ্ত মধুর এবং সর্ব্বদিকে অতুলনীয় এই প্রকাশ! বিগত পঞ্চ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত কাব্যকারগণ ইঁহাদের পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন ও ইঁহাদের কথা লইয়াই 'নাড়াচাড়া' করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কালধর্ম্মে আমাদের মধ্যে কেবল বাক্যের এবং ছন্দের বৈচিত্র এবং তাত্ত্বিকতা ফুটিয়া উঠিতেছে, বরং অতিরিক্ত হইতেছে বই নহে। সরলতা কিংবা আন্তরিকতার বিষয়ে, স্বাধীনতা কিংবা উচ্ছ্বাসের বিষয়ে

বঙ্গে গীতি-কবিতা।

আমরা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। ইহার কারণ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই প্রকৃত কবি; প্রকৃত কবিকে তাঁহার স্বকীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেহ অতিক্রম করা সহজ নহে। কাব্যের রীতি, গতি বা স্ফোটমূর্ত্তি বিষয়েই কবিতে কবিতে প্রধান এবং চিরকালীয় পার্থক্য। গীতি কবিতা অনেক অংশে নামরূপ-হীন; অথচ সাহিত্য-শিল্পের প্রধান লক্ষণ নামরূপ। সুতরাং নামরূপ-হীন বলিয়া গীতিকবিতা অনেক সময় অল্পেই সাহিত্যসংজ্ঞার বহির্ভূত হইয়া পড়ে—উহা সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ। তথাপি গীতি কবিতার যাহা প্রাণ, তাহা গৌণমুখ্য ভাবে সাহিত্য মাত্রেরই প্রাণ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতি কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অতুল।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মধ্যে পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যাত্মা প্রথম এবং অনাবিল জাগ্রতভাব লাভ করিয়াছিল। উভয়ের

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

কাব্য যাহা আমরা পাইয়াছি, জীবনীকিম্বদন্তী যাহা পাইয়াছি, তাহা চিন্তা করুন—কত বড় সরলমধুর উজ্জ্বল এবং স্বাধীন প্রকৃতি এই চণ্ডীদাস! হৃদয়ে ও জীবনে প্রকৃত কবি! বঙ্গসমাজের সেই যুগে, ব্রাহ্মণ্যের অধিকন্তু জন্মজাতিগত প্রাধান্যের যুগে, মানবাত্মা তীব্র উচ্চ উচ্ছ্বাসিত ঋজুকণ্ঠে আপনার মাহাত্ম্য ও বিশ্বমানবের একত্ব ঘোষণা করিয়াছে! প্রেমকে পরমার্থ হইতে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া—কথায় কর্ম্মে জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছে! প্রেমিকের পাদচারণ ক্ষেত্রকে, আপনার ও প্রিয়তমার সমাধিশ্মশানকে বিশ্ববৈষ্ণবের চিরকালের ভক্তি-পবিত্র হৃদয়তীর্থ রূপে রাখিয়া গিয়াছে! এই কবি, এই কাব্য এবং জীবনের সমক্ষে কি আমাদের বর্ত্তমান কালের বোধবুদ্ধি, ভাক্তভাব ও কষ্ট কল্পনা পূর্ণচন্দ্রোদয়ে খদ্যোতিকার ন্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না! যে জাতির হৃদয় এইরূপে আত্মপ্রচার করিয়াছে, তাহার সাহিত্য গঠিত না হইয়া পারে না। তারপর

বিদ্যাপতি! কত আনন্দময়, সুখী, সরল এবং ঐশ্বর্য্যময় এই বিদ্যাপতি! তাঁহার প্রাণের কি অপূর্ব্ববেদনা ললিতমুখর বাক্যচ্ছন্দে, ঝঙ্কারে, ঝনৎকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! ইঁহাদের অব্যবহিত পরে বাঙ্গালায় যে মহা-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব আত্মার শরীরী মূর্ত্তি, এই উভয় কবিহৃদয়ের সংযুক্ত মহাত্ম সংস্করণমাত্র—ইঁহাদের পদাবলীই তাঁহার প্রধান সাধনোপায় ছিল; তিনি এই উভয় কবির ভাবসাধর্ম্মে নিজের জীবনের বিকাশসাধন করিয়া, তাহাকে বিশ্বপূজ্যরূপে দেদীপ্যমান করিয়া, বাঙ্গালীর সমক্ষে ধরিয়াছেন। আগে আলোকদর্শী, আলোকস্বপ্নী কবি; পরে দার্শনিক, ভক্ত, ধর্ম্ম প্রচারক! জগদ্‌ব্যাপার মধ্যে কবি ও ধর্ম্ম প্রচারকের বা সাধকের কার্য্যকে পৃথক করিয়া—পরখ করিয়া দেখিতে হইলে ইহাই পরম্পরা-সূত্র। সকল ধর্ম্মে কবিগণের আত্মাই ভাবসত্যের আদিদ্রষ্টা ও সাধক; কবির আত্মাই মনুষ্যত্ব সাধনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মূর্ত্তি অবলম্বনে অবতীর্ণ হইয়া মানব সমাজকে বাস্তবিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছেন। বঙ্গদেশে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী—বৈষ্ণবী মাধুর পদ্ধতির ইসায়া ও ইজিকিয়েল, এই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি! আশ্চর্য্যের কথা এই, যেমন যীশু অবতারের পূর্ব্বেই হীব্রু ঋষিগণ আপন হৃদয়ে তাহার পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়াছিলেন, তেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পূর্ব্বেই যেন তাঁহার রসমধুর গৌরমূর্ত্তি ভাবোন্মত্ত চণ্ডীদাসের মনোনেত্রে প্রাক্‌ভাসিত হইয়াছিল।

বঙ্গে শ্রীচৈতন্য।

এই চৈতন্য বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইলেন—দেশের বৈষ্ণবগণ যেন দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালী জাতির সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাস, তাহার সমাজকে তাহার ধর্ম্মকে পরিপ্লাবিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে যেন বিশ্বপতির সিংহাসন পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-

চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই দেশের মানুষগুলি আপনাদের মধ্যে এই একটী মানুষ পাইয়া কতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে পরম প্রেমময়ের, অনন্তের শরীরীমূর্ত্তি ধরিয়া সরল স্থির বিশ্বাসে, উন্মত্ত ভাবে স্তুতি নতি আরতি আলিঙ্গন বন্দন করিয়া, আস্ফালন করিয়াছিল। একসঙ্গে একই ভাবে কত শত শত কবি হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছিল। উহার নাম জাগরণ নহে ত আর কি বলিব? কতবড় বিনয়ী মধুর সরল, অমৃতাত্মা এই সব কবি—যাহারা আত্মভোলা প্রীতিভক্তির উচ্ছ্বাসে বলিতে পারিয়াছিল—

'চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি!'

এমন বিশ্বপরিপ্লাবী আনন্দপ্রবাহের লক্ষ্যস্বরূপ সেই প্রেমসাগর চৈতন্যই বা কেমন ছিলেন? যাঁহার পদস্পর্শে এই বঙ্গদেশ নিজকে পবিত্র মনে করিয়াছে—বাঙ্গালী যাঁহাকে সগৌরবে ঋষিভারতের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের সমান আসনে স্থাপন করিয়াছে, *সেই বাঙ্গালীই বা কেমন ছিলেন? এই উচ্ছ্বাসের নিকট আমাদের এই আধুনিকতার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জীবন ভিত্তিহীন ভাক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের কবিতা বর্ষাকালের গঙ্গা প্রবাহ সমক্ষে সহরের সযত্নগুপ্ত পয়োনালার কাপট্য কুলুকুলুর ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে!* দোষে গুণে এই বৈষ্ণব কবিতা ও চরিত কাব্য বাঙ্গালীর নিজস্ব। উহা তাহার জাতীয় হৃদয়ের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিতেছে; ভবিষ্যৎ পন্থা এবং উহার সঙ্কট সমস্যাও সূচিত করিতেছে!

শত শত কবি এই রাধাকৃষ্ণ লীলা ও চৈতন্য চরিত্র বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস প্রবৃত্তি বশে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ করাও একরূপ দুঃসাধ্য। এই সমস্ত কাব্য বেদবেদাঙ্গ পুরাণাদির ন্যায়, রামায়ণ

বৈষ্ণব প্রভাব।

মহাভারতাদির ন্যায় জ্ঞানবৈরাগ্য বা দেবার্চ্চনা ভাবক নহে—আর্য্যবীর্য্য গাম্ভীর্য্যের উদ্দীপকও নহে। উহাদের 'গোঁড়ামী' ও অন্য জাতীয়। উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাণ বাঙ্গালী জাতির হৃদয় মধ্যে নিহিত। বৈষ্ণবের নিকট বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম, মুরারী গুপ্ত কিম্বা গোবিন্দ দাস, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কিংবা ব্যাস বাল্মীকি হইতে কম পূজাপাত্র নহেন। ইঁহাদের গ্রন্থ ও বেদ পুরাণাদির ন্যায় মাহাত্ম্য পূজা লাভ করিয়াছে; অনেকস্থলে উহাদের স্থানই অধিকার করিয়াছে।

আমরা এই মাত্র বলিয়া বৈষ্ণব কবিতা রাখিয়া যাইব। আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালীর—প্রকৃত বঙ্গসাহিত্যের জাগরণ হইয়াছিল এই বৈষ্ণব কবিতায়; তাহার সাহিত্য-কর্ত্তা বিরাট সহস্রশীর্ষা পুরুষ জাগিয়াছিলেন এই বৈষ্ণবী তন্ত্রীর প্রভাতী গানে। এই জাতিভেদ-নিপীড়িত—প্রাচীনাদশ-নিগৃহীত মনুষ্যভূমে সর্ব্বপ্রথম যেই ব্রাহ্মণ উন্নতশির আকাশে তুলিয়া, যেন পদাঘাতে বঙ্গদেশ কম্পিত করিয়া উদার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ", দেশের ধূল্যবলুণ্ঠিত জনহৃদয় তাহাতেই কাঁপিয়া, জাগিয়া এবং অনুপ্রাণিত হইয়া হৃদয়গতির শত পন্থায় ছুটিয়া, বঙ্গীয় মনুষ্যত্বকে—বঙ্গ সাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়া 'খাড়া' করিয়া তুলিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত আমরা কেবল বঙ্গভূমি-প্ররূঢ় সাহিত্য মহীরূহকেই চিন্তা করিয়া আসিয়াছি। এই সাহিত্যের শিকড়মূল দেশের গভীর হৃদয়তলে নিখাত; উহা হইতেই সে মুখ্যভাবে রস সঞ্চয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কোন বৃক্ষের ধারণ, পোষণ বা বর্দ্ধন বিষয়ে কেবল দেশরসই পর্য্যাপ্ত নহে; বীজের প্রাণশক্তি, জাগরণ বা অঙ্কুরপ্ররোহ মাত্রও বৃক্ষ-

সাহিত্যের বিশ্বমুখ আদর্শ।

ত্বের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাহার পক্ষে ঊর্দ্ধাকাশের আলোক, ও বিশ্ব বহির্জগতের বর্ষাতপবায়ুও অপরিহার্য্য। এই বৃক্ষকে স্বয়ং আলোকপ্রয়াসে ঊর্দ্ধশির হইয়া আকাশে উত্তমাঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; তাহাকে স্বাতন্ত্র্যের রক্ষা এবং পোষণকল্পে জীবধাত্রীর গভীর গভীরতলে মূল শিকড় নিহিত, নিমজ্জিত করিতে হইবে; তাহার মূলকাণ্ড শাখা প্রশাখা ফুল-পল্লব ফল, সকলকেই পরম স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সর্ব্বোদ্দিষ্ট হইয়া, চঞ্চলতার মধ্যে স্থির সন্নিবিষ্ট হইয়া, সমস্ত শব্দাড়ম্বরের মধ্যে নিঃশব্দতা, কাঠিন্যের মধ্যে নমনীয়তা ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে একোদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইবে; ঊষাসন্ধ্যা দিনরাত্রি পক্ষমাস অয়ন বর্ষসংক্রমণের মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার আদান প্রদানে আঘাত প্রতিঘাতে তাহাকে স্থির থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতে হইবে; তাহার অন্তস্তত্ত্বে আকাশের গভীরতা ও নিস্তব্ধতা, তাহার শিরা কৈশিকী-সমূহে ও হৃদয়ের প্রবাহে মহা সমুদ্রের কলকল্লোল এবং স্পন্দন, তাহার অন্তঃসারে শৈলসমুচ্চয়ের কঠিন বাস্তবিকতা ও ঋজুতা, তাহার ফুলের মধ্যে দূর দূরান্তলীন নক্ষত্র-তারকার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সাম্যকান্তি, তাহার পল্লব-পত্রের মর্ম্মরে বিশ্ব জগৎ-ব্যাপারের ভ্রমরগীতি ও তাহার ফলের মধ্যে রসালতা এবং চিরন্তন সত্যশিব সৌন্দর্য্যের বীজ সিদ্ধি করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহা একটা সুদূর এবং অস্পষ্টবিজ্ঞাত আদর্শমাত্র; জগতের সকল সাহিত্যই ন্যূনাধিক অসীমকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতেছে; এই আদর্শের নামরূপ কি, তাহা নিশ্চয়নির্ব্বন্ধে জানিতে পারিলে জগতের সাহিত্যগতি স্থগিত হইয়া যাইত। এই অপ্রাপ্তি বা অভাবই অধ্যাত্মতঃ জগদ্‌গতির হেতু। এমনও দেখা যায় যে, সাহিত্যবিশেষ, ভাষা বিশেষ আপনার আদর্শের বহুশীর্ষতাকে লাভ করিতে পারে নাই; অন্তদিকে, কেবল নিজের শক্তির সীমাকেই পাইয়াছে। সেই স্থলে সাহিত্য নির্জীব হইয়া যায়, ভাষাও ক্রমে মৃতভাষায় পরিণত হয়। এইরূপে অনেক

বিশিষ্ট ভাষা-সাহিত্যও মৃত হইয়া পড়িয়াছে; অনেক দিকে অনুপম শক্তি প্রদর্শন করিয়াও এইরূপে, জগৎগতির সহিত নিজের সুর মিলাইতে না পারিয়া ক্রমে সরলতা, সবলতা, স্বচ্ছন্দতা ও সজীবতা হারাইয়া অতীতের শ্মশানমন্দিরের 'মমী' স্বরূপে পরিণত হইয়াছে; দেশে দেশে নূতনযুগের নূতন ফসলের সার যোগাইতেছে। বঙ্গভাষা যৌবনাবস্থাতেই অগ্রসর; এখনও তাহার স্থবির দশার, স্ফীতোদরতার কিম্বা অন্তিম নিশ্চলতার অনেক বিলম্ব আছে। ইহাও আমরা এই সূত্রে দেখিতে পাইব।

২

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, এতদ্দেশীয় ধর্ম্মের প্রভাবে, বৌদ্ধ শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণবীয় মতিরতির বশ্যতায় কিরূপে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা দেখিলাম। বঙ্গ দেশে তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রই জাতীয় জ্ঞান-ভাব সম্পত্তির প্রধান রক্ষক ও পরিবেষক রূপে মনুষ্য সভ্যতার স্থিতি স্থাপকতা সম্পাদন করিয়া, বর্ত্তমান যুগে অভাবনীয় ভাবে কার্য্যকর হইয়াছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই আবিষ্কার অপেক্ষা বৃহৎ বা মহৎ ঘটনা আর নাই। মুদ্রাযন্ত্র মনুষ্য সমাজে উপস্থিত হইয়া, বিশ্বমনুষ্যের সভ্যতা এবং সাহিত্যকে, তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাসকে সুস্পষ্টরেখায় দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। এই মুদ্রাযন্ত্রের অভাব গতিকেই, গ্রন্থরচনা কিম্বা গ্রন্থের প্রচলন বিষয়ক কালক্রম বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রভাবশালী নহে। সুতরাং আমরা, কোন ইতিবৃত্ত-মূলক কাল-পর্য্যায় অনুসরণ না করিয়া, কেবল এক একটা ভাব-ধারার বিকাশকেই বিচার করিয়া চলিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যে আর্য্য আদর্শের প্রভাব ও রামায়ণ মহাভারত।

বঙ্গদেশের শিরোভাগে বিষ্ণুপদ-চুম্বী হিমগিরি। এই হিমালয় হইতেই পরমপাবনী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রধারা দেশ দেশান্তরের জীবনরসে পরিপুষ্ট হইয়া বিপুল প্রবাহে তাহার মর্ম্মতল প্রমথিত ও প্লাবিত করিয়া বহিতেছে। তাহার দক্ষিণ সান্নিধ্যে বিশ্বধরিত্রীর হৃদয়াধার মহাসমুদ্র। এই সুদূর-নিষন্ন শৈল সমুদ্রের আন্তরিক সম্মিলন জনিত মহতী অন্তর্বাষ্পধারা মন্দাকিনী রূপে তাহার আকাশে এবং বাতাসে প্রবাহিত হইয়া তাহার শীতাতপের প্রকৃতি বা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই ত্রিধারাই বঙ্গদেশীয় নৈসর্গিক প্রকৃতির প্রাণ। বঙ্গের সাহিত্যেও, বিশ্বোন্নত আর্য্য সংস্কৃতের ধবলগিরি নিঃসৃত জ্ঞান কর্ম্মভক্তিধারা, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবভাবে প্রবাহিত, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। বঙ্গদেশের হৃদয়ে এই আর্য্য-হিমগিরির আদর্শ ছায়া উহার দ্বিতীয় সংসর্গ ফলরূপে প্রসারিত হইয়া কোন্‌দিকে কার্য্যকরী হইয়াছে, অতঃপর তাহাই দেখিব। রামায়ণ, মহাভারত প্রাচীন ভারতজাতির হৃদয়ের ইতিহাস। এই দুটি গ্রন্থের প্রতিপত্রে, একটা পরম গরিষ্ঠ জাতির চরিত্রছায়া এবং তাহার ভবজীবনের আশা, আদর্শ ও উদ্যম প্রতিফলিত হইয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, কিম্বা ভীমার্জ্জুন তাহার মানব আদর্শ—তাহার দেবাদর্শ বা পূজার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ ইঁহারাই দেবভাবে, অবতারের ভাবে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবযোনির প্রতি ভীতি পরিক্লিষ্ট পূজা নহে, পরম প্রেম ভক্তি ও সহানুভূতি-জনিত এই পূজা! এই কারণে, গ্রন্থদ্বয় প্রাচীন আর্য্য জাতির অকৃত্রিম সাহিত্য; তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম রসাধার! আর্য্য দ্রাবিড়ের সম্মিলন-জনিতা বঙ্গসরস্বতী তাঁহার শৈশব হইতেই এই মহতী সাহিত্যচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। শতাধিক কবি অনুকরণপথে, ন্যূনাধিক স্বদেশীয় বিশেষত্ব-পথে রামায়ণ এবং মহাভারতকে বঙ্গদেশের নিজস্ব করিতে

চাহিয়াছেন। হিন্দু-রাজত্ব-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান রাজত্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ফটোগ্রাফীর বা অনুবাদ এবং কথকতার ও গ্রাহকতার ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখন রামায়ণ মহাভারতের অপরিহার্য্য স্থান। এমন হিন্দুগৃহ নাই, যেখানে একজনমাত্রও সাক্ষর মনুষ্য আছে, অথচ হস্তলিখিত জীর্ণ পুঁথি অন্ততঃপক্ষে বটতলার রামায়ণ মহাভারত নাই। *এই অনুবাদ এখন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে ঐকান্তিক ও অপরিহার্য্য হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থের স্থান* লাভ করিয়াছে। যদি এমন ঘটে যে, বঙ্গদেশ হইতে আর্য্যভারতের বেদপুরাণ, স্মৃতি সংহিতা কিম্বা দর্শনাদি এককালে বিদূরিত হইয়া যায়, বাঙ্গালী গৃহস্থের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। এই দুটি পুঁথিই বঙ্গদেশে প্রাচীনসঙ্গত হিন্দুজীবনের আদর্শ বজায় রাখিতে এবং তাহার 'আর্য্যত্ব' অপ্রতিহত রাখিতে পারিবে। ফলতঃ, এই সমাজে এখন আমরা জনসাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে আর্য্যদর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি; উপরে উপরে, এই সমাজের শীর্ষে বসিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ শ্রুতিস্মৃতির অনুদেশ বা dictum মাত্র রক্ষা করিতেছেন। এই দুটি গ্রন্থই আমাদের জীবনে সর্ব্বতোভাবে ওতপ্রোত হইয়া সূতিকাগৃহ হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত পথপ্রদর্শন করিয়া চলিতেছে। এই পুঁথি বাঙ্গালীর পক্ষে যুগপৎ কাব্যরসানন্দের ও শাসনশাস্ত্রের একাধার। যে কেহ বাঙ্গালীর সহিত কথা কহিতে বা বঙ্গভাষায় দুই পংক্তি রচনা করিতে চাহিবেন—কবি, লেখক, ভাবুক, দার্শনিক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই দুটি গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থদ্বয় ভারতবর্ষীয় মনুষ্য-হৃদয়ের রসভাবের সমুদ্র; এই জাতির ধর্ম্ম এবং কর্ম্মজীবনের, সত্য-মঙ্গল-সৌন্দর্য্য সাধনার প্রাচীন ও পরম পূজ্য আধার। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ভারতের সকল

জাতিই রামায়ণ মহাভারতের আত্মাকে কোন-না-কোনরূপে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের হিন্দুত্ব ও পরস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ সিদ্ধ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে প্রায় ২২ জন কবি রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসই অগ্রণী। তৎপর, ষোড়শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র ও অদ্ভুতাচার্য্য এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকিররাম ও রঘুনন্দনই উল্লেখযোগ্য।

৩৫ জন বাঙ্গালী কবি মহাভারত গাইয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সঞ্জয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয় পণ্ডিত, ষোড়শ শতাব্দীর কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কাশীরাম দাসই শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন প্রায় ৩০ জন কবি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মালাধর বসুই উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত কবির এইরূপ বৃহৎ-বিপুল কাব্য-চেষ্টার উদ্দেশ্য কি ছিল? সমস্ত বঙ্গসমাজে প্রাচীন আর্য্য আদর্শের ভাবধারা প্রবাহিত করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে মুসলমান রাজার নিরাবিল জনহিতৈষণাও সহানুভাবক হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, দেখিতে পাই। পরমেশ্বর ও তৎপুত্র শ্রীকর নন্দীর মহাভারত, পরাগল খাঁ ও ছুটিখাঁর সাহায্যে চট্টগ্রামে বিরচিত, এবং 'পরাগলী মহাভারত' নামে বিখ্যাত। মুসলমান রাজা অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সাহায্য করেন নাই। দেশে সর্ব্বত্র আর্য্যমনুষ্যত্বের আদর্শ যাহাতে কার্য্যকর হয়, সেই বিনির্ম্মল উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ স্বদেশে (পারস্যে) স্বতন্ত্র উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য কবি ওমারখায়মের নামে বর্ত্তমানের ইয়োরোপেও জয়ধ্বনি পড়িতেছে; তদ্ভিন্ন মুসলমানের সাদী, হাফেজ, ফারদৌশী এবং নেজামীর নামও জগৎপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে মুসলমানের অধিকার ও মুসলমান প্রভাবের ফলে সমুন্নত পারস্য-সাহিত্যের ভাবপ্রবাহও নানামুখে বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান-প্রভাব।

মুসলমান ধর্ম্ম স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মযোগতত্ত্বের সম্মিলনে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে, এই কথা অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে স্বীকার করিতে শুনিয়াছি। অন্যদিকে, মুসলমানের ভক্তি-আদর্শ এবং পরমব্রহ্ম উপাসনা-প্রণালীর সম্বন্ধে আসিয়া ভারতবর্ষও প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের নানক কবীর প্রভৃতির মধ্যে মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট; শ্রীচৈতন্যের মধ্যেও কোরাণের উপাসনা-প্রণালীর নিরাবিল সরলতা, ও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাব এবং অভেদবাদ যে বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবগণ একসময় সকল জাতিকেই, আচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে, আপন বক্ষঃতটে আহ্বান করিয়াছিল এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকেই এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের প্রাণ-স্পন্দনে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালায় অনেক মুসলমান বৈষ্ণব কবির রচনা ও পদাবলী গ্রন্থ মিলিতেছে। বাঙ্গালায় মুসলমান ফকির ও হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে এখনও প্রচ্ছন্ন-ভ্রাতৃভাব রহিয়াছে। মুসলমান-ফকিরের হিন্দু-যোগী গুরু অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্র মিলিবে। সাধনতত্ত্ব বিষয়ে হিন্দুযোগী এবং মুসলমান-ফকির সাধারণ সামাজিক ভেদ-আদর্শের অজ্ঞাতে এক গুপ্তমিলন-প্রথা এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

মুসলমানের আগমন এবং প্রভাবের পর হইতে এখন আর বাঙ্গালী বলিতে কেবল হিন্দুকে বুঝাইতেছে না, মুসলমানকেও বুঝাইতেছে। বঙ্গদেশে মৌলিক মোগল-পাঠানের সংখ্যা পরিমিত; ক্রমে তাঁহাদের পরিচিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমান অধিকাংশই

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নানা কারণে (বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের অনুদারতার পীড়ন-প্রাবল্যে) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বঙ্গদেশ এবং বঙ্গভাষা হিন্দুমুসলমান উভয়ের। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মুসলমানের প্রাণস্পন্দন বিশেষভাবে মুদ্রিত। কাব্য, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সঙ্গীত, ইতিহাস, উপাখ্যান ও পীরপূজা বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুসলমান বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্গভাষা, উহার অভিধান, বাঙ্গালীর ব্যবহার-বিধি, বাঙ্গালার রীতি নীতি ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নানাদিকে মুসলমানের নিকট ঋণী। মুসলমান কবিগণের মধ্যে করিমালি, আলিরাজা এবং দৌলতকাজি, সর্ব্ব শেষে আলাওলের নাম প্রসিদ্ধ। উপাখ্যান কাব্য, পারস্য সাহিত্যেরই সৃষ্টি; এই ক্ষেত্রেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমানের প্রভাবে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল-প্রণীত পদ্মাবতী কাব্য এই জাতীয় কাব্যের পথ-প্রদর্শক; উহার প্রভাবই পরবর্ত্তী রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে, কবি জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ীর হরিলীলা এবং চণ্ডীকাব্যে সুপ্রকট হইয়াছে। সেইদিন পর্য্যন্ত রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতকে এই পারস্য প্রভাবই প্রবল ছিল, দেখিতে পাইতেছি। মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্ম্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য-রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উপাখ্যান বাহ্যতঃ আদিরসাক্রান্ত হইলেও পারস্য সাহিত্যে নেজামী প্রভৃতি কবি উহার মধ্যে গভীর আন্তরিকতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি আলাওলের ৭ খানি কাব্য চট্টগ্রামে রক্ষিত আছে; এই সমস্ত কাব্যে স্থানে স্থানে ভাবভাষা এবং সত্যদৃষ্টির পরম সম্মিলনে যে গভীরতা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আধুনিক কাব্য-রসিকেরও বিস্ময়াবহ হইবে। এই উপাখ্যান-কাব্যের প্রথাই বঙ্গসাহিত্যে, তাহার ধর্ম্মপ্রভাব হইতে

দুর ক্ষেত্রে, এক অভিনব এবং সম্পূর্ণ আধুনিক লক্ষণযুক্ত কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

ইহার পর বঙ্গদেশে ইংরাজের আগমন এবং বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজী ভাষার প্রভাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বাঙ্গালার পলাশীক্ষেত্রে,

বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজের প্রভাব।

একরূপ হেলায়-হেলায় যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার গৌণ মুখ্যফল সমস্ত ভারতবর্ষে, তাহার সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মে এখনও থাকিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব যে বঙ্গদেশে এবং সাহিত্যে সর্ব্বত্র নবজীবনের ও পরম পরিত্রাণের আকারে উপস্থিত হইয়াছে, কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই বিষয়ে নির্ব্বাক নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ হইবে না। কোন আধুনিক আলোচনা এইক্ষেত্রে চরম কথা বলিবার আশা করিতে পারে না সত্য; কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং আত্মচৈতন্যই মনুষ্যের সর্ব্ব উন্নতির নিদান, উহার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য-কল্পেই আমরা প্রয়াসী হইতেছি।

জগতের বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম-সমাজ কিম্বা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে, একটী তত্ত্ব সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। জগৎ কোন মঙ্গলনিয়ন্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই হউক, কিম্বা স্বভাবেই হউক, একটা নীতির আশ্রয়ে সুদূর উদ্দেশ্যে চলিয়াছে; উদ্দেশ্যটী যেন সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্য। এই জগতে কোন ব্যক্তি, কোন জাতি, কোন সমাজ কিম্বা সাহিত্য কেবল নিজকে লইয়া কূপমণ্ডুকবৎ নিশ্চিন্ত কিংবা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। বিশ্বের ব্রহ্ম—তাহার 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' পদার্থ—জগতের প্রত্যেক পদার্থকে আপনার অভিমুখে টানিতেছেন। এই আকর্ষণের গৌণমুখ্য ফলেই জগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন; সংপ্রসারণ এবং সামঞ্জস্যই জগতের মঙ্গল-লক্ষ্য। জগতের সমস্ত আপাতিক

অমঙ্গলাভাষ, মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থজ্ঞান এবং ভ্রান্তি-কল্পিত বলিয়াই ভক্তগণ বিশ্বাস করেন। জগন্ময় আলাকের নির্দ্দয়-নির্ম্মম, সব্যসাচী সেনাপতি বাহির হইয়াছেন, বিশ্বভুবনে ঘুরিতেছেন! তাঁহার একহস্তে অসি, অন্ত হস্তে আপন প্রভুর—নিরঞ্জনের—অনন্তের নাম! অবাধ্যগণের নিস্তার নাই। এই বীরভদ্রের অসিসমক্ষে, জগতে মনুষ্যের সমস্ত দক্ষচাতুর্য্য ও কূট কৌটীল্য খণ্ডবিখণ্ড এবং পণ্ড হইয়া যাইতেছে! জগতে এই হেতু, এক ব্যক্তি অন্ত ব্যক্তির, একজাতি অন্তজাতির জারক মারক বা রসায়ণরূপে পরিণত হইতে এবং কার্য্যকর হইতে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপারে প্রণিধান করিতে পারিলে, পরস্পর-সম্বন্ধের এই তত্ব ন্যূনাধিক সর্ব্বত্রই দর্শন করিতে পারিবেন। ইংরাজের মধ্য দিয়া বিশ্ব-ভগবান্ যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ভেষজ প্রয়োগ করিয়াছেন, সন্দেহ হয় না। যেই রোগ-বশতঃ ভারতজাতি ঐক্যতন্ত্রী হইতে পারে নাই, এখনও পারিতেছে না, সাম্যমৈত্রী-মন্ত্রী মুসলমান-বীর তাহাই ভারতবর্ষকে শিখাইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন—নানাদিক্ হইতে এই দেশে উহা নিষ্ফল হইয়াছে। ইংরাজের প্রভাবই পুনশ্চ নানাদিক্ হইতে জ্ঞাতসারে বা অতর্কিতে ভারতের হিতার্থেই কার্য্য করিতেছে। তাহার ফল এখনো সুস্পষ্ট হইতেছে বলিতে পারি না; তবে জাতীয় ইতিহাসে, বিশেষতঃ এই পরম পুরাতন জীর্ণ জাতির ইতিহাসে 'শতবর্ষও পলকনিমেষ' বই নহে।

আমরা এখন এই দেশের সাহিত্যে বা সারস্বত হৃদয়ে ইংরাজের প্রভাব—বিশ্বভুবনের প্রভাব প্রাপ্ত হইতেছি। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বগ্রাহিণী শক্তিমত্তা, আন্তরিকতা, ঋজুতা ও বিষয়বস্তুনিষ্ঠা বিশ্বসাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই পরম গরীয়সী সরস্বতীর অনুগ্রহে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীহৃদয় কিরূপে এবং কতদূর উপকৃত

বঙ্গসাহিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যাদর্শ।

হইতেছে, তাহার রেখামাত্র অনুসরণ করা ভিন্ন, বর্ত্তমানে আমাদের অন্য সাধ্য নাই। আমরা যাহা সাধন করিতেছি, যাহা লাভ করিতেছি, জাগ্রতভাবে তাহার লাভসিদ্ধি করিতে পারিলেই উহা প্রকৃত প্রাপ্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ইংরাজ জাতির সহিত পরিচয়ে বাঙ্গালী প্রথম প্রথম বিব্রত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে প্রকৃতিস্থ হইতেও বহু সময় লাগিয়াছে। সমাজ সাহিত্য ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অশন বসনে চালচলনে বিপরীত ব্যবহিত, একটী প্রবল জাতির সম্পর্কে আসিলে বিজিত জাতি মাত্রেরই ওইরূপ আত্মবিস্মৃতি হওয়া স্বাভাবিক। বাঙ্গালিকে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেও ৫০ বৎসর লাগিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ইংলণ্ড স্বয়ং ফরাশী বিপ্লবের আন্দোলন বশে ইয়োরোপের নব সাহিত্য প্রথায় উদ্বুদ্ধ হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী এই বিজাতীয় সংসর্গের আঘাতই সামলাইতেছিল। তাহার ও পঞ্চাশ বৎসর পরে, বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষার প্রাচীন *তন্ত্রীয় মাহাত্ম্যে—অষ্টাদশ শতাব্দীর* চরিত্রে মাত্র জাগিতে পারিয়াছে। স্বয়ং ইংরাজী সাহিত্যে তিনটী বৃহৎ ভাবযুগ পরিদৃষ্ট হইবে। প্রথমটী *রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকাল হইতে প্রথম চার্লসের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত, উহার নাম সেক্‌সপীয়র যুগ দিতে পারি।* দ্বিতীয়, ওই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; উহা ইংরেজী সাহিত্যের Augustun age বা ফরাশীর দীক্ষাপ্রাপ্ত ভব্যতার যুগ মাত্র। তৃতীয়টী উনবিংশ শতাব্দী হইতে এখন যাবৎ চলিতেছে—উহাকে ইউরোপীয় নবসাহিত্য প্রথার বা গেঠের যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। ইউরোপে গেঠের সময় হইতে জর্ম্মণীর শিষ্যত্বে যে নব-সাহিত্য-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাই ইংলণ্ডে নানাদিকে ব্লেক, বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী,

কীট্‌স, বায়রণ, স্কট্ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল, ব্রাউনীং, জর্জ এলিয়ট, টেনিসন, সুইনবার্ণ, রাস্কিন, মেরিডিথ, হার্ডী ও মরিস প্রভৃতির মধ্য দিয়া আধুনিক কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য প্রথমতঃ ইংরাজী সাহিত্যের এই ভব্যতা যুগের আদর্শেই জাগিতে পারিয়াছিল; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর হইতেই বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যের, পক্ষান্তরে বিশ্বসাহিত্যের প্রথায় ন্যূনাধিক জাগ্রতভাবে সচল হইতে পারিতেছে। এসিয়াবাসী বঙ্গসাহিত্য নানা বিষয়ে, বিধর্ম্মী ইংলণ্ড উপরন্তু ইউরোপ হইতে এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহার বুদ্ধিনাড়ীর গ্রাহিকা-শক্তি প্রথম আঘাতটিকে সামলাইয়া উঠিতে, তাহার পক্ষে প্রকৃতিস্থ হইতে বা বিশ্বসাহিত্য আদর্শের সহানুভাবক হইতে যে ১২০ বৎসর লাগিয়াছে, উহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

ইংরাজ আবির্ভাবের সময়ে বঙ্গসাহিত্য স্বয়ং সেক্‌সপীয়র যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজী সাহিত্য হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না; বরঞ্চ শাক্ত ও বৈষ্ণব কবিগণের উপার্জ্জন ফলে, বিশেষতঃ সংস্কৃতের অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাবে নানাবিষয়ে উন্নত ছিল। এলিজাবেথ যুগের ইংলণ্ড, অতুলনীয় জাতীয় সৌভাগ্যের, এবং অপরূপ দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সমূহের সঙ্গম-গতিকেই যুগপদ্ বিশ্বধরিত্রীর বিষয়-রস অধিকার করিতে ও স্বকীয় সাহিত্যের মর্ম্ম মধ্যে জাতীয় হৃদয়-সমুদ্রের ধ্বনিগীতি চিরতরে ধারণ করিতে পারিয়াছিল; পরম সৌভাগ্য এবং পুরষকার, উভয়ই অতুলিত ভাবে সঙ্গত হইয়া ইংরাজ জাতিকে ও তাহার সাহিত্যকে বিশ্বের গৌরব-শীর্ষে স্থাপন করিয়াছিল।

ইংরাজের সংসর্গ লাভ করিয়াও বাঙ্গালী বহুকাল কেবল তাহার দোকান পাট, খাতা পত্র, বাটখাড়া, এবং বন্দুক সঙ্গীনের সম্পর্কেই জাগ্রত থাকিয়া চলিতেছিল; ইংরাজী ভাষার ফার্ষ্টবুক, সেকেণ্ডবুক, ও

জীবজন্তুবিষয়ক প্রস্তাব পাঠেই চরিতার্থ হইতেছিল। এখনও, এইদেশে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের এত উন্নতি সত্ত্বেও, আমরা অনেকে তদপেক্ষা অধিক লাভ করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইংরাজের বিজাতীয় প্রকৃতি ও পরিচ্ছদের ভিতর যে একটা পরম উন্নত সাহিত্য-হৃদয় রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমে সন্দেহও করি নাই; ঠিক এই পোষাক পরিচ্ছদের এবং চালচলনের বিজাতীয় পার্থক্যব শে তাঁহারাও অনেক সময় আমাদিগকে চিনিতে পারেন না। এইদেশে, অনেক ইংরাজের ঐশ্বর্য্য সুখ-বিলাসী এবং দেহাত্মভাবপূর্ণ বিকৃত জীবনের দৃষ্টান্তও যে সদ্ভাব-উদয়ে সাহায্য করে না, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইংরাজের স্বদেশে, ইংরাজের সহোদরগণ যে পরমোন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা সমস্ত সভ্যজগতের লুব্ধদৃষ্টি এবং সম্মান সহানুভূতি আকর্ষন করিতেছে। বাঙ্গালী ইংরাজজাতির প্রকৃত মাহাত্ম্যজ্ঞানে ধীরগতি-ক্রমেই জাগিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যের স্বকীয় ও পরকীয় শক্তি।

ইংরাজ-আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই বঙ্গদেশে মহিমান্বিত কাব্যসাহিত্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তৎকালে অধিকাংশ গ্রন্থই পদ্যচ্ছন্দে রচিত হইত। বঙ্গভাষার ছন্দোগতি এবং লালিত্যগুণ অসামান্য; ভাবের আবেগ এবং উচ্ছ্বাসকে সংপিণ্ডিত করিয়া সমুজ্জ্বল ছন্দোবন্দে হৃদয়-গ্রাহী করিবার শক্তি বঙ্গবাণীর প্রকৃতিসিদ্ধ। বীণাপাণির পরম অনুগ্রহ-পরিপুষ্টা এই বঙ্গভাষা আজন্মকাল পাণ্ডিত্যগম্ভীর সংস্কৃতের এবং শিরঃস্থিত পুরোহিত সংক্রান্তির প্রভুতায় এবঞ্চ বিদ্বেষে নিপীড়িত হইয়াও, কেবল আপনার জীবনীশক্তির বলেই এতকাল প্রাণধারণ করিয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। সমাজের তথাকথিত উপরিস্থগণের

বিদ্বেষবিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হওয়া, যেন বঙ্গভাষার চিরজীবনের কোষ্ঠীপত্রেই লিখিত আছে। এখন যাবৎ, এইরূপ দুরদৃষ্ট বশেই, বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য পদে পদে ইংরাজের সমক্ষেই নানামতে প্রপীড়িত হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যকে চাপিয়া রাখিবার জন্য, তাহাকে চিরকালের জন্য 'পতিত' এবং কেবল মুটে-মজুর মাত্রের আশ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য, পূর্ব্বকালে পণ্ডিতীপাতি প্রচারিত হইয়াছিল; পুরাণাদি আর্য্য-সংস্কৃতের বিষয়গুলিন যে *"ভাষায়াং মানবো শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"* তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার জনহৃদয় রৌরব-নরকের ভয়কে তুচ্ছ করিতে না পারিলে, এবং বঙ্গবাক্‌দেবীর বক্ষঃস্তন্যেও পরম নরক দুঃখবিস্মারিণী মর্ম্মসুধা না থাকিলে, আজ আমরা এই স্থানে দাঁড়াইতেও পারিতাম না। ভাব-বীর বৈষ্ণবকবিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষার কৌলীন্যগরিমা খ্যাপন করিতে সাহসী হন। এই বৈষ্ণবগণ কতদূর সাহসী! যাঁহারা সংস্কৃত প্রসঙ্গের মধ্যস্থলে, পরম পূজনীয় বেদ পুরাণাদির পবিত্র বাক্যের সমকক্ষতায়, আমাদের এই পতিতা এবং অস্পৃশ্যা বঙ্গভাষার পদপয়ারকেও উদ্ধার করিতে পারিতেন! সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে এবং গোঁড়া আর্য্যগাম্ভীর্য্যের আদর্শ ক্ষেত্রে, এই বৈষ্ণবগণের নামে যে একটা 'ছি-ছি-ঢি ঢি' পড়িয়া গিয়াছিল, উহা নিতান্ত অকারণ কি? এইরূপ অভেদবাদের প্রবাহ অবারিত ভাবে চলিতে পারিলে, হয়ত আজ ইতিহাসই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত! চিন্তা করিয়া দেখুন, সেইকালে কি পরিমাণের দুঃসাহস পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দুষ্কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছে! যাঁহারা এই প্রকার দুষ্কার্য্য সাধন করিতেন, তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে বঙ্গীয় মাতৃভাষার দেবীত্ব, আর্য্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার পরম কৌলীন্য-'মেল' এবঞ্চ সাম্য স্বতঃই প্রমাণিত ছিল; সংস্কৃত বাণী-ভাণ্ডারের রিক্থভাগিনী হইয়াও, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের দাসীপনা করিতে বাধ্য থাকিয়াও তিনিই

বাঙ্গালীর গৃহ-দেবী, তিনিই আমাদের অন্তরতম হৃদয়ের পূজা গৌরবান্বিতা মাতৃদেবী !

পৃথিবীর সকল আদিভাষার প্রথম পদ-চিহ্ন পদ্যবন্ধেই মুদ্রিত। ভাব-প্রবাহিনী পদ্য প্রথাই সাহিত্যের জননী; বঙ্গভাষাও সেই নিয়মের-বহির্ভূত নহে। তবে কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, ইংরাজের প্রভাবই বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছে উহা ভ্রমাত্মক। বঙ্গীয় গদ্যও বহু প্রাচীন। একাদশ শতাব্দীর রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস-কৃত "চৈত্যরূপ-প্রাপ্তি" গ্রন্থে, প্রাথমিক বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শন দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর নীলাম্বর-কৃত দ্বাদশ পাট নির্ণয়" ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়-কৃত প্রায় ৫০ খানি গদ্যগ্রন্থ রহিয়াছে! অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রাথমিক ইংরাজ-প্রভাবের গদ্য হইতে নানাদিকে সজীব এবং ওজস্বী গদ্য রচনাও লক্ষিত হইতেছে।

ইংরাজীর প্রভাব, বিশেষতঃ মুদ্রাঙ্কণের সহায়তাই যে বঙ্গসাহিত্য ও ভাষাকে স্থিতি, দৃঢ়তা এবং সুসিদ্ধ নিয়তি প্রদান করিয়াছে, সর্ব্বোপরি তৎ-সমক্ষে বিশ্ব-সাহিত্যের অসীমতা উদ্ঘাটিত করিয়াছে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য।

৩

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কেরী প্রভৃতি ইংরাজ মহাত্মাগণ বঙ্গ-সাহিত্যের কৃতজ্ঞাভাজন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম এই ভাষাকে দৈন্য

নব্যসাহিত্যের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত।

অবমাননা এবং সংস্কৃতের পদধূলি-নিপীড়িত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে সাহায্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসাহিত্য ও ভাষার নব-আশাপূর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় হইতে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব

পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৭৫ বৎসর কাল নববঙ্গ-সাহিত্যের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত বলিতে পারি। পূর্ব্বাপরের ও নূতন পুরাতনের অস্পষ্ট ছায়ামিলনময় এই মুহূর্ত্ত! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের স্পষ্ট জাগ্রত অথচ আত্মস্থ কর্ম্ম-উদ্যোগই এই পৌণে এক শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস।

বৈদেশিক প্রভাব যথোচিতরূপে গ্রহণ করিতে পারাই ভাষার একটা প্রধান মাহাত্ম্য। এই শক্তি না থাকিলে ভাষার কৌলীন্যই সিদ্ধ হয় না। যথোচিত আরাধিত হইলে কোন সভ্য ভাষাই যে মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত ভাবচিন্তা প্রকাশে অসমর্থ থাকিবে, জর্ম্মণ-পণ্ডিত শ্লেগেল এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বঙ্গীয় গদ্য এই কালে অনুন্নত দশায় থাকিলেও, কেরী প্রভৃতি মহানুভবগণ যে উহার বিপুল সম্ভাবিনী শক্তি অনুভব করিয়াই সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারি। এই গদ্যকে যে আমরা এখনও—এতকাল পরেও সম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। বাঙ্গালা গদ্য এখনও কৌমার দশার অসংযতলীলা চাঞ্চল্যে, অস্থির এবং অপরিণত বয়োবুদ্ধির অবস্থাতেই রহিয়াছে। শত শত সিদ্ধ লেখনীর সমাহিত তুলিস্পর্শেই গদ্যভাষার বর্ণ-সুষমার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। বঙ্গভাষার কথা ছাড়িয়া দিব, কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি জর্ম্মন্, কোন ভাষার গদ্যই যে এখন যাবৎ নিজের সমস্ত সুষমা-সীমা লাভ করিয়াছে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। ভাষার শক্তি অসীম এবং অতলস্পর্শ; সুতরাং উহা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং সামর্থ্যের আধাররূপেই মনুষ্যের হৃদয়ে এবং কণ্ঠে জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকথিত কোন বিদেশীই বঙ্গভাষাকে বেশী অগ্রসর করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের পরবর্ত্তিগণের নিকটেও এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশেষ ঋণ নাই। মিশনারীগণ এখনও যেই ভাষায়, বঙ্গীয় অক্ষরে গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যতীত আর যাহা-তাহা দেওয়া যাইতে পারে। এই

ক্ষেত্রে এই পরমবুদ্ধিজীবী রাজ-জাতির দৃষ্টান্তটি পরম কৌতুহল দান করিতেছে। এই জাতি শতাধিক বৎসর বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিয়াও, তাহার ভাষা কিংবা সাহিত্যের শক্তি বা প্রকৃতি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। ইংরাজগণ যেমন "বাবু ইংরাজী"র দৃষ্টান্ত তুলিয়া আমাদের পরিহাস করেন, আমরাও তেমনি 'ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা'র মূর্ত্তি দেখাইয়া উহার পূর্ণ পরিশোধ দিয়া আসিতেছি। (ফলকথা, জাতীয় অন্তরাত্মা এবং ভাবতন্ত্রের মধ্য হইতে আত্মিকশক্তির অভ্যুত্থান না হইলে, কেবল উৎসাহে কিংবা মহদুদ্দেশ্যের প্রণোদনায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র ফল দেখাইতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গে এই সুকৃতি-সঙ্গম ঘটে নাই।)

নব্যসাহিত্যাদর্শে রামমোহন রায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশমুখে সর্ব্বপ্রথম বীরপুরুষ রামমোহন রায়ের* সহিত সাহিত্য-পথিকের সাক্ষাৎ হয়। রামমোহন রায় বাঙ্গালার ভাষায়, সাহিত্যে, সমাজধর্ম্মে, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি-ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁহারই তেজঃপ্রভাসে আলোকিত। বঙ্গদেশে উচিত সময়েই এই মহাপুরুষ সঙ্গম ঘটিয়াছিল। রামমোহন ইংরাজ মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দুঋষির পরম রজঃসত্ত্ব-গুণের সমষ্টি। প্রাচীন ব্রাহ্মণের সরল বেদবেদান্ত গামিনী বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির বিশ্বগ্রাহিণী উদারতা, ইংরাজের নির্ভীক

* রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যানুবাদ (১১১৫) ; বেদান্তসার অনুবাদ (১৮১৬) 'কেন' উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৭) কঠ ও মুণ্ডক (১৮১৭) শাস্ত্রীয় অর্থ (১৮১৮) ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১) ; পথ্য প্রদান (১৮২৪) প্রার্থনা পত্র (১৮২৩) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (২৮২৮) আত্মানাত্মবিবেক ; গায়ত্র্যা পরমোপাসিতব্যম্ (১৮২৭) ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮) ; অনুষ্ঠান (১৮১৯) ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩০) অজ্ঞানতা তিমির নাশক ইত্যাদি।

কর্ম্মতৎপরতা, মুসলমান এবং হীব্রু ঋষির অকুণ্ঠিত একেশ্বরনিষ্ঠা, এই সমস্ত গুণসঙ্গমে রামমোহন এসিয়া এবং ইয়োরোপের সম্মিলিত সদ্ভাবগরিষ্ঠ বীরপুরুষ। বিশ্বসভ্যতার বর্ত্তমান যুগস্রোতে টিকিয়া থাকিতে হইলে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ভারতবর্ষকে যেরূপ মনুষ্যসৃষ্টি করিতে হইবে, তাহারই সর্ব্বাদর্শ বীজভূত এই রামমোহন! পরাধীন বাঙ্গালী সর্ব্ববিষয়ে নির্জ্জীব নহে, বিশ্বরঙ্গভূমে তাহার লীলা ফুরায় নাই; জীবন-যজ্ঞশালায় তাহার হৃদয়াগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই; সমিধ্-প্রযুক্ত হইলে উহা এখনও প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই রামমোহন! এই প্রকৃতির চরিত্রমধ্যেই অধঃপতিত জাতির অপরিসীম আশা ও আশ্বাস রহিয়াছে। এতদ্দেশীয় মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র যে একেবারে কঙ্করময় হইয়া পড়ে নাই, রামমোহনই তাহা সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতনক্ষত্র। ক্রমে প্রদীপ্ত উষালোকে এই সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব লুকাইয়া গেলেও তিনিই এখন যাবৎ বঙ্গগগনে অতর্কিতে কার্য্য করিতেছেন।

নবজাগরণ ও বহুমুখী সাহিত্য-চেষ্টা।

ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক ব্যবহার-বিধি, প্রাচীন দর্শন ও উপনিষদ্ বেদান্তের তথ্যানুসন্ধান, পক্ষাপক্ষতার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবভক্তিপূর্ণ গীতিগাথা, সাহিত্যে সমাজে এবং ধর্ম্মে বিশ্বোদার পন্থা নির্ণয়, এই সমস্ত বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে রামমোহনের কার্য্য। এই সময়ে এবং পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে কেরী, হটন, মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজ, রাম রাম বসু, (১) মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার (২) রাজা রাধাকান্ত দেব,

(১) প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) লিপিমালা (১৮০২)

(২) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০১); পুরুষ পরীক্ষা (১৮০৮); রাজাবলী (১৮০৮) প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)

(১) মধুসূদন তর্কালঙ্কার, (২) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, (৩) গৌরীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, (৪) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (৫) প্রভৃতি লেখক ব্যাকরণ, অভিধান, নীতিগ্রন্থ, চরিতকথা, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যবস্থা শাস্ত্র, সন্দর্ভ ও কাব্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শক্তি ও জ্ঞানভাব-সম্পত্তির বৃদ্ধি বিধান করিয়া, বাঙ্গালী জাতির সমক্ষে তাহার মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করেন। উহার গতিকে এইজাতির মধ্যে যে অভিনব প্রাণস্পন্দন জাগিয়াছিল, রামমোহন রায় তাহারই ঘনীভূত আবর্ত্ত; এবং উহা হইতেই ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গীয় অনুবাদ সমিতি', ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যসভা, ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্য সভা' স্থাপিত হয়; ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে প্রেমচাঁদ রায়ের 'জ্ঞানার্ণব' ও ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'হিতপ্রভাকর' প্রকাশিত হইয়া উদীয়মান নবসাহিত্যের উষাদীপ্তি দেশময় প্রসারিত করিতে থাকে। এই সকল নাম এবং কালাঙ্ক আপনাদের প্রণিধান যোগ্য বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। সমস্তই এখন নানাদিকে আমাদের নিকটে ঐতিহাসিক নামমাত্রে পর্য্যবসিত। এই লেখক সম্প্রদায় ন্যূনাধিক ইয়োরোপীয় ও খাঁটি দেশীয় ভাবধারার সম্মিলন স্থান; তাঁহাদের উপরেই প্রাথমিক পলিমৃত্তিকা পতিত হইয়া, তাঁহাদের স্ফুট প্রভাব অদৃশ্য করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এই সাহিত্য-পাদপের আভ্যন্তরীণ প্রাণতত্ত্ব এবং উহার মূল শিকড় তাঁহাদের মধ্যেই নিহিত আছে।

(১) স্ত্রীশিক্ষা (১৮২০) শব্দকল্পদ্রুম।
(২) তোতার ইতিহাস (?)
(৩) কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত (১৮০১)
(৪) জ্ঞানাঞ্জন (১৮২৩)
(৫) (১৮০০,১৮৪৭); বাসবদত্তা (১৮৩৬) শিশুশিক্ষা (১৮৪০) রসমঞ্জরী।

ইহার পর, যে সকল কর্ম্মী পুরুষ এই সাহিত্যে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের নাম চিরকালের স্মরণীয় হইয়া আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত (১) ও ঈশ্বর

প্রসারিত আদর্শ সাধনা ও সাধক সম্প্রদায়।

গুপ্তের (২) নাম পূর্ব্বেই আসিয়া পড়িয়াছে; ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৩), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (৬), রামনারায়ণ তর্করত্ন, (৭),

---

(১) (১৮২০-১৮৮৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকত্ব (১৮৪৩) বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ (১৮৫১) ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫২) চারুপাঠ ১ম ভাগ (১৮৫২) ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪) তৃতীয় ভাগ (১৮৫৬) পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬) ধর্ম্মনীতি (১৮৬৫) ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৭০) ২য় ভাগ (১৮৮২)-

(২) (১৮০৯-১৮৫৮) পাষণ্ড পীড়ন মাসিক পত্র (১৮৪৬) প্রবোধ-প্রভাকর (১৮৫৮) হিত-প্রভাকর (১৮৬০) প্রাচীন কবিজীবনী সংগ্রহ ও কলিনাটক।

(৩) (১৮২১-১৮৯১) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) প্রকৃতি ভূগোল; শিবজীর জীবনী; মিবারের ইতিহাস; ব্যাকরণ প্রবেশ; পত্র কৌমুদী; রহস্যসন্দর্ভ; শিল্পিকা-দর্পণ; কামন্দকী নীতিসার।

(৪) (১৮১৩-১৮৮৫) রোমের পুরাবৃত্ত (১৮৪৩) বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৮৪৬) ইজিপ্টের পুরাবৃত্ত (১৮৪৭) পল চরিত; খ্রীষ্টচরিত; গ্যালেলিও-চরিত।

(৫) (১৮২৬-১৮৮৭) এডুকেশন গেজেটের সহ-সম্পাদক (১৮৫৫) পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) কর্ম্মদেবী (১৮৬২) সুরসুন্দরী (১৮৬৯) বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ; শরীর সাধন; কুমার সম্ভব।

(৬) (১৮২৫ হইতে ১৮৯৪) শিক্ষাদর্পণ মাসিকপত্র (১৮৬৪); এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক (১৮৬৭) শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব, অঙ্গুরীয় বিনিময়, পুষ্পাঞ্জলি; পারিবারিক প্রবন্ধ; সামাজিক প্রবন্ধ; আচার প্রবন্ধ; ভারতবর্ষের ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস।

(৭) (১৮২৩-১৮৮৫) পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫২) কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক (১৮৫৪); রত্নমালা; বেণী সংহার; শকুন্তলা; মালতী-মাধব; রুক্মিণী হরণ; নবনাটক।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১), রামকমল ভট্টাচার্য্য (২), তারাশঙ্কর কবিরত্ন (৩), প্রালীপ্রসন্ন সিংহ (৪), দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (৫)। ইঁহারা নব্য-বঙ্গের নবসাহিত্যাদর্শের নানা-পন্থী সাধক; রামমোহন রায়ের *দীক্ষা পথেই এই সাহিত্য-সাধনা অগ্রসর হইয়াছিল। বর্ত্তমানের বঙ্গ সাহিত্য ইহাঁদেরই শিষ্য প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ।*

ইহাঁদের মধ্যে সাহিত্যের আধুনিক ভাবতত্ত্ব এবং আদর্শই ক্রিয়ান্বিত হইয়া বঙ্গভাষাকে তাঁহাদের হৃদয়নীরে পরিস্নাত ও পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল; এবং সেই পরম স্নানপূত বঙ্গভাষাই আজ অক্ষুণ্ণ ভাবে বাঙ্গালী জাতির প্রাণবেগ ধারণে সমর্থ হইতেছে। বঙ্গদেশের বিরাট পুরুষ ইহাঁদের নির্ভরেই নিজের মস্তক উত্তোলিত করিয়াছেন এবং এখন বিশ্বলোক-দৃশ্য হইবার আশা করিতেছেন।

স্বদেশের ক্ষেত্রে নূতন পুরাতনের সমুচিত মিলন, দেশ বিদেশের ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের স্বসিদ্ধসমন্বয়, সর্ব্বোপরি আপন হৃদয়-সমুদ্রের গভীর তল হইতে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট হীরামণিমুক্তা ও সদ্ভাবসুধার স্বাধীন উপঢৌকন, এই সমস্ত গুণেই সাহিত্যবিশেষ বিশ্ব-

(১) (১৮১৬-১৮৮৬) আলালের ঘরের দুলাল, অভেদী; যৎক্রিঞ্চিৎ; আধ্যাত্মিকা; রামারঞ্জিকা; গীতাঙ্কুর; রস্তমজীর জীবনী।

(২) দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। ১৮৫৮?

(৩) কাদম্বরী (১৮৫৬)?

(৪) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১৮৬৬); হুতোম পেঁচার নক্‌সা।

(৫) (১৮২০ ১৮৯১) মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ ১৮৪১, বাসুদেব চরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৯, বোধোদয় ১৮৫১, উপক্রমণিকা ১৮৫১, ঋজুপাঠ ১ম ভাগ ১৮৫২, ২য়, ৩য় ভাগ ১৮৫৩, শকুন্তলা ১৮৪৯, চরিতাবলী ১৮৫৬, বর্ণপরিচয় ১৮৫৫, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ১৮৬০, সীতার বনবাস ১৮৬১, ব্যাকরণকৌমুদী ১৮৬৪, আখ্যান মঞ্জরী ১৮৬৪, বহুবিবাহ ১৮৭২, বিধবা বিবাহ।

সাহিত্যের 'দরবারে' স্থান লাভ করিতে পারে। এই সকল পুরুষ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কৌলীন্য-মর্য্যাদা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীকে অনন্ত আশায় অনন্ত লক্ষ্যে পরিচালিত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং এই স্থলে ইহাঁদের কার্য্য আর একটু বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার এবং বঙ্গীয় সাধু ভাষার উদ্ধার।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আদর্শের সম্মিলন ফলে, রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে সত্য-পিপাসা এবং ভাবোৎসাহ সন্দীপিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান ফল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের ভাষা ক্ষত্রিয়োচিত আবেগপ্রবণ এবং বৈভবপ্রদর্শনে প্রয়াসী; বিদ্যাসাগরের ভাষা ক্রমাম্বিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় সরল, এবং সংস্কৃতের 'বৈদর্ভী' রীতির অনুসরণে সৌষ্টবময় ও প্রাঞ্জল। উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সন্দর্ভ ও কথা-সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত; এবঞ্চ উভয়েই অনতিগভীর, এবং অনাবিল জনহিতৈষণায় পরিচালিত; উভয়েই বাঙ্গালার গদ্যসাহিত্যে সংস্কৃতের এবং প্রতীচ্য আদর্শের সমন্বয় সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা জানি, ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা দেশের প্রাকৃতজীবন হইতে বহুদূরে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; তপোবনে এবং উপাধ্যায়গণের টোলে ও রাজার-মজলিশে বর্দ্ধিত হইয়া এই ভাষা পরিশেষে দেশবাসীর হৃদয় এবং মস্তিষ্ককে জগদ্দল পাথরের মতই স্বাভাবিক বিকাশ হইতে চাপিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের নিকাশ করার পর হইতে, অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে, এই সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য অপরিসীম কূটকাটব্যে এবং কৌশলে জমাট বাঁধিয়া মৃতবৎ নিশ্চল হইয়া পড়ে, এবং ভারতের মানবাত্মাকে সর্ব্বদিকে মৃত্যুর অভিমুখেই লইয়া যাইতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষার এই অধোগতি যে ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতার এবং জাতিভেদ প্রথার অপরিহার্য্য ফল, তাহা জিজ্ঞাসুমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। ভারতের তপোবন ক্রমে টোলে এবং এই টোল ক্রমে 'অকেজো' শিক্ষার ভাণ্ডারে পরিণত হইয়া দেশের কর্ম্ম-জীবন হইতে, তথা ধর্ম্মজীবন হইতেও দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। নিরবচ্ছিন্ন শব্দ শাস্ত্র ও ন্যায়বাদার্থের বিদ্যার্জ্জনেই মানুষ ২০।২৫ বৎসর কাটাইয়া দিয়া নিজকে বিশ্বজ্ঞানী মনে করিতে থাকে। সাধারণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রকৃত মাহাত্ম্য এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধার লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া কেবল একটা জাতিজন্মগত দূরতার ভাবই ঘনাইতে থাকে; এমন কি নিষ্কর্ম্মা পাণ্ডিত্য এবং বেকুবীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর' গল্পটী সমাজে সর্ব্বত্র সকলের মনেই বসিয়া যায়। স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাই যখন দেশ-জীবন হইতে এত দূরবর্ত্তী, তখন তাহার কাব্য-কবিতা বা গদ্যের কথা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ও নাট্য-সাহিত্যের স্থলবিশেষ ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত গদ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংস্কৃতের গদ্য অনর্থক কাব্য-ভাবুকতায় এবং বেগতিক শব্দ পাণ্ডিত্যে জটিল হইয়া, অন্যদিকে অলঙ্কার এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিগড়-বন্ধনে অচল হইয়াই রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক কিম্বা লাটিন ভাষার ন্যায় গদ্য সংস্কৃত সাহিত্যে কদাচিৎ মিলিবে। উপনিষদে কিম্বা দর্শনাদির ভাষ্য মধ্যে যেই গদ্য সূচিত হইয়াছিল, তাহাও অকালে বিপরীত ভাবে সমাসগ্রস্থ এবং নির্জ্জীব হইয়া যায়। বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীর বাক্যপাণ্ডিত্য ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; বাঙ্গালী পাণ্ডিত্যের 'ঝোঁকে' সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এক অপরূপ গদ্যপ্রথা আবিষ্কার করে, তাহার নাম 'গৌড়ীয় রীতি।' পণ্ডিতগণের সংসর্গে বঙ্গভাষার মধ্যেও এই গৌড়ীয় রীতি প্রবেশ করিতে থাকে এবং উহার নামকরণ হইয়াছিল—পণ্ডিতী বাঙ্গালা। এই রীতির প্রধান লক্ষণ কেবল, মনোগত অর্থকে অনর্থক শব্দ সাহায্যে জবরদস্ত ও

দুর্ব্বোধ্য করিয়া প্রকাশ—এককালে উহাই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া পড়ে। স্বয়ং সংস্কৃতভাষা এই প্রণালীবশেই দুরূহ হইয়া গিয়াছে। মনে করুন, সংস্কৃতভাষায় সূর্য্যের নির্দ্দেশক অন্ততঃ ত্রিশটী শব্দ অভিধানে আছে। এখন, সূর্য্যোদয় বুঝাইতে গিয়া পণ্ডিতগণ অসঙ্কোচে বলিবেন, "ত্বিষাম্পতি উদিত হইতেছেন", বা "বিরোচন উদিত হইতেছেন" বা "আদিত্য উদিত হইতেছেন।" এ সকল বাক্যের শব্দশক্তির মধ্যে পরস্পরে যে কত ব্যবধান রহিয়াছে, উহা তাঁহারা মোটেই চিন্তা করিবেন না। সংস্কৃত ভাষার যেমন প্রকৃতি, উহাতে কোন শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না; সকল ভাষাতেই একার্থক শব্দ সংখ্যা পরিমিত। শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র মনের মধ্যে তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ একটা অর্থচ্ছবি স্ফুট হইয়া পড়ে; লেখক নিজের অভিপ্রায়ের সহিত উহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে না পারিলেই শব্দ নিরর্থক হইয়া যায়, বরং বিদ্রোহ করিতে থাকে। এইরূপ সামঞ্জস্য সিদ্ধি করিতে না পারিলে কেহই সুলেখক গণ্য হইতে পারেন না। এখন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীর মনকে উক্তরূপ ভণ্ড পাণ্ডিত্য হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিব না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রামমোহন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা গদ্য যে সুস্থতা, যে সর্ব্বাঙ্গীনতা, যে দেশপ্রাণতার অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা একদিকে অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে আসিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে।

আধুনিক ভাষা সমূহে গদ্যের আবিষ্কার এবং তাহার ভবিষ্যৎ।

সাহিত্যে গদ্যের প্রণালী যে কত শক্ত, এবং উহা যে কত সাধনায় কত বিলম্বে মানুষকে ধরা দিয়াছে, তাহা মনুষ্যসভ্যতা ও সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে কিছু কিছু ধারণা করিতে পারিব। একেত মানুষের পক্ষে শব্দার্থের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করাই কত কঠিন, তন্মধ্যে মনোগতির স্বাভাবিকতা বা সুস্থতা লাভ

করাই আবার কত কঠিন হইয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গীন গদ্যের সৃষ্টি আধুনিক সাহিত্যসমূহে চারিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পর হইতেই মানুষের এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে; মনুষ্যের মন ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভের সুবিধা পাইয়াছে। এখনও যে কোন দেশের সাহিত্য গদ্য সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধার্থ হইতে পারিয়াছে, তাহা মনে করিবেন না। মানুষ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর পদ্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছে; অগণ্য সংখ্যক কাব্য কবিতা এবং পদ্যকথা রচনা করিয়াছে; উাহার অধিকাংশই (কোনটা বা তৎক্ষণে, কোনটা বা দু'দশ বৎসর পরে) ভস্মসাৎ কিংবা ধূলিসাৎ করিয়া আসিয়াছে। সঞ্চিত সম্পত্তির তিনচতুর্থাংশ মানুষ বর্ত্তমানে 'শিকায়' তুলিয়াছে; যৎসামান্য মাত্রই যে তাহার হৃদয়মনের এবং জীবনের সঙ্গ লাভ করিয়া—চলিত কথায়, তাহার 'চিরজীবনের সাথী' হইয়া আছে, তাহাই দেখিবেন। কোটী-কোটী কাব্যকর্ত্তার মধ্য হইতে গুটিকয়েকের মাত্র নামকরণ হইয়াছে—উহারা কবি। এত কালের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ শেষে এই মাত্র স্থির করিয়াছে যে, বাণি-দেবতার পুত্র হইতে না পারিলে অর্থাৎ অদৃষ্ট-শক্তিমান্ না হইলে কবি হওয়া যায় না। মনুষ্য এখন গদ্যসাধনায় মনোযোগী হইরাছে। আরও চারি হাজার বৎসর! তৎপর, ফিরিয়া হয়ত গদ্যের বিষয়েও ঐ কথাই বলিয়া বসিবে! সৌভাগ্য ভিন্ন—অদৃষ্ট কৃপা ভিন্ন গদ্যও ধরা দেয় না। বুঝিয়া লউন, গদ্যও কত শক্ত! কবি মলিউর 'হঠাৎ নবাবের' মতন আমরা এতকাল গদ্যই কহিয়া আসিয়াছি—অথচ টের পাই নাই, উহা কি? উহাকে মনের মধ্য হইতে সাহিত্যের মধ্যে অবতারিত করিতে, নিরূপিত করিতে পারি নাই। ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতেও যে কত কঠিন সাধনার আবশ্যক হইবে, তাহা গত ৫০ বৎসরের সাহিত্য কার্য্যফলে আমরা কিছু-কিছু বুঝিয়া উঠিতেছি বই নহে। বিংশ শতাব্দীর অপর

পারে দাঁড়াইয়া যদি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্থির সঞ্চয়ের গৌরব করিতে পারে! বিশ্ববিষয়কে নিজের মনের মধ্যে, আবার নিজের মাতৃভাষার মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারিলেই উহা প্রকৃত প্রাপ্তি; তৎপূর্ব্বে উহা মনঃ-সমক্ষে ভাসমান মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাহিত্য-সাধকের পক্ষে এইরূপ মনো-জাগরণ লাভ করাই কত কঠিন! আবার জাগরিত কিংবা উদ্বুদ্ধ মনের পক্ষে সামর্থ্য এবং অধিকার লাভ করিয়া, উপস্থিত বিষয়টীর সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণ অথচ সম্প্রসারিত দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া, সমুচিত শব্দদ্বারে অব্যাহত ভাবে উহাকে পরের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত করা ব্যাপারটাই কত কঠিন! হৃদয় মধ্যস্থ অনন্ত ভাব-প্রবাহের মধ্য হইতে কেবল সমুচিত ভাবটিকেই মুষ্টিনিবদ্ধ করিতে, কিম্বা উহার প্রকাশার্থে অপরিহার্য্য শব্দটাকেই 'পাকড়' করিতে কেবল যত্নচেষ্টায় কিম্বা সমীক্ষা-পরীক্ষায় কুলায় না! গদ্যে-প্রণালীতেও অনন্ত প্রকারের ছন্দ আছে; ঐ ছন্দ অনেক সময় কাব্যকবিতার ছন্দ অপেক্ষাও দুরায়ত্ত! উহার মধ্যে কোনরূপ 'বাঁধা গৎ', তাল কিম্বা 'বোলচাল' নাই বলিয়াই উহা দুরায়ত্ত! কত সময় বাক্যের ছন্দ শব্দকে, শব্দ ভাবকে, অথবা পরস্পর যোগে মনোগত উদ্দেশ্য এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়টিকে কত দিকে আবৃত, বিভ্রান্ত বা খণ্ড-বিখণ্ড করিতে থাকে! এই ব্যাপার, মনোযোগ-সিদ্ধ পাঠক এবং অন্তর্দ্দর্শী লেখক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। তাই, সাহিত্যের ইতিহাস খুলিলেই দেখিবেন, শতাব্দীর মধ্যে নিতান্ত সামান্য সংখ্যক লেখকেই অসামান্য দৃষ্টি অথবা তদনুরূপ বাণি-সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রসংশিত হইতে পারিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীর জন্য এই সাধন-পন্থা পরিষ্কৃত করিয়াছেন বই নহে; উহাই তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের ভাষাকে গ্রামের বর্ব্বরতা হইতে, সহরের পঞ্চ-'ইয়ারী' খেয়াল এবং প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও অপভ্রংশ হইতেও উদ্ধার

করিয়াছেন ; বঙ্গভাষার আর্য্যকৌলীন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; বঙ্গ-পরিব্যাপিণী এবং সপ্তকোটি মনুষ্যের হৃদয়মর্ম্ম-বাসিনী মাতৃকামূর্ত্তি পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি আর্য্যকথিত দেশভাষার ন্যায় বঙ্গভাষার প্রধান বিশেষত্ব উহার শব্দবিভক্তি, ক্রিয়া-বিভক্তি, সর্ব্বনাম অব্যয় এবং নির্দ্দেশক প্রভৃতির ব্যবহার ; ইঁহারা নানাদিকে এই সমস্তের নিরূপণ এবং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস প্রভৃতির সময় হইতেই বঙ্গভাষা একরূপ দ্বৈধসমস্যায়, পদ্যগতির শৃঙ্খলে সঙ্কুচিত হইয়া এবং নানাদিকে বিভ্রান্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ইঁহাদের হস্তেই বঙ্গীয় সাধুভাষা জাগরিত হইয়া, আত্মপরিচয় লাভ করিয়া এবং বাঙ্গালীর মনকে প্রসারিত করিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত বাক্যের প্রধান দোষ উহার দূরতা, অনর্থক শব্দাড়ম্বর, সমাস বিশেষণাদির দীর্ঘসূত্রতা, বাক্যগতির চিহ্ন বিচ্ছেদ-বিহীন পাকচক্র এবং বিলম্বিত ছন্দ ; তাঁহারা স্বয়ং এইসমস্ত দোষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে না পারিলেও, তাঁহাদের ভাষা কিম্বা ভাব কদাচিৎ পরস্পর ব্যভিচারী হইতে পারিয়াছে। তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে মহদন্তঃকরণের সুবিস্তারিত উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল ; এবং ওই উচ্ছ্বাসেই অতর্কিতে তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তির গৌরব-মাহাত্ম্য এবং বিস্তার নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। অন্তরাত্মার অভ্যন্তর হইতেই লেখকগণের বাক্যপ্রণালী মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। 'সীতার বাসবাস' কিম্বা 'স্বপ্নদর্শনের' অন্তরাত্মা প্রাকৃত বাঙ্গালার যুক্তবর্ণ-বিরল এবং কর্ম্মালস্যময় উচ্চারণ পদ্ধতি অথবা কোমলতার মধ্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই ; উহাদের প্রাণ-কল্লোল সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে উদাত্ত উচ্ছ্বাসে অতিক্রম পূর্ব্বক দীর্ঘকাল-বিলুপ্ত আর্য্য সরস্বতীর বিপুল ধারায়

বঙ্গভাষা কর্ত্তৃক কৌলীন্য বিস্তৃতি এবং মাহাত্ম্য-লাভ

প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহাই বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের বাক্য-প্রণালীর অন্তরঙ্গীয় রহস্য! তাঁহাদের মধ্যেই বঙ্গসরস্বতী এক দিকে আপনার বিলুপ্ত 'আর্য্য' গৌরব লাভ করিয়া, অন্যদিকে দেশভিত্তি এবং দেশপ্রাণতাকেও সুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, ইহাঁদের কার্য্য মধ্যেও একটা বিশেষ অভিযোগের কারণ ছিল। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সময় হইতেই বঙ্গীয় শব্দশাস্ত্র এবং অভিধানের ক্ষেত্রে একটা প্রবল সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে, ও উত্তরোত্তর ভয়াবহ হইয়া চলিতেছে। এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় শব্দ শাস্ত্রের প্রধান সমস্যা।

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কৃতের দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; সুতরাং তাঁহাদের 'আর্য্যামী'-গৌরব এবং শুচিপ্রবণতাই স্বাভাবিক। আর্য্য আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আপাততঃ বঙ্গভাষার প্রধান সমস্যার পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন বই নহে; স্বয়ং উহার পূরণবিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু, উহাই যে বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যের চিরকালীয় মহাসঙ্কট, তাহা বাঙ্গালী মাত্রকেই স্বীকার করিয়া এবং চিরকাল সতর্ক থাকিয়াই চলিতে হইতেছে।

বঙ্গভাষা হিন্দী প্রভৃতি প্রাকৃতভাষার সমজাতীয়; উহা আর্য্য এবং দেশীয় প্রকৃতির সম্মিলনে, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত পদগতির সংমিশ্রণে, বঙ্গদেশের হৃদয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায়, বিস্তর শব্দ বিদ্যাসাগরীয় অভিধান হইতে, অথবা লিপিবদ্ধ সাধুসাহিত্যের সীমা হইতে তিরস্কৃত হইয়া নিরালম্ব ভাবে দূরে-দূরে এবং বাঙ্গালীর মুখে-মুখে ভাসিতেছে। হিন্দীসাহিত্য ও অভিধান এই জাতীয় শব্দের অনেকগুলি পংক্তি-ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এই জাতীয় অনেক শব্দের কার্য্যকরী শক্তি এবং অর্থশক্তি অসাধারণ। দেশের হৃদয়জাত হইয়া এবঞ্চ উহার

সহবাসে থাকিয়াই, উহারা এই শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরাদির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, বঙ্গসাহিত্যের বহু লেখক একদিকে এই জাতীয় শব্দ স্বীকার করিতেই লাগিয়া গিয়াছে। প্রাচীন গীতি-কবি ও চরিত-কবিগণের মধ্যে, উপাখ্যান-মঙ্গল এবং পুঁথি রচয়িতার মধ্যে, কবি খেউর ঝুমুর পাঁচালী ও মালসী গায়কগণের মধ্যে বঙ্গভাষার দেশভিত্তিই প্রকটিত। তৎপরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইতে, *মহানুভব কেরী প্রভৃতির মধ্য দিয়া* (চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি হইতে আধুনিক কালের যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালা নাটক নভেল ও প্রহসন লেখকগণের মধ্যে) বঙ্গভাষার এই প্রাকৃত ধারাই ন্যূনাধিক প্রবাহিত। বাঙ্গালীর অন্তর্জীবনের সহিত সহানুভূতিশীল কোন লেখক ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। সকল সভ্যসাহিত্যের ন্যায়, এ ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যা; উহা লেখক মাত্রেরই চিন্তনীয়। আমরা যথাস্থানে উহাকে পরিদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। যা' হোক, এই ক্ষেত্রেও, বঙ্গভাষার পদগতি এবং বাক্যশক্তি বিষয়ে, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের নিকট সকল সময়েই ন্যূনাধিক শিক্ষালাভ হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের অবলম্বিত বিষয় এবং আদর্শের গতিকে নানামতে বাঙ্গালাশব্দের স্পর্শ পরিহার করিয়া গেলেও, বঙ্গীয় সাধু বাক্যের মূল আদর্শ-লক্ষণ এবং উহার শক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের মধ্যেই প্রকাশিত; দিক্‌দর্শনের সূচীশলাকা তাঁহাদের রচনা মধ্যেই নিহিত। তাঁহাদের অনুসৃত পদগতির 'ছক' অবলম্বন করিয়া, এবং তাঁহাদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালিকে নব নব শব্দার্থের সাধনা করিতে হইবে; কোন অসংস্কৃত, পতিত অথবা বিজাতীয় শব্দকেও বঙ্গ সরস্বতীর

সাধু বাঙ্গালার আদর্শ

অঞ্চলভুক্ত করিতে হইলে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই জাতসংস্কার অথবা পরিমার্জ্জনা ব্যতীত উহা সাধু-সমাজে গ্রহণীয় হইবে না।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালীকে সার্ব্বজনীন ভাব-পথে, বঙ্গদেশের সর্ব্ব-সামান্য ভাষা প্রকৃতির মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন; বঙ্গভাষার গদ্য প্রণালীকে সুমার্জ্জিত এবং সুদৃঢ় করিয়া উহাকে বিশ্বভাব গ্রহণে দীক্ষাদান করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, প্রায় ৮০ বৎসর, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর (প্রথম বাক্যস্ফুর্ত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার শিক্ষা-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত) শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-জগতে এই দৃষ্টান্ত অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; নব্যবঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকে বিদ্যাসাগরের মানস-পুত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ইঁহারা বিশ্বমানবের জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে বাঙ্গালী-জীবনের সামঞ্জস্য চিন্তা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র তাহার ধর্ম্মজীবনের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন। এ সকল মহাত্মার চেষ্টা ও চিন্তা তাহাদের 'জীবন বেদের' অর্থ এবং জীবন যজ্ঞের ফল বঙ্গভাষা ন্যূনাধিক গ্রহণ পূর্ব্বক চরিতার্থ হইয়াছে; বাঙ্গালার সাহিত্য ও সমাজ ইঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা পথে কার্য্য করিয়া স্থির পরিণতির অন্বেষণ করিতেছে।

বিস্তারিত সাহিত্য আদর্শ ও লেখক সংপ্রদায়

কাব্যের ক্ষেত্রে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কার্য্যসূত্রে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত এবং পারস্য আদর্শের সমন্বয়ে বঙ্গসাহিত্যে উপাখ্যান ও খণ্ড কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি

ইংরাজ কবির এবং বাঙ্গালী কবিওয়ালার সম্মিলন-জনিত অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাঁহার প্রভাবও এককালে কলিকাতা রাজধানী হইতে প্রসারিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অপরূপ স্থিতিশীল ব্যঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; এবং পরবর্ত্তী ক্ষমতাশালী কবিগণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল। ব্যঙ্গভাব এই জাতির মারাত্মক দোষ; বাঙ্গালী প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মী নহে বলিয়াই এই দোষ তাহার পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। গুপ্ত কবির মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা সাহিত্যের অধ্যাত্মলোকের—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সত্য এবং পুণ্য আদর্শের বিরোধী; উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সমাজ এবং সাহিত্যের ক্ষয়রোগ। এই ব্যঙ্গ এবং বিদ্রোহভাব হইতে জন্ম লাভ করিয়াই, ফরাসী বিপ্লব শতাব্দী শেষে সমগ্র ইয়োরোপকে, আগুনের-রসে দগ্ধবিদগ্ধ এবং ধৌতবিধৌত করিয়া গিয়াছে; স্বতঃপরতঃ অভিনব সাহিত্য এবং সমাজ-প্রথার জন্য পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছে। প্রাচ্যের হৃদয় "জাতীয় বিপ্লব" রূপ বিষচিকিৎসার, কিম্বা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষা রাখে না; সুতরাং এই ব্যঙ্গভাবই তাহার চরিত্র মধ্যে আলর্ক বিষের ন্যায় দুশ্চিকিৎসভাবে এবং সাঙ্ঘাতিকভাবে কার্য্য করিতে থাকে। বর্ত্তমান কালেও, এই অনুদার বিদ্বেষ-ব্যঙ্গই আমাদের সাহিত্যের অদৃষ্টে বসিয়া কীটের তথা মূষিকের ব্যবহারেই রত আছে।

বাঙ্গালীর বুদ্ধিমান্ বলিয়া দুর্নাম আছে; এবং নিজের এই 'বুদ্ধি' লইয়া, তাহাকে অহমিকা প্রকাশ করিতে প্রায় দেখা যায়। এই অতি-বুদ্ধিই জাতি পরিবার এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র তাহার অদৃষ্টে সর্ব্বনাশী হইতেছে। জগতের যত নিষ্কর্ম্মা-অবতার, সকলকেই নিজের অধিক 'বুদ্ধির' গৌরব করিতে দেখা যাইবে; তাহারাই নির্ব্বিঘ্নে পরচর্চ্চায় তৎপর হইতে পারে। স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেই, জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত ভ্রাতার

প্রতি সহৃদয়তা এবং সহানুভূতি লাভের অবসর ঘটে। আমাদের সমাজ ও পরিবারবন্ধনের ফলে, দেশে নিষ্কর্ম্মার অভাব নাই; সুতরাং অনেকের জীবনেই জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হইবার পথ সহজ হইয়াছে। যে কারণেই হউক, পূর্ব্বকালের বঙ্গসমাজে এইরূপ বুদ্ধিমানের সংখ্যা যেন অধিক ছিল না; অন্ততঃ তাহার শাক্ত শৈব বৈষ্ণব কিম্বা অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত অধিক মিলে না; ভাড়ু দত্ত এবং হীরামালিনীর সংখ্যাও বেশী নহে। কবিকঙ্কণ স্বয়ং ভাড়ু দত্তকে ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু পলাশীযুগের রাজকবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদ্যন্ত যে সাহিত্য-আদর্শে বিরচিত, উহার অধ্যয়ন ফলে উক্ত শক্তিশালী কবির প্রতি অন্ততঃ ভক্তিসন্মানের ভাব জাগ্রত হয় না; তিনি স্বরচিত কাব্যের প্রতিপদে পরমানন্দ ভোগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, বলিয়াই মনে হয়। পলাশীর পুণ্যক্ষেত্রে যাঁহারা মাতৃভূমিকে কড়ির মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র-রুচিগন্ধ যেন তৎকালের এই কাব্য রসোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই অকপট এবং সাধুচরিত্র ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; তৎসত্ত্বেও বাণিমন্দিরের অন্তঃস্থলে এই যে আরতি-চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে, উহা তৎকালের জনহৃদয়ের অপরিহার্য্য প্রতিভাস বলিয়াই মনে হয়। বরঞ্চ তাঁহাদের অকপটতার দরুণেই যেন দেশব্যাপ্ত জনরুচির অধ্যাত্ম মূর্ত্তি রচনার মর্ম্মদেশে প্রতিফলিত হইবার পক্ষে সমধিক সুবিধা পাইয়াছিল। আমাদের সমাজে নির্লজ্জ, সর্ব্বব্যঙ্গপ্রিয় এবং সর্ব্ববুদ্ধিমান চরিত্রের মাত্রা বর্ত্তমানে অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমাদের দুর্দ্দশা এত ব্যাপক হইতে পারিয়াছে যে জাতির অধিকাংশ লোক কোন বিষয়েই Serious বা তৎপর হইতে পারে না (কার্য্যে পরিণত করার মতন পারে না) তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য। মহৎ চরিত্রের আত্মসমুন্নততৎপরতা বা High seriousness

আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে একদা অবসন্ন হইয়াই, উহার অধঃপাত অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল; এবং এখনও আমাদিগকে পতিতের অবস্থা মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতেছে।

এই যুগের সাহিত্যে, আর তিন জন বিশিষ্ট-কর্ম্মা ব্যক্তির কার্য্যোল্লেখ বাকী আছে। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের নাম শেষে আনিয়াছি; প্যারীচাদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্র। এই তিন জনের নামও বঙ্গীয় গদ্যরীতির ক্ষেত্রে, অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যা-সাগরের সমযোগী, চিরস্মরণীয় এবং চিরপ্রভাবশীল।

জাতীয়তার প্রভাব, বাস্তবিক জীবনের সত্য সৌন্দর্য্যের গভীর অনুধ্যান এবং ঋজু বাক্য-রীতিই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য লক্ষণ।

প্রাচীনকবি মুকুন্দরাম একরূপ অতর্কিতে, কোন কোন দিকে এই আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে-সঙ্গে এই জাতীয়তা এবং বাস্তবতার আদর্শও আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে,—চরিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতের আদর্শ কিংবা বাস্তবতাকে উদ্দেশ্য করিলে, বাক্যরীতিকেও ন্যূনাধিক প্রচলিত ভাষা-পদ্ধতির অনুগত হইতে হয়; আবার, এই বাস্তবপ্রিয়তাই চিরকাল সাহিত্যকে অচলতা এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে থাকে। দেশের মধ্যে বাস্তব-শিল্পীর অভ্যুদয় সাহিত্যের পক্ষে পরমমঙ্গলাবহ ও আশাপ্রদ। আমরা বিদ্যাসাগ-রাদির কার্য্যবিচার কালে এ বিষয়ের সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ ভাষার উভয়াত্মিকাশক্তি—উচ্চতম সত্য-সৌন্দর্য্য হইতে প্রাকৃততম ভাব এবং ক্রিয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত যথাযোগ্যভাবে ধারণা করিবার শক্তি,— যে পর্য্যন্ত সুসিদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভাষা কখনও 'জীবিত' সংজ্ঞা বা

'উন্নত' সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। বঙ্গসাহিত্যের নবজীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উহার আর্য্যকৌলীন্য সিদ্ধ করিয়াছেন, অন্যদিকে "আলালের ঘরের দুলাল" "হুতোম পেঁচার নক্‌সা" প্রভৃতি উহার প্রাকৃতদেশস্থিতি এবং অমায়িকতাও প্রমাণিত করিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের এবং প্রাদেশিকতার মধ্যপথে বঙ্গভাষা আপনার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করিয়াই দাঁড়াইয়াছে। বিশেষভাবে অসংস্কৃত, অপভ্রষ্ট বা শ্রুতিকটু না হইলে, বাঙ্গালী লেখক উপস্থিত মতে সংস্কৃত, দেশজ বা যাবনিক সর্ব্বপ্রকারশব্দ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালার বা ভারতীয় প্রদেশভাষা মাত্রেরই যাহা নিত্য-সঙ্কট, তদ্বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আপন হৃদয়ের বিবেকবুদ্ধি এবং সামঞ্জস্য-জ্ঞানই শব্দ নির্ব্বাচন বিষয়ে লেখকগণের একমাত্র কাণ্ডারী এবং রক্ষক; বিপুল গভীর কিম্বা উচ্ছ্বাসিত মর্ম্মভাবকে চিরকালের বোধগম্য করিতে হইলে, যেমন চিরজীবী শব্দাভিধানের এবং সাধুরীতির সাহায্যে নিরূপিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না; তেমন, প্রাকৃত অথবা 'আটপৌরে' ভাবকে তদনুরূপ শব্দদ্বারা সমুজ্জ্বল করিতে না পারিলেও যথেষ্ট হয় না। সুতরাং এ স্থলে সরস্বতীমাতার স্বাধীন পদগতি এবং অনন্তমুখী মুখরতাকে নিগড়বদ্ধ করিতে পারে, মনুষ্যের এমন সাধ্য নাই। মুদ্রনযন্ত্রের প্রচলন হইতে সকল জাতির সরস্বতীই নানাদিকে চাপল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কোষগ্রন্থের অধিকারে আসিয়াই স্থিরতা লাভ করিতে চাহিতেছেন। ইহাও নিশ্চিত যে, কথিত ভাষা নিত্যকাল নানাপ্রকার অনীতি এবং দুর্নীতির বাধ্য হইয়া, উপরন্তু চঞ্চল হইয়াই চলিতে থাকে। আজ যেই শব্দকে সাধারণের মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হইতেছে, বিশ বৎসর পরে, উহা পুনর্ব্বার সাধারণের মুখেই বেগতিক

হইয়া, বিরূপ হইয়া যাইবে। কথিত ভাষার এই চলন্তভাব চিরকালের সত্য; সাহিত্যই ভাষাকে নিত্যতা দান করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং যে লেখক একান্তভাবে প্রচলিত ভাষার উপরেই আস্থা স্থাপন করিবেন, তাঁহাকে যে একদিন বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে, তাঁহার পদতলের নির্ভর ভিত্তিটাই যে ধ্বসিয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চিত। এই অবস্থায় লেখকের নিজের যোগ্যতা এবং যোগ্যতাজ্ঞান-ব্যতীত অন্য সহায় নাই। বঙ্গভাষা *নিত্যকালের আর্য্য-প্রকৃতি এবং সংস্কৃতের* অভিধানকে আত্মসিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, উহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক অনুসরণ করায় যেমন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গৌরব; তেমন যাঁহারা কথিত বাঙ্গালার শব্দ প্রকৃতিকেও মুদ্রালিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবও কোন অংশে কম নহে। বলিতে কি, বঙ্গভাষায় চিরকাল চ্যুত-সংস্কৃতি অপেক্ষাও বরং শ্রুতি কটুতা ও গ্রাম্যতা, অযুক্ততা এবং অনার্জ্জবই আত্মক দোষ বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গভাষার বাক্যপ্রণালীও, ক্রমে সংস্কৃতের সমাস-বহুল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া Analytic, বা অব্যয় এবং নির্দ্দেশকাদি সাহায্যে বিস্তারী হইয়া পড়িতেছে। মুদ্রা যন্ত্রের প্রচলনের পর হইতে, সভ্যজাতির ভাষা মাত্রেই এখন এই আদর্শে—জাতীয় হৃদয়গতি, কণ্ঠের প্রবৃত্তি এবং প্রকাশ-ধর্ম্মের অনুসরণ-আদর্শেই প্রবাহিনী হইয়া চলিতেছে। ফলতঃ, এই সকল সুকৃতী সন্তানের হৃদয় হইতে, পরম-গরীয়সী স্বাধীন গতি এবং প্রবর্ত্তনা লাভ করিয়াই, বঙ্গভাষা পরবর্ত্তী সুধন্য শিল্পীগণের সমক্ষে "সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে" মূর্ত্তিতে—বঙ্গদেশের আপামর মহাজনের হৃদয়ঙ্গম মূর্ত্তি অবলম্বনে প্রকটিত হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এ ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর * কার্য্যও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু

* দীনবন্ধু মিত্র—জন্ম ১৮৩০ খ্রীঃ অঃ; নদীয়ার অন্তবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রাম; ১৮৫৫ খ্রীঃ কলেজ ত্যাগ ও পোষ্টমাষ্টারের পদপ্রাপ্তি; নীলদর্পণ (১৮৬০) নবীন-তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী, লীলাবতী, সুরধুনী কাব্য (১৮৭১) জামাই বারিক, দ্বাদশকবিতা, কমলেকামিনী; মৃত্যু ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ।

তাঁহার কাব্যাদিতে উন্নত বাঙ্গালী জীবনের ছবি ধারণা করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার শিল্প-তুলিকায়, প্রাকৃত বঙ্গজীবনের চিত্র—আদুরী তোরাপ ও নিমচাঁদ প্রভৃতি, অপূর্ব্ব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা এবং রীতি বিষয়ে দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।) আবার, ১৮৫৯ সালে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু; উহার পর বৎসরই দীনবন্ধুর নীলদর্পন প্রকাশিত হয়; ইহার পূর্ব্ব চারি বৎসরে নব্যবঙ্গের প্রথম কবি মধুসূদনের রত্নাবলী শর্ম্মিষ্ঠা ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল। মধুসূদন পরবর্ত্তী যুগের কবি; সুতরাং তাঁহার বিষয় স্বতন্ত্র প্রসঙ্গেই আলোচ্য। দীনবন্ধুই বঙ্গ সাহিত্যের শিল্প-ক্ষেত্রে নূতন এবং পুরাতনের সন্ধিস্থল। বাঙ্গালী তখন সবে মাত্র, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে স্বাধীন সাহিত্য-শিল্পের আদর্শে জাগিতেছিল। তাহার ভাষা তখনও সর্ব্বাঙ্গীন যোগ্যতা লাভ করে নাই; 'মেঠো' সুরে এবং নিম্নের গ্রাম-পর্য্যায়ে বিলক্ষণ সমর্থ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু উচ্চকণ্ঠে গান ধরিতে গেলেই, তাহার বীণাতন্ত্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া, কণ্ঠস্বর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। দীনবন্ধুর এবঞ্চ মধুসূদনের নাটকগুলিও তাহার প্রমাণ। কিন্তু দীনবন্ধুর হৃদয়ে আনন্দ আছে; উহা প্রকৃত কবিহৃদয়ের ও কারু-কর্ম্মের আন্তরিক সৃষ্টি-সামর্থ্যজনিত পরিতোষ এবং পরিতৃপ্তি। দীনবন্ধু স্বয়ং হাস্যরসিক, সত্য; কিন্তু উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর ড্রাইডেন, পোপ বা বল্‌টেয়ারের হাস্যরস নহে; গুপ্তকবি কিম্বা কবিওয়ালার ব্যঙ্গভাবও নহে। দীনবন্ধুর হাস্য, সহৃদয় বন্ধুর অপিচ সহানুভূতিশীল কবির বিদ্বেষ বিহীন এবং নির্ব্বিষ উচ্চহাস্য।

এই সময়ের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকৃত প্রস্তাবে সুকুমার নাট্য সাহিত্য রচিত হয় নাই, বলিলেই ঠিক হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর (১) স্বপ্নবিলাস

(১) কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮)।

ও রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি, বৈষ্ণব-কবিগনের ভাবোচ্ছ্বাসকে কথোপকথন-সূত্রে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অপেরা বা গীতিনাট্য। রামবসু (১) হরুঠাকুর (২) রামনিধি রায় (৩) ও দাশরথি রায় (৪) প্রভৃতি কবিগান পাঁচালী ও সংগীত রচনা করেন; তাঁহাদের, এবং রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারগণের মধ্যপথে, কথা-বার্ত্তার সূত্র ধরিয়া এবং জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, বঙ্গদেশে 'যাত্রা' নামক একটী অতি বিপুল সাহিত্যচেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে, এবং এখন যাবৎ অক্ষুন্নভাবে সন্ততি রক্ষা করিতেছে। উহা নানাদিকে ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের ধর্ম্মনাট্যগুলির সমপ্রকৃতিক; কিন্তু উহা এখনও গৌরবান্বিত সাহিত্য-শিল্পরূপে পরিণত হইতে পারে নাই। দীনবন্ধু ও মধুসূদনের নাটকাদিতেই, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কিংবা পূজা প্রচারের সম্পর্কহীন কাব্যরসের প্রথম আভাস পাই। ইঁহারাই বঙ্গে প্রকৃত নাট্য-সাহিত্যের অগ্রদূত; সুতরাং ভাষা এবং শিল্প রসতত্ত্বের প্রাথমিক ন্যূনতা ক্ষীণতাও তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু কবি-প্রতিভার আভ্যন্তরীণ যজ্ঞাগ্নিশিখা সর্ব্বত্র সচেতন, এবং উহাই স্থানে স্থানে স্ফুটপ্রভা প্রসারিত করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে থাকে।

আমরা এস্থলে, বঙ্গসাহিত্যের এবং বাঙ্গালী প্রতিভার স্ফুটজাগরণের পুরদ্বারে, এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাই। ইহার পর, বঙ্গসাহিত্য বিশ্ববাণীসঙ্গতে স্বতন্ত্র গতি অবলম্বন করিয়াছে। ওই নবযুগের এবং যুগস্বামিগণের কার্য্যাদি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। এই স্থানে দাঁড়াইয়া, একবার প্রাচীন সাহিত্যকে সমূহভাবে দর্শন করুন। জর্ম্মন-দার্শনিক ফিক্টে (Fichte) সাহিত্যের ও কাব্যের লক্ষণ অভিন্নভাবে

---

(১)। রামবসু (১৭৮৭-১৮২৮) (২)। হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১৩) রামনিধি (৩)। রায় (১৭৪১-১৮৩৪) (৪)। দশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭)

নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—সাহিত্য মানবহৃদয়ের ধর্ম্মভাবের স্ফুটপ্রকাশ মাত্র "Poetry is an expression of a religious idea দার্শনিক, সাহিত্যের সর্ব্বব্যাপক তত্ত্বকে, দেশকাল পাত্রের অশেষ বিভিন্নতা মধ্যস্থিত অবিচ্ছিন্ন প্রাণতত্ত্বকে ধারণা করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফিকৃটে Religious idea বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালের প্লেটো এবং আধুনিককালের ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতিও Moral idea বলিতে তাহাই বুঝিয়াছেন। ভারতীয় সমাজ-দার্শনিক মহর্ষি মনুও 'ধর্ম্ম' বলিতে দেবসম্পর্কহীন এবং সাম্প্রদায়িক পূজা-সম্পর্কহীন মরেল আইডিয়া বা মনুষ্যত্বই বুঝিয়াছেন। বুদ্ধদেব ও ত্রিরত্নের অন্তর্গত 'ধর্ম্ম সংজ্ঞায় মনুষ্যত্বের এই অসাম্প্রদায়িক লক্ষণই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই দেবানুগ্রহ কিম্বা নিগ্রহের সম্পর্কহীন মনুষ্যত্ব ভাবই বর্ত্তমানের 'বিশ্বসাহিত্য' সংজ্ঞার লক্ষ্য; উহা উনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্টপরিদৃষ্ট আদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীই অন্য বহুবিধ তত্ত্বের ন্যায়, সাহিত্যের এই লক্ষণের খ্যাপন, ব্যাখ্যান এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; অপিচ, উহাকে নানাদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবে অনুসরণ করিয়া গিয়াছে। দৈবসম্পর্ক-হীন মনুষ্যত্ব আদর্শের আদিসাধক রূপে, মানবসমাজের সর্ব্বাদিম স্বাধীনতাগুরুরূপে, ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় ঋষি বুদ্ধদেবকে নির্দ্দেশ করিলে, অত্যুক্তি হয় না। মানবসমাজের এক তৃতীয়াংশ এখনো বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান 'বৈজ্ঞানিক' সভ্যতা-আদর্শের ইতিহাসেও, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র বুদ্ধের আত্মাই কার্য্য করিতেছে, দেখিতে পাই। কিন্তু বুদ্ধের আদর্শ ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে, বা বঙ্গদেশে, মুখ্যভাবে কার্য্যকর হয় নাই, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি; সমস্ত ভারতীয় সাহিত্য উহার গৌণ ফলেই নিয়ন্ত্রিত। ভারতবর্ষে বুদ্ধাত্মা প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে, বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ কিংবা রামায়ণ ও মহাভারত

ব্যতীত, আর কোন সাহিত্য জন্মলাভ করিতে বা রক্ষিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষ বহুশত বৎসর কেবল বৈদিক সাহিত্য লইয়া প্রাণধারণ করিয়া আসিয়াছিল; অপর বাক্যচেষ্টার 'আনর্থক্য' একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া গিয়াছিল। প্রবল পৌরোহিত্য এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবেই এই অভাবনীয় ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষ যাহাকে ত্রেতা বা দ্বাপর যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, পূর্ব্বোক্ত দুই তিন খানি সংগ্রহ গ্রন্থ ব্যতীত, তাহার অন্য কোন সাহিত্য বর্ত্তমান নাই। বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক বিদ্রোহের প্রভাবেই, ভারতে সাহিত্য এবং দর্শনের উন্নতি। উহার ফলেই এতদ্দেশের জনমন যেমন পৌরোহিত্য এবং দেবভীতি হইতে, তেমন নিরেট সাংসারিকতা হইতে ও পরিত্রাণ লাভ করিয়া, নানাবিষয়-গামী হইবার সুবিধা পাইয়াছিল। জনসাধারণের অভ্যুদয় ভিন্ন যেমন সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় হয় না; তেমনি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ভিন্নও ঐ অভ্যুদয়ের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয় না। কেন না, সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্বই মাহাত্ম্যের ভিত্তি। এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট না হইলে, যেমন সাহিত্যশিল্পের, তেমন শিল্পীর মাহাত্ম্যও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দেখা যাইবে, বিধাতা যুগ-পরিচালক কবির আত্মাকে একদিকে পরম সামাজিক, অন্যদিকে পরম অসামাজিক করিয়াই সৃষ্টি করেন। সে সংসারী হইয়াও সংন্যাসী; ভোগী হইয়াও ত্যাগী; জনপ্রবাহের সঙ্গে নির্ব্বিশেষে মিশিয়া গিয়াও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া আসে। এই হেতু, অনেক সময়, সাংসারিক সংকীর্ণতা তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিতে পারে না। প্রাচীন ভারত কিরূপে নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদর্শ এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্য হইতেও কবি-ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিয়া, সমুন্নত সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, উহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ; এবং স্বতন্ত্র ভাবে প্রণিধানের যোগ্য।

মানুষের ভাষাব্যাপারে, সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, উহা বিশেষভাবে, মনুষ্যের ভাববৃত্তির সৃষ্টি। এই বৃত্তি, মানুষের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সত্যকে ভিত্তি করিয়া, এবং মনুষ্যের অধ্যাত্মজগৎ লক্ষ্য করিয়া যে ভাষা ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই সাহিত্য। সুতরাং

সারস্বত ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিশেষত্ব

জ্ঞানাধিকারের দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্র প্রভৃতির প্রকৃতি সাহিত্য হইতে মূলেই বিভিন্ন। সাহিত্য এ সকলকে ন্যূনাধিক অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু উহার স্বাতন্ত্র্য এই ভাববৃত্তির নির্ভরে এবং উহার পরিপোষণেই স্থির থাকে। প্রাচীন কালের সাহিত্য-দার্শনিক প্লেটো প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ পূর্ব্বক উনবিংশ শতাব্দীই সচেতন ভাবে সাহিত্যের এই আদর্শ দর্শন করিয়াছে।

এখন, এই আদর্শ চিন্তা করিলেই দেখিব, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক গ্রন্থ প্রকৃত সাহিত্যসংজ্ঞার অধিকার হইতে স্খলিত হইয়াছিল। দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার কিম্বা পূজাপ্রচারের সঙ্গে সাহিত্যের মুখ্য সম্পর্ক নাই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য বরং মনুষ্যের মাহাত্ম্য প্রচার। মনুষ্যত্বের মধ্যে দেবত্বের পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্টাই সাহিত্যের ফিকৃটে-পরিদৃষ্ট religious idea সাহিত্যের এই উচ্চতম রসনিষ্পত্তি লক্ষ্য করিয়াই, সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন :—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্ব-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ॥

সাহিত্য সত্বের—মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা করিবে; সাহিত্য স্বপ্রাকাশাত্মক চিন্ময় আনন্দের উদ্রেক করিবে; এবং ঐ আনন্দে মনুষ্যমনকে সর্ব্বথা তন্ময় করিবার জন্য শক্তিশালী হইবে। ঐ আনন্দ মনুষ্যহৃদয়ে সচ্চিদানন্দ স্বরূপের, সত্যশিবসুন্দরের—ব্রহ্মের—বৃহতের—অনন্তের যোগাস্বাদ উপ-

নীত করিবে; আদি-করুণ প্রভৃতি মনুষ্যহৃদয়ের স্থায়ীভাবের উদ্দীপনা সাহায্যে, বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যঞ্জনা সাহায্যে ঐ আনন্দ মনুষ্যকে স্বাধীনতায়—স্বীয় তত্ত্বে, ব্রহ্মতত্ত্বে পরিচিত করিবে।

উপরোক্ত কথাগুলি নিবিষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখিবেন, সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র, কিম্বা দর্শন বিজ্ঞান হইতে কতদূর পৃথক্! সাহিত্যের ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে; অথচ সকল ধর্ম্মের সার সত্যই উহার উহার ভিত্তি। সাহিত্যের সত্য কোন ইতিহাসের ঘটনা-নিয়মাক্রান্ত সত্য নহে; অরিষ্টোটল (১) উহাকে ইতিবৃত্ত-অধিকার হইতে উচ্চতর সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ (২) উহাকে সকল সত্যের অন্তঃস্থিত মাধুরীধারা, এবং সকল বিজ্ঞানের বয়ান-মুখে ভাব-সমাবিষ্ট প্রসাদ-মূর্ত্তি (এক কথায়, সত্য-প্রসাদ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞানের, ধর্ম্মের কিম্বা ইতিহাসের সত্য সাহিত্যের অপরিহার্য্য উপকরণ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্তই আনন্দ-নিমিত্তক; এবং আনন্দের লক্ষণই সাহিত্য-সংজ্ঞায় মুখ্য। সাহিত্য উপদেশ উপস্থিত করিতে পারে; কিন্তু, উহা 'কান্তাসম্মিতোপদেশ' (৩)। সাহিত্য-সংজ্ঞার এই বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিকগণ উহাকে মনুষ্যের ভাষাব্যাপারমধ্যে এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে স্থাপন করি-

(1) "Poetry has a wider truth and a higher aim than history; for poetry deals rather with the universal, history with the particular."

(2) "Poetry is the finer essence of all kdowldge" "Poetry is the impassioned expression set in the countenance of all science."

Wordsworth

(3) কাব্যপ্রকাশ।

য়াছেন। আধুনিক কালের দার্শনিকগণও (৪) আনন্দকেই সাহিত্য-লক্ষণে মুখ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই আনন্দের 'বিষয়'কেই সাহিত্যক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য্য'নামে নির্দ্দেশ করা হয়।

এই ভাবে চিন্তা করিলে দেখিবেন, ইয়োরোপের প্রাচীন হইতে আধুনিক পণ্ডিতগণ, কেহই, সাহিত্যের উন্নত আদর্শ ধারণায়, এ দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ হইতে অগ্রগামী হন নাই। পরন্তু, অদ্বৈততন্ত্রের দীক্ষা গতিকে, আদর্শের বিশ্বব্যাপকতায় এবং উহার মাহাত্ম্য-ধারণায়, ভারতীয় ব্রাহ্মণ বরং অধিকতর উচ্চতা প্রদর্শন করিতেছেন।

এখন, সাহিত্যের এই আদর্শে যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক গ্রন্থ উপনীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না; দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াও নহে; পূজা প্রচারই উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ।

সমাজের হৃদয় মধ্যে যতকাল জগৎ-বিষয়ে ভয় প্রবল থাকে, এবং ভীতি-লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম, পুনশ্চ ঐ ধর্ম্মের মধ্যে পৌরোহিত্যই একান্ত ভাবে প্রবল থাকে, ততকাল প্রকৃত সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। সভ্যতার প্রধান লক্ষণ, জগদ্ ব্যাপারে মনুষ্যের নির্ভয় নির্ভর; জীবনতত্ত্বে প্রেম কল্যাণ এবং আনন্দের অনুভব; জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি সত্য-মঙ্গল সৌন্দর্য্য, পবিত্রতার আরোপ; এবং ধর্ম্মে-কর্ম্মে উহারই অনুভব সাধনা। বর্ব্বর-জীবনের

(4) "We may be content to set out with a rough definition of Literature, as consisting of works which, whether in verse or prose, are the handicraft of imagination rather that reflection, and aim at the pleasure of the greatest possible number of the nation rather than instruction and practical effect, and appeal to general rather then specialised knowledge." Posnett.

এবং সভ্য-জীবনের মধ্যে, এস্থলেই নিদানের পার্থক্য। জাতি বিশেষের মধ্যে, বর্ব্বরতা হইতে সভ্যতার দিকে গতিও এইরূপ অনুভূতিপথে অগ্রসর হওয়া বই নহে। সামাজিক ইতর বিশেষের মধ্যে, বর্ব্বর এবং শিক্ষিতের মধ্যেও এই স্থলেই বিভিন্নতা। ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যজাতি সমূহের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই অভিব্যক্তির লক্ষণটাই পরিদৃষ্ট হইবে। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় জাতি, ন্যূনাধিক বর্ব্বরাবস্থা হইতেই হীব্রু সভ্যতা এবং গ্রীক-রোমক সভ্যতার সঙ্গমফলে অভ্যুদিত হইয়া আসিয়াছে। উহাদের সাহিত্য-বক্ষে সর্ব্বত্র এই অভিব্যক্তির প্রবাহ-চিহ্নই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু, উহাদের সমুন্নত সাহিত্য-জীবনও কুত্রাপি *পাঁচশত বৎসরের ঊর্দ্ধ-বয়স্ক নহে।*

বঙ্গভাষাও, অভ্যাগত আর্য্য ভাষা এবং দেশজাত দ্রাবিড় ও কোলেরীয় ভাষার সঙ্গমফলে উৎপন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গালীর গৃহ-ভাষা, তাহার সমাজ এবং ধর্ম্ম ন্যূনাধিক উভয় সভ্যতার লক্ষণই বহন করিতেছে। তাহার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রণালীতেও যে সর্ব্বত্র আর্য্য-দ্রাবিড়ের মিশ্রণ চিহ্নই পরিস্ফুট তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। বিজেতা আর্য্যগণের সমুন্নত জীবন এবং ধর্ম্মের আদর্শে, সংস্কৃত সাহিত্যের রাজচ্ছত্রতলে, ব্রাহ্মণ্য এবং পৌরোহিত্যের প্রভাবে যুগপৎ নিগৃহীত এবং অনুগৃহীত হইয়া, এই জাতি আপনার স্বতন্ত্র সাহিত্য-হৃদয়কে সন্তর্পণে বহন পূর্ব্বক বর্ত্তমান যুগ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। উহার প্রকৃত সাহিত্যোচ্ছ্বাস যে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বৈষ্ণবী প্রথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; উহার মধ্যে মনুষ্যত্বের অবসাদক কিম্বা মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী কোনরূপ ভীতি কিংবা ক্ষুদ্রতার লক্ষণ নাই। মানুষ যখন জগদীশ্বরকে প্রেমময় বলিয়া অনুভব করে, এবং প্রেমবশেই তাঁহার ভজন পূজনের আশ্রয় গ্রহণ

করে, তখনই তাহার ধর্ম্মে, সমাজে, পরিবারে এবং সাহিত্যে প্রকৃত মহাত্মতার সূত্রপাত হয়; তাহার সাহিত্য প্রকৃত জীবন লাভ করে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; তাহাকে মনুষ্যত্বের মধ্যেই দেবত্ব সাধনায়, বিশ্ব-প্রভুত্ব-সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছিল; তাহার সাহিত্যকে অকস্মাৎ বিশ্বতোমুখে বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছিল; গৃহকেই পরিমার্জ্জিত এবং পরিশুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে জীবন-যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করিতে, মনোমধ্যেই দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিতে তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। উহার ফল মহিমাময় না হইয়া পারে না।

মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের প্রীতি-পবিত্রতাময় এবং পরম *বিনয়-মূলক ধর্ম্মের*, অধিকন্তু তাঁহার পরম ব্যক্তিত্বের ছায়াগত হইয়াই, ইয়োরোপীয় জাতি-সমূহ আদিম বর্ব্বরতাকে বর্জ্জন পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইবার *জন্য একটা পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্য সভ্যতার প্রধান 'গুপ্ত মন্ত্র' স্বাধীনতা, এবং সমাজের অন্তর্গত থাকিয়াও ব্যক্তিগত সাধনা।* ইয়োরোপীয় সমাজ তন্ত্রে, যীশুর আত্মাকে এই মন্ত্র-সাধনার অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্যত্বের যে স্বর্গীয় অগ্নিদীক্ষায় এই মহাপুরুষ স্বয়ং দীক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে স্বল্প-পরিমিত শিষ্যমধ্যে উহার উদ্দীপনা করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং ওই সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই পৃথিবী হইতে একদা পরম অগৌরবে ও নগণ্য-ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, উহাই পরকালে সমগ্র ইয়োরোপকে নবজীবনের অগ্ন্যুপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছে; ইয়োরোপের বিপুল মনুষ্যসমাজকে ঐ অকিঞ্চনের রাজচ্ছত্রতলে নতশির করিয়া সমবেত করিয়াছে; তাঁহার বিন্দুদুটি হৃদয়রক্তই এখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া, *পশুত্বের কিলিবিলিময় নর-সংঘকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্যস্বপ্নে বিভোর* করিয়া তুলিতেছে! বঙ্গদেশে বুদ্ধদেবের মহান্ স্বাতন্ত্র্যবাদ, ত্যাগ

এবং দুঃখ-বৈরাগ্য মূলক নিবৃত্তি-ধর্ম্মের আদর্শ মুখ্য ভাবে কার্য্যকর হইতে পারে নাই, বাঙ্গালীকে জাগাইতে পারে নাই, উহা আমরা দেখিয়াছি। শ্রীচৈতন্তের প্রেমসঙ্কীর্ত্তনেই তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিল! চৈতন্তের চরিত্র নানাদিকে যীশুর প্রীতি-পবিত্রতা এবং বিনয়-মধুরতার সহোদর। শ্রীচৈতন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি; তাই বুঝি চৈতন্য-আবির্ভাবের-পূর্ব্বেই বাঙ্গালার 'প্রেম-সিদ্ধা' প্রথম-কবি কল্প-লোকে তাঁহার ছায়ামূর্ত্তি দর্শনকরিয়াছিলেন! (১) পরে পরে, যখন উহার প্রকট আবির্ভাব হইল, তখন এই দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরম পরিচয়োল্লাসের জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল; শত শত হৃদয় হইতে প্রেমগঙ্গা-প্রবাহ নিঃসারিত হইয়া উহার ভাষা-সাহিত্যের শুষ্কবক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর মহাকালী ও *প্রীতিকোমলতার এবং করুণার আদর্শে* ভক্তগণের হৃদয়ঙ্গম-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেন; বজ্রকণ্ঠ শাক্তগণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী তন্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসাদী সুর-সাধনায় তদ্গত হইলেন! *বৈরাগ্য সাধনায় কঠোর-শুষ্ক ও রক্ষণশীল বাঙ্গালী-হৃদয় অনুরাগতন্ত্রের নবউন্নতিশীল* উপনিষদ্ *গান করিয়া নাচিতে* লাগিল।

বলা বাহুল্য, বঙ্গসাহিত্য এই পথে ন্যূনাধিক বহির্মুখিন রসের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আদিরসের ক্ষেত্রেই সবিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল—দেবাদি বিষয়ক প্রীতিও আদিরসের অন্তর্গত। কিন্তু, এই আদিরসেও কোনরূপ বিশিষ্ট আন্তরিকতা ব্যাপকভাবে সুসিদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নিধুবাবু ও রামপ্রসাদ -সেনই, আধুনিক-সম্মত ভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। রসের বিষয়ে জাগ্রৎ-গভীর আন্তরিকতা নানামতে

(১) আজু কেগো মুরলী বাজায় এ'তো কভু নহে শ্যামরায়!
এর গৌর বরণে করে আলো চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিলো। চণ্ডীদাস।

আধুনিক, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কোন প্রাচীন সাহিত্য সচেতন ভাবে উহাকে লক্ষ্য করে নাই। ইহা নিশ্চিত যে, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বা ভবভূতি, হোমর, সফোক্লীস বা দান্তে সকলেই গভীর আন্তরিকতা সিদ্ধি করিয়াছিলেন—কোন প্রকৃত কবি, সজ্ঞানে বা অতর্কিতে আন্তরিক না হইয়া পারেন না। অর্থের বাহ্যিক চটক কিংবা রসের বহির্ম্মুখী-স্ফূর্ত্তিই রচনার একান্ত ফল হইলে, কেহই কবিসংজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত কবি মাত্রেই নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং আপন প্রকৃতিস্থ হইয়াই, আপন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে সঙ্গীত উৎসারিত করেন, এবং পাঠকের হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই কারণে, তাঁহাদের রচনা চিরমানবের জন্য সত্য, সুন্দর এবং আন্তরিক না হইয়া পারে না। এইক্ষেত্রে, অন্তর্লোকবাসী এবং অন্তর্যোগী হওয়াই প্রথম কথা। কিন্তু, ইউরোপ, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ, সাহিত্যক্ষেত্রেই নানাদিকে সচেতন ভাবে প্রতিভার 'কল' চালাইয়াছে। ইয়োরোপে কাব্যতত্ত্বের সমালোচনা গ্রন্থ এত সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, ঐ ভূখণ্ডে এখন কাব্যলেখক মাত্রেই শিক্ষা সাহায্যে কিছু-না-কিছু আন্তরিক হইতে এবং সাহিত্যসভ্যতার একটা সাধারণ উন্নতি-ভূমি লাভ করিতে পারিতেছেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিতার একটা প্রধান লক্ষণ, উহার সতর্কধ্বনি বা অন্তর্মুখিতা। ভাব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের বহুপ্রচলন গতিকেই আধুনিক সাহিত্যের এই আন্তরিকতার লক্ষণ কোন কোন দিকে অভ্যাসসিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। আধুনিক কবিতা বলিতে, আমরা, এই আন্তরিক গভীরতা-সিদ্ধ, উপরন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বসিদ্ধ কবিতাই বুঝিতেছি।

কিন্তু, তাই বলিয়া, প্রকৃত সাহিত্য-শিল্পের সৃজন বা উপার্জ্জন যে আধুনিক কালে বিশেষ আধিক্য লাভ করিয়াছে, এমন কেহ মনে করিবেন

না। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পীর সংখ্যা, প্রকৃতকবির সংখ্যা চিরকালই পরিমিত। এই বিষয়ে সহস্র বৎসরের বৃদ্ধ কবি-

প্রকৃত মাহাত্ম্যের স্বল্পতা।

নিবহ হইতে আধুনিক কবি যে প্রকৃত প্রস্তাবে সবিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন, বা তাঁহাদিগকে সকল দিকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, এমন কেহ মনে করিবেন না। কবির মাহাত্ম্য, তাঁহার স্বসিদ্ধ শিল্প-কৃতির উপরেই নির্ভর করে। দ্বিতীয় শকুন্তলা বা মেঘদূত রচিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রে কেহ কালিদাসকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ও পারিবেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শিল্পের মাহাত্ম্য চিরকাল উহার ভাবতত্ত্ব এবং বিষয়-সামঞ্জস্যের উপরেই নির্ভর করে। এই তিনবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, এমন কি, কল চালাইতে জানিয়াও, আধুনিক কবি বাল্মীকি কালিদাসকে বা হোমর সফোক্লিসকে তাঁহাদের নিজের ক্ষেত্রে অতিক্রম করিতে পারিবেন না, বলিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করিতেছি না। জ্ঞান মাত্রেই আয়াসসাধ্য—বিদ্যাসাধ্য; কিন্তু, সামঞ্জস্য-বুদ্ধি চিরকাল কবি-আত্মার সহজাত, বিভুকৃপাজাত পদার্থ—এবং উহার মধ্যেই কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার রহস্য টুকুন নিহিত। এই অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্যের গতিকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পের অনির্ব্বচনীয় শক্তি; দেশ কাল ভেদে, পাত্র ভেদে তাহার অর্থতত্ত্ব বা সৌন্দর্য্য চিরকাল নব নব রূপে মনুষ্যের মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়; সহস্র সহস্র বৎসর পরেও অকস্মাৎ অতর্কিত অর্থসংকেতে নবরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। আধুনিক কবি অভিজ্ঞতা-সাহায্যে, একে একে ভাবুক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক কিম্বা বিষয়-নিপুণ হইতে পারেন, কিন্তু, শিল্পীর অনির্ব্বচনীয় জীবনাত্মা লাভ করাই সৌভাগ্যজনিত বলিয়া, শিল্পের নামরূপের রহস্য, লাভ করা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা, বা স্রষ্টা হওয়াই কঠিন। এই মূল-গত অভাবের গতিকে, প্রকৃত সাহিত্যার্জ্জন প্রাচীন

কালেও যেমন পরিমিত, আধুনিক কালেও তেমনই পরিমিত রহিয়াছে। কোন পণ্ডিত বিদ্যাসাধনার বলে, নির্ভুল, মার্জ্জিত বা বিশুদ্ধ কাব্য রচনা করিতে পারেন, সময় সময় ভাবতত্ব বা সৌন্দর্য্য বিষয়ে পরম গভীরতাও লাভ করিতে পারেন; তৎসত্বেও, প্রকৃত দার্শনিকের চক্ষে, তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টির ছায়াবাদিতা, নিঃসারতা এবং নির্জ্জীবতা দৃষ্টি মাত্রেই প্রকটিত হইয়া যায়। ওই অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যের দরুণেই, শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার দুর্লভতা সাহিত্যজগতে চিরকালের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

সেইরূপ, কবি-মাহাত্ম্যের দ্বিতীয় লক্ষণ উহার স্বাধীনতা বা নিজত্ব। দৃষ্টান্তের জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করুন। মেঘদূতের যক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে কালিদাসেরই কবি-আত্মা। এই আত্মা বিশ্ব মনুষ্যের গড্ডালিকা প্রবাহে অপরূপ দুর্লভ এবং নিজের অমৃত রসেই মধুর! কালিদাসের কবিতার মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মার যে নিসর্গ-উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বল-মধুর আনন্দ-স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য করিতেছি উহা সাহিত্য-লোকে পরম মহার্ঘ। এই মহার্ঘতার উপরেই কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা। বাল্মীকির ভিতরে যেই রসমধুর মহানুভবতা দেখিতেছি, ব্যাসের মধ্যে যেই বিশ্ববিলজ্বী দীপ্তবর্ব্বর বিজ্ঞানী আত্মার পরিচয় পাইতেছি—রামায়ণ মহাভারতের অধ্যয়নফলরূপে যাহা হৃদয়ে চিরকালের জন্য বসিয়া যাইতেছে, তাহাও সাহিত্যের অধ্যাত্ম-লোকে চিরকালের দুর্লভ পদার্থ। *অন্তরাত্মার ঐকান্তিক বিশেষত্ব গুণেই চিরকাল কবির মাহাত্ম্য— প্রকৃত সাহিত্য-রসিকের নিকট ইঁহাদের মাহাত্ম্য কদাপি খর্ব্ব হইবার নহে।* মনুষ্যজাতি চিরকাল, হৃদয়ের ঋজুবৃষ্টি-সিদ্ধ ভাব-সত্যের আদিম গোমুখী ধারায় অবগাহন কল্পে ইঁহাদের শরণাগত হইতে বাধ্য হইবে। ইহাদের শিল্পসৃষ্টির অংশবিশেষ অনুসৃত, অনুকৃত, এমন কি, স্থানে স্থানে

অতিক্রান্ত হইতেও পারে; কিন্তু, সিদ্ধশিল্পের অন্তরঙ্গীয় বিশিষ্টতা চিরকাল পরকীয় করামর্ষের বহির্ভূত; স্বকীয় বর্ণ-ধর্ম্মে, কবি-জীবনের ফলস্বরূপ কবি-কর্ম্মে, ইঁহারা যেমন গরিষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়, তেমনি অননুকরনীয় এবং অনতিক্রম্য হইয়া রহিয়াছেন।

আধুনিক কবিতাকে অতি-প্রবুদ্ধ বলিলেই উহার একটা প্রধান লক্ষণ বিশেষিত হয়। এই অত্যন্ততার দরুণ আধুনিক কবিতা নানাদিকে সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত বুদ্ধিজীবী হৃদয়হীন এবং নিরাকার হইয়া পড়িতেছে। আনন্দের কিম্বা রসের নিষ্পত্তি বিষয়েও নানাদিকে কৃত্রিমতার, সুদূরতার এবং দীর্ঘ-বিলম্বিত পাকচক্রের আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক কবিতার দোষগুণ আমরা পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে, স্থল বিশেষে দৃষ্টি করিতে পারিব।

ইংরাজাধিকার হইতে ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, প্রকৃত প্রস্তাবে উহার গদ্য-পরিপুষ্টির ইতিহাস। গদ্যরীতির পরিপুষ্টি এবং পরিণতির দ্বারাই, ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন মাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়। পদ্য-শক্তি ভাষার অ-সাধারণ বিভাগের অন্তর্গত; উহা চিরকাল অসামান্য প্রতিভা-ঘটনার এবং জাতীয় সৌভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে। ভাষার গদ্য-সমৃদ্ধি এবং উহার অষ্ট-প্রহরীয় মতিরতি বিচার করিয়াই সকল সময় সমগ্র জাতির সভ্যতা এবং উহার মর্য্যাদা পরিমাপিত হইয়া থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর হইতে গদ্যই, জাতিমাত্রের সাধারণ জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাবের আধার রূপে পরিণত হইয়া, তাহার অতীতের দর্পণ, বর্ত্তমানের সহচর এবং ভবিষ্যতের গুরু হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা দেখিয়া আসিলাম এ ক্ষেত্রেও বঙ্গসাহিত্য যাহার সূত্রপাত করিয়া আসিয়াছে, এবং যাহা সমাধা করিয়াছে, তাহা সম্যক

উপসংহার।

বিচার করিলে, জগতের অন্যজাতি সমক্ষে বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার; মৃত্যুঞ্জয়, কৃষ্ণমোহন ও ভূদেব; হুতোম, টেকচাঁদ, রামকমল ও দীনবন্ধু, দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয়কে বিশ্বমনুষ্যের সভ্যতা-সামাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

গদ্যে এবং পদ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী আদর্শ।

বলা বাহুল্য, এ কালের পদ্যও গদ্যের লক্ষণাক্রান্ত। *মদনমোহন,* রঙ্গলাল, হরিশ্চন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ড্রাইডেন, পোপ, জনসন প্রভৃতির সমধর্ম্মা বই নহেন। বাঙ্গালী কবিগণ তাঁহাদের কাব্যাদর্শেই পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্গের বীণাপাণিকেও স্পষ্ট-পরিচ্ছন্ন পদগতি, পরিমার্জ্জনা, সংস্কার এবং সংযত প্রসাধণ-কলায় 'সমর্থ' করিয়া নবযৌবনের লীলাভূমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল সুকৃতি সন্তানের কর্ম্মফল হইতেই ভবিষ্যতের উপজীবিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গ সরস্বতী প্রসারিত রঙ্গভূমির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আমরা এই পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের স্বকীয় এবং পরকীয় ঐশ্বর্য্য অপিচ, উহার উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র অনুধাবন করিয়া আসিলাম; উহার যৌবন পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনা-চর্য্য, সৌন্দর্য্য এবং কৌলীন্যের চিন্তা করিয়া আসিলাম। অতঃপর, বঙ্গসাহিত্য এই উদ্যোগ-সূত্রের অনুসরণে কিম্বা অর্জ্জিত মাহাত্ম্যের পরিবর্দ্ধনে, কোন্ দিকে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোথায় দাঁড়াইয়াছে, এবং উহার ভবিষ্যৎ কি তাহারই রেখাপাত করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশ।

বস্তু সংক্ষেপ।

১। মনুষ্যের ধর্ম্মভাব এবং সাহিত্যের প্রবৃত্তি—ধর্ম্মভাব ও নবযুগের বঙ্গ সাহিত্য—প্রাচীণ বঙ্গ সাহিত্য ও তাহার মূলসূত্র—বঙ্গসাহিত্যের নূতন আদর্শও নূতন ধারা—মধুসূদন দত্ত—মধুসূদনের কবিত্ব লক্ষণ—বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের স্থান—সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক রীতি—হেমচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান—বঙ্গসাহিত্যে বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্রের হৃদয়—বঙ্কিমচন্দ্র ও নব সাহিত্যধর্ম্মের প্রচার—বাঙ্গালা গদ্য—বঙ্গদর্শন—বঙ্গে কথা সাহিত্য—বঙ্গীয় উপন্যাসের সীমা—বঙ্গসমাজে মনুষ্যত্বআদর্শের সীমা—বঙ্কিমের উপন্যাসের কেন্দ্র এবং পরিধি,—এই যুগের কথা লেখক গণ—বঙ্কিমচন্দ্রে 'হিন্দু' আদর্শ—এই আদর্শের অপর লেখকগণ—সাহিত্যসূত্রে মধু হেম বঙ্কিম—বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্র—নবীনচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য—রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি; হিন্দুআদর্শের নব উত্থান—নবীনচন্দ্রের দোষে গুণ—ওই সময়ের অপর কবিগণ।

২। বঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের দ্বিতীয়স্তর: উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব—শিল্পরচনার তিন দিক—পূর্ব্বাপর কবিগণের মধ্যস্থিত সামঞ্জস্যসূত্র—স্বাধীনতার আদর্শ এবং খণ্ড কাব্য—খণ্ডকাব্যের বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি—মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ পরিণতি—আধুনিকসূত্রে উহার সঙ্গতি—বঙ্গসমাজে আধুনিক খণ্ডকবিতার স্থান—আধুনিক খণ্ড কবিতার দোষ—নবকাব্যসূত্রে বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের উন্নতির মূল কারণ—সঙ্গীত আদর্শ এবং চিত্র আদর্শের মধ্যপথিক রবীন্দ্র নাথ—রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ ও বিশেষত্ব—আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যসূত্রে রবীন্দ্র নাথ—রবীন্দ্রের দুইটি কাব্য—রবীন্দ্রের মধ্যে ফরাসিস এবং জর্ম্মণ প্রভাব—রবীন্দ্রের মধ্যে দেশীয় প্রভাব—বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রের মাহাত্ম্য—রবীন্দ্রনাথের শিল্পদোষ—পাঠক সম্বন্ধে অনধিকার দোষ—রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকৃতি এবং উহার দাবী।

৩। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য—কাব্যে আধুনিক গীতি কবিতা বা ভাব-তত্ত্বগত কবিতা—ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় ভাবুকতা—বর্ত্তমানের দোষ-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল—ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শ—অপর কাব্য লেখকগণ—সাহিত্যে অনুবাদ, বঙ্গসাহিত্যে তাহার অভাব—বঙ্গদেশীয় আদর্শের কবিতা।

৪। উপন্যাস—ক্ষুদ্র গল্প—সঙ্গীত—হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত—নাট্যকাব্য—আধুনিক সাহিত্যের হানি ও অপচয়—নাট্যসাহিত্যের অপচয়—হাস্যরসাত্মকনাটক—সাময়িক পত্রিকা—সমালোচনা—বাঙ্গালা গদ্য—বঙ্গসমাজে সভ্যতার 'বৈজ্ঞানিক যুগ' প্রবর্ত্তন লাভ করে নাই—বিস্তারিত মানবত্ব সাধনার অভাব—বিশ্বসাহিত্যের সাধারণ সমতল—বঙ্গে তাহার জ্ঞানাভাব—বঙ্গসাহিত্যের অন্তরায়—বঙ্গসমাজের আশা সাহিত্যে—উপসংহার—বঙ্গসাহিত্যের অভাব—সাহিত্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব ও দায়িত্ব—জাতীয়তার আদর্শ ও বঙ্গসাহিত্য—বঙ্গসাহিত্যের আশা।

বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশ।*

মনুষ্যের সাহিত্য এবং শিল্প চিরকাল ধর্ম্মভাবের সূত্রেই অভ্যুদয় লাভ করিয়া এবং কালে কালে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যজীবনের প্রধান পরিচালক এই ধর্ম্মভাব—প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরাল-গত অজ্ঞাত এবং অপ্রাপ্তের প্রতি মনুষ্যের আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং আহ্বান।

মনুষ্যের ধর্ম্মভাব এবং সাহিত্য প্রকৃতি

এই আকাঙ্ক্ষাই ক্রমে 'মানবীকরণ' এর প্রণালী অনুসরণ পূর্ব্বক, ওই চিরকালের অজ্ঞাত এবং অপ্রাপ্তকে পরিস্ফুট মনুষ্য-আকারে অথবা মানবীয় লক্ষণে পরিকল্পনা করিয়া, উহাকে হৃদয়ের নিকটতর করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অধ্যাত্ম জগতের এই 'মানবীকরণ' প্রণালীই

* এই প্রবন্ধ ১৩১২ সনের সাহিত্যে, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। বর্ত্তমানে সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া ১৯১০ ইং সন পর্য্যন্ত মোটামোটি ৫০ বৎসরের বঙ্গ সাহিত্য ইহার মধ্যে পরিদর্শন করা গিয়াছে।

সাহিত্যের 'পৌরাণিকতা'; এবং সারস্বত ক্ষেত্রে উহাই আধুনিক কালের উন্নত সাহিত্যের জননী। প্রাচীন মনুষ্যের হৃদয় সকল দেশে পরিস্ফুট ধর্ম্মভাব হইতেই পরম আবেগ-প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া তাহার শিল্প এবং সাহিত্যকে ঈশ্বর-স্তুতি রূপে আকারিত করিয়াছিল। মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চভাব, তাহার হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চশিখর এই ঈশ্বর-স্তুতি! প্রাচীন গ্রীস রোম কিংবা ভারতবর্ষের সাহিত্য-শিল্পও উহারই সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং প্রাচীন-সাহিত্য প্রাচীন-মনুষ্যের ধর্ম্মের ন্যায়, অনেক দিকেই দেশকাল-গত সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক-কালে বিজ্ঞান-দর্শনাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-সংঘের মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধের গুরুশিষ্যভাব এবং আদান-প্রদান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, মনুষ্য-হৃদয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অধিকৃত দুর্লঙ্ঘ্য রীতিনীতির কবল হইতে নানাদিকে উদ্ধার লাভ করিতে চাহিতেছে। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শও ধর্ম্ম-আচার সম্বন্ধীয় এবং সংপ্রদায়-ঘটিত সমস্ত সীমা-সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, নির্ম্মল আনন্দ-স্বরূপে মূর্ত্তিমান্ হইবার জন্য চেষ্টিত আছে। বলা বাহুল্য, এই আনন্দের নাম ও প্রকারান্তরে স্তুতি। সুতরাং এখনও সমুন্নত সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে, গৌণ বা মুখ্য ভাবে এই স্তুতির লক্ষণই প্রবল হইয়া আছে। *

এই ধর্ম্ম-আদর্শের পৌরাণিকতা বা পূজা-প্রচারের সংশ্রবে থাকিয়াই যে বঙ্গসাহিত্য আদিকাল হইতে উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে; এবং কিছু পূর্ব্বেও যে মুখ্যতঃ ধর্ম্মের সংশ্রবেই বঙ্গভাষা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। আরও দেখিয়াছি যে, সাহিত্যের শক্তি, উহার স্থায়িত্ব কিংবা অপরিহার্য্যতা অনেকাংশে যেরূপ গদ্যের

* মহামতি Ruskin এই মতের বশবর্ত্তী হইয়াই বলিয়াছেন—all art is praise—লেখক।

উপরে নির্ভর করে, ইংরাজের পূর্ব্বে তদ্রূপ গদ্য বঙ্গভাষায় ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মপ্রচারউদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন—সরস্বতীকেই নবধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য সহায়রূপে অবলম্বন করেন। এ দেশের হৃদয়-সম্মত, অথচ নিদারুণ সরল-ভেদী এবং অভিনব এই অস্ত্রাঘাত! যীশুখ্রীষ্টের পরম উদ্দীপনাময় অথচ বিনয়নম্র বীরচরিত্রই নবধর্ম্মের প্রধান শক্তি! উহা অভিনব সংপ্রদায়সংঘ এবং মুক্তির আদর্শে জাজ্বল্যমান হইয়া দেব-গুরু-বাদী অথচ নিভৃত সাধনাপ্রিয় এবং মূর্ত্তি-পূজক বাঙ্গালীর হৃদয় কবাটে আঘাত করিল! ওই আঘাতে আমাদের স্থিতি-নিষ্ঠ সমাজের মর্ম্ম-স্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল! এ কি অপূর্ব্ব আত্ম-নির্ভর অথচ পিতৃ-নির্ভর, আত্মত্যাগী এবং প্রাণত্যাগী মনুষ্যত্বের আদর্শ! এ কি অপূর্ব্ব সংসার-ধর্ম্ম-প্রবণ বৈরাগ্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা *বিশ্বপ্রেম এবং মুক্তির আদর্শ! খ্রীষ্টধর্ম্ম, বিশেষতঃ লুথরের অভিনব প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম নিজের এই দিক দেখাইয়াই বাঙ্গালী শাক্ত-বৈষ্ণবের* সহানুভূতি আকর্ষণ করে! খ্রীষ্টধর্ম্ম ক্রুশবিদ্ধ যীশু-তত্ত্বের ওই পরমপূজ্য পৌত্তলিকতার পতাকা তুলিয়াই বাঙ্গালী পৌত্তলিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে! বলা বাহুল্য ওই পতাকা একরূপ বিশ্বজয়ী এবং উহাকে কেবল ভারতবর্ষে আসিয়াই, পূর্ব্বকালে আলেকজান্দরের ন্যায় নিজের উচ্চ-আকাঙ্খার সমক্ষে যৎকিঞ্চিৎ সীমা বাধা সহ্য করিতে হইয়াছে! খ্রীষ্টধর্ম্ম নিজের বিনম্র বীরত্ব, ত্যাগ এবং পিতৃ-নির্ভরের মাহাত্ম্যেই প্রাচীন হেলেনিক এবং রোমক আদর্শকে—প্যাগান আদর্শকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ইয়োরোপের হৃদয়টাকে একচ্ছত্রে অধিকার পূর্ব্বক, পরিশেষে ধর্ম্মসভ্যতার মাতৃভূমি ভারতবর্ষের বক্ষে আসিয়াই জয়ধ্বজা উত্তোলিত করিয়াছে! এই নব সভ্যতার, নব ধর্ম্মের এবং মনুষ্যত্বের

আদর্শ—এই গুপ্তমন্ত্র বিহীন এবঞ্চ স্পষ্টবাদী ধর্ম্মের আদর্শ! ইহা অর্দ্ধচন্দ্র পতাকীর ন্যায় অসি-চালনা অবলম্বন না করিয়াও, মনুষ্যের হৃদয়-মর্ম্মে অতর্কিতে ক্রুশধ্বজা নিখাত করিতে এবং তাহাকে অনায়াসে শান্তদান্তে বিনত করিতে পারে! ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-হৃদয় জগদ্-বরেণ্য হইলেও, এবং জগতের অন্যজাতিকে নানাবিষয়ে তাহার অনেক কথা শিখাইবার থাকিলেও, ওই নবাগত ধর্ম্ম, মানবত্ব, সমাজ এবং সংসারের আদর্শ বিষয়ে ইয়োরোপের নিকটে তাহারও অনেক কিছুই শিখিবার আছে! সমতা-*নিষ্ট বিশ্বপ্রকৃতি* তাই বুঝি নিদারুণভাবে বৃদ্ধ ভারতবর্ষকে অর্ব্বাচীন ইয়োরোপের শিষ্যতায় আনয়ণ করিয়াছেন! এই শিক্ষার ব্যাপার নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া সমাধা করিতে না পারিলে, বিশ্বজীবনের সহিত যুগোচিতভাবে *সামঞ্জস্য* ঘটাইতে অক্ষম হইলে, ভারতবর্ষ কখনও আত্ম-উদ্ধার *পথে 'ঋত' দেবতার, কিংবা নিয়তি দেবতার অনুমোদনা লাভ করিতে* পারিবেন না। পশ্চিমের ঈদৃশ আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপেই বঙ্গদেশে বীরপুরুষ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। কেবল ওই আঘাতটি সামলাইবার উদ্দেশ্যে, কোনরূপ পর-জয় লক্ষ্য না করিয়া কেবল আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গসমাজের হৃদয় রামমোহনের সংঘটন করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের অনুসরণে আপাততঃ উপাসনা প্রণালীকেই মুখ্য সংস্কাররূপে লক্ষ্য করিয়া এই আবির্ভাব! এই রামমোহনই বঙ্গীয় গদ্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একদিকে উপনিষদ্ এবং বেদান্ত প্রভৃতি সমুচ্চ দার্শনিক গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষাকে উচ্চ আশায় এবং জ্ঞান-গবেষণার মাহাত্ম্যে উদ্বোধিত করেন; আবার, অন্যদিকে, ঐশ্বর্য্যময়ী ইংরাজী ভাষাকেও জনসাধারণ্যে প্রচলিত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিয়া যান। এইরূপে, বঙ্গদেশে নানামতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিশ্ব-জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে!

উহার ফলেই, ক্রমে বাঙ্গালীর হৃদয় ঐকান্তিক প্রাচীন-নিষ্ঠার এবং রক্ষণশীলতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আধুনিক আদর্শের মানবত্ব এবং স্বাধীনতার জন্য প্রয়াসী হইতে পারিয়াছে। বঙ্গের সাহিত্যমধ্যেও প্রাচীন সংস্কৃতের এবঞ্চ বিশ্বসাহিত্যের ভাবপ্রবাহ সম্মিলিত হইয়া উহাকে এক অভাবনীয় নবজীবন দিয়াছে; বঙ্গীয় সরস্বতী এসিয়া এবং ইয়োরোপের দুইটি সু-চিহ্নিত ভাবস্রোতের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সাহিত্যজগতে স্বকীয় পদবী খুঁজিয়া লইবার আশা করিতেছেন।

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রকৃত প্রস্তাবে ছন্দোময়ী কবিতা; অপিচ, প্রাচান কবিগণের প্রকৃত সাহিত্য আদর্শও ছিল না। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী ব্যতীত নিখুঁত সাহিত্য-নামের উপযুক্ত খণ্ড কবিতাও প্রাচীন সাহিত্যে বিরল। তখনকার কবিগণ প্রায়ই স্বপ্নে আদিষ্ট হইতেন; এবং দেবদেবীর পরিতোষ উদ্দেশ্য করিয়াই কাব্য রচনা করিতেন। ধর্ম্মের একপ্রকার অঙ্গাবরণ জড়াইয়াই তাঁহাদের লেখাগুলি প্রকাশ করিতে হইত—বিদ্যাসুন্দরের মত পুস্তকও দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন ধর্ম্মেরও তেমন-কোন প্রচলিত উচ্চ আদর্শ ছিলনা—স্তবস্তুতি এবং পূজা-অর্চ্চনাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ছিল। চরিত্রের স্থৈর্য্য মাধুর্য্য কিংবা পবিত্রতা, চিত্তের স্বাধীনতা আত্মনিষ্ঠা কিংবা নৈতিক বল সাধারণের ধর্ম্ম-আদর্শের মধ্যে কোথাও উদ্দিষ্ট ছিল না—অন্ততঃ, উহা কবিকল্পনাকে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। শিব আশুতোষ; সময় সময় একএকটা দৈত্যদানবকে বর দান করিয়া সৃষ্টিটাই বিপন্ন করিয়া ফেলিতেন; দুনিয়ার যত চোরডাকাত ভবানীকে দুটা-একটা ছাগমুণ্ড দিয়াই অবাধে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। অন্তলোকের কথা বলাই বাহুল্য, সাহিত্যালোকে তাহাদের কোনও বিচার ছিল না। রামায়ণ

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও তাহার মূলসূত্র।

মহাভারতের প্রাচীন আর্য্য-আদর্শ—'যতোধর্ম্ম স্ততো জয়'এর আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে নানাদিকে বিপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। দেবতা-ভক্তগণের মৃত্যুকালে কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিবদূত, অথবা নিজ-নিজ ইষ্ট-দেবতার ধাম হইতে কোন প্রবলতর 'দূত' অবতীর্ণ হইয়া, বেচারা যমদূত গণকে লগুড়াঘাতে তাড়াইয়া ভক্তকে মোক্ষধামে লইয়া যাইত! যখন দেশে সাহিত্যের আদর্শ কেবল ধর্ম্ম-শিক্ষা, এবং ধর্ম্মের প্রচলিত আদর্শও কেবল দেবদেবী-ভক্তি এবং পূজা-অর্চ্চনা, তখন দেবদেবীর আদর্শও যদি হীন হয়, তাহা হইলে, সাহিত্যকে এক স্রোতে পাতাল-মুখেই গমন করিতে হয়। সুতরাং, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মতি গতি এবং রুচি ইংরাজের প্রভাব পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক নিম্নাভিমুখীই ছিল। ধর্ম্মশিক্ষাই সাহিত্যের আদর্শ থাকায়, যেমন ধর্ম্মের তেমন সাহিত্যেরও প্রকৃত মূর্ত্তি পরিব্যক্ত হইতে পারে নাই। কবিগণের প্রতিভা স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ কিংবা প্রণোদনা কিছুই লাভ করে নাই। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, শক্তি দেবতাগণের—চণ্ডী কিংবা মনসা প্রভৃতির মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, চৈতন্তের জীবন কথা বা বিদ্যাসুন্দরের আখ্যান—এই কয়টি পদার্থই স্থূলতঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রাচীন কালের শত-শত কবি সম্মিলিত হইয়া, এক-একটি বিষয়ে এক-একখানি কাব্যমাত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করায়, তাঁহারা কল্পনাশক্তিকে অবাধে মৌলিক কিংবা অপরিচিত পথে পরিচালিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারা নিজের স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিতে কিংবা পরকীয় কাব্যসম্পত্তি অধিকারীর ক্ষতি পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে, অপরূপ ধর্ম্ম-সঙ্গত চৌর্য্য-বৃত্তির বশে, এবং সাম্প্রদায়িক আদর্শে বঙ্গসাহিত্যের এক-একটা কাব্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

কোনরূপ জাতীয়তার আদর্শে কিংবা বিপ্লবের আদর্শেও পরিচালিত না হওয়ায়, ব্যাক্তিগত শক্তি সামর্থ্যের বা স্বাতন্ত্র্যের উপর আস্থা না থাকায়, বরং পদে-পদে ভাগ্য দৈব অথবা দেব-দেবীর প্রসাদের উপরেই প্রবলভাবে নির্ভর করায়, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শও অবাধে পরিপুষ্ঠ হইতে পারে নাই। চন্দ্রধর প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রমিথিয়স্। কিন্তু, মানবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ত কবির উদ্দেশ্য ছিল না! তাই চন্দ্রধরকে মনসার হস্তে পরাজিত হইতে হইয়াছিল; সাহিত্য লোকের একটি অত্যুন্নত বীরপুরুষকে লৌকিক বিশ্বাসের যূপমূলে বলি দেওয়া হইয়াছিল। এই আদর্শে কবিকঙ্কণও কালকেতুর বীর চরিত্রকে ভীরুতা এবং কলঙ্কের অতলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। এতদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসকল কবি মানবজীবনের অথবা সাহিত্যের কোনও উন্নত আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া কাব্য লিখিতে বসেন নাই। দেবদেবীর অখণ্ডিত মাহাত্ম্য-প্রচারই তাঁহাদের লক্ষ্য। তাই, দেবদেবীর প্রচণ্ড পীঠ-স্থানে বারংবার মহাবলি চলিয়াছে; এই উপলক্ষে কেবল গৌণভাবে কবিত্ব ফুটিয়াছে, বই নহে। উহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক আদর্শ; তবে, নানাদিকে আধুনিক সাহিত্য-আদর্শের জন্মদাতা!

বঙ্গসাহিত্যে নূতন আদর্শ ও নূতন ধারা।

আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বীরাদর্শের নবোদিত সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের সমুন্নত ললাটেই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই রামমোহনের হৃদয়েই প্রথমে সাহিত্যের শুভ্র আদর্শ সমুদিত হয়। সেই আদর্শের আবির্ভাব ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে ভাব-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যরীতি বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অথবা মুসলমান জাতির সংশ্রবে শত শত বৎসরেও যাহা ঘটিতে পারে নাই এক ইংরাজী সাহিত্য অল্পকাল

মধ্যে, অতর্কিত ভাবে এবং আপাততঃ দাক্ষিণ্য-আচরণ পূর্ব্বক তাহার সহস্রগুণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। বঙ্গদেশের অপিচ ভারতবর্ষের মনোলোকে এই অতর্কিত মহাবিপ্লব প্রত্যেক সাহিত্য-চিন্তক ঐতিহাসিক বা দার্শনিকের পরম আলোচনার বিষয়—কিন্তু, সমস্ত দেশ ন্যূনাধিক অতর্কিত ভাবে এই স্রোতের বশে ভাসিয়া চলিয়াছে! রামমোহনের সময় হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যে ধর্ম্মে সমাজে এবং রাষ্ট্রজীবনে নবযুগের সূচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি স্বয়ং আধুনিক আদর্শেই জাগ্রত থাকিয়া যথাশক্তি সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারই এ আদর্শকে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য পরিণত করেন। *আমরা দেখিয়াছি, ইঁহারা* বঙ্গভাষার শিক্ষাগুরু, এই সাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আদর্শের প্রবীণ সাধক; বঙ্গভাষার রীতি বিষয়েও সুদৃঢ় আর্য্য-আদর্শের উদাসক; ইঁহারাই বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত আদর্শে সুমার্জ্জিত এবং সুগঠিত করিয়া আগামিনী প্রতিভার উপযুক্ত রঙ্গভূমিরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিও এই ভাষার অন্তরঙ্গীয় স্বাতন্ত্র্যভাব, প্রাকৃত দেশভিত্তি এবং দেশ-প্রাণতাও সুসিদ্ধ করিয়-ছিলেন; ভূদেব প্রভৃতি লেখক সকলেই ন্যূনাধিক ঐক্যমন্ত্রী হইয়া, বাঙ্গালীজাতির এই অভিনব আদর্শের ঐক্যতান বাদ্যে 'সঙ্গৎ' সাধনায় নিযুক্ত হন। এইরূপে বঙ্গসরস্বতী আর্য্য-সংস্কৃত এবং দেশীয় প্রকৃতির মধ্যপথে নিজের পিতৃমাতৃতত্ত্ব সাব্যস্ত করিয়া, বিশ্বসাহিত্যের পংক্তিভুক্ত হইবার আশায় উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

এই নব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরঙ্গে সর্ব্বপ্রথম আধুনিক আদর্শের প্রতিভা-ভেরী বাজাইয়াছিলেন, মধুসূদন দত্ত। কাব্য-নাটক প্রাকৃত প্রহসণ সনেট গীতি কবিতা খণ্ড কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গভারতীর এই উদ্ধত প্রতিভাশিশু অতি উদ্দামভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন;

বাঙ্গালীকে অশ্রুত তরকের সঙ্গীত শুনাইয়াছেন। প্রচলিত আচার বিশ্বাস ছন্দোবন্ধ ভাষা কিম্বা সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্যমাত্র না রাখিয়া, এই কবি সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় নিজের প্রাণাবেগ অবারিত করিয়াছিলেন; উহা প্রথম-প্রথম রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের কর্ণে কাঁটা বিঁধাইয়াছে।

মধুসূদন দত্ত ও মহাকাব্য প্রভৃতি।

কিন্তু প্রথম হইতেই মধুসূদনের এই মহাপ্রাণ, এবং অমর যোণি-সুলভ উদাত্ত উচ্ছ্বাস বিনামূল্যেই প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তির চিত্তকে কিনিতে পারিয়াছিল। তাঁহার পর হইতেই বঙ্গবাণীর এই অভিনব প্রাপ্তি অপ্রতিহতভাবে ক্রিয়ান্বিত হইয়া, পরবর্ত্তী সকল বাণী-সেবকের মধ্যেই কোন না কোন সূত্রে বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।

সাহিত্য-লোকে এই উচ্ছ্বাসের অন্য নাম মহাপ্রাণতা বা জীবনী শক্তি। মধু-হৃদয়ের এই অভিনব জীবৎশক্তি প্রভাবে সচেতন হইয়াই বাঙ্গালীর সুপ্তপ্রতিভা আত্মপ্রকাশের নবনব পন্থায় প্রবাহিত! তাহার সমক্ষে বিশ্ব-মনুষ্য, এবং বিশ্বসাহিত্যের আদর্শও পরিস্ফুট! মধুসূদনই নববঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে প্রথম পুরুষ-প্রাণের দৃষ্টান্ত! ছন্দের ঝঙ্কার, ভাবের বিস্তারিত প্রখরতা, প্রকাশের সামর্থ্য এবং স্বাধীনতা প্রভৃতি যেই-যেই গুণে কবি প্রকৃত প্রস্তাবে বীরাচারী এবং পৌরুষ প্রাণাপন্ন বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারেন, সে সমুদয়ই মধুসূদনের মধ্যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ অন্তর-তত্ত্বে রাধা-ভাবের ভাবুকতা এবং মৃদুকোমলতার সাধক বই নহেন। সুতরাং নারীহৃদয়-সুলভ অপরূপ তারল্য এবং মাধুর্য্য গুণেই তাঁহাদের কাব্য মনোহারী। বলা বাহুল্য, প্রকৃত কবি মাত্রেই এ সমস্ত গুণ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না; সুতরাং, খ্রীষ্ট-শিষ্য হইলেও, এই নব কবি, (অপ্রত্যাশিত ভাবে) বাঙ্গালী কবি-হৃদয়ের চিরন্তনব্রজাঙ্গনা-তত্ত্বে

চিত্ত প্রসারিত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। অন্যদিকে, কৃত্তিবাস কাশীদাস কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর শক্তি-তন্ত্রীয় পৌরুষভাব উত্তরোত্তর প্রসারিত নিষ্ঠা লাভ করিয়াই মধুস্থদনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আবার, মধুস্থদন প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গম স্থলেই দণ্ডায়মান। একদিকে, আর্য্যসাহিত্যের বাল্মীকি কালিদাস ভারবি এবং ভবভূতি, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমর ভার্জ্জিল ওভীড্ দান্তে টাসো মিল্‌টন ও বায়রণ প্রভৃতি প্রাণ-পৌরুষশালী কবিগণের পদতলে বসিয়াই মধুস্থদন কবি-দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাঁদের আত্মা-প্রভাবেই মধু হৃদয় সবলতা এবং ঘনতা, পূর্ণতা এবং প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়াছিল।

মধুস্থদনের রচনারীতির অভ্যন্তরে এমন একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য এবং সজীবগতি আছে, যাহার সাহায্যে তাঁহার নিজের চিত্ত-উচ্ছ্বাস পাঠকের হৃদয়ে অবলীলাক্রমে প্রসার লাভ করে; উহা শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্যতা। বাঙ্গালার কোন কবি এখন যাবৎ বিস্তারিত কাব্যক্ষেত্রে মধুর এই স্বাতন্ত্র্য অথচ দূর-সমুন্নত স্বাভাবিকতার সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। উহা এই অমর কবির নিত্য-পূজনীয় বিশেষত্ব বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই স্বতঃ-সমুন্নত আভিজাত্য গুণেই মধুস্থদন বঙ্গ-দেশের আপামর সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন! হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সমস্বভাব কবিগণের সহিত তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, অল্প কথায় দিব্য-উজ্জ্বল রসোদ্রেক করিবার ক্রিয়ানৈপুণ্য মধুস্থদনের কেমন অসাধারণ ছিল। হেমচন্দ্র প্রভৃতি যুদ্ধবর্ণনায় কিংবা শোকপ্রকাশে অতিরিক্ত বাক্য-জঞ্জাল সৃষ্টি পূর্ব্বক যে স্থলে এক-একটা সর্গই ব্যয় করেন, মধুস্থদন সেই স্থলে দুটি কথায় সমস্ত সাঙ্গ করিয়াই অনেক সময় অধিক চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ সমভূমি-নিবিষ্ট এবং সমতায়সংস্থাপিত তুলনার সাহায্যেই মধুস্থদনের স্বল্প কাব্যচেষ্টার আভ্য-

স্বরীণ শক্তি সংযম এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিমাপ হইতে পারে।

বঙ্গভাষায় এবং সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যায় যে, মধুসূদন দত্ত নামক একজন অসুর বলশালী 'টিটান' (Titan) বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি প্রমিথিয়সের মতন, স্বর্গ হইতে সারস্বত প্রতিভার অমর বহ্নিশিখা বাঙ্গালীর জন্য হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ভাগ্য-বিধাতার কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমস্ত জীবন দুর্দ্দশার পাষাণশৈলে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া, মস্তক পাতিয়া অবিশ্রাম অশান্তি অভিসম্পাত গ্রহণ করিয়া এবং কুক্ষিদেশে ক্ষুধাকুক্কুরীর করাল দংশন সহ্য করিয়াও, সেই মহাপুরুষ হীনতা স্বীকার করেন নাই, ওই অগ্নির পরিহার করেন নাই। তাঁহার তীব্রযন্ত্রনাময় নিরাশা-নিশ্বাস আর্য্য-যাজ্ঞিক গণের প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ডোত্থিত উত্তপ্ত অগ্নি-নিশ্বাসের মত এখনও বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করিতেছে। মধুসূদনের হৃদয় মেঘের মত বজ্রাগ্নিপূর্ণ, বারিপূর্ণ এবং ধ্বনিপূর্ণ ছিল; তিনি সেই অগ্নি, সেই জল এবং সেই ধ্বনি বঙ্গসাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন! সেই মহামেঘের বর্ষণের পরেই বঙ্গদেশ শ্যামল শস্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; বুঝি ফল পাকিবার সময় আসিয়াছে!

মধুসূদনের দোষদর্শন করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, মনুষ্য মনের উপর যাহাতে চিরস্থায়ী মহিমার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়, এমন নৈতিক গুরুত্ব আন্তরিকতা অথবা অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি মধুসূদনের ছিল না। তাঁহার কাব্যাদিতে মানবের সরল সুখ দুঃখ ক্রোধ প্রীতি প্রভৃতি বৃত্তি সমূহের প্রোজ্জ্বল প্রমূর্ত্তভাব এবং প্রতিকৃতি আছে; এই বিষয়েই মধুসূদন অতুলনীয়। কিন্তু, ঐ সকল প্রতিকৃতির মধ্যে

মধুসুদনের কবিত্ব লক্ষণ।

অনেকস্থলেই মনুষ্যের জন্য অণুমাত্র অধ্যাত্ম সান্ত্বনা নাই। শোক পীড়িত রাবণ, কলঙ্কিনী তারা, ষড়যন্ত্র রঙ্গিণী এবং ভুজঙ্গিনী কৈকেয়ী, তেজস্বিণী জনা, ইহারা অত্যুজ্জ্বল মনোহর চিত্র। কিন্তু মানবহৃদয়ের কোন নৈতিক আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য কবি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন? মধুসূদনের স্বপক্ষে ইহার আধুনিক-সাহিত্য-সঙ্গত উত্তর, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খা। নিরপেক্ষ কাব্যকলার আদর্শে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, এই সমস্ত চিত্রে সান্ত্বনার ভাব প্রবল নহে। এমন যে হ্যামলেট ম্যাক্‌বেথ তৃতীয় রিচার্ডের চিত্র মন্মধ্যেও মনুষ্যহৃদয়ের জন্য নৈতিক সান্ত্বনা, মনুষ্যমঙ্গলের উদ্দেশ্য এবং নির্বৃতি আছে বলিয়াই উহারা উচ্চজাতীয় কাব্যশ্রেণী মধ্যে আসন লাভ করিয়াছে। নচেৎ বিপুল কবিত্ব-ঐশ্বর্য্য এবং মনোহারিতা স্বত্বেও উহারা মাহাত্ম্য বিষয়ে অনেক 'খাটো' হইয়া পড়িত। অকস্মাৎ গোলার আওয়াজ হইলে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হইয়া যায়, হৃদয় স্তম্ভিত হয় কিন্তু মানবজীবনের কোন নীতি সূত্র লক্ষিত হয় না। গোলাজাতীয় কাব্য সাহিত্যে কদাচ সমুন্নত আসন রক্ষা করিতে পারে।

মধুসূদনের কাব্যের এই আলোচনা স্থলে আমরা সকল সাহিত্য বিচারের আধুনিক আদর্শ সঙ্কেত করিয়া যাইতেছি; অতঃপর আর ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিতে সময় হইবে না। বস্তুতঃ এই অধ্যাত্ম নীতির বা 'শিব' আদর্শের হিসাবেই চিরকাল কাব্যের চরম মাহাত্ম্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সত্য বা সৌন্দর্য্যের নির্ব্বাচন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও অনেক কাব্য মনুষ্যহৃদয়ের এই 'শিব' আদর্শে হীন বা উদাসীন হইয়াই নিম্ন শ্রেণীস্থ হইয়া গিয়াছে। সমুন্নত সাহিত্যের উপাদান যেমন সৎ-চিৎ-আনন্দ; উহার মাহাত্ম্য বিচারের আদর্শও তেমনি, সত্য-শিব-সুন্দর।*

* মনোবিজ্ঞান মনুষ্যমনের কার্য্যগুলিকে তিনভাবে বিভক্ত করিয়াছে—জ্ঞান,

আবার, মধুসূদনের কাব্যের আন্তরিক দিকটাও চিন্তা করুন। আদি করুণ প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করিয়া চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি বিধান করাই নিঃসন্দেহে মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল; উহাতেই তিনি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্যতা দেখাইয়াছেন।* মনুষ্যমনে স্থায়ীভাব উদ্রিক্ত করিয়াই কাব্য রসাল হয়। এই স্থায়ীভাব বাক্যে 'ব্যক্ত' (১) হইলেই অলংকার শাস্ত্রে উহার নাম হয়—রস। প্রাচীন আলংকারিকগণ রসোদ্রেককেই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" (২)। এই রসানুভূতির অন্য নাম সংস্কৃত দার্শনিকগণের ভাষায়—আনন্দ; গ্রীক বা ইয়োরোপীয় দার্শণিক গণের মতে—সৌন্দর্য্য। সুতরাং কাব্যের এই সংজ্ঞা বিষয়ে বর্ত্তমানকালেও বিবাদ করিবার কারণ নাই। প্রণিধান করিলেই দেখিব, রসের সংজ্ঞা-বোধেই প্রমাদ ঘটে এবং রসের প্রয়োগ প্রণালীতেই কবিতে-কবিতে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই রসের

ভাব, ইচ্ছা (Cognition, Emotion, Volition)। কাব্য সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কলা ভাবের দ্বারাই সৃষ্ট, এবং ভাব বৃত্তির তৃপ্তি কল্পেই রক্ষিত; কিন্তু মনুষ্যমন অবিভক্ত ভাবে এই তিন বৃত্তিতেই কার্য্য করে বলিয়া, ভাবের কার্য্যেও জ্ঞান ও ইচ্ছার উপাদান অপরিহার্য্য। জ্ঞানের উপাদান সৎ, ইচ্ছার উপাদান চিৎ, ভাবের উপাদান আনন্দ। এইরূপে সমুন্নত কাব্যের উপাদানাদর্শ—সৎ-চিৎ-আনন্দ সিদ্ধ হয়। জর্ম্মন দার্শনিক ইহাকেই কাব্যের divine idea বলিয়াছেন; এইহেতু, সংস্কৃত কাব্য দার্শনিকগণও কাব্যের আনন্দকে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর" বলিয়াছেন। সামাজিক গনের দিক হইতে, এই কারণে, কাব্যের মাহাত্ম্যবিচারের আদর্শও 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকগণ চিদানন্দ বিধান কেই 'শিব' বলিয়া মনে করিতেন।

(১) রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চৈব স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ॥—কাব্যপ্রকাশ।

প্রধানগুণ দ্রুতি দীপ্তি ও প্রসাদ (১)। দ্রুতি বহির্ম্মুখ; দীপ্তি ও প্রসাদ অন্তর্ম্মুখ। প্রাঞ্জলতা, তারল্য এবং আবেশই দ্রুতির ধর্ম্ম। অন্তদিকে ধ্যান ধারণা ভাব-সমাধি বা শান্তি (repose)ই দীপ্তি এবং প্রসাদের ধর্ম্ম। এখন, এই বহির্মুখী অথবা অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তির আনন্দ-জননের হিসাবেই কবি-সমাজে প্রবল জাতিভেদ ঘটিয়াছে (২)। এই কারণে, রসের বাহ্যিকতার বাড়াবাড়ি করিতে গেলেই উহার তত্ত্বমুখিতা বা আন্তরিকতা ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে! মধুসূদনে ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। বাহ্যিক রস-গতির পোষণ করিতে গিয়া তিনি অনেকস্থলে সতর্কতা সংযম এবং ধ্যানযোগ হারাইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণ এতদুভয়ের সামঞ্জস্য করিয়াই শ্রেষ্ঠ! মনুষ্যহৃদয়ের বা জগতের কূট-তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে গভীর ধ্যান যোগের আবশ্যক। এই ধ্যানযোগের অভাবেই তিনি সত্যের দর্শন বিষয়ে, কিংবা রসের পরিবেষণ বিষয়ে সকল সময়ে সমুন্নত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।

(১) যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষ হেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ॥ কাব্যপ্রকাশ।

রসের এই গুণ-ধর্ম্ম বিষয়ে প্রাচীন-সম্মত ব্যাখ্যা কাব্যপ্রকাশের অষ্টমোল্লাসে পাইবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, আধুনিক কালের সমুন্নত কাব্যাদর্শের সহিতও উহার বিবাদের কিছুমাত্র কারণ নাই।

(২) রসের এই ত্রি-গুণ-ভেদে এবং আলম্বন বা উদ্দীপন প্রণালীভেদে এবং এই প্রণালীর সফলতা ভেদেই কবিসমাজে উচ্চনীচ বা শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠের পার্থক্য ঘটিয়াছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বা ভবভূতিরআদিরসে এবং বিদ্যাসুন্দরের আদিরসে এই আন্তরিকতার দরুণেই বিজাতীয় পার্থক্য ঘটিয়াছে। আবার এই দ্রুতি-দীপ্তি-প্রসাদ-গুণের প্রয়োগ-পার্থক্যেই আধুনিক আদর্শ সম্মত —"Poet-as-Mover," "Poet-as-Power;" Poet-as-Seer; Light-girer;" "Poet-as-Life-giver, Inspirer প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যার বিভিন্নতা টুকুন ও ব্যাখ্যা করা যায়।

এই কারণে তাঁহার চরিত্র চিত্রগুলির মধ্যেও যেমন অসৌষ্টব এবং অসামঞ্জস্য অমার্জ্জনীয় ভাবে বর্ত্তমান, তেমনি, উহাদের আন্তরিকতাও বিশেষ গভীর কিংবা অপ্রতিহত হইতে পারেনাই।

পূর্ব্বে আভাষ দিয়াছি ভারতচন্দ্রই বাঙ্গালায় মধুসূদনের অব্যহিত শিক্ষাগুরু। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক উভয় কবির রচনা পাঠ করিলেই উভয়ের সাধর্ম্ম্য প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্দ্রের ন্যায় সংস্কৃতপদ-বন্ধ এবং ছন্দের ঝঙ্কার এবং ওজোগুণ মধুসূদনের প্রধান শক্তি; আবার ভারতচন্দ্রের সেই অত্যুদ্ধত আদিরস-রসিকতাও মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় বীরাঙ্গনায় এবং স্থানে স্থানে মেঘনাদে পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে উলঙ্গ হইয়া আছে। মধুসূদন এই রোগের বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তাঙ্কিত মনোরম চিত্রগুলির উপরেই সময়-সময় কালি ঢালিয়া গিয়াছেন! অন্য দিকে, প্রাচীন হেলেনিক আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া, এবং সম্ভবতঃ পদ্মাপুরাণ এবং চণ্ডীকাব্যের আদর্শেই পরিচালিত হইয়া, দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-বর্দ্ধণের উদ্দেশ্যে তিনি স্থানে-স্থানে মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্য এবঞ্চ পুরুষকারকেও উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা সাহিত্যে একরূপ পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব বই নহে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, এই মেঘনাদ বা ব্রজাঙ্গনা, সমস্তই 'আত্মনিষ্ট শিল্পকলা' আদর্শের—সম্পূর্ণ প্যাগান (Pagan) আদর্শের রচনা। বীরাঙ্গনার অতি-ঔদ্ধত্য যুক্ত নামটাও স্বয়ং ওভীদের (Ovid) Heroic Epistlesএর স্মরণ-পথেই উপস্থিত! বঙ্গ সাহিত্যের আসর হইতে অদম্য পৌরাণিকতা কিংবা পাচালী গান এবং পূজা-কীর্ত্তনের 'আশা'টিকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে এই আদর্শই অপরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিল! ব্রজাঙ্গনাও যেমন খাঁটি সাহিত্যের দিক হইতে বৈষ্ণবী প্রথার ভক্তি-আদর্শকে বরং নিগৃহিত করিয়া, কেবল স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পর নিষ্ঠা প্রাণাবেগ এবং স্থায়ীভাবের উপরেই কবিতার মাহাত্ম্য-স্থাপনে প্রয়াস

পাইয়াছে ; তেমনি মেঘনাদ ও স্বকীয় প্রণালীতে এবং আদর্শে, এক অপূর্ব্ব বীর-বিভূতির প্রদর্শন পূর্ব্বক নীতি-ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা ধর্ম্মভীরুতার নিঃসম্পর্ক-ভাবে কেবল 'মনুষ্যত্ব'-মাত্রের উপস্থাপন করিয়া, বঙ্গসাহিত্যে একটা অতর্কিত যুগান্তর এবং নীরক্ত বিপ্লবেরই সূত্রপাত করিয়াছে! আমাদের সমাজ এবং সাহিত্য, উভয়ের পক্ষেই এ ব্যাপারের আবশ্যক ছিল। বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সমতায় উত্তোলিত করিবার পক্ষে, বঙ্গের সমাজ-ধর্ম্মাক্রান্ত সাহিত্য-বিবেককে বিশ্ব-মানবতার আবহাওয়া সহিয়া লওয়ার পক্ষে, তাহার ওই অতি-প্রবল সাহিত্যেও-সংহিতা-নিষ্ঠা, জাতিভেদ কিংবা 'আর্য্যামীর' ভরং টুকু যেন কিঞ্চিৎ শিথিল করাই আবশ্যক ছিল! তাই বুঝি, পশ্চিমের 'বিজাতীয়' দীক্ষাপ্রাপ্ত মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া সময়-সময় হয়ত অপরূপ উৎকটতা এবং চরম-পন্থীতার আশ্রয় করিয়াও বাঙ্গালার জন্য উহাই অনুপমভাবে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে মধুসুদনের স্থান।

বাঙ্গালীর সাহিত্যযজ্ঞের আদিম উদ্গাতারূপী এই মধুসূদন, কেবল যে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাত্ম লোকেই যুগান্তর সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে ; এই সাহিত্যের ভাষা-রীতি এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ, ভাবগতিক ছন্দ এবং সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, মধুসূদনের অপর কীর্ত্তি, সংযুক্ত পদের এবং অসংক্ষিপ্ত আর্য্যশব্দের ব্যবহার। বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত কোমলতার দরুণ, অনাদি কাল হইতে বঙ্গভাষার মধ্যে হ্রস্বদীর্ঘহীন এবং লঘুগুরুহীন পদগতিই অর্চ্চনা লাভ করিয়া আসিতেছিল। বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ, উহার শীতকালের ক্ষীণ-দেহা এবং সমতল-বাহিণী ভাগীরথীর ন্যায় এতকাল যেন কেবল কোমল-নিখাদেই গান করিয়া

আসিতেছিল! আর্য্যসংস্কৃতের পরম গৌরবগর্ব্বময় পদ-বাক্যের সমস্ত আনতি-উন্নতি ভাঙ্গিয়া এবং চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বঙ্গভাষাকে অপরূপ সমতলে পরিণত করিয়াছিল! গীতিকবিগণের, পাঁচালী এবং পদকর্ত্তা-গণের রীতি এবং সাধারণজনতার অভিরুচি বশে বাধ্য হইয়া, বঙ্গভাষা এইরূপে কেবল জমকানুপ্রাসের কোমল রিনিঝিনি হাবভাব এবং লীলানৃত্য দেখাইয়া গানের মজিলিশ হইতে অন্তঃপুরে এবং অন্তঃপুর হইতে গাণের মজিলিশে যাতায়াত করিতেই যোগ্যতা লাভ কলিয়াছিল। উহার বাহিরে, তাহার বিশেষ কোন আভিজাত্য কিংবা গৌরব গুরুত্ব ছিল না। বাস্তবিক, বঙ্গভাষা গদ্যে এবং পদ্যে, কথায় এবং কার্য্যে কেবল চাষাভুষা মুটেমজুর মুদীমাল্লা এবং অন্তঃপুরিকা গণকেই প্রভু মনে করিয়া চলিয়া আসিতেছিল—আপনার আর্য্যকৌলিন্য বিস্মৃত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কিংবা অক্ষয়কুমারের ন্যায় মধুসূদনও নিজের মহাচ্ছন্দা হৃদয়-নৃত্যের বশবর্ত্তী হইয়াই বঙ্গসরস্বতীর বিলুপ্ত আর্য্যমাহাত্ম্যে জাগরিত হইয়াছিলেন। তিলোত্তমা-সম্ভব মেঘনাদ এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের অভ্যন্তরে বঙ্গীয় বাণীগঙ্গার সাগর-সঙ্গমে সেই অনুপম 'কপোতাক্ষী' এবং 'সাগরদাঁড়ী' ছন্দের উত্তালগীতিই অনুভব করিতেছি! উহা নানাদিক হইতে যথার্থভাবেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কবিগণের যশোহর হইয়া প্রবাহিত!

আমরা দেখিব, জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে কোন নূতন রীতি বা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন যেমন প্রতিভা-সাধ্য, তেমনি, জাতীয় ভাষার অভ্যন্তরে কোন নূতন শক্তির আবিষ্কার বা উহার পূর্ণাঙ্গতা বিধান ও কোন অংশে কম প্রতিভার কার্য্য নহে। প্রতিভা কর্ত্তৃক এই অসাধারণ মাহেন্দ্র ঘটনার পর হইতেই উহা সকলের সহজ-গম্য হইয়া এবং সাধারণ হইয়া যায়। এই আবিষ্কার ঘটনাটির পরেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আপনাদের অন্ধতা চিন্তা পূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার জন্য অবকাশ ঘটে। এত সহজ কথাটি কি

করিয়া এতকাল সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া 'গা-ঢাকা' দিয়া রহিয়া গিয়াছে! এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের "ভ্যাবাচেকা" লাগাইয়া দেয়। জগতের সকল বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রেই এত সাধারণ যে, মনুষ্যকে ন্যূনাধিক গড্ডালিকার বাতিকগ্রস্ত এবং ব্যাপকভাবে অন্ধ বলিয়া মনে না করিলে যেন এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

শব্দের বাহ্যিক মেলবন্ধনের কবল হইতে ছন্দকে উদ্ধার পূর্ব্বক উহাকে অবারিত হৃদয়ভাবের প্রবাহে ছাড়িয়া দিতে—ছন্দকে সম্পূর্ণ ভাবানুগত করিয়া প্রবাহিত করিতে, অন্যদিকে হৃদয়জাত সরল হর্ষবিষাদের কম্পনগুলিকেও বাক্যের ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে চিরকালের জন্য ধৃত করিয়া এবঞ্চ জীবিত রাখিয়া রক্ষা করিতে, সর্ব্বোপরি, শ্রুতিমহতী সরস্বতীর বিপুল-পরাক্রান্ত ধারায় পাঠকের হৃদয়কে বলক্রমে ছুটাইয়া লইতে, এইরূপ সুস্থির শক্তিপ্রচণ্ডতা, এইরূপ যোগ্যতা, এইরূপ অপরিহার্য্যতা ইতিপূর্ব্বে অপর-কোন বাঙ্গালী কবি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। উহা পশ্চিমের অতলস্ত সমুদ্রেরই দীক্ষা! আধুনিক সাহিত্যের এই Titanic element, এই আবেগ-উচ্ছ্বাস, এই পারুষ এবং পৌরুষ, এই হুঙ্কার এবং হাহাকার, ইহা নান দিকে ভারতবর্ষের শৈলাকাশ-দীক্ষিত এবং শান্তিনিষ্ঠ প্রাচীন সভ্যতার অজ্ঞাত। আবার, বাক্যের এই চিত্রণী শক্তি, ভাবপ্রকাশের এই মনোমুগ্ধকরী অথচ মনের স্থিতিবন্ধনী অপরূপ বিষয়বতী প্রবৃত্তি, ইহাও বঙ্গদেশের সাহিত্যে নানাদিকে নূতন বলিতে হইবে। বিদ্যাসুন্দর কিংবা চণ্ডীকাব্য হইতে মেঘনাদ বধের শিল্প-আত্মা মূলেই বিভিন্ন। প্রথম দুইটি বীণা-নিঃসৃত কালোয়াতী সুর; মেঘনাদ অর্গানের সুর! প্যারোডাইসলষ্টের ন্যায়, মহাসমুদ্রের ব্রহ্মতালের সহিত স্বতঃসঙ্গত হইয়াই এই স্বর সমুত্থিত হইতেছে! এতদ্দেশের প্রাচীন আর্য্য-হৃদয় মধ্যে, ব্যাসবাল্মীকির হৃদয়মধ্যেই কেবল এই

জাতীয় সুর এবং উহার সাধনপরিচয় আছে! এই অপূর্ব্ব-সম্ভূত স্বরলয়ের মধ্যেই মধুসূদনের অসামান্যতা লুক্কায়িত! ঢিলাঢালা এবং 'আটপৌরে' ব্যবহারের ধূলিধূসরিতা বঙ্গবাণীর সুগুপ্ত হৃদয় কন্দরে এই অনুপম এবং অপূর্ব্ব সমুদ্র-সঙ্গীতের রহস্যমর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালী জাতির অন্তরে যেই নব প্রাণোচ্ছ্বাস জাগাইয়াছিলেন, তাহার ফল এই সাহিত্যে নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের সমতুল্য হইয়াছিল! দেড়শত বৎসর ইংরাজার সহবাসে থাকিয়াও অন্যকোন বাঙ্গালী উহার সন্ধান পায় নাই। মধু-দত্তের হৃদয় ব্যতীত এই যোগ্যতা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই! ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য এখন-যাবৎ আমাদের এই মধুর সংঘটনা করিতে পারিয়াছে কিনা জানি না; 'মধু-চক্রের' এই অভিনব রস-পরিচয় লাভ করিতে না পারিলে, আমাদের এই অচল-লক্ষণাক্রান্ত সমাজের মধ্যে, 'আধুনিক সাহিত্য' বলিয়া একটা নূতন আদর্শ এত সহজে ঠাঁই পাইত কিনা সন্দেহ।

মধুর অমিত্র চ্ছন্দের এই অন্তরাত্মাই স্বয়ং একটা মহাভাব! পাঠকের অধ্যাত্মলোকে মধুচ্ছন্দের একটা অনির্ব্বচনীয় মনোহারিনী এবং জীবনী শক্তি কার্য্য করিতে থাকে। আধুনিকের সতর্ক-অনুসৃত ভাবুকতা বা 'আইডিয়ার' উপাসনা মধুসূদনের ছিলনা; মধুসূদন কোথাও জাগ্রৎ-ভাবে আন্তরিক হইবার জন্য লক্ষ্য রাখেন নাই; তিনি নাকি সাহিত্য ক্ষেত্রে ফিলজাফীর অবতারণাকে ঘৃণা করিতেন। নিজের হৃদয়ের ভাবকম্পনগুলি পাঠকের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া, তাহাকে আবিষ্ট এবং মুগ্ধ করিয়াই মধুসূদন চরিতার্থ। পাঠকের দার্শনিক বুদ্ধিকে কোনরূপে উত্তেজিত করিয়া তাহার মনঃ-পূর্ণ আবেশকে কোন মতে সংক্ষুব্ধ কিংবা সংমিশ্রিত করিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা নাই। বলা বাহুল্য, প্রাচীন কাল হইতে ইহাই কবিগণের মধ্যে বহু প্রচলিত রীতি—প্রধান রীতি। কবি স্বয়ং

(সতর্ক বা অতর্কিত ভাবে) ভাবের যোগ লাভ পূর্ব্বক পাঠককে তদ্গত রাখিয়া যাইবেন; ইহাই সাহিত্যের সনাতন 'রাজ-পন্থা'। আধুনিক সাহিত্য ওই রাজ পথে চলিয়াই, আবার চারিদিক দেখিয়াদেখাইয়া, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানা গলি ঘুঁজি আক্রমণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইবার একটা বিমিশ্র প্রণালী সাধনা করিয়া চলিতেছে। পাঠকের হৃদয় এবং বুদ্ধিকে খোলাখুলিভাবে দর্শনের অধিকারে জাগরিত করিয়া, তাহাকে একটা বিমিশ্র রসবোধে পরিচিত করিতেছে। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের এই মিশ্র পদ্ধতি এবং ঘোরা-ফেরার প্রণালী একদিকে অসামান্যতা লাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু উহার বাধ্য হইয়া সে যাহা হারাইতেছে শিল্পের ক্ষেত্রে তাহা অমূল্য; উহার নাম প্রাণ—সরলতা—ঋজুতা! আধুনিক সাহিত্য একদিকে তত্ত্ব-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া, তথাকথিত ভব্যতায় এবং ঘনগম্ভীর জটিলতায় অগ্রসর হইতেছে, এবঞ্চ সুদূর-গভীর তপোলোকেও বাসপত্তন নির্ম্মাণ করিতেছে সত্য, কিন্তু আপনার মহর্লোক হইতে, উলঙ্গ-সরল সত্যলোক এবং স্বর্গীয় সরলতা হইতে নানাদিকে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, এখন যেন সকল দিকে সরলতা টুকুই মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য পদার্থ! আধুনিক সাহিত্যে ঋজুতার শতসহস্র প্রকার ভান আছে বই নহে। সকল সময় পাঠকের এবঞ্চ বাজারের সান্নিধ্যে সতর্ক এবং জাগরিত থাকিয়া চলার দরুণ, তাহার কথার মধ্যে মুন্‌শীয়ানা এবং 'চিকন-কাটা'র জন্য একটা অত্যন্ত কপট এবং গর্ব্বিত ভাব সর্ব্বত্র মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছে! এই সমস্ত অতিরিক্ত সভ্যভব্যতা এবং কৌশল বাদের দোষ। উহার দরুণ প্রাচীন সাহিত্যের বলিষ্ট ভাব এবং প্রতিভার অসুর লক্ষণ (titanic element) সকল দিকে ভাবুকতা এবং দার্শনিকতার দ্বারাই নিহত

সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক রীতি।

হইতেছে। সাহিত্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা শক্তির প্রচণ্ডতা মাত্রেই যেন আধুনিক ভব্যতার চক্ষে বর্ব্বরতা বলিয়া নিন্দিত! বরং সর্ব্বত্র অনুবীক্ষণ চালাইয়া, নিতান্ত প্রাকৃত এবং ক্ষুদ্রকেও বড় দেখাইয়া; এবং প্রতিপদে 'গায়ে ফুঁ' দিয়া চলিবার রীতিটাই 'ফেশান' হইয়া পড়িতেছে। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক এই বাতিকগ্রস্ত; কোন কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িলেই তাহার নাম বাতিক। বজ্রগম্ভীর শব্দধ্বনি কিংবা সময় সময় বিজাতীয় 'কটমটি' থাকা সত্ত্বেও, ঋজুতাই মধুসূদনের অনির্ব্বচনীয় বাক্য-শক্তি; উহাকেই স্বাভাবিকতা নামে উল্লেখ করিয়াছি। প্রাচীন-রীতি অবলম্বনেই মধুসূদন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইংরাজ কবিদের মধ্যে বায়রণ পর্য্যন্ত মধুসূদনের সীমা; ওয়ার্ডসোয়ার্থ বা শেলী তাঁহার মনঃপূত ছিল না। এই মধুসূদন আধুনিক কালে জন্মিয়াও প্রাণমনে সাহিত্যের প্রাচীন বৃহৎপথ আশ্রয় করিয়া চলিতেছিলেন। বাল্মীকি এবং হোমরই রীতি বিষয়ে তাঁহার দীক্ষাগুরু। আমরা দেখিব, পরবর্ত্তী হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রও প্রকাশের রীতি বিষয়ে ন্যূনাধিক এই পথে চলিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্যাত্মার ঋজু সরল অনুভূতি এবং প্রকাশের প্রণালীই তাঁহাদের দ্বারা অনুসৃত। তাঁহারা বৃহৎ বিপুল ভাব-পদার্থকে বিভাব এবং অনুভাবাদির সাহায্যে পাঠক-হৃদয়ের অতর্কিত সংস্পর্শে উপস্থিত করত তাহাকে তদ্গত রাখিয়া যান; সুতরাং উহার ভিতরেও অপরূপ আন্তরিকতা না থাকিয়া পারেনা। উহার নাম, কবি-হৃদয়ের ভাব-যোগ— রসানন্দ যোগ। স্বয়ং যোগী হইয়াই কবি পাঠকের হৃদয়কে যুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু, এই পন্থা নানাদিকে দার্শনিকতা কিংবা কবি হৃদয়ের সতর্ক বুদ্ধি-যোজনার বহির্ভূত। সুতরাং, কবিকে অনেক সময়েই দৈবী প্রেরণার অপেক্ষায়—হৃদয়-আকাশের অনুকূল পবনের আশায় পাল গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়! কিন্তু, পালে একটিবার বাতাস লাগিলেই

সে সমস্ত কল কারখানার দিবাব্যাপ্ত কৌশল-করণ্ডিকার সুফল একদণ্ডে অতিক্রম করিতে পারে! সূক্ষ্মের ভিতর বৃহতের তত্ত্বধারণা, অথবা দূর দূরান্তরিত সতর্ক সঙ্কেত বা জ্ঞানকৃত দার্শনিকতা এই জাতীয় কবির প্রণালী নহে; তাঁহাদিগকে যথাযথ ভাবে বুঝিতে হইলেই পাঠকগণকে নিজের পক্ষ হইতে দার্শনিক প্রণালীর আশ্রয় করিতে হয়। উভয় কবি-রীতি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করাটাই আধুনিক কালের প্রকৃত রসিক বা বিচারকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। মধুসূদন হেম বা নবীন চিরপূজ্য এবং দুষ্প্রাপ্য; বিষয়ের সহিত হৃদয়ের নির্ব্বিকল্প অন্তর্যোগ বলিয়া পদার্থটি মনুষ্যলোকে দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ইঁহারা অসাধারণ। অন্যদিকে বুদ্ধিযোগ নামক পদার্থটীও নানাদিকে বিস্তাসাধ্য বলিয়াই, আধুনিক তত্ত্ব-অ দর্শের নানারূপ ভাক্ত কবিতা কাব্য নাটক এবং নবেল দ্বারা আধুনিক সভ্যজগৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। উহাদের মধ্যে 'খাটী বা মেকী' পরিচিহ্নিত করাও অনেক সময় অসম্ভব; সাহিত্যেও শ্রমজীবীর বা কলের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। ইয়োরোপে সাহিত্য একটা 'পেশায়' পরিণত হইয়া যাওয়ায়, কবিজননী বীণাপাণিকে অহোরাত্র 'ঘানী টানিতে' হইতেছে। উহার ফলে আধুনিক নর-সমাজে সাধারণশিক্ষা এবং সাধারণের জ্ঞানসমতল উন্নতি লাভ করিতেছে সত্য; কিন্তু কবি-প্রতিভা নামক পদার্থটি আগেও যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখনও তেমনটাই দুষ্প্রাপ্য রহিয়াছে।

মধুসূদনের ভেরীর পর হেমচন্দ্রই বঙ্গরঙ্গভূমে শিঙ্গা বাজাইয়াছেন। অনুপম দৃঢ়-দীপ্ত, এবং পুণ্য-ব্রত কবিহৃদয়ের কৌলিন্য-গৌরবে অতুলনীয়, এই শিঙ্গা! বঙ্গবাণীর কলাবৎ-গণের মধ্যে কবি হেমচন্দ্রের এই ধ্বনিদীপ্তি এবং কৌলিণ্য, দেবসভামধ্যে হিমালয়ের ধবল শৃঙ্গ-সন্নিভ পিনাকী পুরুষের পদবীর ন্যায় চিরকাল বরিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে। নানাবিষয়ে

~~হেমচন্দ্র ও বঙ্গসা-~~ হিত্যে, তাঁহার স্থান।

পার্থক্য থাকিলেও মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র এক-স্বভাবাপন্ন কবি। সহৃদয় হেমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম অবজ্ঞাত এবং কীর্ত্তিহীন মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠকবি বলিয়া আলিঙ্গন দিয়াছিলেন; বঙ্গসাহিত্যে নবতন্ত্রীয় বাণীদেবতার আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া পরম আত্ম-শ্লাঘায় পুলকিত হইয়া ছিলেন; দিব্য সহমর্ম্মিতার বশীভূত হইয়া মধুসূদনের মাহাত্ম্য স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে এইরূপে এক নববিধানের ভিত্তিপাত হইয়া বাঙ্গালীর অন্ধহৃদয়কে নব দৃষ্টি পন্থায় অবারিত করিয়া দিয়াছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র উভয়েই প্রাচীন ব্যাস বাল্মীকি এবং বিদেশীয় প্রাচীন কবিগণের পথ অনুশরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশের সমতল মধ্যে নব বাণীগঙ্গার অবতারণা করেন। মধুসূদনের স্বাভাবিকতা অসাধারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রতিভার ইন্দ্রজাল-পাত্রে পতিত হইলে পরের জিনিষ ও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়। সাহিত্য-দার্শনিকগণ ইহাকেও মৌলিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাই সাহিত্যে দায়াদ-বৃত্তি; এবং পরবর্ত্তীর পরম স্বত্ব বলিয়া প্রশংসিত। মধুসূদন কবিহৃদয়ের ধূম জ্যোতিঃ সলিল এবং মরুতের সহযোগে বঙ্গভূমির সাহিত্যলোকে এক অভিনব বর্ষা-চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। সহস্র দোষসত্ত্বেও কেবল স্বাভাবিকতা এবং কৌলিণ্যগুণেই এই চিত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। মধুসূদনের মত স্বভাবিকতা হেমচন্দ্রের নাই; তবে প্রতিভার 'সোণার কাঠি' এবং এক অতুলনীয় পুণ্য-দীপ্তি এবং গৌরব-গরিমা পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্ভিন্ন, হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সাবধান এবং সতর্ক শিল্পী বলিয়াও রসজ্ঞের পূজা-লাভ করিতেছেন।

কিন্তু এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কবির পক্ষে এই সতর্কতা তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি-গত বা অনায়াস-সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অন্যথা কেবল বহিরঙ্গভাবে, অলঙ্কার শাস্ত্রাদি হইতে যে সতর্কতার শিক্ষালাভ

হয়, তাহা কবিত্বশক্তির বিকাশের পক্ষে বরং অন্তরায় হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের অত্যন্ত সতর্কতার দরুণেই তাঁহার কবিতা ভাবের নির্ব্বিতর্ক রস-যোগ হারাইয়া হয়ত স্থানে-স্থানে নির্জ্জীব এবং বিপরিণত হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকাব্য বৃত্রসংহারের প্রথম সর্গ (এবং অন্যান্য কাব্যের স্থল বিশেষ) বাঙ্গালীভাবুকের চক্ষে জঘন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। মুখবন্ধেই একটা বিরূপ ছন্দো-বন্ধ এবং মতি-গতির পরিচয় দেয় বলিয়া বৃত্রসংহার সাধারণ সাহিত্য পাঠকের হস্তে চিরকাল অবিচার লাভ করিয়া আসিতেছে। আমাদের এই হেমচন্দ্র পরম সতর্ক শিল্পী; বলিতে কি প্রাণের জ্বালা অপেক্ষা বরং সতর্কতা বেশী ছিল বলিয়াই যেন অমিত্র-ছন্দের স্বাধীনতাটুকু হেমচন্দ্রের পক্ষে চিরকাল কুপথ্য ছিল। আমরা দেখিব, ঠিক ইহার বিপরীত কারণেই নবীনচন্দ্রের পক্ষেও ছন্দের অভিভাবকতা চিরকাল শুভানুবন্ধী হইয়া আসিয়াছে। নবীনচন্দ্রের প্রাণের উন্মাদনা এত অধিক ছিল যে, অমিত্রাক্ষরের মধ্যে আসিলে তাঁহাকে একেবারে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া ছুটাইয়া চলিত। মধুসূদনই কেবল বিভু-দত্ত হৃদয়-সিদ্ধিবলে এই স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতে পারিয়াছেন। এমন কি, বিপরীত দিক হইতে, ছন্দোবন্দের অধীনতাই যেন তাঁহাকে বিপরীত 'মন-মরা' এবং কাহিল করিয়া ফেলিত! মধুসূদনের খণ্ড-কবিতাগুলির বহুস্থানে উহারই পরিচয় পাওয়া যায়!

হেমচন্দ্রের প্রধান মাহাত্ম্য, তাঁহার ক্লাসিক লক্ষণযুক্ত ঘন-সংযত বৃত্রসংহার। উহা চিরকাল প্রকৃত সাহিত্য-রসিকের চক্ষে লোভনীয় হইয়া আছে! বঙ্গীয় ভাবুকতা অন্তরঙ্গে এইরূপ সাধুতা দৃঢ়তা এবং ভাবসংযম মহার্ঘ বলিয়াই উহা চিরকাল মহার্ঘ এবং আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাকিবে। হেমচন্দ্র যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে কেন, আধুনিক

বঙ্গসাহিত্যে বৃত্রসংহার।

সভ্যজগতের সকল সাহিত্যেই মহার্ঘ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রথিত-নামা অল্পায়ুঃ-কবি কীটস, তাঁহার অসমাপ্ত 'হাইপীরিয়ন' কাব্যে প্রাচীন হেলেনিক কাব্য-আদর্শের যেই মহিমা-মূর্ত্তি নিরূপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রথমবর্ষার অভিনব মেঘমন্দ্রের ন্যায়, ইংরাজের হৃদয়কে ক্ষণকালের জন্য রোমাঞ্চিত করিয়াই তাহা অকালে মিলাইয়া গিয়াছিল। সুইনবারণ পরকালে এই ধ্বনি-গৌরবটাই তাঁহার 'আটলাণ্টার' মধ্যে ধারণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কীট্সকবির রস-তন্ময়তা, এবং ভাবের প্রাচুর্য্য হেমচন্দ্রে নাই; কিন্তু তদপেক্ষাও দীপ্তি ঔদ্ধত্য এবং গাম্ভীর্য্যগুণে এবং সম্পূর্ণতার সমাধানে বৃত্রসংহার চিরকাল চিত্ত আকর্ষণ করিতে থাকিবে। ইয়োরোপের দিকে দৃষ্টি না করিলে হেমচন্দ্রের মাহাত্ম্য কখনও যথোচিত মতে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না!

হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় বীরজনসুলভ কঠোরতায় এবং সাধুতায় পরিপূর্ণ। ইহাই বঙ্গীয় কাব্যজগতে হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার কবিতা পাষাণের মত কঠোর, অকুটিল, দুর্দ্ধর্ষ, কিন্তু নীরস নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন-কালে এইরূপ আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ভারবি। হেমচন্দ্র এ কালের কবি নহেন; এই বাঙ্গালী কবির হৃদয় প্রাচীন গ্রীক কবির উপাদানে গঠিত; তাঁহার বিষাণ এ কালে বাজিলেও উহা প্রাচীন 'হেলিকন' এবং আর্য্য-মাহাত্ম্যের হিমালয় পর্ব্বতের আমদানি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাচীন হোমর, টাসো, দান্তে, পিণ্ডার প্রভৃতির সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল কবির ন্যায় তাঁহাকেও জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কারণে দুঃখ-যন্ত্রণার দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে হইয়াছিল। অতীন্দ্রিয় পদার্থে দৃষ্টিপাত করিতে করিতেই যেন তাঁহার বাহ্যচক্ষু শক্তিহীন হইয়া যায় এবং হোমর ও

হেমচন্দ্রের হৃদয়।

মিল্টনের ন্যায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীতধ্বনি অতিমানব ঘটনা-অবলম্বনে, যেন উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ জনমানবকে লক্ষ্য করিয়া ঝরিতেছে। তদ্ভিন্ন হেমচন্দ্রের সমস্ত চেষ্টায় নৈতিক লক্ষ্য ও মানব-মনের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান বলিয়া হেমচন্দ্রের সাহিত্য-আদর্শ মহান্। বিশেষতঃ এই কবি কেবল সরস্বতীর প্রিয়পুত্র নহেন, প্রিয় সেবক। নানা দিগ্দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়া তিনি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার সারস্বত-জীবন সর্ব্বত্র মৌলিক-কবিত্বময় না হইলেও, উহা প্রকৃত মহত্বের *উজ্জ্বলতায় চিরদিন উদ্ভাসিত থাকিবে।*

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, এই কবিত্রয়ের মধ্যে সামাজিক আদর্শ বিষয়ে হেমচন্দ্রের হৃদয় সমধিক উন্নত ও প্রশস্ত। পৃথিবীর উন্নতিস্বপ্নে, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আশায় ও তাহার সাফল্যে হেমচন্দ্রের আন্তরিক সহানুভূতি। মধুসূদন সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাবাপন্ন ; বাঙ্গালী জাতির বা বঙ্গসমাজের সহিত তাঁহার প্রকৃত কোনও সহানুভূতি ছিল না। তিনি শক্তি ছিল বলিয়াই আস্ফালন করিতেন, গান গাহিতে জানিতেন বলিয়াই গাহিতেন। গৌড়জনের জন্য অক্ষয় মধুভাণ্ডারের সৃষ্টি করিয়া যাইব, অমর হইব, 'স্মৃতিজলে চিরফুল্ল তামরসে'র মতন ফুটিয়া থাকিব, এইরূপ উৎকট আত্মপ্রসার এবং যশোলিপ্সাতেই তিনি ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশের সামাজিক মূল 'শিকড়' বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহার প্রতিভাতরু সমাজের অন্তস্থলবাহী প্রকৃত প্রাণরস আকর্ষণ করিতে পারে নাই ; আকাশে আস্থানিক 'শিকড়' বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে স্বদেশপ্রেম, অধীনতা ও দেশাচারের কঠোর পীড়ন হেম নবীনের প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত কবির রচনাতেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, মধুসূদনে তাহার লেশমাত্রও

দেখিতে পাই না। এই অধঃপতিত জাতির হৃদয়োচ্ছ্বাস যখন প্রথম পরিব্যক্ত হইয়াছিল, তখন উক্ত অপরিহার্য্য এবং অতিপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি আদৌ প্রকাশ পায় নাই!

এই সময় বঙ্গসাহিত্যের অদৃষ্ট গগনে অনুপম সৌভাগ্যচন্দ্রের উদয় ঘটে। এই নব সাহিত্য-আদর্শকে কথায়-কার্য্যে, গদ্যে এবং পদ্যে সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে প্রচার করার আবশ্যক ছিল। স্বদেশের সেই অন্তরাহ্বানের ফলস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্গদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও নব সাহিত্য-ধর্ম্মের প্রচার।

পরবর্ত্তী না হইলেও সম্যক্ বিচার-সুবিধার জন্য, হেমচন্দ্রের পর বঙ্কিমের প্রতিভাই আলোচ্য। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্যকে নিখুঁত আর্য্য-আদর্শে সংস্কৃতের অনুগত করিয়া যান। নানা বিজাতীয় প্রভাবের আক্রমণ-বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় প্রভৃতির সময় হইতে বঙ্গদেশ যেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, বঙ্গভাষার এই সংস্কৃত আদর্শ তাহারই একতম ফল—ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ফল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতিও বঙ্গভাষার এই 'আর্য্যামী' রক্ষার উদ্দেশ্যেই বদ্ধ-পরিকর হইয়া চলিতেছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভাই অনুপম স্বভাবশীলতা এবং স্বাধীনতার গুণে, একদিকে বিদ্যাসাগর এবং অন্যদিকে প্যারীচাঁদ প্রভৃতির মধ্যপথে, প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ এবং সাময়িক পত্রিকাদি উহাকে সাগ্রহে অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তিসামর্থ্য দিন দিন বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। এই বাঙ্গালা গদ্য যেন সাগ্রহে বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংস্কৃতবহুল রচনার মধ্যে বঙ্গদেশীয় সকল ভাব ও চিন্তা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না; ওই মৃতভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রের বজ্র-বন্ধনের মধ্যে বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের

বাঙ্গালা গদ্য!

ভাবগুলি বরং নিপীড়িত হইতে থাকে ; অথচ, দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রভাব এবং ক্ষুদ্র ঘটনাই নানামতে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইতেছে। এইরূপে আধুনিক সাহিত্য একদিকে আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি ছাড়িয়া বরং সুখ-দুঃখময় পাপ-পুণ্যময় প্রকৃত মানবচরিত্রের অঙ্কনেই অবহিত। বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যের এই আদর্শ লইয়া এবং উপন্যাস হস্তে করিয়া আসরে নামিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাকে সাধ্যমত প্রচলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপন্যাস ছাড়িয়া কেবল দর্শনাত্মক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে, হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রও বিদ্যাসাগরাদির অনুসরণ পূর্ব্বক সংস্কৃতের শব্দ-সমাস-বহুল রচনা প্রণালীর অনুসরণ করিতেন ; এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অদ্যাবধি বাঙ্গালীর প্রকৃত জীবন হইতে বহুদূরে অবস্থান করিত।

এইরূপে মধু হেম এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, গদ্য এবং পদ্যবিভাগে, নানাদিকে আধুনিকতার আদর্শে নবজীবন লাভ করিয়াছিল। এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-আকাশে আরও এক 'চন্দ্রোদয়' ঘটিয়াছিল—তাহার কথা পরে গ্রহণ করিব।

বঙ্গদর্শন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু এবং তিলোত্তমাসম্ভবের প্রকাশ) হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদর্শনের প্রকাশ পর্য্যন্ত এই ত্রয়োদশ বৎসরেই বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য এক নিশ্বাসে যৌবন-পথবর্ত্তী হইলেন। বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত সমাজ এই নবভাবের কাব্য কবিতা উপন্যাস এবং দর্শনের কথায় তোলপাড় করিতে লাগিল। বঙ্কিমের প্রতিভা এইরূপে সাময়িক পত্রের 'হাওয়া' সাহায্যেই দেশময় নবসাহিত্য বীজ ছড়াইতে লাগিল! আদি রাত্রির অন্ধকার হইতে নবপ্রবুদ্ধ আদিম মানবের হৃদয় কি পরিমাণ আগ্রহে এবং উল্লাসে নবপরিচিত সূর্য্যের জন্য চাহিয়া থাকিত! বঙ্গের শিক্ষিত সাধারণও বুঝি একদিন সেইভাবে প্রত্যেক মাসের প্রথমভাগে

বঙ্গদর্শনের প্রতীক্ষা করিত! মনে রাখিতে হইবে, দেশে এই নবজীবনের প্রবাহ এবং নবদীক্ষা ব্যাপ্ত করিবার প্রধান কর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র; এবং বঙ্কিমের প্রধান কার্য্য বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শন বলিতে এক সময় নব্যবঙ্গের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম এবং দর্শনকেই বুঝাইত; সুতরাং নানা দিকে বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝাইত! তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত, নাতিগভীর, এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা! বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় সেতারতন্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক, সূর্য্যাস্ত দেশের সাহিত্যগৎ বাজাইয়া, এইরূপে সমস্ত বঙ্গদেশের হৃদয়কে সাহিত্যের সদা-ব্রতে আমন্ত্রিত করিলেন! মধু, হেম বা নবীনের পক্ষে যেই প্রচার-কার্য্যের সম্ভব ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই সাময়িকপত্র সাহায্যে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন! বঙ্কিমচন্দ্রের এই আহ্বানফলে বঙ্গদেশে অনেক ছোট বড় 'চন্দ্রের' আবির্ভাব হইয়াছিল! রমেশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, এবং চন্দ্রনাথ প্রভৃতি মুখ্যভাবে বঙ্কিমের রীতি এবং আদর্শ অবলম্বনেই চিরজীবন সাহিত্য-সাধনায় অবহিত ছিলেন! বাঙ্গালীর মাহাত্ম্যসাধন—তাহার অন্তরাত্মার সর্ব্বতোমুখী প্রভূতা সম্পাদন করাই বঙ্কিমের মহীয়ান্ আদর্শ! নিষ্কাম নিরপেক্ষভাবে সরস্বতী-মাতার সেবা করিয়া জীবন অতিবাহিত করার মধ্যেই উহার প্রধান মাহাত্ম্য; বাণীসাধকের চক্ষে উহাই পরমার্থ! এখন কালক্রমে সরস্বতী সেবার আদর্শমধ্যে লক্ষ্মীমাতার পদামৃত-পিপাসা এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিলেও, এই আদর্শই মহত্ত্ব এবং বিশিষ্টতার নামান্তর হইয়া আছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। তাই বা কেন, তিনি বঙ্গদেশে এই এক নবসাহিত্য পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কপালকুণ্ডলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিভার যেই সমুদ্রগর্জ্জন দূর হইতে শুনা গিয়াছে, চন্দ্রশেখর বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহাই ক্রমে

বঙ্গে কথা সাহিত্য।

নিকটবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহদ্বারে আসিয়া তাহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুলকে পুলকিত করিয়াছে। বাঙ্গালী এই ধ্বনি ইতিপূর্ব্বে আর শুনে নাই। ইহা ইয়োরোপের আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক সাহিত্য-আদর্শের দীক্ষা।

বঙ্গীয় কথাসাহিত্যে এবং গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের চির-পূজ্য আসন; উহা মুখ্যভাবে প্রথম আবিষ্কর্ত্তার বা স্রষ্টার আসন; এই কথা কেহ কোনও কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। যথোচিত ঘটনা এবং চরিত্রের সৃষ্টি, উপাখ্যানের নৈতিক ভিত্তি, ভাষার শানিত দীপ্তি, ত্বরিতগতি এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতার গুণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী; তাঁহার ভাষা ভাব ও বস্তুবিষয় সর্ব্বত্র সুমার্জ্জিত এবং সংযত; এই সমস্ত কদাচিৎ একে-অন্যকে অতিক্রম করিয়াছে। সংস্কৃতভাষার কাদম্বরী এবং দশকুমার চরিত হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালার যাবতীয় গদ্যকথার সমভূমে তুলনায় স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিলেই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংযম এবং সামঞ্জস্যের মহিমা সর্ব্বাগ্রে প্রতীয়মান হইতে থাকিবে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের সীমা।

তথাপি বলিতে হয় যে বঙ্কিমের উপন্যাসে আধুনিক ইংরাজী বা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র বা প্রকাণ্ডতা নাই; মনুষ্য-জীবনের সর্ব্ববিধ ভাল মন্দের ঘাত প্রতিঘাতে ওজস্বী কিংবা বৈচিত্র্যময় চরিত্র সমাবেশ নাই। তাঁহার উপন্যাসের আয়তন ক্ষুদ্র; বর্ণিত চরিত্র গুলিও বড় প্রকাণ্ড নহে; এবং মানব জীবনের এক একটা সরল এবং ব্যাপক ভাবকে আশ্রয় করিয়াই উহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি ইয়োরোপীয় আধুনিক মানব-জীবনের বা সমাজের উৎকৃষ্ট সাহিত্য-চরিত্রগুলির সমানতায় তেমন কোনও সূক্ষ্ম সমস্যা কর্ম্মশীলতা বা দার্শনিকতা লইয়া আবির্ভূত হয় নাই।

ইহার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গসমাজও দায়ী। আমাদের সমাজে বৃহৎ চরিত্র বা বৃহৎ কর্ম্মজীবন বিকাশ পাইতে পারে না; অন্যূনপক্ষে, একোদ্দিষ্ট শান্তি প্রবণতা এবং নিষ্কামতাই তাহার চরম এবং প্রবলতম আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা সমাজে অধিকারী বা অনধিকারী সকলের জীবনই ন্যূণাধিক সীমাবদ্ধ এবং নিপীড়িত। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে, এ আদর্শ ই বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে সকল দিকে ইয়োরোপের অধীনতায় আনয়ণ করিয়াছে এবং এখনও অন্ধ করিয়া রাখিতেছে। চারিসহস্র বৎসরের পূর্ব্বকার মনুষ্য সমাজের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম এবং পারিবারিক আদর্শের দ্বারা এ দেশের মনুষ্যমন সকল দিকে সীমাবদ্ধ! উচ্চ-উচ্চতর সম্প্রদায়ের, অধিকন্তু পরস্পরের জন্মজাতিগত স্বার্থ প্রত্যেককে ন্যূনাধিক নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক ভীরু অথবা 'ধর্ম্মভীরু' করিয়া, এবঞ্চ অপরূপ ভাবুকতা গ্রস্ত করিয়াই রাখিয়াছে। গ্রামসমাজ শত সহস্র নিয়ম এবং দেশাচার-কুলাচারের সৃষ্টি পূর্ব্বক মনুষ্য আত্মাকে আঁটিয়া ধরিয়াছে। এই বন্ধন এবং এই সনাতন 'আচার' আদর্শকে রক্ষা করাটাই একান্ত ভাবে ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া গিয়াছে। কার্য্যে কিংবা কথাতেও কোনরূপ স্বাধীনতা, সমাজে বা সাহিত্যে কোনরূপ অভিনবতা এতদ্দেশের জাতি আচার এবং স্থিতিশীলতার আদর্শকে এমন গুরুতর ভাবে আঘাত করিয়া প্রতিহত হয় যে, চারিদিক হইতে এমন বিরোধ প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধ এবঞ্চ গুপ্তস্বার্থের উপহাসও উত্থিত হয় যে, এ দেশে 'নূতন' বলিয়া কথাটাই নানাদিক হইতে 'মহাপরাধের' দণ্ড লাভ করিতে থাকে। স্বাধীনতা নামক কথাটাও বিপরীত বিদ্রুপভাগী হইতে থাকে। পৃথিবীর অন্য সকল জাতি অপেক্ষা এই জাতি যে সমধিক প্রাচীনতা-নিষ্ঠ ভাবুক এবং ভাবুকতার ক্ষেত্রেও সর্ব্বাধিক চরমপন্থী,

বঙ্গসমাজের আদর্শের সীমা।

তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ভিতর বিপুল ঘটনাভিঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনভাবে স্বকীয়-পরমার্থনিষ্ঠ মানব-চরিত্র উঠিবার বসিবার অবকাশ পায় না। ইহার সমাজ-ধর্ম্মের বা আচারের আদর্শটাই প্রত্যেক ব্যক্তির পরমার্থকে চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং ওইরূপ নির্দ্ধারণাই 'অদৃষ্টের ফল' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছে। এ ক্ষেত্রেই তাহার সকল অপরিহার্য্য দোষ গুণ নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সমাজ-ধর্ম্ম এবং সভ্যতায়, বিশেষতঃ 'এসিয়াটিক' সমাজ-সভ্যতার 'মহাপরাধ' এই স্থান হইতেই সুরু হইয়াছে। বিশ্ববিজয়ী ইয়োরোপের চক্ষে যেই পরাচীনতা এবং নেমিবৃত্তি যেন অধর্ম্ম বলিয়াই নিন্দিত তাহাই আমাদের 'পরম' ধর্ম্ম! যেই বিজ্ঞান-দৃষ্টি অন্তর-বাহিরের স্বাস্থ্যজনক বলিয়াই প্রশংসিত, উহাকেই আমরা কথায়-কার্য্যে সকল দিকে 'মহারোগ' মনে করিয়া ঘৃণা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের সামাজিক অনুশাসন, কিংবদন্তী এবং সাময়িক পত্রিকাদি প্রাণপণে, ইয়োরোপের এই 'পৈশাচিক' আদর্শের দোষাঘ্রাণ করিয়া, শতমুখে শতভাবে আকারে-ইঙ্গিতে উহার নিন্দা ঘোষণা করিয়া, আমাদিগকে 'খুশী' রাখিতেই লাগিয়া আছে! প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই, ইয়োরোপের এই 'স্বাধীনতার', এই 'দানবিক' সমাজপ্রথার এবং আন্তরিক সাম্য-আদর্শের দোষ-উদ্ঘাটনের জন্য যেন একটি করিয়া 'স্তম্ভ' উৎসর্গিত আছে। অবশ্য নিজেদের আদর্শের দিক হইতে উহা পাঠ পূর্ব্বক পরম আত্ম-পরিতোষ লাভ করা এবং বর্ত্তমান দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ওই সান্ত্বনাটাই 'তত্ত্ব'-ভাবে আমাদিগকে নিত্যকাল নির্জ্জীব এবং নিশ্চেষ্ট করিয়া এবং ইয়োরোপীয় সমাজের প্রকৃত মাহাত্ম্য বিষয়ে, জীবন পথে উহার শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতা বিষয়ে বেগতিক অন্ধ করিয়া রাখিতেছে! সুতরাং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শক্তি বিপুলতা কিংবা

গভীরতা লাভ করিবার যোগ্যতা এখনো আমাদের নাই। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্য নানাদিকে ইয়োরোপীয় সমাজের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ স্বাধীনতা এবং সাম্য; আদৌ স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক পরে আগন্তুক দোষগুলির প্রতিকার চেষ্টা; অনন্তের সন্তান মনুষ্যকে একেবারে বাধাহীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াই, তৎপরে নীতি-ধর্ম্মের আদর্শে—আইন-কানুন এবং বিধি নিয়মের আদর্শে, তাহার মতি গতি নিয়মিত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে গেলে এই আদর্শের গতিকেই ইয়োরোপ বড় হইয়া এবং সকল দিকে বিশ্ববিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে! তাহার আধুনিক কালের ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান এবং ইতিহাস সমস্তই মূলতঃ এই আদর্শেই অত্যল্পকাল মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে! উহা সকল দিকে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মতন্ত্রীয় সমাজের আদিম বর্ণাশ্রম-বন্ধন এবং 'আচার' আদর্শকে উতরাইয়া গিয়াছে! আমাদের সমাজ এখনো এই সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটাকে যথোচিত ধারণা করিতেও পারে নাই। এই সাহিত্যের পাঠক এবং সমালোচকের বুদ্ধি এবং রুচি ও আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ধর্ম্মের অনুরূপেই গঠিত। কবির দোষ কি? আদর্শ, ভিত্তিভূমি, সহানুভূতি এমন কি সম্ভবের কল্পনা-ক্ষেত্র টুকু পর্য্যন্ত অবারিত না থাকিলে কবি কাহার নির্ভর করিয়া সৃষ্টি করিবেন? আকাশস্থ নিরালম্ব কিংবা বায়ুভূত এবং নিরাশ্রয় ভিত্তির উপরে শিল্প-চরিত্র স্থাপন করিতে গেলে উহা তন্মুহূর্ত্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সামাজিকগণের পদদলিত হইতে থাকিবে! সূর্য্যমুখীকে 'বে-আব্রু' ভাবে পর্দ্দার বাহির এবং 'গৃহের বাহির' করিয়াছিলেন, তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে 'অনার্য্য' এবং 'অ-হিন্দু' বলিয়া টিটকারী ভোগ করিতে হইয়াছিল! ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বৈচিত্র্য অথবা ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশালতা আশা করিবার সময় অথবা যোগ্যতা এখনো বাঙ্গালীর পক্ষে অনেক দূরে!

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এক একটা প্রেমের খেলা; দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ অথবা ব্যভিচারই প্রায় তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড।

বঙ্কিমের উপন্যাসের কেন্দ্র এবং পরিধি।

বঙ্গদেশে গার্হস্থ্য জীবন ভিন্ন জীবন নাই; এবং গার্হস্থ্য প্রেম ব্যতীত মহত্তর বা ব্যাপকতর ভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদের সময় হইতে বাঙ্গালী এই প্রেম লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আসিতেছে; এবং প্রেমের বিষয়েই বাঙ্গালীর প্রতিভা বিশেষ ফুটিয়াছে। 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—এই বাক্য আমরা ভালরূপে বুঝিয়াছি, এবং অন্যকে বুঝাইতেছি। আবার, এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমধিক বিকশিত হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যেরই এই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীনকাল হইতে, ভারতীয় আর্য্য-পরিবারের স্থিতিশীল আদর্শ, ইহার 'আচার আদর্শ' স্ত্রী-চরিত্রের অধীনতা এবং স্বামী-নিষ্ঠার উপরেই সম্যক্ নির্ভর করিয়া আসিতেছে। আমাদের শাস্ত্রাদি নারী-নীতির নির্দ্ধারণে, পতিপ্রাণতা এবং 'সতীত্বের' মাহাত্ম্য ঘোষণায় পরিপূর্ণ; এই সূত্রেই সমাজমধ্যে পূর্ব্ব-কালে সহমরণের প্রথা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়া আসিয়াছে! নারীজাতির নির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং 'অস্বাতন্ত্র্য' সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই এই সমাজ নিজের জাতিভেদ এবং স্থিতি-শীলতা সুসিদ্ধ করিয়াছিল, বলিতে হইবে। কুলস্ত্রীর 'দোষ' বিষয়ে তাই এই সমাজ চিরকাল একটা আত্যন্তিক এমন কি 'চরমপন্থী' ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে। এই ঘৃণার বিষয়ে ভারতবাসী জগতের অন্যসমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে রমণীর বা গৃহিণীর একটা বহুকাল-প্রচলিত আদর্শ আছে; উহা ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্বত্র আত্মত্যাগ নম্রতা এবং সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল। ইয়োরোপের 'স্বাধীনতা' আদর্শের সমক্ষে উহা কোন কোন দিকে অস্বাভাবিক,

'একরোখা' বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উহা এই সমাজে বিস্তর ক্রিয়াশীল এবং কর্ম্মঠ। রমণীর বিষয়ে কিংবা নিজেদের বিষয়ে পুরুষ চরিত্রের তেমন কোন আদর্শের 'কাঠাম' নাই; সুতরাং এই সমাজে রমণী হইতে পুরুষচরিত্র অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্বাধীন বলিতে হইবে। সমাজস্থ মনুষ্য চরিত্রের অধিকার স্বাধীনতা এবং কর্ম্ম-বিস্তার ব্যতীত যে বঙ্গীয় উপন্যাস নব নবতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতে পারিবে না, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়; এবং কেবল নিরবধি কালের দিকে চাহিয়াই যে-কিছু আশা করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রধান গুণ এই যে, উহারা রচনার বস্তু-ভিত্তি, গভীর আন্তরিকতা এবং সর্ব্বত্র ঋজুতার দরুণ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। বঙ্কিমের রচনা প্রণালীর মধ্যেও কোনরূপ একদেশিতা বা সঙ্কীর্ণতা নাই; উহা সর্ব্বত্র আত্ম-সংযত এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। রীতি বিষয়ে ফিল্ডাং, রিচার্ডসন, আডিসন, ষ্টীল, সুইফ্‌ট এবং কোন কোন দিকে (উনবিংশ শতাব্দীর) স্কট্ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সহানুভূতি বিস্তার লাভ করিয়াছে; তাঁহার চাতুর্য্য রসিকতা হাসি-তামাসা এবং সন্দর্ভ রচনার মধ্যেও ইঁহারা প্রভাব দেখাইয়াছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাতী নর্ম্ম রসিকগণের আদর্শেই বিরচিত; বঙ্গদর্শন নামটাও স্পেক্টেটরের ছায়াই বহন করিতেছে। তীক্ষ্ণ মার্জ্জিত এবং স্বল্প-পদ বাক্যে, অথচ গ্রাম্যতা পরিহার পূর্ব্বক যথা-সম্ভব 'ঘরো' ভাবে মনোগত পরিস্ফুট করার একটা আদর্শই ঐ সমস্ত লেখক কর্তৃক অনুসৃত; এবং তাঁহারা ইংরাজী ভাষাকে এই পথে অনির্ব্বচনীয় মার্জ্জিত রুচি এবং ঋদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বঙ্গ-দর্শনের লেখকগণও বঙ্গ ভাষার ইতিহাসে ওইরূপ পদবীর দাবী করিতে পারেন। বার্ক বার্কলী সাফ্‌টসবারী বা গীবনের রীতি-আদর্শ

ইহাঁদের ছিল না। কিন্তু, তৎকালে বঙ্গসাহিত্যে কোন চেষ্টারই অসদ্ভাব ঘটে নাই! বঙ্গ-দর্শনের প্রভায় সমুদ্দীপ্ত হইয়া পরে পরে *'বান্ধব' এবং 'আর্য্য-দর্শনের' প্রকাশ হয়; এবং উহাদের লেখক সংঘও* বিশেষতঃ কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি) জাগ্রৎ ভাবে বঙ্গীয় পদবাক্যের আর্য্য গৌরব, তরঙ্গিত প্রবাহ গতি এবং ধ্বনি-দীপ্তির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আমরা জানি, বর্ত্তমানের ইংরাজী ভাষা উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য সিদ্ধ করিয়াই নব-নব মাহাত্ম্যের অর্জ্জনে অবহিত হইয়াছে; বঙ্গভাষাও উহাই লক্ষ্য করিতেছে। যা' হোক, বঙ্কিমের ভাষা এবং সাহিত্য-সাধনার আদর্শ নানাদিকে 'ক্লাসিক' বলিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে, উপন্যাস বা সন্দর্ভের ক্ষেত্রে আর কেহ এইরূপ স্থিরসংযত অথচ বিমোহিনী শিল্প প্রতিভা দেখাইতে পারেন নাই! আমরা দেখিব, পরকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সূক্ষ্ম-ভাবুকতা এবং তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রকে স্থানে স্থানে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কিন্তু শিল্পকলার সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠগুণে (বস্তু, তত্ত্ব এবং ভাবের সামঞ্জস্য গুণে) এই বঙ্কিমচন্দ্র এখন যাবৎ এ'দেশে অনতিক্রম্য রহিয়াছেন। বঙ্গদেশের গদ্য-ক্ষেত্রে এই একটি মাত্র প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে আত্ম-পূর্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে হয় না।

এই দেশের পরিবার, রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইতিহাস এবং ধর্ম্ম-আদর্শের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বঙ্কিমের উপন্যাস এবং সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ' ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিভা এবং বঙ্গ-দর্শনের আহ্বান অনেক বিশিষ্ট-কর্ম্মা ব্যক্তিকেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বঙ্গীয় কথা সাহিত্যে ইহার ফল বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। বঙ্কিমের সম-ক্ষেত্রে 'স্বর্ণলতা' প্রণেতার নাম সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। 'স্বর্ণলতা'র প্রথম ভাগ

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত; উহা বঙ্গীয় পরিবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্তও ঐতিহাসিক এবং সামাজিক কথা রচনায় ব্রতী হইয়াইলেন। নানা বিষয়ে (বিশেষতঃ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস চিন্তায়) মনঃসংযোগ করায়, তাঁহার উপন্যাস রচনার প্রতিভা যথোচিত মতে বিকশিত হইতে না পারিলেও, 'শতবর্ষ' 'সংসার' 'সমাজ' প্রভৃতি এখন যাবৎ বিশিষ্ঠ সৌরভে এবং মাধুর্য্যে অটল রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন সঞ্জীবচন্দ্র, চণ্ডীচরণ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি অক্লিষ্ট-কর্ম্মা লেখকগণও বঙ্কিমের সম-সূত্রে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালীর মনকে, অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের পথে নানাদিকে জাগরিত করিয়া গিয়াছেন।

এই যুগের কথা লেখকগণ।

বঙ্কিমের প্রতিভা, সন্দর্ভ এবং উপন্যাস ব্যতীত অন্য দিকেও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তিনি সমকালিক বঙ্গ সাহিত্যের একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক। বঙ্গদেশে 'হিন্দু-আদর্শের পুনরুত্থান' ভাবনায় তিনিই অগ্রণী; এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহযোগী। বঙ্কিম শেষ বয়সের উপন্যাসাদিতে এবং 'ধর্ম্মতত্ত্বে', দেশের বহুপ্রচলিত 'একান্ত বৈরাগ্য' এবং 'সংন্যাসের' আদর্শকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া, গীতোক্ত 'ভাগবত ধর্ম্ম' এবং সেশ্বর ভক্তি-আদর্শের প্রচার করিয়াছেন; বর্ত্তমান যুগের ভারত-জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম-পন্থা নির্দ্দেশ করিতেও একটা চেষ্টা করিয়াছেন; এবং গভীর গবেষণার সাহায্যে, নবীনচন্দ্রের সম-সূত্রে, পুরাণাদির অন্ধ-গুহা হইতে কৃষ্ণ চরিত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য বঙ্গ সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী ফল-প্রসূ হইবে, আশা করা যায়। এই বঙ্কিম এবং নবীন, গদ্যে ও পদ্যে, ন্যূনাধিক যুগোচিত ভাবে,

বঙ্কিমচন্দ্রে 'হিন্দু' আদর্শ।

ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক ভিত্তির উপরে, প্রাচীন মহাভারতের মহাপুরুষ-চরিত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন; এবং এই ক্ষেত্রে, সতর্কভাবে একটা জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয়তার পন্থা-নির্দ্দেশেও প্রয়াস পাইয়াছেন।

ওই আদর্শের অপর লেখকগণ।

শশধর এবং চন্দ্রনাথ ন্যূনাধিক 'এক রোখা' হইয়া, 'হিন্দুত্বের' আদর্শটাকে একরূপ বিশ্ব-বিস্মৃত ভাবে অনুসরণ করিতেছেন, বই নহে; বিশ্ব সভ্যতা এবং যুগধর্ম্মের দাবী পদদলিত করিয়াই, তাঁহারা এ' দেশের অতীত কালের 'পৌরাণিক' ব্রাহ্মণ্য এবং ধর্ম্মভাবুকতার আদর্শ সমর্থন করিয়াছেন। ভূদেবের মধ্যেই প্রাচীন উপনিষদের অন্তর্নিহিত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, সৌম্য-সংযত এবং বিশ্ব-পূজ্য ঋষি-আত্মার পরিচয় পাই! বঙ্কিমের মধ্যে ভূদেবের আর্য লক্ষণ না থাকিলেও, তাঁহার সাহিত্যিক সিদ্ধ-লেখনী, তীক্ষ্ণ-ধার লিপি চাতুর্য্য এবং বিচার গবেষণার শক্তি তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপেই অধিকার প্রদান করিয়াছিল। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে পরিচালিত হইয়াই 'ব্রাহ্মণ্য' আদর্শকে নানাদিকে আধুনিক যুগগতি এবং বিশ্ব-সভ্যতার সহিত সঙ্গত করিতে চাহিয়াছেন। স্থলবিশেষে একদেশিত্ব অথবা 'চোক বোজায়' ভাব সত্ত্বেও বঙ্কিমের আলোচনা বিচারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মাহাত্ম্যই মানিয়া বলিয়াছে—মনুষ্যত্বের পরিব্যাপক আদর্শ, মানব-ধর্ম্ম এবং বিশ্ব সভ্যতার সহিত সঙ্গতির আদর্শটাই সম্মুখে রাখিয়াছে। এই দেশের সনাতন 'পৈত্র্য-তন্ত্র' 'শাস্ত্র বন্ধন' এবং 'নৈমিবৃত্তি'-আদর্শের অচল-অটল পরিবেষ মধ্যে এই প্রাপ্তিটুকুই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর আমরা বঙ্গসাহিত্যের পত্র-সূত্র পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র বহু-পরিমাণে স্বদেশী বিদেশী প্রাচীন মহাকাব্যকার-গণের অনুসরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের কাব্যগুলির সমস্ত লোভনীয়

উপাদান এবং উপকরণ ইঁহারা প্রতিভার ইন্দ্রজাল-সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই দুইজন কবি বাঙ্গালী হইয়াও নানামতে প্রাচীন গ্রীক চরিত্র এবং আর্য্য-চরিত্রের অংশ-সম্ভূত বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক, ইঁহাদের শক্তি উচ্ছ্বাস এবং সংযম বাঙ্গালার মাটীতে নানাদিকে অপূর্ব্ব এবং দুর্ল্লভ বলিয়াই পদেপদে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে যেই অসাধারণ বীরাচার লইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার প্রভাব প্রকৃত প্রস্তাবে লোকায়ত (Popular) হইতে পারে নাই ; উপরে উপরে ভাসিতেছে ; ক্বচিৎ কেবল শিক্ষিতের এবং বিশিষ্টের মনোমধ্যেই আসন লাভ করিতে পারিয়াছে। এই বীরাচার বা অলৌকিক অথবা চমৎকারী কল্পনার উচ্চ চরিত্র এবং কণ্ঠ বঙ্গের সাধারণ-পাঠকের মনঃপূত বা স্বভাব-সঙ্গত নহে ; উহার বিষয়ে যথোচিত সহানুভূতি টুকুও তাহার পক্ষে যেন সাধনা এবং শিক্ষার অপেক্ষা করে। এই তত্ত্ব অন্ততঃ হেমচন্দ্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। ইহার অনুধাবন করিতে বসিলে স্বজাতির একটা পরিস্ফুট চরিত্র-দৈন্য এবং সংকীর্ণতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াই লজ্জিত হইতে হয়—কিন্তু ইহা সত্য ! এবং এ স্থলেই অধ্যাত্ম-ভাবে, জাতীয় জীবনে এবং সামাজিক জীবনে, এই জাতির সর্ব্বপ্রধান সমস্যা নিহিত আছে। মনে হয়, বঙ্গসাহিত্যে মধু হেম এবং বঙ্কিমের এই 'ক্লাসিক' রীতি, এই হেলেনিক এবং দূরগত আর্য্য-আদর্শের (রামায়ণ মহাভারতের) 'বস্তু-সঙ্গতি' এবং ভাব-সংযমের প্রণালী যেন আরও কিছুকাল প্রবল থাকিলে ভাল হইত ! বাঙ্গালীর পক্ষে অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরও কিছুকাল তেজোবীর্য্য এবং শব্দশক্তির সাধনায় এবং দৃঢ়তার সাধনায় অবহিত থাকাই বাঞ্ছিত ছিল। তাহার ভাষা বা সাহিত্য উত্তর

সাহিত্যসূত্রে মধু, হেম, বঙ্কিম।

যেন পূর্ণ যৌবন লাভ করিবার পূর্ব্বেই, 'ইচড়ে পাকিয়া' আধুনিক ফরাসী এবং জর্ম্মন্ সাহিত্যের এক-রোখা দলাদলি-গ্রস্ত এবং বাতিক গ্রস্ত হইয়া গিয়াছে; উচ্চাঙ্গের বিষয়-ধারণা এবং ভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শক্তি সিদ্ধি করার পূর্ব্বেই বাঙ্গালী শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে সঙ্গীত তন্ত্রের চরমপন্থী ভাবুক এবং দার্শনিক হইয়া বৈতালিক নৃত্য-গীতে মাতিয়া গিয়াছে!

বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্র

যা হোক, ইঁহাদের পর-সূত্রেই নবীনচন্দ্রের প্রতিভা জাতীয় তত্ত্ব অবলম্বনে বঙ্গীয় কাব্যজগতে মৌলিক-ভাবে বিকশিত হইয়াছে। মধুসূদন এবং হেম তাঁহাদের আদর্শের বশে নানাবিধ অলৌকিক উপকরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন; এবং এই শ্রেণীর উপকরণ ভাণ্ডার একরূপ রিক্ত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র এই শ্রেণীর উপকরণের আশ্রয় না লইয়া সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরেই বাগ্দেবীর প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বঙ্গবাসিকে অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনাইয়াছেন।

অনেকে অনুমান করেন, বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্র বায়রণের শিষ্য! অবকাশ রঞ্জিনী, ক্লিওপেট্রা এবং পলাশীর যুদ্ধের মূলীভূত ভাবপ্রবাহের অনুধাবন করিলে, নবীনচন্দ্র যে প্রথম বয়সে বায়রণের অনুকরণ করিতেছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হইতে পারে; তদ্ভিন্ন বায়রণের অনেক কাব্যও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়রণের কবিতা সর্ব্বত্র জ্বালাময়ী; গভীরতা অপেক্ষা তাহাতে বরং তরঙ্গই অধিক; এবং

নবীনচন্দ্রের স্বাধীনতা।

তিনি রচনা প্রণালী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবধান ও অসতর্ক। এই সমস্ত দোষে এবং গুণে নবীনচন্দ্রও পরিপূর্ণ; তাঁহার পলাশীর যুদ্ধে এবং অবকাশ রঞ্জিনীতে এই প্রকৃতিই সমধিক পরিস্ফুট। কিন্তু উহা অত্যন্ত বায়রণ পাঠের ফল বলিয়া মনে হয় না। নবীনচন্দ্রের অধ্যাত্ম প্রকৃতি এবং

সাহিত্যজীবনেই ইহার মূল 'শিকড়' নিহিত আছে। রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র তাঁহার অন্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা অধিক 'ধরা' দিয়াছেন; উচ্ছৃঙ্খল বন-প্রকৃতির মত কবিপ্রকৃতি মধ্যে মধ্যে সমস্ত শৃঙ্খলা-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছে; বর্ষার পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত কাব্যকলা, রস, অলঙ্কার প্রভৃতিকে ভাববশে বিদলিত উন্মূলিত করিয়া যথেচ্ছ ছুটিয়াছে। এই কাব্যেই কবির হৃদয়শোণিত যথার্থভাবে সঞ্চারিত! নবীনচন্দ্র রঙ্গমতীর প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক অঙ্কে যত দূর হৃদয়বিতরণ করিবার অবসর পাইয়াছেন, আর কোনও কাব্যে তত দূর পারেন নাই। কবি *স্বয়ং এই কাব্যের প্রধান নায়ক বলিলে, কথাটি অমূলক হয় না। এই কাব্যে এমন-সমস্ত সুদীর্ঘ জল্পনা এবং বর্ণনা আছে, যাহা কেবল কবির সম্পর্কেই সার্থক হয়।*

নবীনচন্দ্রের প্রতিভা অনেকপরিমাণে ঐতিহাসিক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কল্পনা এবং বিচিত্রভাবপ্রবণতার সহিত এই ঐতিহাসিক প্রতিভা সম্মিলিত হইয়া কবির হৃদয় গঠিত করিয়াছিল। সত্যের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণে, কায়ার সহিত অদ্ভুত ছায়াবাজির সংমিশ্রণে, বিরাট রক্তমাংসবহুল শরীর এবং বিপুল সুখদুঃখভাস্বর চরিত্রের সৃষ্টিই এই কবির বিশেষত্ব! সামান্য কাঠামের উপর চকিতে বিচিত্র কল্পনাজাল বিস্তার করিতে, এক কটাক্ষে তাহার আদ্যন্ত মধ্য আয়ত্ত করিয়া রেখাপাত করিতে, নবীনচন্দ্রের তূলিকা খুব পটু। তাঁহার কাব্য-পাঠকের চিত্তকে ইহা সর্ব্বপ্রথমে আঘাত করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। নবীনচন্দ্র হাসি কান্নার রাজা! অতিরিক্ত হাসি, অতিরিক্ত কান্না! অনেক সময় হয়ত অকারণ হাসি অকারণ কান্না!

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস লিখিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ

বিরুদ্ধে হিন্দু আদর্শের পুনরুত্থানের কবি। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকাল হইতে ধর্ম্মবিপ্লবে বঙ্গসাহিত্য কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহার কিয়ৎপরিমাণে আভাস দিয়াছি। নবীনচন্দ্রের চেষ্টাও এ ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, প্রেমদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমধর্ম্মী। বৈষ্ণব কবিগণ স্বহস্তে রাধাকৃষ্ণ গঠন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেব-বোধে পূজা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রও কল্পনায় অভিনব কৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে প্রকৃত ভক্তের ন্যায় পূজা করিয়াছেন।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি; হিন্দু আদর্শের নব্য উত্থান।

এই বিষয়ে আধুনিক বাঙ্গালী কবি পিতামহ প্রপিতামহের ভাবধর্ম্মের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে, এই কাব্যগুলিতে প্রাচীন মহাকাব্য ও আধুনিক উপন্যাসের উভয় প্রকৃতিই সম্মিলিত; চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতের ভক্তিপ্রবণতাও বহুপরিমাণে না আছে এমন নহে। প্রভাসের কৃষ্ণ পূর্ণমাত্রায় শ্রীচৈতন্য। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 'সোঽহং' জ্ঞান ছাড়িয়া প্রকৃত ভক্তের ন্যায় এই কাব্যে নৃত্য করিয়াছেন। রৈবতকে, যে সংযতগম্ভীর এবং মহিমান্বিত কৃষ্ণ-চরিত্রের আভাস সূচিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ পায় নাই; বাঙ্গালীর চরিত্র মধ্যে বর্ত্তমানে বৈষ্ণব তন্ত্রের ভাবুকতা লক্ষণটিই বিশেষ বলিষ্ঠ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং নবীনের প্রতিভা স্বজাতির অন্তরতত্ত্ব হইতেই প্রাণ লাভ পূর্ব্বক অপরূপ উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছিল। উহা শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের প্রভাব এবং দেশব্যাপ্ত ভক্তিধর্ম্মের অপিচ সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিজয়-ধ্বজার ফল।

বহুপূর্ব্বে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বর্ত্তমান আদর্শ প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন। তাঁহার পথানুসরণে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে কৃষ্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য

সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিকল্পনার দিগন্তবিসারী নেত্র সমক্ষে এই বিষয় প্রকট, মহান্ ও বিভক্তাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক তথ্য, কল্পনা ও গবেষণা, সৃষ্টি ও আবিষ্কার একাকার করিয়া, এই বিপুলায়তন কাব্যত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের জাতীয় সংঘর্ষ, ফরাসি বিপ্লব, আবটের নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, চিন্তাদগ্ধ মেরী আণ্টনিয়েট, মানবহিতৈষিণী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি সকলেই এই মহাকাব্যের উপকরণ যোগাইয়াছেন। আবার, ইহাদের ঐতিহাসিক প্রকৃতিও নিরবচ্ছিন্ন শিল্প আদর্শের প্রকৃতি নহে; উহারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা বা সমাজের কোনরূপ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিতে চাহে নাই; উহাদের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের 'প্রচার' আদর্শ—পৌরাণিক আদর্শই প্রবল হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে জাগ্রত হইয়া পূর্ব্বকালের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি আধুনিক পরিচ্ছদ অবলম্বনে এই কাব্যে পরিস্ফুরিত। ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সাম্যভাব, মৈত্রী, দাসত্বপ্রথা, বিবাহপ্রথা, অদৃষ্টবাদ, জনবৃদ্ধি প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সমস্যাসমূহের বিচার বিতর্ক এবং কবির আত্মমতানুযায়ী সিদ্ধান্তে এই কাব্য মুখরিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র জাতীয়তা নাই, ধর্ম্মই এই সমাজের মূল ভিত্তি ও বন্ধনগ্রন্থি, এবং ভাবুকতাই তাহার ধর্ম্মের বলিষ্ঠতম লক্ষণ; তাহার দুর্ব্বলতার লক্ষণ ও এই ভাবুকতা। সুতরাং এই কাব্য ত্রয়কে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'জাতীয় কাব্য' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই কাব্যে যে সমস্ত সাহিত্যগত দোষ বর্ত্তমান আছে, তাহারাও হয়ত গুণের অনুপাতে অল্প নহে। নবীনের রচনা-প্রণালীর বাহুল্য, পুনরুক্তি, অসতর্কতা ও কবির ভাববিহ্বলতা, স্থানে স্থানে সর্গবন্ধে

শৈথিল্য, অকিঞ্চিৎ বিষয়ের বর্ণনা, কবি কর্তৃক প্রকাশ্যভাবে পাঠককে ধরা দেওয়া এবং অনাবশ্যক রসিকতা করিবার প্রয়াস, উদ্দিষ্ট বিষয়ে সমুচিত নিষ্ঠা-সংযম বা অধিকারের অভাব, স্থানে স্থানে বিজাতীয় বিপরীতের সংমিশ্রন প্রভৃতিও রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে সুস্পষ্ট।

নবীনচন্দ্রের দোষ গুণ।

নবীনচন্দ্র ভাবুক; মধুসূদন ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভাবাবেগ বা কল্পনা-দৃষ্টির প্রসার অনেক বিস্তৃত এবং দূরগামী? তাহার ভাষাও সমধিক জ্বালাময়ী লীলাচঞ্চল এবং বেগগামী; তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্ব-নিষ্ঠাও হয়ত সমধিক প্রসারিত; কিন্তু ইনি তাঁহাদের ন্যায় সংযত এবং কুশলী কবি নহেন। ভাবাবিষ্ট হইলে তাঁহার আত্মসংযম থাকে না। তিনি ভাবের বেগে মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন; শত বৎসরের সূক্ষ্ম বীজাণুকে মহাবৃক্ষে পরিণত করিতে পারেন,—যদি কোনও মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে উহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে! কারণ, তাঁহার প্রতিভা আকাশের হাওয়ায় পরিচালিত হয়। তাঁহার হৃদয় যদি কোনও বিষয় লক্ষ্য করিয়া ছুটে, তাহা হইলে অবিরাম ছুটিতে থাকে; যেন উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কবির নাই, ইচ্ছাও নাই। এই কারণে তিনি শক্তিশালী কবি হইয়াও কাব্যকুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই—নিখুঁত সাহিত্য আদর্শে উন্নত শ্রেণীর 'আর্টিষ্ট' হইতে পারেন নাই।

সুতরাং, নবীনচন্দ্রের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কবির অনুরূপ আবেগ আছে, স্থানের প্রসারও আছে, কিন্তু অনুরূপ গাম্ভীর্য্য এবং শিল্পসংযম নাই; তাঁহার কল্পনা চঞ্চলা পক্ষিমাতার মত প্রত্যহ নব-নব দেশে নব-নব বৃক্ষে নব-নব শাখায় উড়িয়া বেড়ায়; প্রত্যহ নব ডিম্ব প্রসব করিয়া এক চঞ্চুর আঘাতেই উহাকে ফুটাইয়া রাখিয়া যায়—ধৈর্য্যের সহিত তাহার

উপর জাগিয়া থাকিয়া উত্তাপ দিবার অপেক্ষা রাখে না। আমরা খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাথের মধ্যেও এই অধৈর্য্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিব। এই চাঞ্চল্য, এই দ্রুতগতি এবং এই প্রচণ্ডশক্তি নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রত্যেক পত্রে অনুভূত হয়। এ দেশের কোন সাহিত্য-পণ্ডিত বলিতে চাহিয়াছেন—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস যে বিশাল কল্পনা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ মৌলিক ও বিশ্ব-পরিব্যাপী, উহাদের রঙ্গভূমি যেরূপ বিপুল ও অনন্তপ্রসারিণী, উহাদের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ছায়ালোকসম্পাতে যেরূপ বর্ণসৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে, এই সমস্ত যদি উপযুক্ত ধৈর্য্য এবং নৈপুণ্যের সাহায্যে দৃঢ়ীভূত হইত, এমন কি, যদি শুধু কাটিয়া-ছাঁটিয়া দোষাশ্রিত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে, এই কাব্যত্রয়ী পৃথিবীর উৎকৃষ্ট মহাকাব্য-শ্রেণীতে স্পর্দ্ধার সহিত স্থানগ্রহণ করিতে পারিত; স্বদেশে বিদেশে বাঙ্গালী এই কাব্য গৌরবের সহিত দেখাইতে পারিত। এই কথায় অনেক সত্য আছে।

এই সমস্ত কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই জানেন, সকল দোষ সত্ত্বেও নবীনচন্দ্রের কাব্য সাহিত্য-রসিকের চিরকালের উপভোগ্য হইয়া আছে। সাহিত্যশাস্ত্রকে নানাদিকে পদদলিত করিয়াও এই কবি যেন সকলের অপেক্ষা পাঠক-হৃদয়ের সমধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াই আপনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন, কোন প্রকৃত কবিকে পূর্ব্ব প্রচলিত শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা সম্যক্ বিচার করিতে গেলে নানাদিকে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়; কারণ প্রত্যেকের একটা বিশেষ দাবী এই যে, নিজের বিশেষ শাস্ত্র-আদর্শে বিচারিত হওয়া! সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্বটা কি, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন দার্শনিকের চক্ষে ধরা দেয় নাই। নবীনচন্দ্র

সমস্ত শাসন-শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়াও, বঙ্গদেশের বক্ষে, নিজের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াই দাঁড়াইয়াছেন ; তাহার সহস্র দোষ 'ধরপাকড়' করিয়াও, এই-যে পদে পদে মুগ্ধ হইতে হয়, উহার প্রধান রহস্যটা তাঁহার অভাবনীয় স্বাধীনতা এবং সরলতার মধ্যেই কোথাও যে নিহিত আছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কবি এই অনির্ব্বচনীয় হৃদয়-গুণেই অন্যের হৃদয় অধিকার করেন। মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের গৌরবান্বিত ক্লাসিক কালোয়াতির পর নবীনের এই নবতন্ত্রীয় জংলা-সুর! উহা চট্টগ্রামের স্বাধীন রঙ্গমতী-কর্ণফুলী এবং শৈল সমুদ্রের দীক্ষা!

এই কল্পনা-প্রবণ অথচ ইতিবৃত্তের ধাতুযুক্ত বস্তু-রস এবং এই বাহ্যকল্লোল-প্রবণ ভাবুকতা বিষয়ে নবীনচন্দ্রের কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়! এই বিষয়োন্মত্ত অথচ সুদৃঢ় কিংবা গভীর পর্য্যবেক্ষণ-বিস্মৃত কাব্যরীতি, এই মৃত্তিকা-নির্ভর অথচ বিপুল-প্রকাণ্ড উচ্ছ্বাস-যুক্ত ভাবুকতা, এই তত্ত্ব-আলোচনাশীল অথচ রজোগুণের বিক্ষেপবশে উত্তপ্ত এবং দুঃখ-সুখের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত রচনা প্রণালী! হৃদয়ের এই উচ্ছ্বাস কবিত্বশক্তির একটা ব্যাপক লক্ষণ বলিয়া ইতি পূর্ব্বে মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের মধ্যে উহার পরিচয় মিলিলেও, বঙ্গসাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে কিংবা পরে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ সম্পর্কের এইরূপ উদগ্রতপ্ত অথচ বহুমুখ প্রসার, পারিবারিক স্নেহ প্রীতি সম্বন্ধের এত আত্মবিস্মৃত অথচ সমুজ্জ্বল প্রকাশ, স্বদেশ স্বজাতি বা স্বধর্ম্মের ইতিবৃত্ত-গত পুরাতন এবং নূতনকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বর্ণে পরিস্নাত করিয়া বক্ষঃ-তটে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য এইরূপ জ্বালাময়ী আকুলতার দৃষ্টান্ত, আর দ্বিতীয়টি মিলিবে না। ইতিহাসকে—প্রাচীন আর্য্যরীতির 'মহাভারত' আদর্শকে, আধুনিক হিন্দুর ভাবুকতা লইয়া অন্তরঙ্গভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা, প্রাচীন অবতার-বাদকে বিশ্বজনীনভাবে বুঝিবার জন্য এত বড় প্রকাণ্ড এবং জীবনব্যাপী

সাধনা, এ'দেশে অপর কোন কবির মধ্যে এত উদগ্র হইয়া প্রকাশিত হয় নাই! এই সর্ব্ববিস্মারক হৃদয়-ধর্ম্মের গতিকেই নবীনচন্দ্র হয়ত প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হইতে পারেন নাই; ভাষাকে সুস্থির উদ্দেশ্যে পরিমার্জ্জিত করিয়া, ভাবকে সর্ব্বকালের পাঠকের ন্যূনাধিক মনন-সই করিয়া মূর্ত্তিমান্ করার জন্য যে তাঁহার যথোচিত ধৈর্য্য কিংবা কারুকরী ছিল না তাহা প্রতিক্ষণেই প্রতীয়মান হইতে থাকে! মনে হইতে থাকে যে, এই কবি এক-নিশ্বাসেই হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা-বেদনা ভাষামুখে প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন! এইরূপ নিশ্চিন্ত-নির্ভীক হৃদয়ধর্ম্মিতা, অহমিকা, আত্ম-প্রকাশ এবং আত্ম প্রসাদ জগতে একা বায়রণ ব্যতীত অন্য কোন কবির বেলায় দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। যেরূপেই হোক ইহা সত্য কথা; এবং এ ক্ষেত্রেই নবীনচন্দ্রের সমস্ত অমার্জ্জনীয় দোষ এবং অসাধারণ গুণ উভয়েই দেদীপ্যমান!

যেমন বলিয়াছি, এই কবি যেন ইতিহাসেরও খুব অভিনিবিষ্ট পাঠক নহেন; তিনি কল্পনা নেত্রেই ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। প্রাচীনকে প্রাচীনতার বিশিষ্ট পরিবেষের মধ্যে ধারণা করা এবং ওই ধারণাকে স্থানীয় বর্ণ-ধর্ম্মে প্রকটিত করিয়া তোলা, আধুনিক শিল্পকলার একটা আদর্শ! কেবল নবীনচন্দ্র কেন, মধুসূদন কিংবা হেমচন্দ্র অথবা পরবর্ত্তী কোন কবিই যেন আধুনিক শিল্পের এই দাবী সতর্কভাবে রক্ষা করিতে চাহেন নাই; তাই নবীনচন্দ্রের ইতিবৃত্তও আত্ম-ভাবুকতায় পরিপূর্ণ! কিন্তু কত বড় প্রকাণ্ড অথচ উজ্জ্বল এবং সত্যাভাস-যুক্ত এই ভাবুকতা! অন্যদিকে, কবির ভাষাও যেন অযত্নসিদ্ধভাবেই চির-যৌবন-সম্পন্না! অবকাশ রঞ্জিণী হইতে অমৃতাভ পর্য্যন্ত একই হৃদয়-আকরোদ্ভূত, অমার্জ্জিত অথচ অযত্নসৌন্দর্য্য-সম্ভূতা সরস্বতী! বিশ্বের কবি-মহলে, বায়রণে ব্যতীত এইরূপ ব্যাপারও হয়ত দ্বিতীয়টি মিলিবে

না! ইংরাজী ভাষার চির-উন্নতিশীল সাহিত্য-গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াও, এই কবি একবার মাত্র ওই গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছেন! অবকাশ রঞ্জিণী পলাশীর যুদ্ধ বা রঙ্গমতীর মধ্যে বায়রণ এবং স্কটের যেইটুকু ঝাঁঝ লাগিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার বিদেশীয় ঋণের পরিসমাপ্তি! রৈবতক হইতে অমৃতাভের অভ্যন্তরে স্থল বিশেষে বিদেশী ঘটনা-বস্তুর পরিগ্রহ থাকিলেও উহারা সকলদিকে ব্যাসবাল্মীকি এবং বৈষ্ণব "চরিত" কবিগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছে; কেবল কবির হৃদয়রক্ত সাধর্ম্ম্যেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে! এইরূপ কবি সহস্র দোষ সত্বও কেবল নিজের বাঙ্গালিত্ব, শিশু-সারল্যযুক্ত অহমিকার ঔদ্ধত্য এবং অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাসের বলেই হিন্দু বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গে অমরতা লাভ করিতে পারেন। সুতরাং এক শ্রেণীর পাঠক যে, আধুনিক বাঙ্গালীর অন্য সমস্ত কাব্যব্যাপারকে 'কৃত্রিম' বলিয়া অবহেলা পূর্ব্বক নবীনচন্দ্রকে আধুনিক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি পদবীতে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহা একবারে অকারণ নহে।

ওই আদর্শের অপর কবিগণ।

মধু হেম এবং নবীনের প্রতিভা প্রকাশের পর বঙ্গদেশে শত শত হৃদয় হইতে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া শিষ্যতা এবং অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছিল। এই সূত্রে কবি আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। কিন্তু এই কবিত্রয়ের বিশেষত্ব এতই দৃঢ়তার উপর সংস্থাপিত যে, উহাঁদের কেহই দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কিংবা ইহাঁদিগকে ছায়ায় ফেলিতে পারেন নাই। অনেকেই এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। কোনরূপ নিজস্ব না থাকাতেই, হয়ত অনুকরণ বিষয়ে আশাতীত পারদর্শিতা দেখাইয়াও, অনেকে প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নাই। সাহিত্য-জগৎ যে মৌলিকতা এবং কৃতিত্বের বিচার

করিতে বসিয়া, পরবর্ত্তীর প্রতি বিশেষতঃ শিষ্য কিংবা অনুকরণ-কারীর প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা-ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং এ ক্ষেত্রে অনেক সময় যে অবিচারও ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের এই নির্ম্মমতা সকলকেই বেশীকম সহ্য করিতে হয়; অনেক সময় প্রকৃত কবি-প্রতিভা ও বাঁদ পড়ে না! এইরূপে মহাকাল নিদারুণ ভাবে 'কাটিয়া-ছাঁটিয়া' 'পূর্ব্ব-শূরি'-বৃন্দের ও অনিষ্ট সাধন করিতেছেন! এককালের বহুমূল্য সম্পত্তির সংখ্যা, পরিমাণ বা ওজন কমাইয়াও নবাগতের জন্য স্থান করিতেছেন! সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেক 'অমর-যোণিকেও' এইরূপে ব্যাধি-বিপত্তি, ব্যবচ্ছেদ বিধি, এবঞ্চ মৃত্যুনিয়তির বশীভূত হইতে দেখা যায়।

২

এখানে আমরা বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক শিল্প লক্ষণের অপর স্তর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে উহা উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এবং শিল্পাদিতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ হইতেই নব জীবনের সূত্রপাত, তাহার নাম Renaisance এই নবজীবন ক্রমে সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে সমাজতত্ত্বে এবং ধর্ম্মে সকলদিকে কার্য্য করিয়া ইয়োরোপে 'আধুনিক সভ্যতা' আদর্শের জনক হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক সাহিত্যের উদ্ধার এবং নিবিষ্ট অধ্যয়ন, ষোড়শ শতাব্দীর লুথরের নবসংস্কার বা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব ও জর্ম্মণীর 'নব-সাহিত্য বাদীগণ' (German Illuminati) কর্ত্তৃক যথাক্রমে ইয়োরোপের ধর্ম্মে সমাজে ও সাহিত্যে এই 'আধুনিকতার' আদর্শ সমাহিত হইয়াছিল। ইয়োরোপের এই নব-জীবনের ইতিবৃত্ত প্রত্যেক

বঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তর; উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব।

শ্রেয়ঃকামী সাহিত্যরসিকের এবং সমাজ-দার্শনিকের পক্ষেই অবশ্য-পাঠ্য এবং পুনঃপুনঃ চিন্তনীয় হইয়াই রহিয়াছে। উহার জ্ঞান লাভ না করিয়া আধুনিক কালে কেহই, কোন সাহিত্যমধ্যেই, প্রকৃত পাঠক বা লেখক শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন না বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং এই স্থলে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। এই 'নব-জীবন' আদর্শের ফলে, ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং শিল্পাদি সকল-দিকে 'প্রাচীনতার' আদর্শকে ন্যূনাধিক নিগৃহিত করিয়াই নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে। উহা হইতেই সর্ব্বত্র স্বাধীনতা এবং 'মানবত্ব-নিষ্ঠা' (humanism) আদর্শের রাজত্ব স্পষ্টবাক্যে বিঘোষিত হইয়া সমগ্র ইয়োরোপকে 'নব-সভ্যতার' নবমন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছে! এই নবজীবন দুইভাবে কার্য্য করিয়াছিল; প্রথমতঃ 'প্রাচীন' আদর্শের উদ্ধার এবং উহার যথাযথ নিরূপন। সাহিত্যে বা শিল্পে গ্রীক ও রোমকগণ যে পথে চলিয়াছিলেন, তাহা বস্তুগত আদর্শে ভাব এবং তত্ত্ব সংযমের রীতি—উহারই প্রচলিত নাম, 'ক্লাসিক, আদর্শ। ওই আদর্শকে যথাযথভাবে উদ্ধার পূর্ব্বক ইয়োরোপীয় মনুষ্যমন স্বতন্ত্র পথে খেলিয়াছে; *আধুনিকের এই স্বাতন্ত্র্য-প্রণালীর নামই স্থূলতঃ 'রোমাণ্টিক' আদর্শ।* এই আদর্শে আধুনিক মনুষ্যের হৃদয়-গতিটাকেই নানাদিকে অনুসরণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্য নানাপথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে! সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে, প্রত্যেক শিল্প রচনার মধ্যেই তিনটা বিশেষদিক পরিদৃষ্ট হইবে। রচয়িতার নিজের দিক হইতে তাঁহার হৃদয়-গত 'ভাব' (emotional element); বাহিরের দিক হইতে বিষয় বা বস্তু, এবং তত্ত্ব—সাহিত্যের ক্ষেত্রে উভয়ের নামই 'পদার্থ'। আধুনিক শিল্পী নিজের দিক হইতে এই হৃদয়ভাবটিকে অত্যধিক 'লাই দিয়া',

শিল্পরচনার তিন দিক

এমন কি ভাবুকতা বা ভাবোন্মত্ততার (Sentimentalism) বশবর্ত্তী হইয়াও যেমন 'ভাবগত' সাহিত্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছে, অন্যদিকে বিষয় অথবা তত্ত্বকে ঐকান্তিক ভাবে অনুসরণ করিয়া বস্তু-গত এবং তত্ত্বগত আদর্শের পন্থাও দর্শন করিয়াছে। সুতরাং এই রোমাণ্টিক আদর্শকে তাহার তিন বিভাগে স্থূলতঃ 'বস্তুগত' 'তত্ত্বগত' এবং 'ভাবগত' নামে নির্দ্দেশ করা যায়। এই আদর্শ এখন নানাদিকে অপরূপ চরমপন্থা অবলম্বন করিয়াই ইয়োরোপীয় সাহিত্যে নানামূর্ত্তিতে প্রকটিত। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি মধুসূদন এবং হেম নানাদিকে আধুনিকের হৃদয় এবং বুদ্ধি লইয়াই 'বস্তুগত' আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ও নানামতে উহাই রক্ষা পূর্ব্বক বঙ্গীয় গদ্য এবং কথা সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সংযম পেশলতা এবং শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদের রচনা কদাচিৎ হৃদয়ভাব বৈষিয়কতা বা আন্তরিকতাকে একদেশী হইয়া অনুসরণ করিয়াছে! তাঁহাদের পর, নবীনচন্দ্রের মধ্যেই ভাবুকতার অত্যধিক প্রসার লক্ষিত হইবে। নবীনচন্দ্র নিজের হৃদয়ের দিক হইতে একরূপ চরমপন্থী হইয়া কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের পর এই প্রণালী আর একজন বিশিষ্ঠকর্ম্মা কবির মধ্যে এবং দেখাদেখি অসংখ্য আধুনিক লেখকের মধ্যে বরং তদপেক্ষাও চরমপন্থী আদর্শে প্রসারিত! তবে, নবীনচন্দ্রের এই ভাবুকতা তাঁহার নিজের আন্তরিক 'রসোন্মত্ততার' নামান্তর বই নহে। পরবর্ত্তী কবিনিবহের মধ্যে উহা অনেক স্থলে বরং প্রকৃত রসভাবকে গুণীভূত করিয়া, কেবল ছায়াবাদিতা, ভাক্ত রস-বুদ্ধি এবং অহমিকার নির্ভরেই চলিয়াছে। নবীনচন্দ্রের মধ্যে যে স্থলে অত্যন্ত সরল ভাব বা

পূর্ব্বাপর কবিগণের মধ্যস্থিত সামঞ্জস্য সুত্র।

emotional element প্রবল ছিল, ইঁহাদের মধ্যে তাহা নাই বলিলেও চলে; অনেকের মধ্যেই বরং একটা বিষয়-বিভ্রান্ত বাতিক অন্ততঃপক্ষে তাত্ত্বিক লক্ষণই পরিস্ফুট হইতেছে; সর্ব্বত্র হৃদয়-গোপনের, এমন কি মর্ম্মগত প্রকৃত অর্থটাকে গোপন করার আদর্শই প্রবল হইয়া চলিয়াছে! হৃদয় সংক্রান্ত 'রসের' আদর্শ অবজ্ঞাত হইয়া দূর-দূরান্তরিত তত্ত্ব-সঙ্কেত কিংবা বুদ্ধি-গবেষণার আদর্শটাই বরং অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ ফরাসী জর্ম্মন এবং ওলন্দাজী সাহিত্যে একদল সাহিত্যসেবী এই আদর্শটাকে একরূপ 'দলাদলির' ভাবেই অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্য একদিকে ইয়োরোপীয় 'আধুনিকতার' ভাবেই অনুপ্রাণিত! এই কারণে, নবীনচন্দ্র হইতে, বিশেষতঃ তাঁহার পরবর্ত্তিতা সূত্রে, বঙ্গসাহিত্যে একদিকে একটা নব-পদ্ধতি প্রবল হইতেছে বলিলে, অত্যুক্তি হইবে না। বলা বাহুল্য, এই আদর্শ, এমন কি উহার চরমপন্থিতাটুকুও বর্ত্তমানে অবশ্যম্ভাবী; বাঙ্গালীর চরিত্রে ভাবুকতার লক্ষণ এত প্রবল যে, একবার উহার আস্বাদ লাভ করিলে পর, উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা সহস্রের মধ্যে একজনের পক্ষে ও যেন অসম্ভব; উহার পক্ষে সমস্ত অতিরিক্ততা ঝারিয়া ফেলিয়া সাহিত্যে স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করাও সময় সাপেক্ষ! উহা দেশে-দেশে বিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ কার্য্য। বিশেষতঃ, উহার সাধর্ম্ম্যবশেই বঙ্গসাহিত্য একদিকে অতুলনীয় বিকাশ এবং মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে; সুতরাং উহাকে যৎকিঞ্চিৎ নিরূপণ করাই বর্ত্তমানে আমাদের লক্ষ্য হইবে।

মধুসূদন প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে যে সকল উপকরণ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাঁহারা যেমন আজন্মবন্দিনী বঙ্গভাষার

চরণ শৃঙ্খল উন্মোচিত করিয়াছেন, তেমনি দৈন্য মালিন্য বিদূরিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রকৃত মহত্ব এবং স্বাধীনতার সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত করিয়াগিয়াছেন। কিন্তু, দীর্ঘ-বিস্তৃত কাব্যাদি ব্যতীত বঙ্গভাষায়, ইয়োরোপীয় আধুনিক সাহিত্য-পথে,অপর এক শ্রেণীর কাব্য সাহিত্যও উদ্ভূত হইয়াছে ; উহাই অন্যদিকে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্পত্তি। ইংরাজীর প্রভাবে বঙ্গসমাজের হৃদয় নানাদিকে স্বাধীনতা-আদর্শের পরিচয় লাভ করিয়াছে ; কিন্তু, এই স্বাধীনতা বরং সমাজ অপেক্ষাও তাহার সাহিত্যেই প্রবলতর ভাবে প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ গতিকে আধুনিক ইয়োরোপে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের খণ্ড-কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি! মনুষ্যের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ, হাসি-অশ্রু, ভাব ও চিন্তা, ভয় বিস্ময়বিস্ফুর্ত্তি এবং শান্তি, রৌদ্রবীর্য্য করুণা জুগুপ্সা, প্রতিদিনের অগণিত আশা এবং নিরাশা ইহাতে স্থান লাভ করিয়া—প্রকটিত নিরূপিত এবং নির্ব্বর্ণিত হইতেছে ; মানব-হৃদয়ের অপরিমিত সহানুভূতি লাভ করিয়াই নিত্যজীবনে নিয়ত-বর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে! সুতরাং উহা বিশেষভাবে মনুষ্যের ব্যক্তিত্বগত অনুভব এবং দার্শনিক বুদ্ধির সম্পর্কজনিত সাহিত্য।

স্বাধীনতার আদর্শ এবং খণ্ড কাব্য।

প্রাচীন কালের এক-শ্লোকী বা দুই-তিন শ্লোকের ক্ষুদ্র কবিতা এবং সঙ্গীতগাথা এইরূপে বর্দ্ধিত আকার-প্রকার অবলম্বন পূর্ব্বক নানাজাতীয় খণ্ড কাব্যে পরিণত হইতেছে। একদিকে ক্রমান্বয়ে বস্তু, তত্ব অথবা ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে তিনটি বিশিষ্ট প্রকৃতি-ভেদ ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অন্য দিকে, কেবল বাক্যের-প্রবাহের উপরে অথবা শব্দের বাহ্যিক মিলনের উপর নির্ভর করিয়াও

খণ্ডকাব্যের বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি।

কবিতামাত্রের দুইটী বিশেষ প্রণালী-ভেদ ঘটিতে পারে। (১) ইহাদের মধ্যেই পুনশ্চ, বর্ণণী (descriptive) বিবরণী (narrative) চিত্রনী (deleneative) দর্শনী (reflective, meditative, metaphysical) রূপনী (allegorical) সংকেতনী (symbolical); এবং কথা কাহিনী (ballad, pastoral) কণিকা (epigram), কল্পনা (poetry of fancy) গাথা (rhapsody) আরতি (psalmody) প্রভৃতি বহু আকৃতি-প্রকৃতি ভেদ ঘটিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এইরূপে, কবি-চরিত্রের স্বাধীনতা এবং বিবক্ষা ভেদে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রণালীতে, এই খণ্ড কাব্য প্রত্যহ নব-নব বর্ণাকৃতি লাভ করিতেছে; ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই এক অভিনব শিল্প-আদর্শের ক্ষণিকা অথচ মহতী রঙ্গ-ক্রীড়াই অভিনীত ! বঙ্গসাহিত্যও বিশ্ববাণীর নব প্রথায় সম্যক্ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

এই অভিনব সাহিত্য-শক্তির প্রধান প্রয়োগ রহস্য এবং আকর্ষণ কবির স্বাতন্ত্র্য, ও কবির ব্যক্তিগত সম্পর্ক (personal element); এবং উহা প্রায়ই, লেখকের দিক হইতে—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগত 'আমিত্বের' দিক হইতেই রচিত হয়; 'আমির' মুখেই বাক্য উদ্গীরণ করে। অতএব এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ অহমিকা, এবং

(১) সংপ্রতি 'গীতি কবিতা' বলিতে কেহ কেহ ছন্দোবদ্ধ ক্ষুদ্র কাব্য মাত্রকেই বুঝাইতে চাহেন; কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ নানাকারণে প্রমাদ-জনক হইতে পারে। ক্ষুদ্র ছন্দোরচনামাত্রেই গীতি-কবিতা নহে। গীত মাত্রেই ন্যূনাধিক ভাব-প্রবন বা Sentimental সুতরাং আমরা 'গীতি-কবিতা' বলিতে সঙ্গীতধর্ম্মাত্মক কবিতাই বুঝিব। বাণী-কবিতা বা বাক্য ধর্ম্মাত্মক কবিতার দ্বারা তদ্বিপরীত বা poetry proper বুঝিব। বাক্য অর্থবোধক ধ্বনি; গীত বা তান ভাবের (emotion) সংযোজক বা সংকেতক ধ্বনি বই নহে। গীতের প্রকৃত অর্থ-ব্যক্তি না থাকিলেও চলে। এই বিষয় বাণীপন্থায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমিত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ। সুতরাং, ইহা স্বীকার্য্য যে এই প্রণালীর অত্যধিক সেবা-ফলে, লেখক বা পাঠক উভয়ের মধ্যেই একটা বেগতিক 'অহংমুখ' ভাব এবং বাতিকের বৃদ্ধি করিতে পারে। এই প্রণালী যে আধুনিক সাহিত্যে নানাস্থলে স্বেচ্ছাচারে বা ব্যভিচারে পরিণত হইতেছে, তাহাও বিনা বিচারে স্বীকার করা যায়। সাহিত্য-রীতির পাপ পুণ্য বিচার এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আমরা অপরিহার্য্য স্থল ব্যতীত ওই কার্য্য হইতে বিরত থাকিব; 'স্বরূপ কথনেই' ব্যাপৃত থাকিব। জীবিত কবিগণের সম্পর্কেও গুণ-মুখ্য সমালোচনার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিব।

মহাকাব্য ও খণ্ড কাব্যের তুলনায় বিচার।

এখন, প্রাচীন 'মহাকাব্য' রচনার সহিত এই খণ্ড কাব্যের প্রভূত বৈসাদৃশ্য আছে। সামগ্র্যের প্রতি, সমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি (synthetical vision) এবং ন্যূনাধিক 'বিশিষ্টের' বা আদর্শের (idealisation) সৃষ্টিই মহাকাব্যের লক্ষ্য। ওই দৃষ্টি কিংবা লক্ষ্যের প্রসার দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। মহাকাব্যের কবি স্বয়ং উচ্চ বেদীর উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিম্নস্থ শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিতেছেন। আধুনিক কবিতায়, উহার স্বল্পে-তৃপ্ত এবং স্বল্প-নিষ্ঠ প্রবৃত্তি এবং মুহূর্ত্ত-নিষ্ঠ আবেগের উপরে নির্ভর করিয়া, এক পরিস্ফুট অথচ গভীর বেদনা-সঙ্গীত মনুষ্য-হৃদয় হইতে অনন্ত-অব্যক্ত-অজ্ঞাত এবং অপ্রাপ্তের অভিমুখে উত্থিত হইতেছে! অতএব এই কবিতায়, কবির সহিত পাঠকের আন্তরিক সহানুভূতিই উহার প্রধান শক্তি; এবং প্রকৃত জীবনই প্রায়স্থলে এই কবিতার ভিত্তি। স্থৈর্য্য এবং বিশ্বাসেই প্রাচীন সাহিত্যের মূল শক্তি বলিয়া উহার লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ বা অভিব্যক্তি ন্যূনাধিক স্থির আছে। আধুনিক সাহিত্য সুগভীর সংশয়ে আশায় এবং নিরাশায়

উদ্দীপ্ত এবঞ্চ ওতপ্রোত হইয়া উন্মত্তবৎ কোনও অজ্ঞাত লক্ষ্যের উদ্দেশেই প্রধাবিত! সুতরাং উহা অনেক সময় দিশাহারা, অর্থহীন এমন কি প্রলাপ-গ্রস্ত; অনেক সময় এমন অসম্বন্ধ এবং প্রতিপত্তি-হীন যে উহার মধ্যে খাঁটী কিংবা মেকীর অবধারণ করাও দুষ্কর!' প্রাচীনের আদর্শ অতীতে; আধুনিকের আদর্শ ভবিষ্যতে! সে অতীতের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শব্দ-শক্তির সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক চিত্র কিংবা সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেখা এবং আভাসের রাজ্যে, তাল মান বা বোলচালের রাজ্যেও দিক্‌ভ্রান্তবৎ ঘুরিতেছে! বিশিষ্ট-পক্ষে ব্যক্তিগত সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির উপরেই তাহার প্রাণ; কোন 'সামান্য লক্ষণ' নাই। সমগ্র পদার্থ অপেক্ষা তাহার বিশেষ স্বরূপতত্ত্ব, রেখাময় চিত্রতত্ত্ব, বা ঈশারাময় সঙ্গীত-তত্ত্বটুকু ধরিবার জন্যই আধুনিক কবিতা সবিশেষ লালায়িত; কাব্যবস্তু অপেক্ষা বরং কবির নিজের ভাবোন্মত্ততা প্রকাশের জন্যই সবিশেষ উদ্বিগ্ন! এই লক্ষ্য এবং আদর্শ, এই লালসা আবেগ এবং উদ্বেগ যে প্রকৃতির কবিতায় বিকাশিত হইতেছে, তাহার আয়তন ক্ষুদ্র—পৃথিবীর বক্ষে মনুষ্যদেহের মতই ক্ষুদ্র; কিন্তু তাহার ভাব ও তত্ত্বাকাঙ্খা দেহস্থ মনের মতই বৃহৎ এবং অনন্ত-প্রসারী! এই কবিতা সময়-সময় দুটি কথায় মানব-হৃদয়কে স্বর্গতটে উন্নীত করিতে পারে! শরীর ক্ষুদ্র হইলেও কবির শক্তি এবং নৈপুণ্য গুণে, ভাবময় বৃহতের বা অনন্তের ধারণা এবং সঙ্কেতে, এই কবিতা সময়-সময় ক্ষুদ্রদেহে মহাকাব্যের অভ্রান্নতি স্পর্শ করিয়াছে! প্রাচীন মহাকাব্য প্রকাণ্ড পর্ব্বত; উহাতে প্রস্তর কঙ্কর এবং বালুকা-রাশির মধ্যে স্থানগতিক মহার্ঘরত্ন নিহিত আছে; কিন্তু তন্মধ্যে কবির সাময়িক শ্রান্তি দৈন্য বা অসামর্থ্য প্রকাশ না পাইয়া যায় না। অপর পক্ষে, উচ্চ অঙ্গের খণ্ড কবিতা

প্রত্যেকে এক-একটি নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ নিটোল হীরক খণ্ড! চিরজীবন সহজে সাহচর্য্যে রাখিবার এবং ব্যবহার করিবার উপযুক্ত! এই খণ্ড কবিতা পর্ব্বতের সমস্ত পার্থিব অংশ বাদ দিয়া, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এবং বাছাই করিয়া কেবল রত্নটুকু উদ্ধার করিতে চাহিতেছে! এসেন্সের চাষ করিতেছে! সুতরাং উহার দোষগুণ উভয়েই অপরিহার্য্য। কোথাও উহা নিরাকার, কোথাও বা সাকার! কোথাও অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্য; উহার ধোঁয়া-ধোঁয়া এবং ছুঁই-না-ছুঁই ভাব! কোথাও অত্যধিক তীব্রতায় মাথা ধরিতেছে; কোথাও বা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে অন্তরাত্মাকে পর্য্যাকুল করিয়া যাইতেছে! সুতরাং এই কবিতা নানাদিকে অল্পেই সাহিত্য-শাস্ত্রের এবং সাহিত্য-অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। তথাপি, উহা যে পর্য্যন্ত পরিস্ফুট এবং পরিমেয় অথবা অনুমেয় অর্থবস্তুর উপস্থাপনে জনসাধারণের বোধগম্য হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার মাহাত্ম্যও কম নহে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সমালোচকগণ এই কবিতার গৌরব বুঝিয়াছেন; তাই, তাঁহারা ক্ষুদ্র কাব্যের সমর্থ শিল্পীগণকেও শ্রেষ্ঠ-কবির আসন দিয়াছেন। আধুনিক সভ্যজগতে এই খণ্ড কবিতা শতশতদিকে অপূর্ব্ব পন্থায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওই সমস্ত আমাদের আলোচ্য নহে; সুতরাং, আমরা কেবল বঙ্গসাহিত্য-ভূমেই আবদ্ধ থাকিব।

বৈষ্ণব কবিগণ বহু পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে যে সকল ক্ষুদ্র কবিতায় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও বহু স্থলে ভাবের বৃহত্ব এবং অসীমতা প্রকাশিত। এই বৈষ্ণব কবিতা অমর, বঙ্গসাহিত্যে তাহার প্রভাব কদাপি বিলুপ্ত হইবার নহে। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সহিত উহার অপরিমেয় ঐক্যবন্ধন রহিয়াছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার ধারা এবং পরিণাম।

অনেক কাল ধরিয়া, বাঙ্গালার কবিমণ্ডলীর ভিতর দিয়া 'ভাবগত'

কবিতা পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালার জলাজঙ্গলের আর্দ্র বাতাসের ন্যায় এই কবিতা আর্দ্র, স্নিগ্ধকারী, কখন কখন ম্যালেরিয়া-দুষ্ট ও বটে। ইহা প্রধানতঃ প্রেমের কবিতা। বঙ্গকবি শতমুখে প্রেমের বিবৃতি করিয়াছেন; তবু তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া, ইতিপূর্ব্বে রামনিধি গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে কয়েকটি মনোহর প্রণয়-সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আধুনিক সূত্রে সঙ্গতি।

নিধুবাবুর গভীর দাম্পত্যপ্রেম-মূলক গানগুলি বঙ্গসাহিত্যে প্রণয় সঙ্গীতের যুগান্তর সূচিত করিয়াছে। ভারতীয় সমাজের নীতিশাস্ত্রে দাম্পত্য ব্যতীত অন্যবিধ প্রেমের স্থান নাই; পরিণয়-পূর্ব্ব প্রেম বা প্রেম-পূর্ব্বক পরিণয়ের আদর্শও ইহার চক্ষে দূষিত; উহার দ্বারা এই সমাজের স্থিতি,—উহার জাতি-ভিত্তি নিদারুণভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে বলিয়াই দূষিত! রাধা-কৃষ্ণ আদর্শের প্রেম দাম্পত্য প্রেম নহে; দেবতার অছিলা ধরিয়াই বঙ্গসমাজের হৃদয় এইরূপে 'পরকীয়' প্রেম-কথায় বিলাসী হইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব কবিগণই নাম-করণ করিয়াছেন, উহা 'পিরীতি'। পিরীতির মধ্যে শান্তি নাই; উহার মিলন ও বিরহ, আশা হতাশা অবিশ্বাস, সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভের আন্দোলনে হৃদয়কে তরঙ্গিত এবং উত্তপ্ত রাখে; তাহাতে ভাবের আবেগ এবং কবিতার রঙ্গভূমি অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট প্রসারিত হয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, পরিণয়-হীন এমন কি 'পরকীয়' প্রেমের আদর্শে পুনর্ব্বার প্রাচীন 'পিরীতি'-কবিতার স্রোত, রাধা-কৃষ্ণের 'মুখশ' বর্জ্জনেই বঙ্গ সাহিত্যে অবাধে প্রবাহিত। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এ শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রথম-প্রথম উপন্যাস মধ্যে এইরূপ প্রেমের সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন; এবং বর্ত্তমান

কালেও যে-কোন লেখক কলম ধরিতেছেন তাঁহার নিকট হইতেই এই 'পিরীতি' প্রসঙ্গ মিলিতেছে। নরনারীর যেই মিলন বা প্রেমকে আর্য্যঋষিগণ ন্যূনাধিক দেহজ বা বাসনাজাত বলিয়া বিশেষ আমল দিতে চাহেন নাই, এমন কি দাম্পত্য মিলনকেও 'ধর্ম্মের' আদর্শে কঠোর শাস্ত্র শাসনে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজের চক্ষে উহাই মনুষ্য জীবনের এবং সংসারের প্রধান সমস্যা বলিয়া পরিগণিত। ওই সমাজে 'স্বাধীনতার' আদর্শ গতিকেই নর-নারীর মিলন বা দাম্পত্য প্রেম প্রবল সমস্যা-আকারে উপস্থিত! আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য তাই ব্যাপকভাবে প্রেমের দায়িত্ব এবং উহার সু-কু সীমা নির্দ্ধারণেই ব্যতিব্যস্ত; প্রেমের মাহাত্ম্যকেও অত্যধিক আমল দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় সমাজের আদর্শে, দাম্পত্য প্রেম একটা অদৃষ্ট-নিয়ত পদার্থ এবং সাধনার প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নহে। হিন্দু নর-নারীকে চোক বুজিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে এবং মানিয়া লইতে হয়; ইয়োরোপীয় সমাজ নরনারীর মিলন ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করত পূর্ব্ব হইতেই উহাকে প্রধান সমস্যাকারে উপস্থিত করিতেছে; বঙ্গসাহিত্যও (অনেক সময় মায়িক এবং কাল্পনিক প্রণালীতে) উক্ত সমস্যা-সূত্রের গ্রহণ পূর্ব্বক কবিতা এবং উপন্যাস রচনা করিতেছে। এসমস্ত প্রেম-কবিতার অধিকাংশই গীত-ধর্ম্মাত্মক এবং দেশের প্রকৃত জীবন হইতে নানাদিকে দূরবর্ত্তী বলিয়া, উহারা কেবল 'ভাব-গত' প্রকৃতি অবলম্বনেই প্রকাশ পায়; এবং অল্পেই পরিস্ফুট অর্থ কিম্বা প্রতিপত্তি হারাইয়া ফেলে। অপিচ 'চোখে না দেখিয়াও' অনেক সময় কেবল মাত্র 'বাঁশি শুনিয়াই' প্রেমোন্মত্ত হইতে হয় বলিয়া, উহার মধ্যে একদিকে অপরিসীম

বঙ্গসমাজে আধুনিক খণ্ড কবিতার স্থান।

ভাবুকতা এবং তাত্ত্বিকতা উপপন্ন হইতেছে। পাশ্চাত্য প্রেমের 'বস্তুভিত্তি' হইতে অতিতর দূরবর্ত্তী থাকার দরুণ এই কবিতা একদিকে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতেছে সন্দেহ নাই, উহাকে বঙ্গীয় সমাজের' বিশেষত্ব মূলক বলিয়া "বাঙ্গালী গীতিকবিতা" নামে বিশ্ব-সাহিত্যে নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইয়োরোপীয় সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে, বঙ্গীয় 'প্রেম' কবিতা হয়ত এই দিকে একটা সম্মান লাভ করিতে পারিবে। উহা উৎকর্ষ স্থলে প্রেমের অনুপম তত্ত্বদর্শী কবিতা! কিন্তু অধিকাংশ স্থলে লেখকের দিক হইতে কেবল 'ভাবোন্মাদ' বাচক বলিয়া বিরূপ 'টিটকারী' ভোগ করিতেও পারে! যা হোক বিশেষভাবে ছন্দোধর্ম্ম এবং সঙ্গীতের ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছে— গীতি কবিতা। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এই কবিতায় ভর-পূর। উহার অধিকাংশই অবশ্য উল্লেখ-যোগ্য নহে; কোনওরূপ সাহিত্য ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত নহে। অধিকাংশই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের প্রগাঢ়তা বা ঐকান্তিকতায় প্রাচীন চণ্ডীদাস কিংবা বিদ্যাপতির ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। পরিণত ভাষার নবনব ছন্দ এবং শব্দাবলীর সাহায্যে কেবল কোলাহল তুলিতেছে বই নহে; মুহূর্ত্তকালের জন্য হৃদয়কে 'আনছান' করিয়া যাওয়া ব্যতীত উহাদের কোন স্থিরতর উদ্দেশ্য ও নাই। *

আধুনিক গ্রন্থ কবিতার দোষ।

সুতরাং, আধুনিক গীতি কবিতার প্রধান লক্ষণ এই যে, উহাদের সঙ্গে নিসর্গপ্রকৃতির কিংবা জাগতিক বস্তু-বিষয়ের সম্পর্ক সামান্য; উহারা নানাদিকে কেবল আকাশস্থ নিরালম্ব হইয়া, মানসিক ভাবের প্রপঞ্চ লইয়াই ব্যাপৃত! বিশিষ্টপক্ষে দার্শনিকতা বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কিংবা লেখকের নিজের খেয়ালজনিত উচ্ছ্বাসেই উহাদের মাহাত্ম্য।

* গীতি কবিতা যে চিত্র এবং সঙ্গীতের অধিকার হইতে অপরিস্ফুট ছায়াভাস

কোনরূপ বস্তুবিষয়ক অভিব্যক্তি বা সৃষ্টির মধ্যে উহাদের প্রতিষ্ঠা নহে। আবার, এই দর্শনও অনেক স্থলে কেবল অনুবীক্ষণ বা বিশেষের দর্শন; দূরবীক্ষণ কিংবা প্রকৃতের দর্শন ও নহে। কেবল, ক্ষুদ্রকে, চিরপরিচিত বস্তুকে বৃহৎ করিয়া ধারণা করিতেই ব্যাপৃত। উচ্চ মহৎ চরিত্রের বা মহদন্তঃকরণের বৃহৎ-বিস্ফারিত ভাবুকতা, কোনরূপ উদগ্রতা কিংবা প্রচণ্ডতার দৃষ্টান্ত ও এই আধুনিকতার মধ্যে কদাচিৎ মিলিবে। অনেক সময়, কেবল 'চুটকী' অবলম্বন পূর্ব্বক চটক দেখাইয়াই উহা চিত্ত আকর্ষণে সফলতা লাভ করে। এই কারণে সকল সভ্য সাহিত্যেই এই খুঁৎ-খুঁৎ-কারী ক্ষুদ্রতার, ভব্যতার এবং ভাবুকতার দুর্ণাম রটিয়াছে—কক্নী-ঈজম বা 'সহুরে খেয়াল'! উহার বিরুদ্ধে সময় সময় হয়ত অশ্লীলতার এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের অপবাদ ও রটিতেছে!

নব্য কাব্যসূত্রে বিহারীলাল।

এতদ্দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব খণ্ড কবিতার, বা গীতি-কবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল বঙ্গের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইনি প্রকৃতিকে এক নব ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা। ইংরাজ কবি কীট্সের ন্যায় তাঁহার হৃদয় এই পিপাসায় জগতের দিকে উন্মুক্ত ছিল। "সারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী"তে ইনি স্থানে স্থানে এমন মহনীয় কমনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। কমনীয়তার পিপাসু কবি, স্বপ্নাবিষ্টনেত্রে এ দেশের নিসর্গমুখে উহাকে অন্বেষণ করিয়াছেন;

এবং ধ্বনিতত্ত্বটুকু ধার করিয়া বর্ত্তমানে নানাদিকে বিপুলতা প্রাপ্ত হইতেছে, অধিকন্তু, সাহিত্যের সীমাটাও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহার আলোচনা লেখকের বাণীপন্থায় পাইবেন।

সেই জন্য তিনি সর্ব্বজনসমাদৃত কবি হইতে পারেন নাই। এই নব গীতি কবিতার উষারাজ্যে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মহিলা' প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও স্বর্ণকুমারী দেবীর নামও বিশেষ মতে উল্লেখ করিতে হয়।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মধু হেম বা বঙ্কিমের মধ্যে সরস্বতীর যে মূর্ত্তি পরিস্ফুট তাহা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষভাবে মনুষ্যের প্রাচীন অথচ সনাতন বাণি-পন্থার অনুক্রমেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাই, ইঁহাদের কৃতিত্ব উৎকর্ষস্থলে নানাদিকে সাহিত্যের বিশ্বজনীন সম্পত্তি লক্ষণেই উর্জ্জস্বল; উপরন্তু, মনুষ্যের সর্ব্ব-সামান্য অনুভূতি-ভূমির উপরেই উহাদের ভিত্তি। ইঁহাদের পর, বৈষ্ণবতন্ত্রের গীতিকবিতা এবং এই বিহারীলাল প্রভৃতির সন্ততি-সূত্রে, অপিচ ইয়োরোপীয় আধুনিক গীতিভাবুকতার অনুসরণ এবং সমুন্নয়নের সূত্রেও, বঙ্গসাহিত্যে অপর এক দেব-সূনু ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন— তিনি রবীন্দ্রনাথ! জন্ম-গায়ক রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে মনুষ্যের আধুনিক ভাষা ও ভাবপদ্ধতির ক্ষেত্রে নানাদিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা এবং একনিষ্ঠ সাধনার বিশিষ্টতা, অধিকন্তু, একটা বিশেষপথে অতুলনীয় সিদ্ধির নামবরতার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবিকার্য্য এবং উপার্জ্জন বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্বশূরিগণের অবলম্বিত পদ্ধতি হইতে নানাদিকে বিভিন্ন। আরও দেখিবেন যে, নবীনচন্দ্রের ওই ভাবুকতা, ওই ব্যক্তিত্ব-সম্পর্ক এবং অসংযম বা দীর্ঘবিস্তৃত ধ্যানযোগের অসামর্থ্যই পরবর্ত্তিতা-সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়াই যেন একদিকে দীর্ঘ-ধ্যান-বিস্তার-বিহীন ক্ষুদ্র কবিতার বা গীতিকবিতার স্বল্পপরিসর মধ্যেই নিজের সাফল্য খুঁজিয়াছে; বিস্তারিত কাব্যচেষ্টার দুরাকাঙ্খা পরিহার পূর্ব্বক স্বীয়কণ্ঠের অতুলনীয় সঙ্গীত-রতি এবং দার্শনিক প্রতিভার সমুচিত রঙ্গভূমি লাভে চেষ্টিত হইয়াছে।

বিহারীলাল প্রভৃতির অপূর্ণ চেষ্টা তাঁহাদের শিষ্য রবীন্দ্রনাথে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু গুরু-ঋণ বিস্মৃত হন নাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। এখনও তাঁহার সম্যক সমালোচনার সময় আসে নাই। সে সময় বহু দূরবর্ত্তী থাকুক—বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভায় কৃতার্থ, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হউক! রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে সকল মৌলিক উপকরণ ও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও কবি কিংবা লেখক পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা নিত্য নব নব পথে খেলিতেছে। তিনি বঙ্গীয় খণ্ড কবিতার সাহিত্যকে এমন শব্দসম্পৎ, সত্য ও সৌন্দর্য্যের উপাদান, রচনার কারুকার্য্য, চরণের মাধুর্য্য, অলঙ্কারের পারিপাট্য ও ছন্দের শত সহস্র প্রকার বৈচিত্র্যে ভূষিত করিয়া যাইতেছেন যে, বঙ্গভাষা এই ক্ষেত্রে স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীর অন্য সাহিত্যকে আপন কুটীরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে পারে। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আমরা জগতের আধুনিক সাহিত্য-প্রদর্শনীতে নির্ভয়ে পাঠাইতে পারি; এবং এইরূপ কবিতার সংখ্যাও শতাধিক হইবে। ইহা বঙ্গভাষার অল্প গৌরবের কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্টতার মূল কারণ স্বাধীনতা। তিনি শৈশব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, এমন কি, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বকীয় শক্তির অনুসরণ করিতেছেন; সমস্ত শক্তিশালী মানবের চরিত্রের মধ্যেই প্রকৃতি এমন একটী আপাতঃ-দাম্ভিক উগ্রতা মিশ্রিত করিয়া দেন যে, উহার প্রেরণায় তাঁহারা সমস্ত প্রশংসা-অপ্রশংসাকে তুচ্ছ করিয়া অবিশ্রান্ত প্রবাহে স্বকীয় নিয়তির অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারেন,

রবীন্দ্রনাথের উন্নতির মূল কারণ।

আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন। এই স্বাধীনতায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও অপ্রকৃতি উভয়ই চরিতার্থ হইয়াছে; আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয় অভিনেতা লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ছন্দের বন্ধন কিংবা ভাষার আপাতিক সৌকুমার্য্যের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভাব-প্রকাশ। যে রূপেই হউক, ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলেই কবিতা হইল, ইহাই তাঁহার আদিম আদর্শ ছিল। ওই আদর্শের বশীভূত হইয়া তিনি প্রকৃত কবিতাও লিখিয়াছিলেন, অনেক তুচ্ছ জিনিসও লিখিয়াছিলেন। কারণ, তখন তিনি ভাবকে স্বাধীন প্রণালীতে আপনার আয়ত্তাধীন করিতেছিলেন। যখন কবি কোনও সুন্দর ভাবকে বশীভূত করেন, তখন সেই ভাব যে ছন্দে বা যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা কবিতা। কিন্তু, ভাবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত না করিয়া, অথবা ভাবের আভাষমাত্র ধরিয়া, উৎকৃষ্ট ভাষায় অনবদ্য ছন্দোবন্ধে গ্রথিত রাশি-রাশি *পুঁথিও কবিতা নহে। উহা কেবল দুর্ব্বলতার, দরিদ্রতার এবং ভাবোন্মাদের পরিচায়ক। রবি কবির কিশোর বয়সের প্রায় সমস্ত* কবিতাই শেষোক্ত শ্রেণীর। তিনি পরিণত বয়সে উক্ত দোষ পরিহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ক্রমে ভাবের উপর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন ভাষা ও ছন্দ তাঁহার হস্তে আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে; তাঁহার চির জীবনের একাগ্র সাহিত্য-সাধনা সফল করিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথ অপরূপ স্বাতন্ত্র্যজীবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি দীর্ঘকাল নিজের হৃদয়ের গহণ অরণ্যে একরূপ দিশাহারা হইয়াই ঘুরিতেছিলেন;— নিজের চিত্ত-পুরীর তেতালা হইতে, 'রাজধানী কলিকাতার তেতালার ছাদ' হইতে অস্পষ্ট-পরিদৃষ্ট জগৎচিত্রের দিকে দৃষ্টি

করিয়া এবং উহার অস্ফুট জীবন-সঙ্গীত শুনিয়া-শুনিয়াই স্বপ্নরসে বিভোর হইতেছিলেন ; পরিশেষে ঐ পথেই, এবং উহার মধ্য হইতেই আপন প্রতিভার মূলতত্ত্বটাকে লাভ করিয়াছেন! তিনি স্বকণ্ঠসিদ্ধ গায়ক, এবং নিজের দর্শনতত্ত্ব-সিদ্ধ চিত্রকর! আর্টের ক্ষেত্রে তিনি চিত্র এবং সঙ্গীত উভয়ের অস্পষ্ট মিলন-ক্ষেত্রে তাঁহার কবিতাকে তথা তাঁহার গদ্যকেও স্থাপন করিয়াছেন।

সঙ্গীত আদর্শ এবং চিত্র-আদর্শের মধ্য-পথিক রবীন্দ্রনাথ।

শৈশব সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যা সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, মানসী, সোণার তরী, চিত্রাঙ্গদা, চিত্রা—সমস্তই তাঁহার অন্তশ্চরিত্রের ওতপ্রোত গীতি-চিত্রতত্ত্বই প্রমাণিত করিতেছে। আবার, তিনি ভাবুক ; পূর্ব্বোক্ত কাব্যগুলির প্রতিপত্রে এবং ভগ্ন হৃদয়, মায়ার খেলা প্রভৃতির নামরূপেও তাঁহার অন্তস্তত্ত্ব টুকুই প্রতীয়মান! আত্মতত্ত্বে সুস্থির সমাধি লাভ করিয়াই, তিনি চিত্রার পর হইতে, চৈতালির সময় হইতে, বঙ্গজীবনের এবং জগৎ-জীবনের 'সাধনা'-রাজ্যে *অবতরণ করিয়াছেন; 'কথায়', 'কাহিনী'তে, ক্ষণিকায়, সন্দর্ভে,* ক্ষুদ্র গল্পে এবং উপন্যাসে—গদ্যে এবং পদ্যে নিজের অন্তস্তত্ত্বে স্থির থাকিয়াই অপরূপ 'নৈবেদ্য' চয়ণ পূর্ব্বক 'খেয়া' দিয়াছেন ; পরিশেষে শান্তিনিকেতনের ছায়ায় বসিয়া, অবিজ্ঞাত এবং অপরিচিত 'রাজার' রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন! বিশেষমতে চিত্রার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ যেন প্রথমযৌবনের প্রকট সৌন্দর্য্য-মত্ততা এবং ন্যূনাধিক জীবন-ভিত্তিহীন ভাবুকতার কবল হইতে নানাদিকে নিজের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ক্রমে স্বজাতির এবং স্বদেশের জীবন-ক্ষেত্রে পদার্পন করিয়াছেন ; অভিনব 'সাধনার' আদর্শে শক্তি এবং রঙ্গক্ষেত্রের প্রসার লাভ পূর্ব্বক বঙ্গ-জীবনের উদ্যান হইতে ক্ষুদ্র গল্পের 'গদ্যপদ্য'ময় পুষ্প চয়ন

করিয়াছেন; দেশের পূর্ব্বাপর কাহিনী-কথার মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবরসের আস্বাদ লইয়াছেন; দেশের ধর্ম্মনীতি এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক নিজের স্বপ্নাবেশ-বিহ্বল তত্ত্ব-ভাবুকতায় অবগাহন করিয়াছেন; সমাজ এবং পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়া অভিনিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়াছেন; আসঙ্গ-লিপ্সা নামক পদার্থটাকে টুকুড়া-টুকুড়া করিয়া কাটিয়াছেন, অনুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন; দাম্পত্য প্রেমকে নৌকাডুবি করিয়া একেবারে ডুবাইয়া দিয়া, ক্রমে ছায়াসঙ্কেত এবং অপরিস্ফুট অনুভবের মধ্য দিয়া তাহাকে আবার নবজীবনে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন; বর্ত্তমান ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ মধ্যে 'জাতীয় জীবন' নামক পদার্থকে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ পূর্ব্বক উহাকে সোজাসুজি 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' দরজা দেখাইয়া দিয়া, স্বয়ং শান্তিনিকেতনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; হিন্দু সমাজের অচলায়তনের প্রাচীন পাকাদেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সমাজ সভ্যতার সূর্য্যালোক প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কবি-জীবনের এবং কবিকার্য্যের মধ্যে যে একটা পরম অধৃষ্য বিশিষ্টতা আছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে! রবি-প্রতিভার এই আভ্যন্তরীণ গতি-তত্ত্ব এবং নিয়তি সকল সাহিত্যসেবীর পক্ষেই পুনঃ পুনঃ চিন্তা এবং গবেষণার সামগ্রী হইয়া থাকিবে! কিন্তু, উহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি করার জন্য ইহা স্থান নহে। *

* বর্ত্তমানে জীবিত কবি প্রসঙ্গে অপরিহার্য্য কথাগুলিই কেবল বলা হইবে। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহার ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণ বিষয়ে ইহা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে। আমরা দেখিব, বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের এই চলৎশক্তিশীল প্রতিভার কোন-না-কোন সাময়িক লক্ষণে উদ্দীপ্ত হইয়াই অনেকগুলি নব্যলেখক লেখনী চালাইতেছেন। আমরা তাঁহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ পরিহার করিতেই বাধ্য হইব। লেখক।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমে কিশোর অবস্থার ভাবোন্মাদ হইতে প্রকৃত কবিত্বে, এবং নিজের বিশেষত্ব রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবগত প্রেমের উপাসক; তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাই প্রেমের কবিতা। প্রেম হইতেই তাঁহার প্রতিভার প্রকৃত জাগরণ! এই প্রেম প্রথম-প্রথম কেবল স্নায়ু-চাঞ্চল্য-জনিত, এবং বস্তু-ভীত ছিল; সুতরাং ছায়াবাদী এবং অগভীর ছিল। এই সময়ে, প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে, তাঁহার ভাব এবং ভাষা উভয়েই অতি অপরূপ মূর্ত্তি গ্রহণে 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' পরিস্ফুরিত হয়! ইহাতেই দেখা যায়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আত্মা বর্ত্তমান কালে উপনীত হইয়াও কিরূপ প্রভাব দেখাইয়াছে! 'রাধিকা' বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালী-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার প্রেমোন্মাদের এবং ভাবোন্মাদের প্রতিমূর্ত্তি! সাধারণ প্রেমিকার পক্ষে যেই ভাববিহ্বলতা হয়ত নিতান্ত অস্বাভাবিক ও হাস্যকর মনে হইতে পারে, রাধিকার পক্ষে তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বাভাবিক! কবির যাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে দোষ ছিল, তাহাই বিষয়নির্ব্বাচন মাহাত্ম্যে এ ক্ষেত্রে গুণে পরিণত হইয়াছে! সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকৃত শক্তি অপেক্ষাও চরিত্রসিদ্ধ সহানুভূতি বা কুশলতা কিরূপে উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ হয়, ভানু-সিংহের পদাবলী তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ ও বিশেষত্ব।

এই প্রেমই পরে-পরে নানারূপ প্রেমসঙ্গীতে, এবং কড়ি ও কোমলের সনেটগুলির মধ্যে ঘনতা এবং জীবনের অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে; 'মানসীর' ধ্যান ধারণার রাজ্যে নিগূঢ় অন্তর্লীনতা লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা দিয়াছে; এবং চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একাধারে কবির সমস্ত পূর্ব্ব অর্জ্জনের ঘন সন্নিবেশ করিয়াছে; পরিশেষে কবিকে 'সোণার তরী'তে ভাসাইয়া, 'চিত্রা' প্রভৃতির মধ্য দিয়া এমন এক 'রাজা'র

রাজ্যে উপনীত করিয়াছে যাহাকে 'যোগ' বলিলেও বলা যায়! তিনি মানবীয় এবং ইন্দ্রিয়জ প্রেম-বাসনার ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে জগৎলক্ষ্মীর চরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইতেছিলেন, উহা তাঁহার 'মানস সুন্দরী' 'চিত্রা' 'উর্ব্বশী' 'অন্তর্য্যামী' প্রভৃতি কবিতায় পরিস্ফুট; ওই 'প্রেমই' ক্রমে, বৈষ্ণবের পথে, তাঁহাকে সাহিত্যজীবনে 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলী'র মধ্যে বিশ্বসুন্দরের বা লক্ষ্মী-পতির চরণতটে উপস্থিত করিয়াছে! ভাবোন্মত্ততা হইতে এইরূপ 'যোগে' উন্নতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিতে পারে। এইরূপে বৈষ্ণব কবিদের 'পিরীতিই', কবির মৌলিক প্রতিভায় (এবঞ্চ ইয়োরোপীয় গীতি কবিতার প্রভাবে) পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গে আধুনিক আদর্শের সমুন্নত গীতি-কবিতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। আবার এই প্রেমই পরে বৈষ্ণবী প্রথার সহিত পারশীক সূফী আত্মার সম্মিলন করিয়া নৈবেদ্যের হরিচন্দন-সুরভিত রসাবেশ এবং সঙ্গীত-ভাবনার মধ্যে, এবং খেয়ার একতন্ত্রী-ঝঙ্কৃত সন্ধ্যারতির মধ্যে কবিকে উত্তীর্ণ করিয়াছে; উপরন্তু, হীব্রুবাইবেলের গীতসংহিতার সহিত আধুনিক ইয়োরোপের সংকেতনী কাব্যপ্রণালী (symbolist style) সম্মিলিত করিয়া তাঁহাকে 'রাজা' এবং 'ডাকঘরের' বিশেষত্বেও উপনীত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে বহুরূপী, এবং তিনি আধুনিক খণ্ড কাব্যের অনেক বিভাগেই ন্যূনাধিক সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কতরূপে কতভাবে দেখা দিয়াছেন—দিতেছেন, এখনও তাহার বিরাম নাই। অতএব তাঁহার দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমানে সহজ নহে; সম্ভবও নহে। তবে, এবিষয়ে কিছু না বলিলে বর্ত্তমান-প্রসঙ্গ নানাদিকে একেবারে অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে বই নহে।

বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথের বিচার করিতে হইলে কেবল তাঁহার ভিতরে যাহা আছে, তাহা দেখিয়াই বিচার করিতে হইবেনা; অন্যের সঙ্গে

তুলনা করিয়া, তাঁহার মধ্যে যাহা নাই তাহাও বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। বলাবাহুল্য এইরূপ 'অন্বয়ী' এবং 'ব্যতিরেকী' গুণ-বিচার ব্যতীত কোন কবির সমালোচনাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। এইরূপ বিচারেই প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের শক্তি, এবং ওই শক্তির বিশিষ্টতা কিংবা সীমা বুঝা যাইবে। বঙ্গ সমাজের একটা বিশিষ্ট স্থান কাল এবং পরিবেশ, একটা বিশিষ্ট ধনী পরিবার এবং ওই পরিবারজাত একটা বিশিষ্ট মজলিশী refinement বা ভব্যতা, সর্ব্বোপরি নিজের স্বভাবসিদ্ধ একটা চিত্র এবং সঙ্গীতের প্রতিভা এবং দার্শনিকতা—এই কয়টা ঘটনার ঘনফল বিশেষভাবে চিন্তা না করিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে পারা যাইবেনা। এই কয়টা ঘটনাই তাঁহাকে মুখ্যভাবে গঠন করিয়াছে; এবং আধুনিক ইয়োরোপের একটা বিশেষ সাহিত্য-রীতির অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন উাঁহার সাহায্য করিয়া এ দেশের পূর্ব্ব-শূরিগণের সঙ্গে নানাদিকে তাঁহার পার্থক্য ঘটনা করিয়াছে। পূর্ব্বকবিগণের, কিংবা সাহিত্যজগতের 'সামান্ত-লক্ষণ' বিজ্ঞাপক অনেক-কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। উহা নানাদিকে একটা ঐকান্তিক 'বিশেষত্ব-জীবী' প্রতিভা; কোন কোন দিকে সহজে অনুকরণীয় বলিয়া প্রতীয়-মান হইলেও, অনেক দিকেই সমস্ত অনুকরণ-চেষ্টার বাহিরে।

নবীনচন্দ্র এবং বিহারীলালের ভাবুকতা সূত্রেই বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্র-নাথের এই অপূর্ব্ব খণ্ড কবিতা এবং গীতি কবিতার উচ্ছ্বাস বহিয়াছে।

আধুনিক এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্য সুত্রে রবীন্দ্রনাথ।

এইজাতীয় কবিতার যাহা প্রধান দাবী এবং লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে সাধারণ ভাবে তাহার আভাস দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও বিশেষ-বিশেষ অবস্থাজাত একটা ভাবের বা তত্ত্বের সৌন্দর্য্য, সর্ব্বোপরি, লেখকের নিজের ব্যক্তিত্বই পাঠকের সহানুভূতি লাভে চেষ্টা করে; অনেক সময় উহা কেবল কবির

নিজের দিক হইতে ভাবের আকুলতা টুকু ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হয়, বিষয়-বস্তুর পরিদ্যোতনে কোনরূপ লক্ষ্যই করে না। বড় বড় কাব্যে কবিগণ আত্মবিলোপ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়াই কাব্যের বিষয় চরিত্র এবং ফলশ্রুতির মধ্যে ভাবরসের বা তত্বের সৌন্দর্য্যকে সমাহিতভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিস্তারিত কাব্যচেষ্টার মধ্যে যে প্রকার বা যেই পরিমাণ শক্তি সংযম উচ্ছ্বাস অথবা ঐকান্তিকতার আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতার মধ্যে তাহার কিছুই দরকার নাই। প্রতিদিনের উপস্থিত ভাবতরঙ্গ গুলির আঘাত হৃদয়তীরে যথাযথ ভাবে ধারণা করিয়া উপস্থিত মতে এবং অনুগত ছন্দোবন্ধে নিরূপিত করিতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য শেষ হইয়া যায়। এই সকল কবিতার আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব ভাব কিংবা রীতির মধ্যে কোনরূপ ঐক্য বা সামঞ্জস্য রক্ষা করাও তাঁহার পক্ষে আবশ্যকীয় নহে। ক্ষুদ্র কবিতার এই সুবিধাটুকুন আধুনিক সাহিত্যে যে সকল দিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হইতেছে, উহা যে সু-কু উভয় দিকে অতিরিক্ততার সীমাও অতিক্রম করিতে চাহিতেছে, ইতিপূর্ব্বে তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। আবার, ইংরাজী সাহিত্যে ব্রাউনীং প্রভৃতি কবিগণ খণ্ড কবিতার বা গীতি কবিতার মধ্যেও চরিত্র-চিত্রনের এবং চরিত্র বিশ্লেষণের একটা প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। উহার দরুন, তাঁহাদের রচনা কাব্যের বিশেষত্বকে নানাদিকে পদদলিত করিয়াও একটা বৈজ্ঞানিক বা তাত্বিক লক্ষণ লাভ করায় চেষ্টা করিয়াছে; অনেক সময় সমুন্নত রসভাবকে অবহেলা করিয়াও কেবল প্রাকৃত এবং উলঙ্গ সত্যকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ইহা আধুনিক সাহিত্যে 'বৈজ্ঞানিক' আদর্শের প্রভাব বলিতে হইবে; এই আদর্শের নামই 'প্রকৃত-বাদ' বা Naturalism. এইরূপে খণ্ড কবিতার মধ্যেও সময়-সময় কথাবার্ত্তা বা একোক্তি-পথে নাটকের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য বিকাশের চেষ্টা দেখা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা 'উৎকৃষ্ট কাব্য'

বিষয়ে আর্ণল্ডের আদর্শ (Poetry is the best thought expressed in the best language) যেমন অবজ্ঞাত; তেমন, কোলরীজের আদর্শও (Poetry is best words in their best order) তিরস্কৃত। সময়-সময় নিদারুণ অত্যন্ততা দোষে দূষিত হইলেও, স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাউনীং প্রভৃতির কবিতার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। উহা নানাদিকে কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্য বা দার্শনিক গবেষণার বিশেষত্ব—বুদ্ধি-অধিকারের বিশেষত্ব। গদ্যের প্রণালীতে ওই বিশেষত্বটুকু বরং অবাধে প্রতিফলিত করা যাইত। রবীন্দ্র এই জাতীয় পদ্য এবং গদ্যও অনেক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গীতি-প্রবণতা এবং প্রসাধন-কলার কোমলতা, ব্রাউনীংয়ের কটমটি হইতে তাঁহাকে বিশেষ মতে রক্ষা করিয়াছে। ব্রাউনীংয়ের প্রতি প্রবল অনুরক্তি সত্ত্বেও তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, তিনি আশৈশব যথাক্রমে বায়রণ ও গ্যেঠে (বনফুল, ভগ্নহৃদয়, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা), শেলী ও কীট্স (কবি, কড়ি ও কোমল) ভিক্টর হুগো (মানসী) শীলার ও জর্ম্মনীর নবযুগের কবিগণকে (কথা, কাহিনী, কণিকা ক্ষনিকা) এবং বিশেষভাবে আধুনিক মৈতরলিংক কে (রাজা, ডাকঘর) আত্মসাৎ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যে উপনীত হইয়াছেন; নানাদিকে ইয়োরোপীয় আধুনিক খণ্ড কবিতার মতিরতি এবং প্রণালী আত্মস্থ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ছোটগল্পের এবং নবেলের ক্ষেত্রেও তিনি সবিশেষ জর্জ্জ এলিয়ট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যেঠে, পো মেরিডিথ, টলষ্টয় বিশেষতঃ ফরাশি কথা-লেখকগণকে (বেলজাক, গীঁদে মোপাসা, থিওফাইল গঁতিয়ে এবং এনাটোল ফ্রান্স্ প্রভৃতিকে) উদরসাৎ করিয়াই নিজের স্বাধীন মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াছেন। চিরকাল ন্যূনাধিক অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সবিশেষ প্রতিবাদের ভাবে

উদ্দীপ্ত হইয়াও, তিনি সুইনবার্ণের ন্যায় নিজের স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। (ক) অনেক স্থলে পূর্ব্বোক্ত কবিগণ যে-যে স্থানে শেষ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই স্থান হইতেই সুরু করিয়া, এবং নিজের আদর্শে সমাহিত হইয়া বিশিষ্টফল উপার্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের

(ক) শেলীব্রাউনীং গ্যেঠে বা হিউগো প্রভৃতির পথে রবীন্দ্রনাথ অনেক খণ্ড কবিতা ও গীতি কবিতা রচনা পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের বিত্তভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কিন্তু চরম বিশিষ্ঠতা বিচারের ক্ষেত্রে ঐসমস্ত হয়ত ধর্ত্তব্য নহে। পরে পরে উহাদের প্রভুত্ব ন্যূনাধিক অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় জীবনের স্বতন্ত্র অনুভূতি পথে তিনি যে ফল চয়ন করিয়াছেন, তাহাই খেয়া এবং নৈবেদ্যের প্রাণবস্তুর সংগ্রহ রূপে—ইংরাজী গীতাঞ্জলি-রূপে সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার পূর্ব্বক ইয়োরোপীয় কাব্যরসিকগণের সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে; এবং ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের 'নোবল' পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছে। চিত্রার যুগ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রের 'ভাবগত' কবিতার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কবিনিবহের ভাবতন্ত্ব কোন কোন দিকে উদ্দেশ করিতে পারাযায়; 'চৈতালীর' পর হইতেই তিনি মানবজীবনের সঙ্গে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজীবনের সঙ্গে, পদ্যে এবং ক্ষুদ্র গল্পে এবং বিস্তৃত উপন্যাস-কথায় সহানুভূতি 'সাধনা' করিতে আরম্ভ করেন। উহার ফল একদিকে, কথাকাহিনী ক্ষণিকা ও নাট্যকথাগুলি; অন্যদিকে ক্ষুদ্র গল্পগুলি ও নৌকাডুবি চোকের বালি এবং গোরা প্রভৃতি। ক্ষণিকার পর হইতেই, নৈবেদ্য খেয়া এবং গীতাঞ্জলি প্রভৃতির মধ্যে তাঁহার, ন্যূনাধিক স্বকীয় বিশেষত্ব-জ্ঞাপক গীতিকবিতার ও দোঁহা এবং অভঙ্গ জাতীয় কবিতার উৎস খুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে হিন্দুবৈষ্ণব ও হীব্রুপারসীক সুফীতন্ত্রের মধ্য পথে, 'এসিয়াটিক' মাহাত্ম্যলক্ষণে স্থির করিয়াছে। এই সমস্ত কবিতা *ইয়োরোপীয় সাহিত্য দরবারে আত্মবিশেষত্ব খ্যাপন পূর্ব্বক* প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। অকিঘন্ত, রাজা এবং ডাকঘরও উক্ত এসিয়াটিক সূত্রেই, 'আইরিষ রিভাইভেলের' কবিগণ এবং সিম্বোলিষ্ট কবিসংপ্রদায়ের—বিশেষতঃ মৈতংলিংকের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইয়োরোপীয় 'সাঙ্কেতিক' আদর্শের কবিতাকে কোন-কোন দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

লেখক।

গ্রন্থাবলীকে এইভাবে বিচার এবং পরীক্ষা পূর্ব্বক একটা বৃহৎ সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। রবি কবির আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া চিরকাল নির্দ্দিষ্ট হইবে। তিনি বঙ্গসাহিত্যে, বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তঃসুপ্ত ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাকে নানাদিকে উদ্দীপিত করিয়া, নানাপ্রকার-ছোট-বড় পরভৃৎ লেখকের আহারদাতা, এবং স্বাধীন কবিনিবহের শিক্ষা-স্থানীয় হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার আভ্যন্তরীন শক্তি এবং মাহাত্ম্য তাঁহার হস্তে নানাদিকে বর্দ্ধিত হইয়া উহার রুচি এবং সভ্যতার আদর্শকেও নানাপ্রকারে শাসিত করিতেছে।

এই সুত্রে রবীন্দ্রের দুইটি কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ খণ্ড কবিতা এবং গীতি কবিতার বহিঃক্ষেত্রে, কিঞ্চিৎ বিস্তারিত কিংবা ঘনসংযত শিল্পের ক্ষেত্রে কেবল দুইটি মাত্র কাব্য রচনা করিয়াছেন—চিত্রাঙ্গদা ও রাজা। চিত্রাঙ্গদা যৌবন মধ্যবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বাপর সমস্ত সদ্‌গুণ সঙ্গমে, আন্তরিকতায়, এবং ভাবসৌন্দর্য্যের চিত্র লীলায় সমুজ্জ্বল। ভাবগত অথচ বস্তু-লক্ষণাক্রান্ত আন্তরিকতায় কবি রবীন্দ্রনাথের যত দূর অভিনিবেশ সম্ভব ছিল, চিত্রাঙ্গদা কাব্যে তাহা চিরতরে নামরূপ-ধৃত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী পদবী লাভ করিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে, গীতোচ্ছ্বাসময় ভাবুকতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এসাহিত্যে পরম বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশ বিদেশের গীতি-কবিগণের অভ্যন্তরে পরম বহুতার মধ্যেও অপরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়। তৎসত্বেও প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র হৃদয়-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক-একটা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব না ঘটিয়া পারেনা। উভয় সূত্রেই প্রত্যেক জাতির মধ্যে কোন-না-কোন কবি গরিষ্টতা অর্জ্জন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, লক্ষ্য করিতেছি! রবীন্দ্র নানাদিকে বাঙ্গালী সঙ্গীত-ভাবুকের আধুনিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিনিধি বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর বৈষ্ণব সঙ্গীত এবং

কিয়ৎ পরিমাণে শক্তি-সঙ্গীত নানাদিকে রবীন্দ্রনাথকে মুখপাত্র করিয়া অন্ত জাতির সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস নিধুবাবু নীলকণ্ঠ এবং রাম প্রসাদের সঙ্গীততত্ত্বকেও নানাদিকে এই কবি সঙ্গীত এবং গীতি কবিতায় আত্মস্থ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিশ্বের গীতসভায় বাঙ্গালী সঙ্গীতের যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহার একদিক তাত্ত্বিকতা এবং ভাবুকতা নামে নির্দ্দেশ করিয়াই গীতাগুলিকে প্রদর্শন করা যায়। গীতিতত্ত্বের প্রভাব এখন বঙ্গসাহিত্যে আত্যন্তিক ভাবেই পরিস্ফুট; পরন্তু, 'রাজা' কাব্য গদ্যে বিরচিত হইলেও রবীন্দ্র-হৃদয়ের এই সঙ্গীত-তত্ত্ব টুকুই সাঙ্কেতিক প্রণালীতে ঘন-সঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এ দুটি কাব্যই বিচার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধান উপার্জ্জন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

আবার, রবীন্দ্রনাথ লিপিরীতির উজ্জ্বলতায়, তারল্যে, অলংকারের শিঞ্জনে এবং ভাবের লীলামন্দ বিভ্রমে ফরাসি। তাঁহার গদ্যে পদ্যে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যে ফরাসী রীতি সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট। ফরাসি নিয়মের মনস্তত্ব বিশ্লেষণের উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। পদ্যে, খণ্ড কাব্যে, উহার ভাবুকতায় এবং সঙ্গীত-ধর্ম্মে, রবীন্দ্রনাথ এ দেশে তত্ত্বগত বা নিখুঁত ভাবগত গীতি কবিতার জনক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম বয়সে ইংরাজ কবি শেলীর অনুকারী হইলেও, তিনি পরে-পরে শেলীর অলৌকিক বায়ুতত্ত্বীয় উচ্ছ্বাস এবং প্রচণ্ড শক্তি-প্রগল্‌ভতার সম্পর্ক পরিহার পূর্ব্বক প্রাণমনে বদলেয়ার ভার্লেন এবং গঁতিয়ের লালিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত তত্ত্ব এবং চিত্রতত্ত্বের সঙ্গমে, নিত্য-নূতন ছন্দের বৈচিত্র্যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অত্যন্ত আধুনিক; এবং শত শত কবিতার প্রণালী ও নিষ্পত্তি-রীতি বিষয়ে ফরাসি সাহিত্যের 'পার্ণেশিয়ান' 'সেন্টিমেণ্টাল' এবং 'ডিকেডেণ্ট' কবিসংঘের প্রভাবও প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার

প্রতিভা বরং অগ্নি কিংবা বায়ুর তত্ত্ব অপেক্ষা জলতত্ত্বই সমধিক সিদ্ধি করিয়াছে। এই সিদ্ধির প্রকৃতি এমন যে, সমগ্র নবমুদ্রিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কদাচিৎ একটা 'বেসুরা বুলি' অথবা 'বেতালা' ছন্দের দৃষ্টান্ত মিলিতেছে! * এই ঘটনা অতুলনীয়, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক আদর্শে সচেতন হইয়া, বঙ্গের বীণাবাদিনী পঞ্চাশ বৎসরেই রবীন্দ্র নাথের মধ্যে আসিয়া অপরূপ মজিলিসী চাতুর্য্য এবং মার্জ্জনা লাভ পূর্ব্বক যেইরূপে কলাবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহাও আশাতীত, বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সন্দর্ভরচনার ক্ষেত্রেও ফরাসি ইযুজিন-দি-গরীণ হইতে আরম্ভ করিয়া আমিয়েল এবং জুবেয়ার প্রভৃতির মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে, ঐকান্তিকী ভাব-গতি এবং ভাবনার গাঢ়তায় রবীন্দ্রনাথ জর্ম্মন। অনেক স্থলে জর্ম্মণীর সিম্বোলিষ্ট কবিসংঘের প্রভাবও তাঁহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হইবে। ফলতঃ, এ দুটি সমুন্নত সাহিত্যের আধুনিক আকৃতি-প্রকৃতি এবং দোষ গুণ-সমুন্নতি নানামতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া, সাহিত্যে তাঁহার স্বতন্ত্র আসন নানামতে সুস্থির করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র নানাদিকে ইয়োরোপীয় আধুনিকতাকেই আত্মসিদ্ধ করিয়াছেন; এই বাঙ্গালী কবি গদ্যে-পদ্যে নানামতে আধুনিক ইউরোপের বহু-অভিমানবতী সরস্বতী এবং কলালক্ষ্মীকে বঙ্গদেশের সমতলবক্ষে কোমল-তরল পদবন্ধে সঞ্চারিনী এবং স্বচ্ছন্দ-বিহারিনী করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভাকে নানাদিকে তাঁহার নিজের নির্ঝর-বর্ণনার সাহায্যেই বর্ণিত করা যায়—

ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
 মানব হৃদয় হরণে!
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু স্বর
বাজে অবিরল তরল মধুর;
সদা-শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
 বাঁধা চঞ্চল চরণে!

আবার, রবীন্দ্রনাথ গত কয়েক বৎসর হইতে—দৃষ্টতঃ 'সাধনা'র সময় হইতে, ভাবুকতা-বিষয়ে একান্ত ইয়োরোপ-প্রীতি এবং ইয়োরোপের শিষ্যতা পরিহার পূর্ব্বক বঙ্গগৃহে—ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিতে ছিলেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বিশেষতঃ 'নবজীবনে'র সময়ে যেমন কোমতের প্রভাব বাঙ্গালীকে হিন্দু-আদর্শের মাহাত্ম্য-বিষয়ে আত্যন্তিক ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল; নব-পর্য্যায় 'বঙ্গ দর্শনের' সময় হইতে তেমনি টলষ্টয়ের প্রভাব, নানাদিকে প্রাচ্য শান্তিশীলতা এবং ক্রিয়াসংযমের মাহাত্ম্য সঙ্কেতিত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় আদর্শ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছে। এ ক্ষেত্রে যেমন টলষ্টয়ের, তেমন ভগিণী নিবেদিতা এবং (ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়বয়সের গদ্যে এবং পদ্যে কম নহে। 'সাধনা'র ছোট গল্প এবং সন্দর্ভ-যুগের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বস্তু-বিতৃষ্ণা এবং অভ্রংলিহ ভাবুকতার গৃহ হইতে (প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজের 'রুদ্ধগৃহ' হইতে) বাঙ্গালীর জীবন-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক এই প্রভাব গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! কিন্তু, এই সংকল্প বা এই প্রত্যাবর্ত্তন হয়ত প্রকৃতপ্রস্তাবে বা পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সাহিত্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নহে —দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের! সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস রচয়িতা (গোরা প্রভৃতি) রবীন্দ্রনাথের! তাঁহার রচনায় বিষয়-ভিত্তি বা সুদৃঢ় অর্থ-শক্তি অপেক্ষা উহার অর্থ সংকেত বা অর্থাভাস যেমন প্রবল; তেমনি তত্ত্ব এবং ভাব-প্রবণতাই বরঞ্চ অধিক বলশালী। স্বকীয় প্রতিভার মূল প্রকৃতিটাকে ছাড়াইয়া উঠা সর্ব্বত্র সকলের পক্ষেই কঠিন। ইয়োরোপীয় দার্শনিকতা কিংবা সঙ্গীত-ভাবুকতা স্বকীয় আত্মার ধর্ম্ম উপরন্তু দীর্ঘ অভ্যাস-সাধনা বশে তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উভয়ে মিলিত

রবীন্দ্রনাথ এবং দেশীয় প্রভাব।

হইয়া তাঁহার স্বজনীশক্তি এবং শিল্প-কলার কিছু-না-কিছু ক্ষতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য এ ঘটনা হইতেও প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। সংপ্রতি কবি কোন কারণে, দৃষ্টতঃ 'অচলায়তনের' পর হইতে, প্রাচ্য মন্দির হইতে ন্যূনাধিক প্রতিহত হইয়া আবার ইয়োরোপের দিকে, বা 'বিশ্বমানবের' দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলা বাহুল্য, কোমত বা টলষ্টয়ের মতিগতি এবং আদর্শ কোনমতেই আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত ভাবে গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাঁহারা ইয়োরোপের একটা সবিশেষ রুগ্ন অবস্থার 'পথ্য' বই নহেন; জীবনগতি-শীল ইয়োয়োপীয় সমাজের প্রবল বীরাচার-পদ্ধতি কোমত টলষ্টয় প্রভৃতির শান্তি তিতিক্ষার আদর্শ-খ্যাপনে, নিজের অতিরিক্ততা সংশোধন পূর্ব্বক স্বাস্থ্যলাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে বই নহে। মৃত-কল্প ভারতীয় সমাজের পক্ষে কেবল আত্ম-সম্মান বর্দ্ধন বিষয়েই তাঁহাদের যে-কিছু উপযোগিতা আছে; বর্ত্তমানে উহার জীবন-ধারণ বা স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ যে কত অনুপযোগী এবঞ্চ মারাত্মক.তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালী স্বীকারতঃ অধিকার বাদী হইয়াও, এ ক্ষেত্রে নিজের ভাবুকতা বশে চিরকাল ভুল করিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ মুসলমান বিশেষতঃ ইয়োরোপীয় সমাজ আদর্শের আক্রমণ তাহার সমাজের বর্ণ-জাতিভেদ এবং অধিকার বাদের মূল চিরকালের জন্ম ক্ষয়িত করিয়া গিয়াছে; উহার সঙ্গে বর্ত্তমানের জাতীয় দুর্দ্দশা সম্মিলিত হইয়া তাহাকে কেবল অতীতের মায়া-মরীচিকা এবং অপ্রকৃতের রাজ্যে স্বপ্ন-সঞ্চরণ করিতেই লুব্ধ করিতেছে! কর্ম্মীর জীবনে ভাবুকতা সময়গতিকে অপরাজেয় শক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই ভাবুকের পক্ষে 'যথার্থ-জ্ঞান' লাভ এবং উহার সাহায্যে নিজের জীবন পরিচালিত করা কত শক্ত!

যাহোক, এইরূপে বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আধুনিক অথচ অর্দ্ধ-ইয়োরোপীয় প্রাচ্য। তিনি বাঙ্গালীজীবনের দোষে ইয়োরোপের—সবিশেষ ইংরাজের দৃঢ়-সরল বস্তু-নিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-কুশল শিল্পনৈপুণ্যকে সম্যক লাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু কোমল-সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতা এবং বুদ্ধি-উপজীবী রসবত্তার বিষয়ে শ্রেষ্টশ্রেণীর গীতি-কবির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন।

বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রের মাহাত্ম্য

রবীন্দ্রনাথ হয়ত বঙ্গভাষার শক্তি এবং এই সাহিত্যের সত্য-সৌন্দর্য্য-পন্থার আবিষ্কারেই মুখ্যভাবে জীবন ব্যয় করিয়া যাইতেছেন; বঙ্গ সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের নানাপ্রকার দুর্লভ মাহাত্ম্যে ও বিশেষত্বে সচেতন করিয়া যাইতেছেন। বাঙ্গালীর হৃদয় যাহাতে আধুনিক ইয়োরোপের সর্ব্বপ্রকার ভাবনা-মহিমায় পরিচিত হইতে পারে, চিরজীবন সাময়িক পত্রিকার সম্পর্কে থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ সে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতেছেন! এই কার্য্যে যে শক্তি ব্যয়িত হইতেছে *তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়!* রবীন্দ্রের প্রকৃত কাব্যকৃতি বা বিশিষ্ট শিল্প-অর্জ্জন হয়ত তাঁহার অতুলনীয় শক্তির অনুপাতে যথেষ্ট নহে; এ ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি অবস্থা এবং কার্য্যফল নানাদিকে আধুনিক ফরাসি সাহিত্যের থিওফাইল গঁতিয়ের অনুরূপ। শক্তি সুবিধা এবং অবসর যথেষ্ট থাকিয়াও, কেবল সাময়িক পত্রের সংসর্গ এবং আদর্শ গতিকে, তাঁহার সবিশেষ হানি করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালীর দুঃখিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। রবীন্দ্র নাথ এই দেশে আধুনিক অথচ অবিজ্ঞাত এবং সুদুর্ল্লভ সাহিত্য-ধর্ম্মের প্রচারক। এই কার্য্যের পবিত্র মাহাত্ম্য গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। যাঁহারা স্বদেশ স্বজাতির উন্নতিলক্ষ্যে মাতৃভাষার মধ্যে নবনব ঐশ্বর্য্য এবং মাহাত্ম্য

পন্থার আবিষ্কার করিয়া যান, তাঁহারা রহিয়া-বসিয়া হয়ত সকল আবিষ্কারের যথোচিত ফলভোগী হইতে পারেন না; উহার ইচ্ছাও করেন না। কিন্তু ওই কারণেই মনুষ্যহৃদয়ে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি এবং পূজা গৌরব চিরকালের অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংলণ্ডের নবসাহিত্য পন্থার আবিষ্কারক ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী বা কীট্‌স ওইরূপে স্ব-স্ব আবিষ্কারের সম্যক ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের অযোগ্যগণও তাহা চয়ন করিতেছেন! কিন্তু, প্রকৃত মাহাত্ম্য কাহাদের? বঙ্গসাহিত্যের সংস্কৃত সম্বন্ধ সূত্রে যেমন বিদ্যাসাগর প্রমুখ, ইংরাজী বা ক্লাসিক আদর্শের সম্বন্ধে যেমন মধুসূদন হেম নবীন ও বঙ্কিম ইয়োরোপীয় আধুনিকতার সম্বন্ধে তেমনই রবীন্দ্রনাথ!

রবীন্দ্র নাথের শিল্পদোষ।

সংপ্রতি একটা দোষের কথাও বলা আবশ্যক; সমাজের শ্রেয়ঃ এবং অনভিজ্ঞের হিতকল্পে বিশেষ ভাবেই বলা আবশ্যক। এ দোষ অবশ্য কবির ততটা নহে, যতটা অনধিকারী পাঠকের! জগতে অমিশ্র শুভ বলিয়া কোন পদার্থ নাই; এমন যে লোকজীবন এবং মনুষ্য-উন্নতির প্রধান সহায় অগ্নি তাহাও ব্যবহার সম্বন্ধে ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কার্য্যেও এ সত্য বিশেষ মতে প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ সার্থক-কর্ম্মা কবি; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহের দরুণেই নানাদিকে একাংশীয়। তাঁহার কবিতা ভাবতত্ত্বে এবং মাধুর্য্যগুণে গরিষ্ঠ; কিন্তু সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ সুস্থ বলিষ্ঠ কিংবা পেশল নহে। সুতরাং তিনি সর্ব্বঅবস্থায় সর্ব্বজন-ভজনীয় কবি নহেন। শেক্ষপীয়র কিম্বা স্কট, বাল্মীকি কালিদাস কিম্বা গ্যেঠে, শীলার বা হুগোর মধ্যে যে-অনুপাতে বস্তু তত্ত্ব ও ভাবের ন্যূনাধিক সামঞ্জস্য আছে, রবীন্দ্রে

তাহা নাই। সুতরাং, এই কবি মানব হৃদয়ের একান্ত নির্ভর-করে বা সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়ঃ এবং স্বাস্থ্য করে স্বয়ং পর্য্যাপ্ত নহেন। অনবধানে কিংবা অসতর্কভাবে এ-জাতীয় কবির সাহচর্য্য অবলম্বন করিলে নানাদিকে বিড়ম্বিত হইতে হয়; অবাস্তব ভাবুকতা, সংসারসম্পর্কহীন দার্শনিকতা এবং অভিমানে আক্রান্ত হইতে হয়। অপ্রবুদ্ধ পাঠক কিম্বা ভক্ত অনুকারকের হস্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষফল উপস্থিত করিতে পারে। ফলতঃ, এই কবিতার পাঠক সম্বন্ধে কয়েকটি নিদারুণ স্পর্শাক্রামক দোষ উহার ঐ ভাবুকতা, রামাজন-সুলভ মার্দ্দব এবং অভিমান! বহুস্থানে উহার স্বভাব কিম্বা সমুচ্চ ভাব (emotion) সম্পর্কও সামান্য; তাই, উহার বল কিংবা অর্থও সর্ব্বত্র পরিস্ফুট নহে। বলা বাহুল্য, জর্ম্মন *সাহিত্যের ballad* কবিতার আদর্শে রচিত, কবির পরিণত বয়সের 'কথা' 'কাহিনী' এবং কতিপয় 'নাট্য সংলাপ' এবং নৈবেদ্য ও খেয়া প্রভৃতি ব্যতীত তাঁহার কবিতায় হৃদয়ের কোন পূজনীয় কিম্বা মহত্তমা বৃত্তির বিশেষ অভিব্যক্তি নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্য তত্ত্বের পুরোহিত—High priest of beauty. এই সৌন্দর্য্যও বহুস্থলে কেবল যৌনভাবের সৌন্দর্য্য বই নহে; তাঁহার নিজের বাক্য-বৃত্তি, ব্যক্তিগত দৃষ্টি যন্ত্র, অথবা দৃষ্টি-স্থানের প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্য্য বই নহে। রবীন্দ্রের কবিত্বমধ্যেও ভাবের উচ্চতা এবং নিটোল শক্তিমত্তা অপেক্ষা উহার জলতরল মন্দগতি এবং গভীরতার আভাস, সবলতা অপেক্ষা উহার মিষ্টতার অনুপাত, প্রাঞ্জলতা অপেক্ষা অনির্ব্বচনীয় শাব্দধ্বনি এবং ইঙ্গিত-মাধুরী, দ্রুতি অপেক্ষা উহার মতি-মুগ্ধকারী মধুচক্রই সমধিক বলশালী হইয়াছে! গদ্যে এবং পদ্যে রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী চাতুর্য্যে, কোমলতায়, মিষ্টমধুর মুগ্ধতায়, এবং ভাবাবিষ্ট গবেষণায় বঙ্গভাষাকে ভারতীয় আধুনিক ভাষানিবহের সৌন্দর্য্য-মেলায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্টপুরস্কার-ভাগিণী করিয়াছে। এই কথা

নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীই তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ওইকারণেই হয়ত উহা পাঠক-হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য কিম্বা সাহায্য-নির্ভর বিষয়ে সর্ব্বাংশে পর্য্যাপ্ত নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও সাহিত্যের সাধারণ বাক্য-প্রণালী নহে। উহার মধুচক্রের মধ্যে পড়িয়া হৃদয় বিশ্ব-বিস্মৃতভ'বে 'পাক খাইতে' পারে! রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক; এই দর্শনশক্তি এবং ভাবুকতা লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার সর্ব্ব প্রধান শক্তি। কিন্তু, অগঠিতমতি যুবকগণ উহা যথোচিতমতে গ্রহণ করিতে পারেন না; উহার আপাতঃ-ভাসমান মার্দ্দবে সঙ্গীত-ধর্ম্মে এবং অস্পষ্টতায় মন সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় বলিয়া, এই কবিতা পাঠ মাত্র অপরিণতমতি পাঠক বিকার-গ্রস্ত হইতে পারেন। অধিক কি, এ কবিতার অনেক-স্থানে অর্থের সযত্নগুপ্ত অস্পষ্ট সঙ্কেতের দরুন, পাঠমাত্রেই পাঠক নিজ-নিজ ভাবে উহার অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজকে স্বতন্ত্র কবিপ্রেরণা-গ্রস্ত মনে করিয়া স্বয়ং কবি-যশঃ-প্রার্থী হইয়া পড়েন; অস্পষ্টতাই কাব্যের প্রধান গুণ মনে করিয়া 'যাহা তাহা' লিখিয়া যাইতে পারেণ! এ দোষ পাঠক সমাজে, এবং সাহিত্যিক সমাজেও এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল যে, বঙ্গসাহিত্যে প্রথম হইতেই তদ্বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল।

পাঠক সম্বন্ধে অনধিকার দোষ।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে বুঝাযাইবে যে, খণ্ড কবিতার বা গীতি কবিতার মূল প্রকৃতি কবির ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অথবা সাময়িক 'খেয়ালের' উপরেই নির্ভর করে। কবির মনে যখন যে খেয়াল উপস্থিত হয়, প্রত্যহ তাঁহার মন যেই যেই ভাবে তরঙ্গিত হয়, এ-জাতীয় কবি তাহাই ছন্দোবদ্ধে ধরিয়া রাখেন। বৃহৎ কাব্যের মধ্যে যে-একটা পরিব্যাপ্ত উদ্দেশ্ত এবং সংযমের 'ধ্রুবপদ' আছে, এ কবিতায় তাহা

নাই। কবি উপস্থিতমতে পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ ভাবেও ভাবুক হইতে পারেন। পাঠকগণের পক্ষে খণ্ড কবিতার এই বিশেষত্বটুকু সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এবং অধিকারী হইয়াই, এ জাতীয় কবিতা পাঠে রত হওয়া অপরিহার্য্য। এইরূপ কোন কবিতার প্রণালী কিংবা মতবিশেষ একান্তভাবে কবির নিজের বলিয়া ধারণা করিলেই অবিচার হইবে; 'নাটকত্বের' হিসাবেই প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে। এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতার দরুণ বঙ্গীয় যুবক সংপ্রদায়, বহুকর্ম্মা রবীন্দ্র নাথের ভিতর হইতে কেবল 'ভাবোন্মাদ' প্রকাশক কবিতাগুলিই বাছিয়া লইয়া, এবং উহাই তাঁহার *'স্থির মত' ধরিয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছেন; বিপরীত শিষ্যভাব* গ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ দোষ পাঠকের; কবির নহে। অনধিকারীর পক্ষে এ জাতীয় কবিতা পাঠ এবং এইরূপ শিষ্য-ভাব নিদারুণ ভয়াবহ দোষফল প্রসব করিতে পারে। ফলতঃ, আধুনিক কালে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বহু-পন্থা বিকাশ এমন কি 'চরমপন্থী' বিকাশের দরুণেই, সর্ব্বত্র পাঠকের পক্ষে 'অধিকার' লাভ ব্যাপারটাই অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ভক্ত-ভাব বা শিষ্যতা পরম গৌরবজনক গুণ হইয়াও সাহিত্যে, কেবল সাহিত্যে কেন সকলদিকেই পরম শঙ্কটাবহ হইয়া গিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথের শিল্প প্রকৃতি ও উহার দাবী।

সঙ্গীততন্ত্রবশে কবি কায়া অপেক্ষা বরঞ্চ ছায়ারই অধিক পক্ষপাতী। তাঁহার এই বস্তু-ভীতি, এবং 'প্রাকৃত' ভাব মাত্রকেই ঘৃণা পূর্ব্বক পরিহার করার লক্ষণটুকু সর্ব্বাগ্রে 'নোট' করিয়া রাখিয়াই, তাঁহার কাব্যপাঠে মনোযোগী হইতে হইবে। ক্ষুদ্র গল্প এবং নবেলের ক্ষেত্রে আসিয়া, তিনি এই লক্ষণ বহু পরিমাণে উতরাইয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার কবিতা-পাঠককে উহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে

হইবে। কবি রবীন্দ্র নাথ বিশেষ মতে আধুনিক কবিতার ভাবগত এবং তত্ত্বগত আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়াছেন; গীতি কবিতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জীবনের রক্তমাংসময় শরীরী চরিত্রমূর্তি অপেক্ষা ও বরং তিনি ভাবতত্ত্বময়ী প্রকৃতির অঙ্কনে-সঙ্গেতে এবং আভাষেই অধিক অনুরাগী। এই একটা কথাতেই কাব্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত দোষগুণ বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ডে এই ভাবাপন্ন, অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কবি শেলী! শেলী আকাশে উড়িতেন; লোকসীমার উর্দ্ধে উঠিয়া এই কুহেলিময়, ছায়াময়, আবভক্তাবয়ব পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতেন। কায়া অপেক্ষা ছায়ার কোনও কোনও বিষয়ে মাহাত্ম্য বা আকর্ষণ অধিক; এবং কবি সেখানে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনার ঐন্দ্রজালিক জগতের সৃষ্টি করিয়া, পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারেন। এই রাজ্যে দাঁড়াইয়া কবি একটা সম্পূর্ণ অলীক উপন্যাস করিলেও, মর্ত্ত্যবাসীর পক্ষে তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে দ্বিধা-বাক্য প্রয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং এই রাজ্যের কবি, সৌভরাজের ন্যায় অস্পৃশ্য দুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক যথেষ্ট দম্ভ এবং অভিমানে স্ফীত হইতে পারেন। এ দিকে, মর্ত্তবাসীও তাঁহাদের কথাকে তুচ্ছ করিয়া জলীয় বাষ্পের মত উড়াইয়া দিতে পারেন। এইরূপ কবি একদেশ-দর্শী, সন্দেহ নাই। কেবল শূন্যপথে উড্ডীন হইয়া শ্যেনের মত তীব্রগতি হইতে পারিলেই, হয় না; এই রুক্ষবন্ধুর পৃথিবীর উপর দিয়াও তুরঙ্গের মত দ্রুতপদে ছুটিতে হইবে; এবং অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় রসাতলে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মপ্রবাহিণী ভোগবতীর পাবনী ধারা মানবের জন্য উৎসারিত করিতে হইবে। অন্যথা, তিনি একশ্রেণীর পাঠকের হৃদয়জীবী কবি হইতে পারেন, "কবির কবি" হইতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কবি হইতে পারেন না। বলা বাহুল্য, আধুনিক ইয়োরোপের অনেক প্রধান কবিই এইরূপে—একাংশীয় গরিষ্টতা ও

মহার্ঘতা গুণেই বিশিষ্টশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। স্বয়ং শেলী, ওয়ার্ড সোয়ার্থ, বদ্‌লেয়ার, ভার্লেন বা মৈতরলিঙ্ক এই জাতীয়! পাঠককে জাগ্রত সতর্ক ভাবেই তাঁহাদের বিশিষ্টতার সংসর্গ করিতে হয়।

কথন বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ ভাবকে আবৃত এবং আচ্ছন্ন করিতেছে! সোনার তরী ও চিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া গীতাঞ্জলি ও খেয়ার মধ্যস্থিত সঙ্গীত এবং চিত্র ধর্ম্মাক্রান্ত অনেক কবিতা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্দের নৃত্যে, ভাষার ঝঙ্কারে, সঙ্গীততন্ত্রীয় আবেগে, ভাবের সুচিক্কণ রশ্মি বা অর্থ ডুবিয়া গিয়াছে; অনেক স্থলে অস্তিত্ব এবং সঙ্গতি পর্য্যন্ত অনুভব করা দায় হইয়াছে। ভাষা ও ছন্দোবন্ধের উপর অতি-মাত্রায় দখল জন্মিলে, সচরাচর অনেক কবির যে দোষ ঘটিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই। এই জাতীয় অনেক কবিতা বাহুল্যময়, অতিরঞ্জিত ও অতিভূষিত। তিনি মহৈশ্বর্য্যশালী চিত্রকর; তাঁহার ভাবুকতার বর্ণভাণ্ডার অপরিমেয়; কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র সাহিত্য-আদর্শের সুদক্ষ চিত্রকর নহেন। আঁকিতে আঁকিতে তিনি ভাবের বশে এত আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, স্থানে স্থানে বুঝি তুলি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত ভাণ্ডটি রিক্ত করিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করেন। শুধু *ধন থাকিলে হয় না*; মিতব্যয়িতা, সংযম ও নিপুণতার অভাবে অতিবড় বিত্ত-সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিও সাফল্যের ক্ষেত্রে সাধারণ হইয়া পড়া বিচিত্র নহে। তদ্ভিন্ন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে অনেক স্থলে গ্রামের সরলতা অপেক্ষা নগরের ভব্যতাই যেন অধিক! তিনি শিশুজীবনের অধিকাংশ কাল নগরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, সুতরাং উন্মুক্ত নিসর্গের বা মনুষ্যের হৃদয়রাজ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দগতি হয় নাই। রাজধানীতে তিনি প্রথম প্রথম ভাবুকতার বিশুদ্ধ কাঞ্চন ও লাভ করিতে পারেন নাই; 'মলয়া-অম্বর' যুক্ত তাম্রই পাইয়াছিলেন। ক্রমে তিনি অল্পে অল্পে প্রকৃতের রাজ্য

অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গল্প এবং 'চৈতালি, কথা ও কাহিনী এইরূপে প্রকৃতের মন্দিরে প্রত্যাগমনের দৃষ্টান্তই বহন করিতেছে। কিন্তু, চিরকাল যেন তাঁহার 'রাজার সাজ'। রাজবেশে প্রকৃতি-মন্দিরে অনেক-সময়েই প্রবেশ করা যায় না; এই ভীরুস্বভাবা পল্লী বালিকা ও রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া যেন ভয়ে-সম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়! জবরদস্তের হস্তে সহজে ধরা দিতে চায় না। 'ক্ষণিকার' সময় হইতেই কবি স্বদোষ বিষয়ে যেন আত্মজাগরণ লাভ করিয়াছিলেন।

আবার, কখন বা রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা ভাষাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য এবং অলক্ষ্যলোকে অনুপম ভাবে সঙ্কেত পরিচালিত করিতে চাহিয়াছে; এবং অকস্মাৎ সঙ্কেতটাকেও হারাইয়া বসিয়াছে! যেই পর্য্যন্ত শক্তমাটীর উপর দিয়া স্থির পদে চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল তাহা না গিয়া, ওইরূপে হটাৎকার অবলম্বন করায়, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে তাঁহার বহু কবিতার মাহাত্ম্য হয়ত উত্তরকালে কমিয়া যাইবে। কিন্তু চিরকাল মনে রাখিতে হইবে, এ জাতীয় কবিতা 'চিত্র-কবিতা' বা 'গীতকবিতা'! সঙ্গীত এবং কাব্যের মধ্য-দেশ-গত কবিতা! উহাদিগকে চাপিয়া ধরিতে চাহিলেই গলিয়া যাইবে! তাঁহার সৌন্দর্য্য-ইন্দ্রজালের অল্পাংশ মাত্র সবিচার-বুদ্ধির রাজত্ব মধ্যে বিস্তৃত; বেশী অংশই স্নায়ু-লোকে; অথবা অব্যক্ত লোকে!

পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির সমবায়ে, প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশিষ্টতার ক্ষেত্রেই, এ দেশের সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্জ্জেয় এবং অধৃষ্য হইয়া আছেন! ইহাও সত্য যে, তাঁহার শত শত কবিতা পড়িয়া আসিয়াও অনেক সময় এক বিন্দু অশ্রুবর্ষনের বা কোনরূপ স্ফুট রসাপত্তির অবকাশ ঘটেনা; কেবল বুদ্ধিগত সঙ্কেত এবং আভাসই অনেকের মূল লক্ষ্য! ইহা কাব্য-শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যধিক সূক্ষ্মতৎপরতা, সঙ্গীতভাবুকতা বা

দার্শনিকতার দোষ বলিতে হইবে। অত্যন্ততার দরুনেই হয়ত উহাদের রসাপত্তি ন্যূনাধিক বাষ্পীয় হইয়া যায়! তাঁহার ভাষার রাজ-বেশ, অলংকারের ঝিকিমিকি, এবং শব্দশিঞ্জনের পারিপাট্য অথবা অত্যধিক মার্জ্জনার গতিকেও হয়ত দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়—মনোযোগ স্থিরকরার পক্ষে অতিমাত্রায় পিচ্ছল বোধ হইতে থাকে; তাঁহার সহিত সর্ব্বাংশে সহানুভূতি স্ফুর্ত্ত হইবার অবকাশ পায়না। তাঁহার অনেক কবিতার সুখ-দুঃখ নিতান্ত ঘনিষ্ট পাঠক ব্যতীত অপরের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে থাকে। আবার; সহানুভাবক বা শিষ্যশিল্পী গণের মধ্যে সহস্রের একজনেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝেন কিনা সন্দেহ—তাঁহাদের নিজের কাব্য-কৃতিই উহার দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা যায়। কিন্তু, সমস্ত বিচ্ছিত্তি সত্বেও এই কবি নানামতে স্বকীয় বিশিষ্টতায় অতুলনীয় এবং বাঙ্গালীর পরম গৌরবের সামগ্রী; তাঁহার কাব্যকৃতির প্রকৃত মাহাত্ম্য বোধ এবং তাঁহার সহিত সম্যক সহানুভূতি-সাধনা বাঙ্গালী মাত্রের পক্ষেই একটা উচ্চশিক্ষা বা Liberal education বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

অতএব, রবি কবির প্রতিভা নিরূপন করিতে গিয়া বলিতে হয় যে, উহা সঙ্গীত-তন্ত্রীয় বিশিষ্টতা এবং ভাবগত দার্শনিকতা! সুতরাং উহার প্রধান শক্তি ছন্দ। আবার, তাঁহার প্রধান ছন্দ-শক্তি স্থির করিতে হইলে (তাঁহার চিত্রাঙ্গদা, মানসসুন্দরী, ভাষা ও ছন্দ এবং নাট্য কথাগুলির মাহাত্ম্য মনে রাখিয়াও) বলিতে হয় যে, মিশ্র লাচারী ছন্দই উহার প্রধান বিকাশ! তাঁহার রচনা-রীতিও সুদৃঢ় অর্থ-সাধনার, সংযত ভাবুকতার কিংবা বাগর্থের সুদৃঢ় প্রতিপত্তি-সাধনার রীতি নহে! উহা প্রধানতঃ বরং সাহিত্য অপেক্ষাও সঙ্গীত-অধিকারের ঘনিষ্টতর রীতি! সমস্ত কবিতার

রবি-প্রতিভার বিশেষত্ব।

মধ্যে দুটি-একটি মাত্র পংক্তিতেই হয়ত মূল অর্থটুকু ধারণা করিয়া, বাকী কথাগুলি কেবল আবেশের সৃজন-উদ্দেশ্যে উহার চতুর্দ্দিকে রেখাবিন্যাসের চেষ্টা করে বই নহে! তাঁহার কবিতার অভিধান-সম্পত্তি বা Vocabulary ও খুব বড় নহে। কতকগুলি বাছাবাছা তরল-কোমল শব্দই তাঁহার মুখ্য অবলম্বন! অথচ উহারাই তাঁহার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ করিতে সমর্থ! এই গীতি-কবিতা তাই ইটালীর Sonataর সম-প্রকৃতিক! উহার অর্থের মধ্যে কোন বিশেষ গতিশীলতা নাই; উহা হয়ত একমাত্র দার্শনিক অর্থবিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া, ভাষা এবং ছন্দের ঝঙ্কার-সাহায্যে, এবং কবির একটা নিজস্ব বোলচাল সাহায্যে পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে। তাই, উহা সহজেই হয়ত বাক্যবিলাসিতায় (mannerism) পরিণত হইতে পারে। এই রীতি আজন্ম সঙ্গীত-সাধক রবিকবির পরম বিশেষত্ব রূপেই বঙ্গসাহিত্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে! শত শত যুবক উহা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলেও কদাচিৎ কেহ এই সিদ্ধসাধকের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন! অন্যের শতসহস্র কবিতার মধ্যে বেমালুমভাবে মিশাইয়া রাখিলেও, নিজের এই অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্বগুণেই বিশেষজ্ঞের পক্ষে রবীন্দ্র রচনাকে 'পরখ' করিয়া লইতে বিলম্ব হয় না! অন্যের নিষ্ফল চেষ্টা কেবল তাঁহাদের মুগ্ধতাই প্রমাণিত করে; এই মৌলিক কবির মাহাত্ম্যটুকুই প্রমাণিত করে।

অন্যদিকে, মনস্তত্ত্বের একটা স্বতঃসিদ্ধ কথাও এই যে, সমুচিত বস্তুভিত্তি ব্যতীত কোন ভাবই মনুষ্যের মনে দৃঢ় অধিকার 'গাড়িতে' পারে না। সুতরাং আত্যন্তিক লক্ষণের ভাবুক এবং দার্শনিক কবিগণ পাঠকের দিক হইতে চিরকাল একটা অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যে অনেক স্থলে এই ভাব এবং বস্তুর অবলম্বন যে সম-অনুপাতে শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তাঁহার ভাবের অনুরূপ সমুন্নত কিংবা প্রকাণ্ড বিষয়ের ধারণা তাঁহার নাই। আমরা জানি, মধু হেম প্রভৃতি কবি (তাঁহাদের উৎকর্ষ-স্থলে) ন্যূনাধিক এই সামঞ্জস্য-পথেই পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন! রবীন্দ্র নাথের প্রধান শক্তি যে ভাবুকতা, উহা অণু-পরমাণুর মধ্যে বৃহত্বের দর্শন পূর্ব্বক, এবং ওই পথেই মৌলিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুচ্চ কবি-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত, (এবং তাহার কতিপয় 'কথা' এবং 'কাহিনী' জাতীয় কবিতা ব্যতীত) তাঁহার কাব্যের বস্তুঘটনার মধ্যে, কোনরূপ প্রতীয়মান নৈতিক ভিত্তি বা নৈতিক সমুন্নতির প্রবল দৃষ্টান্তও অধিক নাই বলিতে হইবে। তিনি একজন আর্টিষ্ট! এবং অনন্তনিষ্ঠ ভাবুকতার ক্ষেত্রেই তাঁহার কবিতা, (একরূপ গৌণভাবেই) নৈতিক মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং, সাধারণ পাঠক তাঁহাকে সহজেই অগ্রাহ্য করিতে পারে। অধিকন্তু, রবীন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির মধ্যেই দুর্ভাগ্যক্রমে এমন সমস্ত 'বস্তু' আসিয়া পড়ে যে, সাধারণ পাঠকের চক্ষে উহারা নৈতিক আদর্শে অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে! বিশেষতঃ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্বন্ধ উপস্থাপন পূর্ব্বক, পাঠকের চিত্তকে একদিকে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবুকতা-তন্তুর উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, পাঠকের স্নায়ু ধৈর্য্য কিংবা সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারেনা! তাহার অন্তরাত্মা বিসদৃশ বিরক্ত হইয়া উঠে! এইরূপ স্থলে অনেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই বিরূপ বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি! এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? আমরা জানি, রবীন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ঠিক এই বিদ্রোহ সংঘটনার বিপরীত। নিবিষ্ট বিচারকের চক্ষে, ওই দুটি স্থল রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট উপার্জ্জণ বলিয়াই পরিগণিত।

সুতরাং, সাহিত্যের সাধারণ পাঠকের দিক হইতে রবীন্দ্র প্রতিভার

তাবৎ গদ্যপদ্য উপার্জ্জনের বিরুদ্ধে এই একটা অভিযোগ আনিতে পারা যায় যে,উহার মধ্যে কোনরূপ বস্তুগত বৃহত্ত্ব নাই; কোনরূপ বহিরালম্বনযুক্ত সুতরাং ত্বরিত-প্রতীয়মান উচ্চতা নাই; কিংবা স্থায়ী ভাবযুক্ত বিশালতা অথবা সৃষ্টি-সামর্থ্যের প্রকাণ্ডতা নাই। মনুষ্যের হৃদয়কে বিষয়নিষ্ঠ শক্তিমত্তায় অভিভূত রাখিবার জন্য সমর্থ, কিংবা তাহার চিত্তপটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কনক্ষম বর্ণতুলিকা তাঁহার যথোচিত নহে। কিন্তু, তাঁহার বিশিষ্ট কবিতা সমূহের ভাবগত বৃহত্ত্ব এবং অনন্তনিষ্ঠ সংকেত অসাধারণ! উহা বিশ্ব-সাহিত্যে নানাদিকে অতুলনীয়! এই বিশেষত্বের গুণেই রবীন্দ্র প্রতিভা স্বদেশীয় সাহিত্যের সীমা ডিঙ্গাইয়াও জগতের স্থায়ী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা স্থির করিতে পারিবে; লেখক কিংবা পাঠককে পরম সতর্কভাবে এই চরমপন্থিতার সহিত সঙ্গ করিতে হইলেও, উহার মাহাত্ম্য অটুট থাকিবে! কেন না, কোনদিকে বিশেষত্ব বা মাহাত্ম্যের মহার্ঘতা বিচারেই সাহিত্যের চরম নির্দ্ধারণা ঘটিয়া আসিতেছে! জগতের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিগণের সহিত বিচারে তাঁহার নবনব অভাব দৃষ্টিমাত্রে প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও, এই ভাবগত এবং সঙ্গীত-অধিকারের বিশেষত্বই তাঁহাকে অতুলনীয় বলিয়া চিহ্নিত রাখিবে! সত্যের সূক্ষ্ম অনুভূতি, ছন্দের অন্তরঙ্গীয় (এবং বহির্মুখ) প্রাণস্পন্দন, ভাষার উচ্চ-উচ্ছাসিত কিংবা সমাধিনিমগ্ন ধ্বনি, ভাবধারণার অনন্তনিষ্ঠ প্রয়াস, ক্ষুদ্রের অভ্যন্তরস্থ বৃহত্ত্বকে অসীম এবং অমৃতময় করিয়া এবং অনুভবক্ষম করিয়া প্রদর্শন, পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া অথবা অভিনব নামরূপ প্রদান পূর্ব্বক উপস্থাপন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার উন্নত গুণলক্ষণের অনেকানেক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র নাথের মধ্যে যথেষ্ট আছে! এবং উহারাই তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিবে। অন্যদিকে, তাঁহার শান্তিনিকেতনের ধর্ম্মচিন্তা-সমূহ এবং বহু সংখ্যক 'অধ্যাত্ম' কবিতাও (উহাদের ওই অভিমান যুক্ত অথচ

প্রভুভক্তি-প্রবণ ধার্ম্মিকতা, এবং অহংবাদী (১) অথচ নতনেত্র এবং নতশির আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও) তাঁহাকে গুহাযাত্রিগণের এবং 'ক্ষুরধার' পথের পান্থগণের সমক্ষে ন্যূনাধিক সদয় সহানুভূতি লাভে সজীব রাখিতে পারিবে।

বলিতে কি, আধুনিক সাহিত্যের খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গদ্যপদ্য চেষ্টার সম্মিলিত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে, সাহিত্যে সঙ্গীত তন্ত্রতা এবং আধ্যাত্মিকতার বিস্তার ক্ষেত্রে, নানাদিকে ভিক্টর হিউগো ব্যতীত আর এইরূপ অবিশ্রান্ত ক্রিয়াশীল এবং অবিরাম ক্ষুদ্র তরঙ্গশীল প্রকাণ্ড প্রতিভার সঙ্গম লাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। উহার মধ্যে হিউগো-প্রতিভার বৃংহিত ভাব, উহার অমৃতমত্ততা, সমুদ্র গর্জ্জন, সমুদ্র-উচ্ছ্বাস অথবা সামুদ্রিক সহৃদয়তার পরিচয় নাই সত্য; দ্বীপ মহাদ্বীপ মহাদেশ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রচণ্ডগভীর তৎপরতাও নাই; কিন্তু উহা ভারতবর্ষের ব্রহ্মপুত্র! অন্ততঃ একভাবে ভারতের বিশিষ্ট সুর-তালের অপত্য-পরিণতি! ঋক্‌সামযজুর অন্তরঙ্গীয় রাগিনীগঙ্গার প্রবাহ-সন্ততি! উহা একদিকে বিষ্ণুপদের, আকাশের আত্মজপুত্র; অন্যদিকে সমুদ্রের কৃতকন্যা! উহার প্রধান শক্তি—ভাষার তরল তরঙ্গভঙ্গী উচ্ছ্বাস, ছন্দের নিত্য-নব লীলা-নৃত্য, এবং সর্ব্বত্র অনন্তের প্রতিচ্ছবি ধারণক্ষম ভাবুকতা! উহার কোথাও কূল কিনারা পরিস্ফুট হইয়াছে,কোথাও বা উহা আপাতঃ-দর্শনে অসীম এবং অপার! কোথাও হয়ত হাঁটিয়া পার হওয়া যায়,কোথাও এত গভীর এবং 'ডহর' যে মনুষ্যের ওলনদড়ী থাই পায় না! কোথাও উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লীলা-কৌতুকের লহরী তুলিয়া নাচিতেছে (যাহা হিউগোতে নাই), কোথাও বা উত্তাল তরঙ্গের আভোগ দেখাইয়া সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা

(১) বাক্য চেষ্টাশীল কবির বা লেখকের পক্ষে এই 'অহমিকা' নিয়তি নানাদিকে অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। লেখক।

অনুভব করিতেছে! যেখানে উহা গঙ্গপন্থের ধারা সম্মিলন করিয়াছে—কি অপরূপ মিলন! উর্ব্বশীর সহিত মিনার্ভার সম্মিলন! জগতের অন্য কোন নদনদীর বেলায় এই বিশিষ্টতার তুলনা মিলিবে না! স্বয়-নিষ্ট হইলেও ক্ষণেক্ষণে, দিনেদিনে, জীবনের পক্ষমাস-ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার কত চিত্রবিচিত্র মর্জ্জি! কোথাও ফেনিল-আবিল! কোথাও বা স্বচ্ছ-নির্ম্মল! কোথাও শান্তিনিকেতন, কোথাও বা বাসনা বৃত্তির ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র! উহার শিরে অনন্তনিহিতশীর্ষা ঘনতুহিনশুভ্র হিমালয়—জগতের সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা; অন্যদিকে, জগতের সলীল আনন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাস-রঙ্গী বঙ্গীয় অখাত!

৩

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তিতা-সূত্রে, আমরা এস্থলে বঙ্গের বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যের একটা প্রবল বিস্তারিত লক্ষণের দিকে সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া যাইব। বলা বাহুল্য, 'বর্ত্তমান' কথাটি চিরকাল স্থান পরিবর্ত্তন করে বলিয়া, এ ক্ষেত্রে কোন আলোচনাই সুসম্পূর্ণ, সম্বদ্ধ অথবা চূড়ান্ত হইবার আশা করিতে পারে না।

বঙ্গীয় কাব্যের বর্ত্তমান অবস্থা।

বঙ্গীয় কাব্যের বর্ত্তমান অবস্থাকে 'রবীন্দ্র যুগ' বলিয়া একটা ন্যূনাধিক ব্যঙ্গোক্তি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দারা, প্রকৃত বিচারকের নিকটে রবীন্দ্রের কোন বিশেষ দোষাঘ্রাণ না থাকিলেও, উদ্দিষ্ট লেখক গণের পক্ষে কথাটা কোনমতেই গৌরবজনক নহে। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চিরকাল স্বাধীনতা এবং বিশিষ্টতা লইয়াই সবিশেষ ব্যাপৃত; উহা 'অধীনগণের' অথবা পিষ্টপেষকগণের নামোল্লেখ করাও আবশ্যকীয় মনে করে না। ভালমন্দ যেমনই হউক, কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কবি একবার যাহা দিয়া গিয়াছেন, কোন পরবর্ত্তী আসিয়া তাহা নিঃশেষে পুনঃ-পুনঃ চর্ব্বণ করিতে পারিলেন কি না, অথবা ঐ

প্রকারে কোন মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিলেন কি না, সাহিত্য-ইতিহাস তাহার হিসাব রক্ষা করিতেও কিছুমাত্র ব্যস্ত নহে। বিস্তারিত সাহিত্য-জ্ঞান, স্থায়ী সাহিত্যের আদর্শপরিজ্ঞান, অথবা আত্মজ্ঞানের অভাব হইতেই যে সাহিত্যে অনেক সময় দল-গঠন অথবা দলাদলি ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন, 'রবীন্দ্রযুগ' বলিতে যে দোষ সংকেতিত হয়, উহা নানাদিকে একটা প্রণালী-দোষ বা বাক্য-বিলাস (mannerism) ব্যতীত আর কিছুই নহে ; এবং উহার মূলতত্ত্বও জীবনভিত্তি-বিহীন ভাবোন্মত্ততা। অন্যদিকে, আমাদের জাতীয়চরিত্রে ভাবুকতা কত প্রবল এবং নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কোন্-কোন্ দিকে উহার সূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি! অশিক্ষিত অথবা অগঠিতমস্তিস্ক বাঙ্গালী যুবকমাত্রের পক্ষেই যেন উহা স্বাভাবিক! এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের—বিশেষতঃ তাঁহার প্রথমজীবনের গীতিকবিতার দৃষ্টান্তই, 'একমাত্র কাব্য-আদর্শ' রূপে পরিগণিত হইয়া, এবং পরিব্যাপ্ত ভাবে অনুসৃত হইয়া 'রবীন্দ্রযুগের' সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং উহার কারণ বুঝিতে গিয়া কেবল রবীন্দ্রনাথকে নির্দ্দেশ করিলেও সম্পূর্ণ সত্য-নির্দ্দেশ হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশবৎসর হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশবৎসর পর্য্যন্ত, বঙ্গের বহুসংখ্যক লেখকের গলদপদ্ম চেষ্টার বিষয়ে উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে। ওই সময়েও যেমন অনেক লেখক রবিচ্ছায়া হইতে স্বাধীনভাবে আত্ম-নিয়তি অন্বেষণ করিতেছিলেন, তেমন বিগত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহাদের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে! 'রবীন্দ্রযুগ' প্রসঙ্গে আমরা ১০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

'সূর্যের চারি দিকে অনেক গ্রহ উপগ্রহ থাকে ; তেমন, প্রকৃত

কবির চারিদিকে অনেক 'উপ-কবি'র আবির্ভাব হয়। উহারা সূর্য্যের আলোককেই নিজের আলোক মনে করিয়া বাতুলতা গ্রস্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের এখন বহুপরিমাণে সেই অবস্থা। এখন অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের আলোকে আলোকিত ও তাঁহার শক্তিতেই শক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই ; এবং স্থানে স্থানে স্বাতন্ত্র্যের আভাস পাওয়া গেলেও, উহা রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতার এবং ভাবুকতা-রীতির অসতর্ক অনুকরণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের দ্বারা অপরিচিতের নিকট রবীন্দ্রনাথের ও সম্মানের লাঘব হইতেছে।'

'এ কালের সাহিত্যিকগণের যেন নিজের কথা বলিবার প্রয়াস নাই! তাই, তাঁহাদের ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্ত কপট ও গর্ব্বিত। তাঁহাদের ছন্দ (বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলের ন্যায়) আপন শরীরের ভার বহন করিয়াও চলিতে পারে না। উহার পেশীসমূহে অণুমাত্র বস্তুভিত্তি স্বাস্থ্য বা কর্ম্ম-নিষ্ঠার আভাস নাই। অশিক্ষা, অনুকরণ, ভাবোন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতা এবং অতিরিক্ত যশোলিপ্সাই এ সমস্ত দোষের মূল কারণ। যে পর্য্যন্ত না তাহা দূর হয়, সে পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিপথে প্রধান অন্তরায়টি অন্তর্হিত হইবার আশা নাই। একমাত্র স্বাধীনতার এবং স্বচিন্তার প্রভাবেই রবীন্দ্র নাথ প্রথম জীবনের ভাবোন্মত্ততা হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু, অনুকারকগণের কাহারও হস্তে উক্ত বহুমূল্য ঔষধ দেখা যাইতেছে না! সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের গতি রীতি বা আদর্শ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিয়াই অনেকে কেবল দেখাদেখি আসরে নামিতেছেন!'

এই যুগের কাব্য-আদর্শে, কোন বৃহৎ কিংবা বিস্তারিত ভাবকে তদনুরূপ বর্ণরস অবলম্বনে, ঘটনা অথবা চরিত্রের সৃজন পূর্ব্বক ঘনবিস্তারিত

কাব্যের বা নাটকের আকারে নিরূপিত করার জন্ত কোন লক্ষ্য নাই।

'কাব্যির' যুগ ও * ছড়ার যুগ।

কোন একটি 'ছোট্ট' ঘটনা, 'ছোট্ট' ভাব, বা জীবনের ক্ষুদ্র আনন্দ এবং চিন্তাকে মনের অণুবীক্ষণ শক্তি সাহায্যে বৃহৎ করিয়া দর্শন পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল বর্ণপ্রপাতে নবনব বাক্যচ্ছন্দের মনোমুগ্ধকর তান-লয়ে পাঠকসমক্ষে উপস্থাপন! এবঞ্চ, প্রত্যক্ষ ঘটনা কিংবা ভাবের অতিরিক্ত (অথচ উহার সহিত বেশীকম সম্পর্কিত) একটা অব্যক্ত ভাববর্ণের অথবা রসের ইঙ্গিত! উৎকর্ষ পক্ষে ইহাই আধুনিক গীতি কবিতার আদর্শ! যদিও আদর্শের নিকটবর্ত্তী কবিতার দৃষ্টান্তই অল্প, তথাপি, অনুসন্ধান করিলে বহু লেখকের রচনা হইতে চয়ন পূর্ব্বক এই জাতীয় কবিতার একটা সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে। তবে,এই সব লেখকের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবি-প্রতিভার কোনরূপ প্রচণ্ড কিংবা প্রকাণ্ড লীলা মিলিবেনা। একটা ইংরেজী কথায় এই কবিতার মাহাত্ম্য যথাবৎ নির্দ্দেশ করা যায়—উহারা Pretty—মিষ্টি! এই কবিতার প্রথম অবস্থায় রক্ষণশীলদলের কোন তীব্র সমালোচক উহার স্ত্রীজনোচিত কোমলতা, স্ত্রীত্বের অভিমানযুক্ত ভাবভঙ্গী, এবং আলাপের ভাষারীতিকে কটাক্ষ করিয়া মেয়েলীভাষার অনুকরণে বলিয়াছিলেন—উহারা 'কাব্যি'! কথাটাকে—উহার জুগুপ্সা সঙ্কেত টুকুন বাদ দিয়া, এখনো সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়। শৈশব সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া কড়ি-ও-কোমল পর্য্যন্ত. কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই 'কাব্যি-যুগ' প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর,বঙ্গের কবিযশঃ-প্রার্থী যুবকযুবতীগণের মধ্যে তুমুল অনুকরণ কোলাহল পড়িয়া যায়; মাসিকে, সাপ্তাহিকে ঐরূপ কবিতার 'জ্বালায়' 'কলে 'ঝালাপালা' হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের শিক্ষাদীক্ষা, ভাষা কিংবা সাহিত্যের জ্ঞান, জগতের সাহিত্য কিংবা সভ্যতার বর্ত্তমান উন্নতি-

পরিজ্ঞানে যথেষ্ট ছিল না; বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কবির কার্য্যফলে যে কয়েকটি ভাব সাধারণ হইয়া পড়িতেছিল, তাই লইয়া উঁহারা 'নাড়াচাড়া করিতেছিলেন বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তিকে অতিক্রম পূর্ব্বক কোন বিশেষ মৌলিকতা কিংবা স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ ও তাঁহাদের মধ্যে পরিব্যক্ত হইতে পারে নাই। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই উদ্ধৃত কথা গুলি লিখিত। এখন সেই কোলাহল বহু পরিমাণে শান্ত হইয়া গিয়াছে; ওই কবিকুঞ্জ নীরব না হইলেও (এবং বাঙ্গালীর মধ্যে উহা কখনো নীরব হওয়াও অসম্ভব) এখন আর প্রবল নহে। তাঁহাদের কবিতা অনেকটা সাময়িক পত্রিকার বক্ষেই সমাধি লাভ করিতেছে। পুস্তকাকারে যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও ক্রমে অন্তর্ধান করিবে। তৎসঙ্গে দুটি-দশটি প্রকৃত কবিতাও যে তলাইয়া যাইবে না এমন নহে। (ক) ফলতঃ, 'কাব্যি যুগ' হইতেও দুই চারিজন কবি আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ন্যূনাধিক রক্ষা পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

রবীন্দ্র নাথের 'ক্ষণিকার' পর হইতেই তাঁহার মধ্যে আর একটি কাব্য-প্রণালী প্রবল হইতেছে—উহা বিশেষভাবে 'ছড়া' লইয়া। ছড়া বাঙ্গালী গৃহের একটা নিজস্ব সৃষ্টি; এবং উহা লাচাড়ী ছন্দের মূল। উহার মধ্যে, বর্ণ-উচ্চারণের অনেকটা 'খাম-খেয়ালি' গতিকে, উদাত্ত অনুদাত্ত উচ্চারণ মূলক একটা 'নাচনী' গতি আছে; একটা আশৈশব পরিচিত নৈকট্য এবং মিষ্টকোমল তারল্য আছে। উহা একরূপ গ্রাম্যতা এবং কথাবার্ত্তার রীতি ধরিয়াই, প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালার কবিওয়ালা ঝুমুর খেউর এবং পাঁচালী-

(১) এই সমস্ত কবিতার চয়নিকা রচনা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অন্যথা অনেক সুন্দর কবিতাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রবীন্দ্র নাথের 'ভগ্ন হৃদয়' স্বয়ং বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। অথচ উহার মধ্যে এমন অনেক সুন্দর কবিতা-পংক্তি আছে, রবীন্দ্র নাথ পরিণত বয়সেও যাহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কারগণের মধ্যেই সবিশেষ প্রচলিত ছিল; বঙ্গ সাহিত্যে উহাকে কদাপি সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই। মধুসূদন হেমচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্র লাল প্রভৃতি হাস্যরস বা জুগুপ্সা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে, এই ছন্দঃ এবং রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। হুতোম, টেকচাঁদ, সবিশেষ পরমহংসের উপদেশ গুলি, বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রণালীকে ঋজুতার মাহাত্ম্য দান করিয়া গিয়াছে! রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকার পর হইতে ধর্ম্ম অধিকারে সরলতার সাধনা করিতেছেন বলিয়া, গদ্যেপদ্যে এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই ছড়ার প্রণালীকে তত্ত্বভাবে অনুসরণ করিতেছেন। উহার পর, বাঙ্গালীর গীতি কবিতার মধ্যে এখন আবার ছড়ার 'হুজুগ' চলিতেছে! দ্বিজেন্দ্র লাল 'চাষার পূর্ব্বরাগ' বর্ণনায় যে ছন্দ এবং ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন তাহা 'ভদ্রলোকের পূর্ব্বরাগ' ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্কোচে ব্যবহৃত! বহু কবি ছড়ার ছন্দেই সকল রকমের কবিতা রচনা করিয়া চলিয়াছেন। ইহাও হয়ত কালে 'কাব্যি'র ন্যায় শিথিল হইয়া আসিবে। কিন্তু এই রীতি একদিকে, বঙ্গীয় খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে, অপূর্ব্ব বস্তুবাদ এবং প্রাকৃতবাদ—সুতরাং স্বাতন্ত্র্য—আনয়ন পূর্ব্বক অভিনব শক্তি-পরিচয় প্রদান করিতেছে! ইতিমধ্যেই দুই-একজন তরুণ কবি, ছড়ার হৃদয়-মধ্যে দুটি চারিটি নূতন সুর এবং বাস্তবতা আবিষ্কার করিয়াছেন। উহারা বাঙ্গালীর ছন্দ-কবিতার এবং খণ্ড কবিতার স্থায়ী প্রাপ্তি বলিয়াই পরিগণিত হইবে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, এই ছন্দঃ এখনো প্রাদেশিকতার, অল্পতার কিংবা doggrel এর রীতি অতিক্রম করিতে পারে নাই; মেয়েলী ছড়ার স্বপ্নবিলাস, শিশুনেত্রের পরীপুরীবিহারিনী মুগ্ধ দৃষ্টি, কিম্বা শিশুমুখের স্তনন্ধয় গন্ধও অতিক্রম করিতে পারে নাই! উহা কখনো বয়স্কতার কিংবা স্থবিরতার প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে সিদ্ধি করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, উহার সঙ্গে বাঙ্গালী-জীবনের অংশ-বিশেষের

যে সত্য-সম্বন্ধ আছে, প্রাকৃত জীবনের সহিত উহা যে রূপে নিকট-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক উহার 'ধাত' ব্যক্ত করিতে পারে, ফুলে-ফুলে পরী-আত্মা এবং গাছে-গাছে দেবদেবতাযক্ষ কিন্নরের অধিষ্ঠান ঘটনা করিয়া উহা যে একটা রসের সাধনা করিতে পারে, তাহার মূল্যও সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রে কম নহে।

কিন্তু, যেমন বলিয়াছি, এই যুগের পরিব্যাপক লক্ষণ এই যে, উহার অধিকাংশ কবিতাই কেবল দেখাদেখি মামুলী রচনা বা Hack work শত শত 'কলম পেশা'র মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেই নিজের ভাবে বা নিজের ভাষায় লিখিতেছেন—অনেকের ভাষা-জ্ঞানই লেখনীধারণের বিষয়ে যেন পর্য্যাপ্ত নহে! বিশেষতঃ, এখন খণ্ড কবিতার, এবং তন্মধ্যে পুনশ্চ গীতি-কবিতার হুযুগই প্রবল; উহা গত বিশ বৎসর ধরিয়া বিপরীত 'একঘেয়ে' ভাবে চলিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বলিতে কি, বঙ্গদেশে এখন ভাবুকতার, বিশেষতঃ গীতিতন্ত্রীয় ভাবুকতার হাওয়াই এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা প্রবল থাকিলে বঙ্গসাহিত্য অতঃপর খণ্ডকাব্য চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন দিকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। এই প্রাবল্যের বশবর্ত্তী হইয়া এ কালের যুবকগণ যেন মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র প্রভৃতিকে ও অবজ্ঞা করিতেছেন বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে। কেহ কেহ নির্ভয় ভাবে অভিমত প্রকাশ করিতেও সাহসী হইতেছেন! আমরা অনেকেই পূর্ব্বগণের প্রতি যথোচিত প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার ভাবও যেন বিস্মৃত হইয়াছি! বঙ্গভাষায় বর্ত্তমানে গীতি-কবিতা কর্ত্তৃক প্রচলিত মিষ্টকোমল পদগতি এবং উহার ভাববিলাসী পাকচক্রে আত্মহারা হইয়া আমরা সময় সময়, যেমন অক্ষয় কুমার এবং বিদ্যাসাগরকে, তেমন মধুসূদন এবং হেম নবীনকেও অপদস্থ করিতে ছাড়ি নাই। উহা আমাদের চরিত্রগত বাতিক এবং শিক্ষাদীক্ষার বেগতিক

সঙ্কীর্ণতাই প্রমাণ করে! এদেশের সাধারণ পাঠক-সমাজ এখনও যেন প্রকৃত সাহিত্যবিবেক লাভ করিতে পারে নাই!

নবীন ও রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গালীর ভাবুকতাতে পরিপোষণ পূর্ব্বক কোন্ দিকে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পৌরাণিক এবং বৈষ্ণবী রীতির ভাবুকতাকে ইঁহারা যুগোপযোগী পরিচ্ছদে উপস্থিত করিয়াই বঙ্গদেশে লোকায়ত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সময় সময় বাতিক বা রুগ্নতার লক্ষণ প্রকট হইতে থাকিলেও, উহা যে বঙ্গের আধুনিক যুবক-জীবনের সঙ্গে নানাদিকে সাধর্ম্ম্য সাধন পূর্ব্বক সহানুভূতি অর্জ্জন করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র আপনাদের রচনার মধ্যে যেই কঠোর এবং নিরাভরণ সরলতা, সুদৃঢ় অর্থ-ঋদ্ধি, সমুচ্চকণ্ঠ, এবং অনন্য পৌরুষের উপস্থাপন পূর্ব্বক আমাদের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, নবীনচন্দ্রে বা রবীন্দ্র নাথে উহা প্রবল নহে। এই সমস্ত গুণ মনুষ্যের সুদৃঢ় মেরুদণ্ড এবং তাহার সামাজিক সভ্যতার মাহাত্ম্যপরিচয়-পথেই হৃদয় মধ্যে অতর্কিতে অধিকার লাভ করে! মেরুদণ্ডের এই পৌরুষ এবং কাঠিন্যই মানুষের পক্ষে দাঁড়াইবার প্রধান সহায়! উহা একাই একশত! উহা কবির সমস্ত কাব্যার্থ এবং শিল্পার্থের মধ্য হইতে অপরূপ অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক কবিকে চিরকাল পূজ্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে! ইঁহাদের কাব্যশিল্পের এই অন্তরাত্মা, এই সমুচ্চ ধ্বনি এবং বৃংহিতভাব, এই ক্লাসিক এবং আর্য্যমাহাত্ম্য, ইহা আধুনিক গীতি-কবিতার কোমলকান্ত ছন্দ-রুচি এবং বর্ণধর্ম্মের কিংবা মিষ্টতার আদর্শ হইতে. অথবা দার্শনিক লক্ষণের দ্যুতি কিংবা প্রসাদগুণ হইতেও কোন অংশে ন্যূন নহে! বাঙ্গালীর পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়াই উহার মাহাত্ম্য বরং অধিক! মধু এবং হেম এই পরম-দুর্লভ অধ্যাত্মগৌরবেই দীর্ঘকাল বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আত্মমাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া জীবিত থাকিবেন বলিয়াই মনে হয়।

এই সুযোগে আধুনিক গীতিকবিতা ও ভাবগত কবিতার স্বরূপ এবং আদর্শের বিষয়ে আরও কয়েকটী কথার আবশ্যক মনে করিতেছি। সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, যে কাব্য উপযুক্ত বস্তুর সাহায্যে কোন দুর্লভ সত্য এবং সৌন্দর্য্যকে শিল্পনীতি-সঙ্গতে আকারিত করিতে পারিয়াছে, তাহাই কালপ্রবাহে টিকিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক বা সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি, জাতীয় ভাগ্যবিপ্লবের অভাবনীয় ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সত্বেও, এ কারণেই বিলুপ্ত হয় নাই। মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ভাবোচ্ছ্বাস বা গীতোচ্ছ্বাস যতই মহৎ গভীর বা মধুর হউক না কেন, মানুষ যত্ন করিয়া তাহাকে রক্ষা করে নাই! অথবা, পরবর্ত্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ত অতিক্রান্ত হইয়াই আসিতেছে। সুতরাং শিল্পের হিসাবে অগম্য অস্পৃশনীয়,অলীক বা নিরাকার কাব্য-কৃতি কিংবা গীতোচ্ছ্বাস আপাত মনোরম এবং বর্ত্তমানে প্রভূত আদরণীয় হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোন স্থায়িত্ব-যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না। রাম-যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য বা আকবরের সভায় অবলা-কণ্ঠে যেই সমস্ত সঙ্গীত তানলয় বিশুদ্ধ ভাবসঙ্কেতে মন মুগ্ধ করিত, ঐ সমস্ত নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্যযোগ্য ছিলনা। সেই কাল হইতে পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সুখেদুঃখে, সজনে বিজনে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, বাসরগৃহে,উন্মুক্ত প্রান্তরে বা নদীবক্ষে এ বঙ্গদেশেই যে সকল সঙ্গীত-গাথা মানুষের হৃদয়ভাবকে তানলয়চ্ছন্দে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে তাহাদের সমস্তই কি 'ভুয়া'? আধুনিক গীতিকবিতা অপেক্ষা সমস্তই নিকৃষ্ট? এখনো এই দেশে, শিক্ষাসভ্যতার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত, দূর-প্রত্যন্তশায়ী গ্রাম্য-পথে কৃষকের কণ্ঠেও এমন সঙ্গীত ভাবোচ্ছ্বাস শুনা যায়, যাহার মাধুর্য্য কিংবা মাহাত্ম্য আধুনিক শ্রেষ্ঠগীতিকবিতার ভাবাদর্শে বিচার করিলেও কিছুমাত্র

কাব্যে আধুনিক গীতিকবিতা বা ভাবতন্ত্রের কবিতা।

মলিন হয় না। অথচ, উহা প্রকৃত কাব্য নহে। কাব্যের বিশেষত্ব কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবুকতায় কিংবা ভাবসঙ্কেতে নহে। অর্থবৎ বাক্যের প্রণালি-পথে সত্যকে, সৌন্দর্য্যকে প্রমূর্ত্ত এবং স্থায়ীভাবে পরিব্যক্ত করাই কাব্যের প্রধান মাহাত্ম্য। বিস্তারিত বস্তু, ভাব এবং তত্ত্বের সামঞ্জস্যই শ্রেষ্ঠশিল্পের লক্ষ্য। কারণ, যেমন বলিয়াছি, উপযুক্ত বস্তু ব্যতীত মনুষ্যের মনোভূমে কিছুই প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, অস্পষ্টতা কিংবা মনে 'সুড়-সুড়ি' দেওয়াকে কদাপি শিল্পের উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রকাশ করিতেও নাই; সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উহা অন্যায় বলিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য। ঐ আদর্শের মাহাত্ম্য কিংবা স্থিরতার কোনরূপ মাপকাঠি নাই। কর্ত্তার ভাবনী-শক্তি বা সামর্থ্যের ভেদে উহার ভিত্তি প্রতিনিয়ত নিদারুণ ভাবেই বিচলিত হইতেছে! একের মুখে যেই অর্থ অস্পষ্টতার মাহাত্ম্যে, পাঠকের মনের উপর কেবল 'সুড়-সুড়ি' দিয়াই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, কালক্রমে যোগ্যতর কবির হস্তে তাহাই পরম সূর্য্যালোক-দীপ্ত অনুভবের ক্ষেত্রে আনীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের স্থায়ীভাব-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছে! সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিব, এইরূপে অনেক অস্পষ্ট এবং 'অনির্ব্বচনীয়' ভাব কিংবা ভাব-সঙ্কেত পর-পরবর্ত্তী কবির হস্তে পরম স্পষ্ট-সরস্বতীর ক্রোড়গত হইয়া মূর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছে! মনুষ্যসমাজের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, যাহা পরম সত্য হইলেও, কদাপি 'মুখ ফুটিয়া' প্রকাশ করিতে নাই; এবং ধরা পড়িলে যাহার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। অন্যথা, উহার গতিকেই সমস্ত সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া, সমাজকে নিদারুণ ভাবে ধূলিসাৎ করিতে পারে; অশিক্ষিতগণ, ক্ষীণমতিগণ সাহস লাভ করিয়া সাহিত্যের সকল নীতিরীতি এবং কাব্যের অর্থভিত্তির আদর্শকে পদদলিত করিয়া, অরাজকতা উপস্থিত করিতে পারে! যেমন সমাজের মধ্যে, তেমন

সাহিত্যের মধ্যেও অনেক শিষ্টাচার আছে, যাহা কদাপি লঙ্ঘন করিতে নাই; এবং লঙ্ঘন অপরিহার্য্য হইলেও শাস্তি টুকুন মানিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। অস্পষ্টতা, অনির্ব্বচনীয়তা অথবা সঙ্কেত-শক্তি যে সঙ্গীত এবং চিত্র-শিল্পের একটা পরম গরিয়সী শক্তি, তাহা কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু কাব্যের মধ্যে, সারস্বত আচারের মধ্যে নানাদিকে উহার সীমা আছে। বিশেষতঃ, শিল্পমাত্রের মাহাত্ম্য চিরকাল স্থান কাল এবং বিবক্ষার উপরেই নির্ভর করে। সঙ্কেত ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা, অনুরণন বা অস্পষ্টতাও নানাপ্রকার হইতে পারে। কোন পদার্থ দূরবর্ত্তী, দূর-দুরান্ত-বিগাহী বা অসীমের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই অস্পষ্ট; কোনটা বা নিজের চারিদিকে ইচ্ছাকৃত ছায়া-কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়াই অস্পষ্ট! কোন পদার্থ নিজের ভাবসৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যেই সাধারণের জন্য দুর্গম; কোনটা বা নিজের চতুর্দ্দিক্ অযথা কণ্টকাবৃত করিয়াই দুর্গম! কোন কথা কেবল ছন্দের নৃত্য, ফাঁকতাল অথবা কেবল সুরের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া অস্পষ্ট; কোনটা বা ব্যাকরণ, লজিক কিংবা ন্যায়বাদার্থের শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত অসামাজিক হইয়াছে বলিয়াই অস্পষ্ট! *অস্পষ্টতাটুকুন অপরিহার্য্য না 'বেফাঁস'* ইচ্ছাকৃত? এইরূপ বিচারেই সত্য নিশ্চিত হইয়া শিল্পমাত্রের সাধুতা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে!

আরও বলিতে হয়, এবং চিরকাল মনে রাখিতে হয় যে, ভাবুকতা ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকার এবং জলবায়ুর অপরিহার্য্য রোগ! বহির্দ্দিক্ হইতে অত্যন্ত বাঁধনের গতিকেই ভারতীয় সমাজে ভাবুকতা এত ব্যাপক হইয়াছে! ধর্ম্মেকর্ম্মে বাস্তব জগৎকে, কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ করিতে পারিলে যে দেশে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়, সেই দেশে ভাবু-

ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাবুকতা।

কতার অত্যন্ত বৃদ্ধি না হইয়া পারে না। ইয়োরোপে যে ভাবুকতা হয়ত বিলাসিতার দরুণেই জন্মিতে পারে, আমাদের দেশে তাহাই বৈরাগ্য; কর্ম্মালস্য ও সংসারে অনভিজ্ঞতার দিক্ হইতেই উপজাত হয়। সুতরাং, এই দেশে মানবচরিত্রকে সম্পূর্ণতা ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে সংযত-সচেতন ভাবে কর্ম্মসাধনার আবশ্যক করে। সংস্কৃত ভাষায়, ব্যাকরণের অষ্টপাশ বন্ধন এবং কঠিন ন্যায় আদর্শের মধ্যেই, এই ভাবুকতা জগতের অন্য প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় অনেক প্রবল পরিদৃষ্ট হইবে। বঙ্গের বৈষ্ণব কবিমহলে এবং নবীন চন্দ্রেও এই ভাবুকতালক্ষণ আমরা দেখিয়াছি। উহা একদিকে ভারতীয় সাহিত্য-রীতির প্রধান শক্তি সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, জর্ম্মন দার্শনিকতা কিংবা ফরাশী রীতির ভাবুকতা, কোনটাই এ দেশে নিতান্ত অপরিচিত নহে। বঙ্গদেশে এই ভাবুকতা সহজে অত্যন্ততা-রোগে পরিণত হইতে পারে। বাঙ্গালী ভীরু নহে, ভাবুক; তাহার শক্তি কিংবা দুর্ব্বলতা, উভয়ের নিদান টুকু এই স্থানেই অন্বেষণ করিতে হইবে! ইতিহাসে, অতীতে কিংবা বর্ত্তমানে, বাঙ্গালী যখন যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা এই ভাবুকতার বশেই করিয়াছে (১)। সুতরাং, বঙ্গসাহিত্যে, স্বদেশী কিংবা বিদেশী শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তে ভাবোন্মত্ততার সমর্থন করিতে পারিলে, উহা যে পরম দলবদ্ধ ভাবেই ছাইয়া পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। ফলতঃ, ভাবুকতা-আদর্শের ফল বঙ্গ সাহিত্যে মারাত্মক হইতেছে। পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠাবান লেখকগণের কথা ছাড়িয়া দিলে, বিংশ শতাব্দীর গত দশ বৎসরে, সপ্তকোটী মানবের মাতৃভাষার মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কয়টি বাক্যশক্তিমান্ ব্যক্তির উদ্ভব

(১) মুসলমান আক্রমণভয়ে বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রসিদ্ধ (?) পলায়নও প্রকৃত প্রস্তাবে রাজধর্ম্মের অবহেলা এবং বৈরাগ্য-বিলাসী ধার্ম্মিকতার বা ধর্ম্ম-ভাবুকতার ফল বলিয়াই মনে হয়। লেখক।

হইয়াছে? বঙ্গে সাহিত্যসেবীর সংখ্যা পরিমিত হউক, তন্মধ্যে অনুপাত গ্রহণ করিলেই দেখিব, কবিতা, গীতি-কবিতা, কিংবা ভাবগত-কবিতা-লেখকের অনুপাত কত অধিক! প্রায় সকলেই কবি হইতে চাহিতেছেন! আবার, তাঁহাদের এই গীতি-কবিতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিব, উহার প্রতিপত্তি কিংবা যোগ্যতা অন্য বাণি-শিল্পের তুলনায় কত স্বল্প এবং সামান্য! বিষয়-বক্তব্যের আবশ্যক নাই; উদ্দেশ্য কিংবা প্রতিপাদ্যের অনুভাব-বিভাব সামঞ্জস্যের আবশ্যক নাই; কেবল লেখক যে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন, একটা 'কিছু' অনুভব করিতেছেন, এই কথাটি প্রকাশ কিংবা সংকেত করিতে পারিলেই হইল! অধিকন্তু, কেবল শিরোনামা বা নামকরণের মধ্যেই যেন উহার মাহাত্ম্য! রচনা যখন প্রকৃত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ না করিয়া কেবল হাবভাব দেখাইতেই লাগিয়া যায়, বাক্য যখন অর্থকে আলোকিত না করিয়া কেবল অলংকারের ঝিকিমিকি দেখাইয়াই চিত্ত আকর্ষণ করিতে চায়, তখন, (বিশেষতঃ, উহার রহস্য পাঠকের চক্ষে ধরা পড়িলে) তাদৃশ কবির কিংবা লেখকের সংসর্গ পদেপদে ক্লেশকর হইতে থাকে। সংপ্রতি ইয়োরোপে, যখন সাহিত্যে-শিল্পে সর্ব্বত্র, প্রকৃত-বাদের (Naturalism) আদর্শ ই প্রবল হইতেছে, তখনই এরূপে, ভণ্ডভাব, কষ্ট-কল্পনা, ভাসা-ভাসা ছলনা এবং পাঠককে প্রবঞ্চনাকরার একটা 'চোখ-দেখা' হুজুগেই আমাদিগকে পাইয়া বসিতেছে! যে কবিতা জীবন হইতে, বা কোনরূপ-সত্য কিংবা অর্থের সম্পর্ক হইতে যত অধিক দূরবর্ত্তী হইতে পারে, অথবা অর্থের উপরে অবগুণ্ঠন পরিয়া যতই মেয়েলী ভাব দেখাইতে চাহে, তাহার মাহাত্ম্য ততই যেন গভীর এবং অলৌকিক বলিয়া মনে করার একটা 'ঝোঁক' আমাদের মধ্যে পূজা লাভ করিতেছে! নিঃসঙ্কোচে বলিব, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে একটা সবিশেষ 'রোগ' এবং দীনতার

লক্ষণ। এইরূপ রুগ্নচরিত্রের সংখ্যা এখন যে অগণ্যভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ভালমন্দ যাহাই হোক, ভাবগত-কবিতা যে আধুনিক খণ্ডকাব্যের একটি প্রকারভেদ, তাহা আমরা স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। এবং ইহাতে যে কোন বিশেষ যোগ্যতা কিংবা শিক্ষা-সাধনা অথবা তপঃ-খেদের আবশ্যক নাই, তাহাও বর্ত্তমানের দৃষ্টান্ত মধ্যে দেখিতেছি! বঙ্গীয় যুবকগণের হৃদয় এ পন্থাটিই অতর্কিত কর্ম্মালস্তে অবলম্বন করিয়াছে; এবং অধিকাংশেই কবিকীর্ত্তি নিতান্ত সহজলভ্য মনে করিতেছে! সুতরাং, অনেক লেখকের শক্তিই যে বিক্ষিপ্ত হইয়া নিষ্ফল হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি!

ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের এবং নিশ্চিত নিপাতের পন্থা! গত বিশবৎসরের বঙ্গসাহিত্য উহা সকল দিকে প্রমাণ করিবে। বঙ্গসাহিত্যে এমন শক্তিধর এবং সৌভাগ্যজন্মা পুরুষ কে আছেন, যিনি এই বিপত্তি হইতে সমুচিত দৃষ্টান্তে বঙ্গ-সাহিত্যকে রক্ষা করিতে পারেন! এই ভণ্ডতা,

বর্ত্তমানের দোষ-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র পাল।

এবং ভাবোন্মত্ততা, এই Prettiness বা 'মেয়ে মুখো' এবং 'মুখ চোরা' ভাবই যে সাহিত্যে শালীনতা বা ভব্যতার একান্ত লক্ষণ নহে, উহা কথায়-কার্য্যে প্রমাণিত করিতে পারেন! আমাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এ দোষ ন্যূনাধিক পরিদৃষ্ট, বলিলে অত্যুক্তি হয়না। তবে, ইহা ক্ষণিক; এবং সাহিত্যের ইতিহাসে, কেবল বর্ত্তমানের বিবেচনা-ক্ষেত্রেই ইহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। অবশ্য, বর্ত্তমান নামক পদার্থটি সকলকালেই কিছুনাকিছু দোষাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। আর বিশ বৎসর মধ্যেই হয়ত বঙ্গসাহিত্য এ দোষ সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিবে; অযোগ্যগণ তাঁহাদের সমস্ত দোষ সহ মিলাইয়া যাইবেন; কেবল বিশিষ্টগণই আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। সাহিত্যে কেবল

দোষক্ষালনের উদ্দেশ্যে সমালোচকের পক্ষে কোনও কালে ব্যক্তিগত কিংবা অতিরিক্ত রূঢ়তা অবলম্বন করার আবশ্যক নাই; মহাকালই সুস্থির স্নেহহস্তে এ ব্যাপার সমাধা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানের দোষটুকুই যেমন সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তেমন, উহাই স্বয়ং দোষের পরিহার বিষয়ে বিশ্বগতির সহায় হয়। ফলতঃ, বর্ত্তমানের নানা দোষবিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল কথায়-কার্য্যে এ বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, সুস্পষ্ট ছবি-গ্রহণের শক্তি, ঋজুতা, বাস্তব-বুদ্ধি এবং প্রমোদ-আনন্দের পরিচয় আছে, যাহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কবিগণের মধ্যে দুর্ল্লভ! গদ্যের ক্ষেত্রে, একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই উহার প্রাক্‌ভাস লাভ করিতেছি। এ সমস্ত গুণও সাহিত্য-লোকে পরম মহার্ঘ! এই গুণ-সমষ্টি যথোচিত মতে প্রমূর্ত্ত হইলে, কবিকে পাঠকের হৃদয়ে অমরপদবী প্রদান করিতে পারে! বলিতে কি, দ্বিজেন্দ্র লাল নানাদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। ঋজুতা, বস্তু-ভিত্তি এবং ভাবসংযম, এ সমস্ত 'ক্লাসিক' আদর্শের কাব্যশিল্পের প্রধান শক্তি। দ্বিজেন্দ্র লাল এই ক্লাসিক আদর্শে পরিচালিত হইয়াই, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের অত্যন্তপ্রবল অস্পষ্টতা আদর্শের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; উচিত উপযুক্ত সময়েই করিয়াছিলেন। এককালে, জর্ম্মন সাহিত্যের ভাবুক বা রোমাণ্টিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, কবি হায়েন যাহা সমাধা করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের সমক্ষেও সে প্রকৃতির সমস্যাই উপস্থিত ছিল! কিন্তু; এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অসহায়; এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের উদ্যোগ-শক্তি কিংবা অস্ত্র-সম্পত্তিও পর্য্যাপ্ত ছিল না। তবে, এই বিদ্রোহ ঘোষণার ফল উত্তরোত্তর শুভদায়ী হইতেছে।

ফলতঃ, এই ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক বা বস্তুগত এবং ভাবগত আদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রের দুইটি অত্যন্তদিক্ প্রদর্শন করিতেছে; এবং বর্ত্তমানের বঙ্গসাহিত্য শেষোক্তেরদিকেই অতিমাত্রায়'ঝোঁক' দেখাইয়াছে। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে, ক্লাসিক প্রতীচ্য এবং রোমাণ্টিক প্রাচ্য। প্রণিধান করিলেই দেখিব, খ্রীষ্টধর্ম্ম, অপিচ হিব্রু সাহিত্য ইয়োরোপে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্মিলন ঘটনা করিয়াছিল। এই সম্মিলনফলে, ইয়োরোপে দান্তে গ্যেঠে শীলার শেক্ষপীয়র হুগো প্রভৃতির সম্ভব হইয়াছে। প্রতীচ্য আদর্শের সহিত সম্মিলন এবং সামঞ্জস্য ব্যতীত, কোন প্রাচ্য সাহিত্যের কিংবা বঙ্গসাহিত্যের ও কদাপি শ্রেয়ঃ নাই। তাহারই অনুকূল-বায়ু বহিতেছে! বস্তুতঃ, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যের ক্ষেত্রে * কাব্যশিল্পের একটা প্রধান শক্তির অধিকারী। কিন্তু, তাঁহার অভ্যুন্নতি, আন্তরিকতা, সংযম এবং দর্শন-শক্তি, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান ভাবতত্ত্ব-গত সমুন্নতি বা রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তিতার হিসাবে প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত ছিলনা। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষিত এবং ভাবুক বঙ্গবাসীর মনে যথোচিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে এবং নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন! তাঁহার অনতিগভীর সরস ঋজুতায় বঙ্গসাহিত্যের পাঠক সাধারণ সবিশেষ উপকৃত হইতেছে।

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক সাহিত্যাদর্শ।

* আর্য্য গাথা (১৮৮২); Lyrics of Ind (১৮৮৬); এক ঘরে (১৮৮৭) আষাঢ়ে (১৮৯০); আর্য্য গাথা ২য় ভাগ (১৮৯২); কল্কি অবতার (১৮৯৬); বিরহ (১৯০০) পাষাণী, ত্র্যহস্পর্শ (১৯০১) হাসিরগান (১৯০২) প্রায়শ্চিত্ত, সীতা, মন্দ্র (১৯০৩); তারাবাই (১৯০৪) রাণা প্রতাপ (১৯০৫); দুর্গাদাস; Crops of Beagirl (১৯০৭) নুরজাহান (১৯০৭); মেবার পতন; Lessons in English; আলেখ্য; সোরাব রুস্তম (১৯০৮) প্রভৃতি।

কবিত্বশক্তিই সাহিত্যের জননী এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের মূল শক্তি। এই কবিত্ব শক্তির (বা পরিকল্পনা ও দর্শন শক্তির) গতিকেই সাহিত্যের গতি। উহার গতিকেই সাহিত্যের সৃষ্টি, স্থিতি, পরিণতি এবং মৃত্যুও সংঘটিত হইয়া থাকে। এই কারণে, আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের যোগ্যতা অতিক্রম করিয়াও এ আলোচনা করিয়া আসিলাম। ফলতঃ, আলোচনা কোন অংশেই পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা উপস্থিতমতে কেবল সঙ্কেত করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতেছি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র লাল উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বে এবং স্বাতন্ত্র্যেই স্থায়িত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে, 'যোগেশ' প্রণেতা ঈশানচন্দ্রের নাম ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস তুচ্ছ করিতে পারে না। মহিলা কবিগণের মধ্যে 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রীর কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা রমণী-জন-সুলভ অনুচ্চ কমনীয় সুরে বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। এই কবি এবং স্বর্ণ কুমারী দেবীই বঙ্গসাহিত্যে মহিলা-প্রভাবের সূচনা করিয়াছেন। তবে, আমাদের সমাজবন্ধনের ফলে রমণী জাতি সাহিত্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছেন না। ইয়োরোপীয় সমাজে রমণীশক্তি বিগত শতাব্দীতেই প্রভূত হইয়া যাহা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত না হইলেও, উহার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র বঙ্গীয় রমণীজাতি এ সাহিত্যের জন্য করিতে পারেন নাই। এই দিকে একটা প্রধান অভাবই থাকিয়া যাইতেছে।

এতদ্ব্যতীত, অক্ষয়কুমার বড়ালের (বিশেষতঃ তাঁহার 'এষা'র) কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস, এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের কতিপয় নাতিশীতোষ্ণ এবং নর্ম্মতরল, অথচ গার্হস্থ্য জীবনের শোনিততাপোজ্জ্বল উল্লাস, বঙ্গসাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছে। অক্ষয় যেমন কোন-কোন দিকে রবীন্দ্রের, তেমন দেবেন্দ্রনাথ ও নবীনের ভাবাত্মিকতা লাভ করিয়াই, উহাকে খণ্ডকবিতার ক্ষেত্রে

ন্যূনাধিক বিক্ষিপ্তভাবের আনন্দরসে অনুসরণ পূর্ব্বক বিশিষ্ঠতায় উপনীত হইয়াছেন। এই সূত্রে, শশধর রায়ও হেমচন্দ্রের পথেই নিজের স্বাতন্ত্র্যে উপস্থিত হইতে চাহিতেছেন। বিপিন বিহারী নন্দী প্রাচীন 'ইতিহাস' লেখক কবিগণের পথে, এবং নবীন-দ্বিজেন্দ্রের মধ্যপথে, আর্য্য-আদর্শের শৌর্য্যবীর্য্য মহত্বের কথাকে ন্যূনাধিক আধুনিকভাবেই বাঙ্গালী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহিতেছেম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দেশবিদেশের গীতি-কবিতার তীর্থসলিল এবং তীর্থরেণু বঙ্গবাণীকে উপহার দিতেছেন। বিশেষতঃ, ইনি রবীন্দ্রনাথের গীতি-চিত্রগত কবিতার আদর্শকে ছড়ার ক্ষেত্রে ধারণা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব প্রকৃত বাদ এবং বাস্তবিক প্রণালী অবলম্বনেই আকার দান করিতেছেন। অল্পায়ুঃ রজনীকান্ত সেনও বাঙ্গালার সঙ্গীতসরস্বতীকে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের মধ্যপথে আনয়ন পূর্ব্বক বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বলিয়াই মনে হয়।

নব্যসাহিত্যের স্বল্প অমুষ্কাল মধ্যেই কয়েকজন অল্পায়ুঃ কবি আমাদিগকে গভীর অনুশোচনায় রাখিয়া গিয়াছেন। অল্পায়ুঃ কবিগণের মধ্যে বলেন্দ্র-নাথ ঠাকুর যেমন কবিতাকে প্রাচীন ভর্ত্তৃহরি এবং কালিদাসাদির পথে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনি, বাঙ্গালী-চাটার্টন সতীশচন্দ্র রায়ের কোরক-হৃদয়ের মধ্যেও প্রাচীন অগ্নিহোত্রীগণের প্রজ্জ্বলিত হোমশিখার আভাসই লক্ষ্য করিতেছি! রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যে'র পর হইতে, একদিকে 'নিবেদন' কবিতার, বা ন্যূনাধিক 'ধর্ম্ম' তরফের স্তুতি-আরতি এবং বন্দনা-জাতীয় কবিতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু 'নিবেদন' কবিতার প্রধান শক্তি এই যে, আপনাকেই অকৃত্রিমভাবে নিবেদন করিতে হয়; নিজের ভাবে এবং ভাষায়, নিজের হৃদয়টাকেই

(১) অপরিহার্য্য বলিয়া বোধ হওয়ায়, কয়েকজন জীবিত লেখকের নাম মাত্র করা গেল; পরন্তু তাঁহাদের নামোল্লেখ বা আলোচনা কোন অংশেই সম্পূর্ণ এবং পর্য্যাপ্ত নহে।

অনাবৃত করিতে হয়। কোনরূপ 'শেখা মন্ত্র' 'পড়া বুলি' অথবা কেবল 'ধর্ম্ম বুলি'র জন্যও সাহিত্যে স্থান নাই। পরন্তু, এ ক্ষেত্রে ৺ নিত্যকৃষ্ণ বসুর স্বল্পপরিমিত হৃদয়-নিবেদনের মধ্যে এক অপরূপ সাধুতার—সুতরাং পবিত্রতার রসই লাভ করিতেছিলাম। এই সকল কবি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া আত্মপ্রসার এবং আত্মপ্রাপ্তি সিদ্ধি করিতে পারিলে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করিতেন। তবে, কোন কবির আদিম লক্ষণের দ্বারা, জন্মস্বত্ব অথবা জন্ম-পত্রিকার দ্বারা, শেষের কথা কিছুই স্থির করা যায় না। ফলে, নরলোকে কবিত্বকে যে 'দুর্ল্লভ' বলা হয়, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ সম্ভাব্যতাকে অবলম্বন করিয়া নহে। শেষের প্রাপ্তি বা সাফল্য-কেই লক্ষ্য করিয়া! বিশ্বের ব্রহ্মা মনুষ্য-হৃদয়ে হোমাগ্নি-সেক পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত পরিবেষ সংঘটন করিয়া দেন, উহারাই শত্রুমিত্র উভয়ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে যেমন ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিতে তেমন নির্ব্বাপিত অথবা সন্ধুক্ষিত করিতেও চেষ্টা করে! জীবনের কোন্ অবস্থায় কাহার কি হইত স্থির করার কিছুমাত্র উপায় নাই। একের অমৃতই অন্যের পক্ষে গরল হইতে পারিত! দীর্ঘায়ুঃ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও, সংসারে মনুষ্যের পক্ষে স্বকীয় চরমার্থ লাভ করা কত কঠিন! দুর্ল্লভকে লাভ করিয়াও, রক্ষা করিতে পারাই কত শক্ত! যিনি পারেন, নির্ম্মম-নিরপেক্ষ ইতিহাস কেবল তাঁহার নামটারই হিসাব রাখে!

উক্ত সমস্ত লেখকগণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের 'রবীন্দ্রযুগ' অনেক দিকে বাধিত হইয়া, অপিচ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াও, নবতর জীবন-দীপ্তির সূচনা করিয়াছে; স্থলবিশেষে সম্পূর্ণ পৃথক্ দিব্যমূর্ত্তিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

এই স্থলে, বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ অভাব এবং দৈন্যের দিকেই (অপিচ রবীন্দ্র যুগের অপর একটা প্রধান কারণের দিকেই) দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতেছি ; উহা, অনুবাদের অভাব ! এ অভাবের গতিকেই বঙ্গসাহিত্য সকল দিকে উন্নত সাহিত্যের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতেছে না। বৃহৎ-বিস্তারিত বা উচ্চগভীর ভাব-তত্ব এবং সৌন্দর্য্যকে প্রমূর্ত্ত করিবার জন্য নিরলঙ্কার সামর্থ্য, ঋজুতা অথবা সবলতা বঙ্গভাষার এখনও প্রকৃতিসিদ্ধ হয় নাই। অন্ততঃ, পাঠকগণের মতিরতি এবং রুচিবুদ্ধি উচ্চাঙ্গীয় কবিত্বের গ্রাহক হইবার জন্য সম্যক্ প্রস্তুত নহে ! প্রকৃত মাহাত্ম্য বিষয়ে, এ সাহিত্য এখনও নানাদিকে 'আপ্রেণ্টিস' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কতকগুলিন সাধারণ 'বোল চাল' লইয়াই আমরা কোলাহল করিতেছি বই নহে। ওই সাহিত্যের মহৎ বস্তু-বিষয় কিংবা বিস্তারিত আদর্শ আমরা এখনো যথোচিত মতে গ্রহণ করিতে বা বুঝিতেও পারিতেছি না। উহাও রবীন্দ্র যুগের হেতু ; অশিক্ষা এবঞ্চ কুশিক্ষাই হেতু ! বাহ্যিকভাবে যেমন ইয়োরোপীয় বীরাচারের, ধর্ম্মনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি এবং সভাসমিতি প্রভৃতির অনুভাবে ভাবুক হইয়া বাঙ্গালী 'ইয়ংবেঙ্গল' হইয়া লাফালাফি করিতেছিল ; সাহিত্যেও সেইরূপ একটা ভাক্তবুদ্ধি, অভিমান এবঞ্চ অজ্ঞতার বশেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে কিংবা ব্যাপকভাবে কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। ভাবুকের পক্ষে মৌলিকতার অভিমান কত সহজ তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ভাবুক জগতের এবং জীবনের বস্তু-বিষয়ে প্রমত্ত ; এবং প্রমত্ত বলিয়াই নানাদিকে অন্ধ ! যথোচিত বিষয়ার্থে ভাবকে 'ব্যক্ত' করিতে না পারিলে, সত্য কিংবা সৌন্দর্য্যকে আকারিত করিতে না পারিলে, গ্রাহকের অনুভব-ক্ষেত্রে উহাকে স্থিরতা প্রদান করিতে না পারিলে, উহা অকিঞ্চিৎকর—উহার শিল্পগৌরব নাই—শিল্প-'রস' নাই। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন আলংকারিকের উক্তি শিরোধার্য্য—"ব্যক্তঃ স তৈ বিভাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রস স্মৃতঃ"। সাহিত্যে ওইরূপ দৃঢ়-নিরূপিত

শিল্পের দৃষ্টান্ত দুর্লভ সন্দেহ নাই; দুর্লভ বলিয়াই অনুবাদ অপরিহার্য্য হইয়া আছে। পরকীয় সাহিত্যের মহাজন-ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। যেমন জগতে, তেমনি সাহিত্যে, মহৎ ব্যক্তি-বিশেষের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-শক্তি আর দ্বিরাবর্ত্তন করে না; উহা মহৎ জীবনের অতুলনীয় সিদ্ধি। দ্বিতীয় কালিদাস, দ্বিতীয় শেক্‌সপীয়র বা সফোক্লিস, দ্বিতীয় গ্যেঠে বা দ্বিতীয় হুগো জন্মাইবে না; তাঁহাদের শিল্প বস্তুর প্রতিকৃতি ব্যতীত অন্য সাহিত্যের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাদের শিল্পের ভাবতত্ত্ব, সৌন্দর্য্য কলার কিংবা দার্শনিকতার সংক্ষিপ্তসার অথবা বিবৃতি বুঝিয়া লইলেই যথেষ্ট হইল না; শিল্পের ক্ষেত্রে পণ্ডিত কিংবা দার্শনিক ব্যক্তিকে চিরকাল বলিতে পারা যায়—"বক্তুং সুকরমিদং দুষ্কর মধ্যবসাতুং"। শিল্পের ক্ষেত্রে, কর্ম্ম-কৃতি কিংবা সৃষ্টির হিসাবে দার্শনিকের আসন চিরকাল সাধারণ। প্লেটো, অরিষ্টোটল, কাণ্ট্, হেগেল টায়ন, সেণ্টবুভ বা ডাউডেন কোনমতে ফাউষ্ট-হেমলেট বা শকুন্তলা, মেঘদূত রচনা করিতে পারেন না; অন্য কোন কবিও পারেন না। কারণ, সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পই অদ্বিতীয় শিল্পি-জীবনের অদ্বিতীয় তাপসী সিদ্ধি। সুতরাং, উহার যথাযথ অনুবাদ ব্যতীত অন্য সাহিত্যের উপায় কি? এই অনুবাদের কার্য্যকারিতা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। তাই, আমাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দিক্‌বিস্তৃত বিশ্বতোমুখ পন্থার বিষয়ে এখনো উদ্বুদ্ধ নহে। আমরা কেবল মৌলিকতার স্বপ্নে এবং অভিমানে অযথা স্ফীত হইতেছি মাত্র। বঙ্গসাহিত্যের অনুবাদ সম্পত্তি কোন বিভাগেই গণনীয় নহে। এ ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙ্গালীর গুরুস্থানীয়। দুঃখের বিষয় আমরা গুরু-দীক্ষা সম্পূর্ণমতে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কথা উঠিতে পারে, ইংরাজী যখন বঙ্গীয় সাহিত্যিকের দ্বিতীয় ভাষা, এবং ইংরাজীর মধ্যে

যখন বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, তখন অন্ততঃ ইংরাজীতে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর পক্ষে অনুবাদের আবশ্যক নাই। এই আপত্তি তুচ্ছ। ইংরাজী গ্রন্থের রসবোধে বুদ্ধির যেই ধারা কার্য্য করিয়া থাকে, মাতৃভাষার গ্রন্থে কদাপি তাহার আবশ্যক করে না। মাতৃভাষার সাহায্যে কোন বস্তুকে সমক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেই বোদ্ধার প্রকৃত লাভ; উহাই প্রকৃত উপার্জ্জন। ইংরাজীতে বুঝিয়া, প্রকৃত উপার্জ্জন উপপন্ন করিতে কোটির মধ্যে গুটিকেও পারেন না। বঙ্গসাহিত্যের অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বকার ইতিহাস— মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস, এ সত্যই খ্যাপন করিতেছে! ইংরাজী-শিক্ষিতের নিকট যেই অর্থ ইংরাজীতে উক্তি-মাত্র সুবোধ্য হইয়া পড়ে, উহা বাঙ্গালায় বলিলেই অনেক স্থলে তাঁহার 'চক্ষুঃস্থির' হইয়া যায়। সমুচিত শব্দ-শক্তি শিক্ষার অভাবেই এ বিপদ্ ঘটে। এ স্থানেই আমরা বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত অভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব! বঙ্গভাষা এখনও মনুষ্যমনের সমস্ত ভাবপ্রকাশে ঋজু শক্তি লাভ করিতে পারে নাই! পরকীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অর্থের প্রতিকৃতি মুখামুখি গ্রহণ করিতে না পারিলেই, ভাষার শক্তি লাভ হয় নাই, ধরিতে হইবে। প্রকৃত অনুবাদের অসদ্ভাবে এবঞ্চ চেষ্টার অভাবেও এ দোষ ঘটিতেছে! জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি সংস্কৃতসাহিত্যের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তথাপি, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে মনে হয় না। কেন না, সংস্কৃত ভাষার যাহা শক্তি তাহা ন্যূনাধিক বঙ্গভাষারও প্রকৃতি সিদ্ধ। সংস্কৃত শব্দ-অভিধান এবং বঙ্গাভিধানের মধ্যস্থলে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নাই। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের যশস্বীগণের অর্থ-সেবা এবং শক্তি-চর্য্যা বঙ্গভাষার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। অথচ এ ক্ষেত্রে কেহই যথোচিত মতে উদ্বুদ্ধ নহেন। বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদ প্রাচীন গ্রন্থ গুলি রক্ষা পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু, বঙ্গভাষার প্রাচীন সম্পত্তি এই সাহিত্যের পক্ষে স্বসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানের গ্রন্থকারগণ উহার শক্তি-নির্ভরেই দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহাদিগকেই অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীনগণের আত্মা জীবিত রহিয়াছে! সুতরাং, প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথি এ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-গৌরব বর্দ্ধনে পর্য্যাপ্ত হইলেও, ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে উহাদের সবিশেষ সার্থকতা নাই। অনুবাদ ব্যতীত, অন্ততঃ ওই পথে সাহিত্য-জগতের উপার্জ্জিত শিল্পসম্পত্তির সম্যক্ অধিকার ব্যতীত, এ সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য-ভাণ্ডার যেমন ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠকের, তেমন লেখকদের শক্তি-সাধনা কিংবা দৃষ্টান্তের পরিজ্ঞান-বিষয়ে সকল দিকেই অপ্রচুর। কেবল সাহিত্য-গ্রন্থের অনুবাদ কেন, ইয়োরোপের আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস গ্রন্থাবলীর সমুচিত অনুবাদ, এবং এতদ্দেশের ঘরেঘরে প্রচলন ব্যতীত, তাহার সাহিত্য-উন্নতির আদর্শ ও কোন দিকে অবাধ হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত কাব্যাদি ব্যতীত বঙ্গসাহিত্যে সংপ্রতি এক নব জাতীয় 'খাঁটি' দেশীয় কবিতার জন্ম হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র দাস আধুনিক বঙ্গের বার্ণস! বহু কবিতার মধ্যে আমরা তাঁহার স্বভাবিক শক্তির পরিচয় পাই। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রত্যক্ষপ্রভাব হইতে বহুদূরে, আধুনিক বঙ্গের গ্রামদেশে, এই অযত্ন-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত-পটু স্বভাব-কবির উদ্ভব। নবীনচন্দ্রীয় ভাবুকতাও কার্য্য করিয়াছে। গীতি কবিতার অস্পষ্ট,অসমাপ্ত সঙ্কেত এবং স্বল্পনিশ্বাসযুক্ত প্রকাশকে স্পষ্টবিস্তারিত করিয়া প্রদর্শন করাই এ কবিতার লক্ষণ। প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের শেষেই বাক্য বিশেষের 'পুনরুক্তি' আছে; এবং ছন্দের প্রকৃতি মধ্যেও একপ্রকার পুরাতন একটানা গতি আছে। মান কুমারী প্রভৃতি এই আদর্শে

কবিতা লিখিতেছেন। এ সকল লেখক যেই ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কবিতা লিখিতে বসেন, কবিতার গতি সহকারে তাহার কোনও উন্নতি বিবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেবল চক্রভ্রমীর ন্যায় একই ভাব বিভিন্ন শব্দসহকারে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকে! চক্রের ঘর্ঘরে, উৎপতনে, নিপতনে বিস্তর কোলাহল উপস্থিত হয়। মনে হয়, প্রভূত পরিশ্রম এবং আকুলতার ব্যয় হইতেছে, তথাপি উপযুক্ত পরিমানে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা দূরেই রহিয়াছে!

এইরূপ কবিতার অবলম্বিত ছন্দঃপ্রণালী অতি প্রাচীন। যখন মানব ভাবের কিংবা শব্দের শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তখনি এইরূপ ব্যাবৃত্তি-বহুল বাক্যবিন্যাস প্রচলিত ছিল। আবার, এই সমস্ত কবিতায় আধুনিকসাহিত্য-সঙ্গত কোন উচ্চ আদর্শ নাই। একমাত্র আপনাকে অবলম্বন করিয়া—নিজের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, আপদ-বিপদ প্রভৃতিকেই মূল উদ্দীপন স্বরূপ রাখিয়া, কাবতা লিখিতে বসিলে সে কবিতা কদাচিৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এ সকল কবিতা প্রায়ই অসম্পূর্ণ এবং অসংযত; পরন্তু, ব্যক্তিগতিক সহানুভূতির উদ্রেকেও সমধিক শক্তিশালী। রবীন্দ্রযুগের সমসূত্রে গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাও বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে প্রাকৃতবাদ প্রবর্ত্তিত করার সাহায্য করিয়াছে।

আকারপ্রকারে প্রাচীন কাব্য-আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী আধুনিক আবির্ভাব—উপন্যাস, কথা বা গল্প। গল্প কথা আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রবল লক্ষণ। সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সংপ্রসারণের সঙ্গেসঙ্গে গত দুই শতাব্দীতে ইয়োরোপে গল্পকথা বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে। ফলতঃ, অদ্যতাবৎ বাণীশিল্পের (কাব্য নাটক সঙ্গীতের) পরাভব করিয়াও সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং সাহিত্যের বাজার

উপন্যাস।

দখল করিয়া বসিয়াছে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, উহাদের কোন বিশেষ মৌলিক, সংযমযুক্ত,ঐক্যনিষ্ঠ, বা উচ্চ সাহিত্যসঙ্গত আদর্শ নাই। প্রতিভাবান্ কবিগণের বরিষ্ঠ শিল্পকৃতিসমূহের গহন ঘনরসকে তরল কোমল কিংবা ফেনিল করিয়া উপস্থিত করাই উহাদের লক্ষ্য। অধিকাংশই বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজের যুবকযুবতীকর্ত্তৃক যৌননির্ব্বাচনের সহায়তা কল্পেই লিখিত। বস্তুতঃ, যুবক-জীবন এবং অবিবাহিত জীবনকে মুখ্যভাবে উদ্দেশ্য করাই এ সমস্ত গ্রন্থের উদ্যম প্রকটিত এবং বিবাহ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পরিসমাপ্তি। এতদ্ভিন্ন, গ্রন্থের রীতি, আকাঙ্খা বা যোগ্যতা বিষয়ে কোন সাধারণ আদর্শ নাই; প্রত্যেকের আদর্শই স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায়। সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত চরিত্র-রীতির চিত্র-অঙ্কনে নিযুক্ত থাকিয়া, অনেক সময় উলঙ্গ প্রাকৃতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক বিপুল লিপি-বাহুল্যে অধ্যায়ের পর অধ্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই, এ সকল গ্রন্থ পরিণয়ে পরিশিষ্ট হইয়া পড়ে। কখন বা, দর্শন এবং সন্দর্ভের প্রণালীতে মনস্তত্ব এবং সমাজতত্বের বিশ্লেষণকেও লক্ষ্য করে। বলিতে গেলে, ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি মানুষের যাবতীয় জ্ঞানকর্ম্ম-বিষয় নানামতে এই গল্প কথার মধ্যে উপস্থিত হইয়া, লোকায়ত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক জনসাধারণের হৃদ্য-আকারে প্রকটিত হইতেছে; এবং পাঠান্তেই অনেকস্থলে পরিত্যক্ত হইয়া বিস্মৃতি-তলে নিমগ্ন হইতেছে! সময় সময় প্রতিভাবান্ কবিগণও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লেখনী চালনা করিতেছেন। সাহিত্যশিল্পের স্থায়ী চেষ্টা, উচ্চ-গভীর বিভাবনা, বস্তু ও ভাবের সামঞ্জস্য, মিতাচার, তনুতা,সৌষ্ঠব কিংবা মাহাত্ম্যের হিসাবে এ সকল গ্রন্থ কদাচিৎ অসামান্যতা লাভ করিতেছে; এবং উহারা তদনুরূপ কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও রাখে না। যে-কোন উপায়ে, বিশেষতঃ, কেবল প্রকৃতবাদ, ভূয়োদর্শন পরীক্ষা এবং ব্যাখ্যার অবলম্বনে প্রীতিকর বা interesting হইয়া

কাল হরণ করিতে পারিলেই যেন এই গল্প-কথা চরিতার্থতা লাভ করে। যাহাই হউক,এই গল্প কথা আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ সূচনা করিতেছে ; এবং সমাজের দিক হইতে নানামতে উহার সাফল্য আছে। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং পুরাণের আখ্যায়িকা লক্ষণের সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য আছে। বঙ্কিম প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বর্ত্তমানেও, রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ এই ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। অবশ্য, নবেলের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোন সবিশেষ নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে,কিংবা ভারতীয় পদ্ধতিকেও স্বকীয় প্রতিভাসঙ্গমে সাহিত্য-জগতের লোভনীয় করিয়া উপস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমের নাটকীয় গুণ, দৃঢ়নিয়মিত ঘটনা-সৃষ্টি, স্থির-সংযত নিবেশ-শক্তি, মাংসপেশী-বহুল চরিত্র-অঙ্কন, কিংবা চমৎকারী অবস্থার ধারণা তাঁহার নহে ; তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রও ইতিহাস কিংবা field of high romance নহে। তৎসত্ত্বেও, 'নৌকাডুবি' তাঁহার একটি কবিত্ব-সুন্দর পারিবারিক উপন্যাস। এতদ্ভিন্ন,তাঁহার 'চোখেরবালি'ও'গোরা' প্রভৃতিও, আধুনিক ইয়োরোপের বহু-প্রচলিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপন্যাস ধারাকে ন্যূনাধিক প্রকৃত-বাদের পথে বর্ত্তমান বাঙ্গালী-জীবনের অবস্থাক্ষেত্রে আনয়নপূর্ব্বক, মৃদু সঙ্কেতময় ভাবুকতা, ভাষার চিত্র-সামর্থ্য এবং অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছে! বিষয়-নির্ব্বাচনের দরুণ তন্মধ্যে সমুন্নত কবি-কল্পনা বা বিভাবনার জন্য কোন অবকাশ নাই। কিন্তু,রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট ভাবুকতা প্রকাশ পূর্ব্বক উহারা পাঠকের এবং জিজ্ঞাসুমাত্রের অপরিহার্য্য হইয়া গিয়াছে। তবে,এই নবেলের ক্ষেত্রেই সংপ্রতি কয়েকজন মহিলা, কোন কোন দিকে বাঙ্গালী হিন্দু-পরিবারের বিশেষত্ব ধারণায় অতুলনীয় ভূয়োদর্শন এবং বিভাবনা-শক্তির সমন্বয় পূর্ব্বক নামিয়াছেন

বলিয়াই মনে হইতেছে! সংখ্যায়, শক্তিমত্তায় কিংবা প্রসার-বিষয়ে এখনো ইয়োরোপীয় কথা-সাহিত্যের সহিত তুলনীয় না হইলেও, এই উপন্যাস নানাদিকে বঙ্গভাষায় প্রবল হইয়া পড়িতেছে! বাঙ্গালীর নব বিস্তৃতিশীল সমাজ এবং জাতীয় জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস এই গল্প-কথার মধ্যেই নানা দিকে রচিত হইতেছে। ভবিষ্যতের বঙ্গ সাহিত্য, এই ন্যূনাধিক বিক্ষিপ্ত গীতিকবিতা এবং উপন্যাস-কথা হইতেই স্বকীয় জীবন-তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক দেদীপ্যমান হইবে, আশা হয়।

সংপ্রতি, গল্প-কথার ক্ষেত্রেই এক সুসিদ্ধ সাহিত্যশিল্প দেখা দিয়াছে। যেমন কাব্যে সূক্ষ্ম শিল্প খণ্ড কবিতা; তেমনি, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম-শিল্প ক্ষুদ্র গল্প। উহাও ইংরাজি ফরাসি এবং জর্ম্মণ সাহিত্যের সৃষ্টি। প্রাচীন থিওক্রাইটাস এবং বোকাসিয় প্রভৃতির পন্থায় এই সৃষ্টি সমাধা হইয়াছিল। আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি 'পো' সর্ব্বপ্রথম ক্ষুদ্র গল্পকে আধুনিকতার ক্ষেত্রে মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন; এবং উহার কলা-মূর্ত্তি (technique) পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও, গীতিকবিতার ন্যায় ক্ষুদ্র আয়তনের অভ্যন্তরে ভাবগত সঙ্কেত এবং অসীমতা ফুটিয়া উঠিতেছে; মানব-জীবনের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই তন্মধ্যে জীবনের দায়িত্ব, বীজ-নির্ভর এবং নিয়তি-কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। এক কথায়, উহার আদর্শ এবং লক্ষ্যও পূর্ব্বকথিত খণ্ড কবিতার ন্যায় অসীমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ গল্পের প্রভাব মানবের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের জটিলতার সঙ্গেসঙ্গে দিনদিন বাড়িয়া উঠিতেছে!

ক্ষুদ্র গল্প।

এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতিকবিতার 'অকথিত কথা' এবং 'অসমাপ্ত গানের' সঙ্কেত-লক্ষণ ক্ষুদ্র গল্পেও সুস্পষ্ট। তিনি বস্তুগতিক উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধিলাভ

করিতে পারেন নাই, আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার দৃষ্টি ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব-দর্শনেই সবিশেষ পটু। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে, মানবচরিত্র-অধ্যয়নের গভীরতায়, তাঁহার অনেক গল্প সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ হইবার উপযুক্ত। এই সমস্ত গল্পে বঙ্গীয় গদ্যের বর্ত্তমান উচ্চতা ও বুঝিতে পারা যায়।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশ মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মাসিক পত্রে এইরূপ ক্ষুদ্র গল্প ও গদ্য কথা লিখিতেছেন। তাঁহাদের রচনাতেও স্থানেস্থানে প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণ লক্ষিত হইবে। সুতরাং, আশা হইতেছে, বঙ্গভাষাও কালে এইরূপ গল্প এবং উপন্যাস সাহিত্যের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাপানী সাহিত্যের প্রভাবও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। এসিয়ার জাপান স্বসিদ্ধ ক্লাসিক আদর্শের সহিত আধুনিক ভাব-তত্ত্বের অতুলনীয় সঙ্গতি ঘটন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব গল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি জাপানী আদর্শে প্রবুদ্ধ হইয়া, উহার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিতেছেন।

সঙ্গীত সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র কলা হইলেও, ক্ষুদ্র গল্পের পর বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গীতের দিকেই সর্ব্বাগ্রে মন আকৃষ্ট হয়। বঙ্গে সাহিত্যের লক্ষণযুক্ত সঙ্গীত-সম্পত্তি ও নিতান্ত অল্প নহে। প্রাচীন

সঙ্গীত।

বৈষ্ণবগণের সঙ্গীতকবিতা এবং রামপ্রসাদ ও নিধুবাবুর সঙ্গীতের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। এইসূত্রে গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন, বর্ত্তমান কালেও বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রেমসঙ্গীত দিয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত ইয়োরোপীয় গীতিকবিতার আদর্শে রচিত; সুতরাং, স্ফুট রসোদ্রেক অপেক্ষা ভাবসঙ্কেতেই উহাদের সবিশেষ লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ভাবের উদ্দীপক ও বিরাট

পুরুষের মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক ; এবং ঐ গুণে সঙ্গীত-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের ভারতীয় 'যোগ'-মূলক ধারণায় এবং আন্তরিকতায় চিরঞ্জীব প্রভৃতি সাধু-সাধকগণের সঙ্গীতও বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে। রজনীকান্ত সেন এবং রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতি রঙ্গালয়ের নেতৃগণের নিকট হইতেও আমরা কয়েকটি সঙ্গীত পাইয়াছি। এই সমস্ত গান পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের প্রভাব, মিশ্র সুর, ভাবুকতা এবং ভাবের ছায়াত্মক অবভাসে বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যে আসন প্রাপ্ত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গানে বঙ্গের সঙ্গীত-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন! বিশুদ্ধ হাস্যরসে ভাষার চপলগতি ও আকস্মিক বিস্ফুরণ, উভয়ের আবশ্যক। হাস্যরসপ্রকাশের উপযোগী হইলেই ভাষা কত দূর সমর্থ হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ও মনসার ভাসানে কবিগণ হাস্যরস উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের পর, কবিওয়ালাগণ, বিশেষতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নানা অস্বাভাবিক উপাদানের সাহায্যে হাস্যরস-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে, প্রথমতঃ দীনবন্ধুর উচ্চ হাস্যই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। পরে সেই হাস্য বহু-পরিমাণে মধুর এবং মসৃণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মধ্যে ভদ্রসমাজের উপযোগী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রকৃত হাস্যরসের কবিতা রবীন্দ্রনাথ যেমন "মানসী"তে লক্ষ্য করিয়াছেন ; তেমন দ্বিজেন্দ্রলালও প্রতিভাবলে উহাকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন।

হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত।

বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভাই স্ফুর্ত্তিলাভ করিতেছিল। কেবল হাসির গানে বা কৌতুক-রচনায় নহে ;

অন্যত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল "পাষাণী" নামে যে নাটক লিখিয়াছেন, সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিতে পারা যায়। 'পাষাণী'র চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনার সন্নিবেশ, ভাষার প্রয়োগ ও নাটকীয় সমাধান বিবেচনা করিলে, এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গসাহিত্যে কোনও নাটকে ইতিপূর্ব্বে একাধারে এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় নাই। তবে, বলা উচিত যে, এতসমস্ত সত্বেও 'পাষাণী' একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটক বই নহে। দ্বিজেন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিও গদ্যে রচিত হইয়া কাব্যশক্তির প্রধান অবলম্বনটুকু পরিহার করিয়াছে; পদ্যে রচিত হইলে উহাদের সমাধান কি হইত বলা দুরূহ! তবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহাদের মধ্যে কোন অসাধারণ কবিত্ব বা বিভাবনার পরিচয় না থাকিলেও, উহারা লৌকিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে! দ্বিজেন্দ্রের বর্ণতুলিকা ঐতিহাসিক পরিবেষ-ধারণায় কিংবা 'আব্ হাওয়ার' সৃজন বিষয়ে পটুতা না দেখাইলেও এ সমস্ত নাটকের মধ্যে অনেক সজীব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থায়ী ভাবের সমাধান বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রের কণ্ঠ সর্ব্বত্র বিস্তারী, সুস্থির কিংবা গভীর না হইলেও, এবং স্থানে স্থানে গ্লানিকর চাঞ্চল্য দেখাইলেও, উহা স্ফুট-সমুজ্জ্বল রস-বর্ণনার ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যে দীর্ঘকাল অনতিক্রান্ত থাকিবে। এই কবির দার্শনিকতা, ভাবুকতা, কিংবা প্রসাধনের নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, মনে হয়, জীবনের পরিব্যাপ্ত বস্তু-ধারণায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সমস্ত বঙ্গীয় লেখককেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুলির মধ্যে, অনেকগুলি পরম্পরিত সংস্করণ মাত্র হইলেও, উহাদের ব্যক্তি-সংখ্যা কম নহে। ইহাও নিশ্চিত যে, সাহিত্যে মাহাত্ম্য পরিমাপের সময় ক্রিয়াফলের বিস্তৃতি বিশেষ কিছুই নহে; গভীরতাই

নাট্যকাব্য।

মাহাত্ম্যের পরিমাপক। নিজের সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে হইলেও, রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে যে সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রের মধ্যে নাই; এবং উহাতেই রবীন্দ্রের বিশিষ্টতা! প্রমীলা কিংবা শচী চরিত্রের সমুন্নত কাব্য-ধ্বনি, শৈলজার ভাবোন্মত্ত মনস্বিতা কিংবা চিত্রাঙ্গদা-বিনোদিনীর ভাবুকতা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাই; ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-ধারণাও নাই; মনুষ্য জীবনের সূক্ষ্মতম সমস্যাসমূহের ধারণা-বিষয়েও দ্বিজেন্দ্র হয়ত পটু নহেন। তথাপি, দ্বিজেন্দ্রের অনেকগুলি চরিত্র লৌকিকতার ক্ষেত্রেই যে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়া সহানুভূতি অর্জ্জন করিতেছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গসাহিত্যে পূর্ব্বে নাটক রচিত হয় নাই, এমন নহে। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ টাকুর, মনোমোহন বসু, মতি রায় প্রমুখ যাত্রাওয়ালাগণ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি রঙ্গাধ্যক্ষগণ, এবং ক্ষিরোদপ্রাসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহাদের নাটক কোনও কোনও অংশে সুখপাঠ্য হইতে পারে; কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক বা ইয়োরোপীয় নাটকাদির সহিত উহাদের তুলনা হইতে পারে না। প্রকৃত নাট্যকাব্যের আদর্শ, গতি কিংবা পরিণতি, এই সমস্ত নাটকে নাই। সাহিত্যের সর্ব্ববিধ রচনা অপেক্ষাই নাটক-রচনা কঠিন। নাটকে কবিত্ব-শক্তি অর্থাৎ সৃজনী ও দর্শনী শক্তির সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের বিভাবনার সমন্বয়, সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য-চরিত্রের সহিত কবির সহানুভূতি এবং লোকচরিত্র-জ্ঞান, হৃদয়ের উদারতা, ভাবে তন্ময়তা, ভাব প্রকাশের শক্তি এবং সংযম, ঘটনা-সৃষ্টির সামর্থ্য, অবিশিষ্ট কিংবা সাধারণ বিষয়ের পরিহার, ব্যঞ্জিতার্থময় ঘটনা-সন্নিবেশে নৈপুণ্য, এবঞ্চ সমগ্র নাটকের একত্বনিষ্ঠ ফলক্রুতির সমাধান বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও চমৎকারিত্ব বিধায়িনী প্রতিভার আবশ্যক হয়। এইরূপ

বহুমুখী প্রতিভার অভাবেই আমাদের সাহিত্যে নাটক পুষ্টিলাভ করিতেছে না।

ইয়োরোপের অনেক বড়বড় কবি এই নাটক রচনা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বলিতে গেলে, প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজী ও স্পেনীয় ভাষাই প্রকৃত নাট্য শিল্পের গৌরব করিতে পারে। আধুনিককালের সুইডেন, নরোয়ে, জর্ম্মনী, বেল্‌জিয়ম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে সামাজিক সমস্যা-অবলম্বন পূর্ব্বক নাঠককে এক স্বতন্ত্রপথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিস্তারিত চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; কিন্তু, উহা এখনো কাব্যশিল্পের বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রতিভাশালী রবীন্দ্র নাথও নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার নাটকগুলি আমাদের দুর্গা প্রতিমার মত; সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাঙ্গতার চাক্‌চিক্য —সকলই আছে, নাই কেবল প্রাণ! এত জাঁকজমক, এত বর্ণনার পারিপাট্য সাহিত্যে অল্প নাটকেই আছে। কিন্তু, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য এবং অন্তরতম পদার্থটির অভাবে যেন সমস্ত বিফল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত আমাদের প্রকৃত সহানুভূতি হয় না; মনে হয়, একটাও যেন প্রকৃতিস্থ নহে! সকলেই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত; এবং সঙ্গীত-ভাবাক্রান্ত বাক্য-বিন্যাসের জন্য একান্ত ব্যাকুল! বাঙ্গালার অন্য সমস্ত নাট্যকাব্য সৌন্দর্য্য-বিষয়ে রবীন্দ্র নাথের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। পরন্তু, উহাদের মধ্যেও উক্ত সমস্ত দোষ অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। তবে, এই স্থলে সাহিত্য-সেবিগণের দৃষ্টি একটা অপরূপ ঘটনার দিকেই আকর্ষণ করিতে পারি। প্রকৃত কবি মাত্রেই সতর্ক বা অতর্কিতভাবে আত্ম-সমালোচক; এবং অন্তরে-অন্তরে জানিতে পারেন যে, এক কবির যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, উহা তাঁহার জীবন-তরুর অতুলনীয় ফল বলিয়াই, অপরের নহে। রবীন্দ্র নাথ ক্রমে যেন বুঝিতে

পারিয়াছেন যে, সেক্‌সপীয়রীয় বা সফোক্লীয় নাটক লিখিয়া সাফল্য লাভ তাঁহার অদৃষ্ট নহে! এই স্বানুভব হইতেই পরে পরে, কবির স্বকীয় জীবনের অতুলনীয় ফল, রাজা ও ডাকঘর আমরা পাইয়াছি! উহারা নাটকের কথা-বার্ত্তার প্রণালীমাত্র রক্ষা করিয়াই—অবশ্য, ইয়োরোপীয় 'সিম্বোলিষ্ট' গণের পথে—তত্ত্বএবং ভাবুবকতার ক্ষেত্রে প্রতিপদে সঙ্কেতবার্ত্তা উপস্থাপন পূর্ব্বক নিজের মাহাত্ম্য সিদ্ধ করিয়াছে! উহাদের মূল প্রাপ্তি নানাদিকে কবির নিজস্ব সিদ্ধি; এবং উহারা আপন মাহাত্ম্যেই উজ্জ্বল!

আমাদের রঙ্গালয়গুলি নৃত্য গীত ও আমোদ বিলাসের গৃহ। সেস্থানে অভিনয় উদ্দেশ্যে প্রস্তুত নাটকগুলিও সুতরাং, সাহিত্য হইতে দূরগত এবং বিকৃত রুচির পরিচায়ক। উহাদের মধ্যে, ভাষার সৌন্দর্য্য, গঠনের কারুকার্য্য বা জীবিত চরিত্রের সমাবেশ, কিছুই অবারিত নহে। দেশের সাধারণ লোকও যেন 'পুতুলের নাচ' দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে; জীবিত মনুষ্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না; তাহারা সত্য কিংবা সৌন্দর্য্যের বস্তু অপেক্ষা সুর বেশী ভাল বাসে; সহজ এবং স্বভাবানুগত দেহলীলার পরিবর্ত্তে কষ্টশিক্ষিত অঙ্গবিভ্রম ভালবাসে; হৃদয়ে অনুভব না করিয়াই 'বাহবা' দিবার জন্য লালায়িত হয়। তাই, আমাদের নাটকও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছে। সামাজিক মণ্ডলীর পরিব্যাপ্তভাবে অভ্যুন্নতি ব্যতীত, সাধারণ অভিনেয় নাটকের উন্নতি কদাপি সম্ভব হয় না। ফলতঃ, এ ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্র লাল যে বঙ্গীয় নাটককে অনেক দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালার লোকশিক্ষকগণের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

এস্থলে, আধুনিক সাহিত্যের অপর একটা লক্ষণও কিঞ্চিৎ চিন্তা করা উচিত। উহা নানামতে প্রাচীন 'ক্লাসিক' আদর্শের হানি এবং

আধুনিক সাহিত্যের হানি ও অপচয়।

বশ্যতাপন্না হইতেছেন। বাণি-পুত্রগণের মহৎ দারিদ্র্য,স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। এই দারিদ্র্য এবং লৌকিক ঋদ্ধি বিষয়ে ন্যূনাধিক বৈরাগ্য, মহৎ জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। উহার বশেই কবিগণ সাধারণের আদর্শানুগত্য বা লৌকিক দাক্ষিণ্য হইতে মুক্ত থাকিয়া, স্বকীয় জীবনাদর্শের সুমেরুশিখরে, অনেকসময় পরম রিক্ততার নগ্নগৌরবেই অবস্থান করিয়া, আত্মসিদ্ধি ও অমরত্ব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন! প্রাচীন কালের কাব্যগুলির মধ্যে, আমরা অনেক সময়েই কবিগণের এই অনন্য আত্ম-নিষ্টা, সংযম এবং আদর্শনিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হই! এ কালে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও সমাজ-গতির ফলে, কবিগণ ভ্রান্ত এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া যেন লোক-প্রতিষ্ঠা লাভেই মুখ্যভাবে চেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন! যেমন বলিয়াছি, সাহিত্য ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং, উচ্চতা এবং সমুন্নতি হইতে, অপূর্ব্বতা কিংবা অসামান্ততার ভূমি হইতে, কে কতনিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক ‘আসর জমাইতে’ পারেন, সে দিকেই যেন সকলের দৃষ্টি লাগিয়া আছে! এই অবস্থায়, সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ যাহা উন্নতি হইতেছে, সময়ে সময়ে যে দুই-এক-জন "দিশাহারা বাতুল" মাথা তুলিতে পারিতেছেন, ইহাই পরম পরিতোষের বিষয়। এ ক্ষেত্রে, আমাদের দ্বিজেন্দ্র লালের, বিশেষতঃ ফরাসী সাহিত্যের অনুপম থিওফাইল গঁতিয়েের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি! গঁতিয়ে নানাদিকে আমাদের রবীন্দ্র নাথের সমধর্ম্মা। ত্রিশ বৎসর অক্লান্তভাবে কবিতা. ক্ষুদ্র গল্প, উপন্থাস এবং দার্শনিক প্রবন্ধের দ্বারা ফরাসীজাতির মন মুগ্ধ করিয়াও, সাহিত্যের বিশিষ্ট-কৃতির ক্ষেত্রে গঁতিয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণের চক্ষে যেন সাধারণ হইয়া আছেন! সাময়িক

সাহিত্যের আদর্শ এবং সংসর্গই উহার প্রধান হেতু, বলিতে হইবে। যত বড় প্রতিভাই হউক, সামান্যতার সংসর্গ হইতে দূর-ক্ষেত্রে, অন্য-নিরপেক্ষ এবং ঘন-সংযত স্বাতন্ত্র্যের মন্দিরে যোগ-সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে, পরিণামে একদিন সকলের সমস্তকার্য্যই সাধারণ হইয়া, অবিশিষ্ট হইয়া, এবং অন্যকর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে! এই রূপে এক কালের পরম মহার্ঘই পরবর্ত্তী কালের সাধারণ হইয়া যাইতেছেন।

এ সমস্ত কারণে সকল দেশেই প্রকৃত সাহিত্যশিল্পের গ্লানি ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সবিশেষ অধঃপতন ঘটিয়াছে নাটকের, বা প্রাচীন নাট্য কাব্যের। কথা এবং উপন্যাসাদি যেমন লোকানুবর্ত্তন করিতেছে, নাটকও সুখবোধ্য এবং সুখাভিনেয় হইতে গিয়াই সাধারণের দাস্য অবলম্বণ করিয়াছে। ইয়োরোপের একদল সাহিত্যিক এখন প্রাকৃতের অনুকরণকেই সাহিত্যের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া, কথায় কার্য্যে প্রচার করিতেছেন। ফরাসী লেখক বেলজাক, জোলা (Emille Zola) প্রভৃতি ইঁহাদের নায়ক। প্রাকৃত সত্যবাদ ও সাধারণের উপভোগ্যতার হিসাবে বর্ত্তমান গদ্য-নাটক একদিকে অগ্রসর হইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে কাব্যশিল্পের উচ্চ আদর্শের সম্পূর্ণ হানি হইয়া গিয়াছে! তন্মধ্যে প্রকৃত গৌরবের পদার্থ অল্পই মিলিতেছে! নাটক এই হৃত অধিকার কখনো ফিরিয়া পাইবে কিনা সন্দেহ। তবে, এ দেশে দশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ন্যূনাধিক অপ্রকৃত অথচ নিম্নস্তরের লৌকিকতাকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া নাটক নিম্ন হইতে নিম্নতর নিরয়েই চলিয়াছিল; ক্ষিরোদ প্রসাদ, বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্র লাল উহাকে রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্র লালের গদ্য নাটকগুলি অভিনেয় আকারে উপাদেয় উপন্যাস বা কথা ব্যতিরিক্ত যেন আর কিছুই হইতে পারে নাই। দ্বিজেন্দ্র লালও যেন উন্নত সাহিত্যকে

নাট্য সাহিত্যের গ্লানি।

উদ্দেশ্য না করিয়া, অথবা, লোকানুবৃত্তিই সাহিত্যের একান্ত কার্য্য মনে করিয়াই চলিতেছিলেন!

শ্রেষ্ঠশ্রেণীর নাটকের প্রধান লক্ষণ, একদিকে মনুষ্যজীবনের স্থায়ী ভাবযুক্ত অবস্থার এবং মৌলিক বস্তু-ঘটনার উপস্থাপন (representation); অন্যদিকে, সমস্ত ভাবক্রিয়ার অতীত পদার্থের সঙ্কেত এবং সন্দীপন (interpretation); একদিকে, প্রকৃতের অনুকৃতি (imitation) এবং অন্যদিকে বিভাবনা বা বিশেষোক্তি (idealization), এই উভয় প্রণালীর সমন্বয়। এই কারণে, নাটক যেমন চরিত্র-এবং-বস্তু-প্রধান; তেমনি, ভাব-এবং-তত্ত্ব-প্রধান; সর্ব্বোপরি নাটক একতা-সম্বদ্ধ এবং শিল্পীর প্রয়োগ-উদ্দেশ্যযুক্ত কাব্যগ্রন্থ! এই সূত্রে, নাটকের শিল্প-আদর্শ বিষয়ে হ্যাজলিটের ভাষায় বলা যায়—"The greatest Art is to conceal art" মহামতি রস্‌কীনের ভাষায় বলিতে পারা যায়, সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মাত্রেই লিপি-প্রকৃতিক, আলাপ-প্রকৃতিক নহে—a book is essentially a written thing, not a spoken thing. এ আদর্শেই ন্যূনাধিক জাগ্রৎ-ভাবে প্রাচীন কাল হইতে কাব্য এবং নাটক রচিত ও বিচারিত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য এই আদর্শে এখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

চিরকাল সভ্যসাহিত্যে এক শ্রেণীর গ্রন্থকার অভ্যুদিত হন, যাঁহারা সাহিত্যের প্রতিভাবান্ কবিগণের আবিষ্কৃত সত্য এবং সৌন্দর্য্যকে লোকায়তভাবে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের রচনা সাহিত্যের হিসাবে সম্যক্ উচ্চতা লাভ করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহারা নিজের অভীষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ লোক-প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা দেশের সাধারণ্যমধ্যে মহত্ত্বের সংবাদ এবং মহিমা সঞ্চালিত করেন। তবে, সাহিত্যের বিচারক্ষেত্রে তাঁহাদের শতশত অসম্পূর্ণ, অসংযত, অসংহত এবং অসিদ্ধ প্রয়াস অপেক্ষাও

একমাত্র সুসিদ্ধের গৌরবই অধিক। উভয় কবি-কৃতিত্বের মধ্যে ফল-বিষয়ে অনন্ত ব্যবধান রহিয়াছে! কবি এবং অকবির মধ্যেও প্রকৃত-প্রস্তাবে এই অনন্তের ব্যবধান! সুসিদ্ধ শিল্প-কৃতির সমুন্নত-সংযত ঐক্য-সমন্বয় এবং অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যেই সাহিত্যের গৌরব। সাহিত্যজগতে এইরূপ গৌরব-প্রতিষ্ঠার রহস্য বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন—সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ট, শকুন্তলা, মেঘদূত ও উত্তরচরিত প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলে উহা তন্মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হইয়া যায়: বিশ্বের সাহিত্য-সভা তাহার দিকে দৃক্‌পাত ও করে না! এভরেষ্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরির দ্বারাই যেমন সমগ্র হিমালয়শ্রেণীর উচ্চতা-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমন, অন্যদিকে উহাদের ছায়াতেই অপরসমস্ত শিখরারণ্যের জাতি-মাহাত্ম্যও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে! জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি কিংবা কাব্যবিশেষের প্রতিষ্ঠাও সমগ্র জাতি-পরিবেষের জন্যই প্রগুণফলপ্রসূ হইয়া থাকে! আবার, সাহিত্যে কাব্যবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্তও সংস্কৃতসাহিত্য হইতেই গ্রহণ করুণ—মহানাটক। মহানাটকের স্বতন্ত্র শ্লোকগুলির সৌন্দর্য্য-সম্পৎ অপরাপর সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা অনেক অধিক, বলিতে পারি। এ ক্ষেত্রে উত্তরচরিত বা শকুন্তলাকেও আমরা বাদ দিতে চাহিতেছি না। কিন্তু, সাহিত্যশিল্পের পূর্ব্বোক্ত আদর্শে মহানাটকের স্থান কোথায়? উহার ভাবুকতা এবং বস্তুর মধ্যে অনুমাত্র সৌষ্টব-সামঞ্জস্য কিংবা নাটকীয় একত্ব নাই—এক কথায়, এই নাটকের প্রাণ নাই। বস্তুতঃ, উহা আদ্যন্ত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভাবুকতায় পূর্ণ। এই কারণে সংস্কৃত নাটকশিল্পের তালিকায় মহানাটকের নাম নিম্নে পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য এ হিসাবেই এখনো প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিও উন্নত আদর্শ পায় নাই। বিশুদ্ধ হাস্যরসে সামাজিকের মন তুষ্ট হয় না। তাই অমিশ্র ঠাট্টা, পরের কুৎসা,

হাস্যরসাত্মক নাটক।

অথবা কোনও নবপ্রচলিত রীতি-নীতির অবলম্বনে বিপরীত 'ভাঁড়ামির' সৃষ্টি হয়, এবং তাহাই দর্শকগণকে অধিক আমোদ দিয়া থাকে। বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া হাস্যোদ্রেক করাই রঙ্গালয়ের নাট্য-কোবিদগণের 'আর্ট' বা কলাকৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ শ্রেণীর নাটকেও প্রকৃত হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

সাময়িক পত্রিকাগুলি, বিশেষতঃ 'সাহিত্য' পত্রিকা দেশে ইতিহাস-আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছে; ও বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ইতিবৃত্ত-রসের জন্য একটা স্থান হওয়ায়, এই দিকে বাঙ্গালীর চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করার জন্য একটা সুবিধা লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু, এই সমস্ত ইতিবৃত্ত-চিন্তকের অনেকের মধ্যেই কোনরূপ সাহিত্য-আচার বা Styleএর দিকে লক্ষ্য না থাকায়, তাঁহাদের সংসর্গবশে সাহিত্য-আদর্শের অপচয় টুকুও অপরিহার্য্য হইয়াছে। বিশেষতঃ, সাময়িক পত্রিকার দ্বারা প্রভূত অপকার হইতেছে কবিতার। কবিগণ

সাময়িক পত্রিকা।

আপাত-যশে লোলুপ হইয়া এবং এই দিকে আত্মবিজ্ঞাপনের সুযোগ পাইয়া, মাহাত্ম্য-সাধনার গূঢ়-তপোবন পরিহার পূর্ব্বক একেবারে বাজারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা-পাঠে মনে হয়, কবিতা-সুন্দরী যেন নিতান্ত তাড়াতাড়ি অসংযত ও অসংলগ্ন বেশে প্রকাশ্যতায় আসিয়াছেন! পাঠকগণ তাহা দেখিয়া তুষ্ট হন না, এবং কবিরও গৌরব নষ্ট হয়।

অনেকস্থলে, অনভীজ্ঞের পক্ষে কাব্য-সাহিত্যের আদর্শটাই ঘোলা হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে, এ সকল সাময়িকপত্রে প্রকৃত সমালোচনার একান্ত অভাবটাই পরিস্ফুট। সমালোচনা সাহিত্যের গতিনির্দ্দেশ করিতে পারে না, কিম্বা কোনও কবিকে সৃষ্টিকার্য্য শিক্ষা দিতে পারে না, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু সমালোচনা সাহিত্যকে দূষিত পথ হইতে নিবর্ত্তিত করে।

সমালোচনা।

বিশেষতঃ, সমালোচনা প্রতিভাকে আত্মজ্ঞান-লাভে ও সাহিত্যের আদর্শ পরিজ্ঞানে সাহায্য করে। দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিবরণী-সংবলিত একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু, সাধনায় রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনার কতিপয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে রীতির সমালোচনাও এখন আর হইতেছে না। এখন মাসিকপত্রের সমালোচনার কোনও মূল্য নাই। আমাদের দেশের সমালোচকগণের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে মনে হয়, এই দেশ সেক্ষপীয়র ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল ও বেকন, পিট এবং শেরিডানে 'কণায় কাণায়' পূর্ণ হইয়াছে। অনেকের ভাষা ভয়ানক অতিশয়োক্তিপূর্ণ ; তাঁহাদের প্রশংসা কিংবা নিন্দাও সীমাহীন এবং সর্ব্বগ্রাসী। আবার, এদেশের অনেক প্রবীন সমালোচকেও গ্রন্থের সাহিত্যগত দোষগুণের বিচার না করিয়া, কেবল অমুক কাব্য 'হিন্দু কাব্য' কি না, অমুক রচনা 'মনুসঙ্গত' কি না, ইত্যাদি আদর্শেই বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং সে ভাবেই সমালোচনা করিয়া নিরস্ত হন। বলা বাহুল্য, কেবল উক্তরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের আদর্শ জীবন্তভাবে সমাহিত হয়।

বলিতে কি, গ্রন্থ সমালোচনার নানা দিক আছে। গ্রন্থের আকৃতি প্রকৃতি, গ্রন্থের অংশের এবং সামগ্র্যের ভাব-সত্য-সৌন্দর্য্যবস্তুর বিকাশ,

গ্রন্থের অধ্যাত্ম গুণ, গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্র বস্তু, কবির জীবন-সম্বন্ধে বা কবির দেশকাল জাতি সম্বন্ধে গ্রন্থের সার্থকতা, গ্রন্থের সাহিত্য আদর্শে দোষগুণ, অলঙ্কার, রীতি, গ্রন্থ রীতির প্রাচীনতা কিংবা অভিনবতা, গ্রন্থ শক্তির সাধারণ ভাব বা মৌলিকতা, কবির মর্ম্মগত উদ্দেশ্য বা আদর্শের হিসাবে অথবা গ্রন্থটীর স্বকীয় আচরণের হিসাবে উহার সফলতা, ইত্যাদি নানাদিক হইতেই গ্রন্থকে দর্শন করিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত আদর্শদ্বয়ই একদিকে interpretative কিংবা appreciative criticism, অন্যদিকে impressionist criticisim নামে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত। ইয়োরোপে এই সমালোচনাই একটা স্বতন্ত্র শিল্প বা প্রতিভা-সৃষ্টির ন্যায় আদৃত হইয়া, লেখক এবং পাঠক উভয়পক্ষ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেছে। এইরূপ সমালোচনাই একটী স্বতন্ত্র দর্শন—কাব্য-দর্শন! উহাতে অনুরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে মনুষ্যমন প্রত্যহ নবনব আদর্শের দেশে, নবনব সত্য সৌন্দর্য্য এবং ভাবের দেশে, নবনব কবিচিত্তের অপরিচিত ঐশ্বর্য্যদেশে সংপ্রসারিত হইয়া বিশ্ব সাহিত্যের স্বরূপতত্ত্বে, উহার পরম বৃহত্ত্বে এবং মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হইতেছে! বঙ্গসাহিত্যে যেমন প্রকৃত সমালোচনার অভাবে, তেমন প্রকৃত আদর্শ জ্ঞানের অভাবেও সাহিত্য-রচনা কিংবা সাহিত্য-অধ্যয়নের জন্য কিছুমাত্র সৌকর্য্য-সুবিধা নাই বলিয়া, লেখক এবং পাঠক উভয়েই অন্ধভাবে পরিচালিত হইতেছেন! সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ কি, প্রাচীন বা আধুনিক আদর্শের উপার্জ্জন উদ্দেশ্য কিংবা যোগ্যতা কি, তাহার বস্তু পরিচয় মাত্র না করিয়া প্রকৃত ফল ভোগ করিতে পারেন সেরূপ ব্যক্তির ঘটনা বর্ত্তমান সমাজে অসম্ভব! এই অভাবের ফল বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে বিষময় হইতেছে। অযোগ্যের হস্তে পড়িয়া যাহা গুণ তাহাই বিদূষিত

ও অনাদৃত; যাহা দুর্লভ ও মহার্ঘ তাহাই উপহসিত; যাহা সাধারণ তাহাই পুরস্কৃত! তুলনা ব্যতীত প্রকৃত সমালোচনা নাই; বহুদর্শন ব্যতীত প্রকৃত তুলনা হইতে পারে না; আবার সহৃদয়তা ব্যতীত সমস্তই বিফল। বঙ্গীয় সমালোচনায় তিনেরই অভাব পরিদৃষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক পাঠকের মুদ্রিত গ্রন্থ বিষয়ে নিজের ভালমন্দ অভিমত প্রকাশ করিবার স্বত্ব আছে। কিন্তু, বহুদর্শন, সর্ব্বোপরি লেখকের প্রতি সহৃদয়তা পর্য্যাপ্তপরিমাণে অনুভব না করিয়া, কাহারও উক্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা কিংবা লেখনী ধারণ করা উচিত নহে। সাহিত্য হৃদয়ের রাজ্য, সহৃদয়তাই এ রাজ্যে প্রবেশ করার একমাত্র দ্বার—দক্ষিণ দ্বার। এই সহৃদয়তাকে আত্মসিদ্ধ না করিয়া, এ রাজ্যে প্রবেশে কাহারও অধিকার নাই। সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, উহাতে কোনরূপ অবজ্ঞা, ব্যক্তিগত উপহাস কিম্বা কলুষোক্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। প্রত্যেক লেখক এই প্রেমদরবারে সাধ্যমতে উপঢৌকন দিতেছেন; স্বয়ং মহাকাল সদয়ভাবে সেই উপঢৌকন গ্রহণ করিতেছেন! যাহা যথাযোগ্য হইল না, তাহা নীরবে এবং অসূয়াবিহীন দাক্ষিণ্যে নিম্নগত ও অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! কাহার অদৃষ্টে কি আছে, কে নির্ণয় করিবে? কে নিশ্চিত মতে নির্দ্দেশ করিবে—কে যোগ্য—কে অযোগ্য? আবার, অযোগ্যের পক্ষে—ন্যূনাধিক অপূর্ণ প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষেই, স্বকীয় অযোগ্যতার স্বগত অনুভবটিই কি পর্য্যাপ্ত নহে? প্রত্যেক মনুষ্যই স্বকীয় মর্ম্মগত আদর্শের ক্ষেত্রে কৃত কার্য্যের অযোগ্যতা অনুভব করিয়াই দগ্ধ হইতেছে—বাহিরে যাহাই প্রকাশ করুক! মনুষ্য জীবনের এই সত্যগুপ্ত হা-হুতাশটিই কি পরস্পর-কারুণ্যলাভে পর্য্যাপ্ত নহে?

বর্ত্তমান গল্প সাহিত্য এবং উহার শক্তির আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে, এইমাত্র বলা আবশ্যক যে,

বঙ্গীয় গদ্য ক্ষুদ্র গল্প, উপন্যাস, জীবনবৃত্ত, এবং ঐতিহাসিক-সামাজিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মন পুলকিত হয়। বাঙ্গালা গদ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণ, বিশেষতঃ, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রভৃতি বক্তৃতায়, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রামপ্রাণ গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ইতিহাসে, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত, তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তারাকিশোর চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, বিনয় কুমার সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিজয়রত্ন বসু প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থে এবং বিবিধ প্রবন্ধাদিতে, বঙ্গসাহিত্যকে নবনব শক্তি-সামর্থ্যে বলীয়ান্ করিয়া আসিয়াছেন। তবে, অনেকের মধ্যে যে, সাহিত্য-ভাষার রীতি, সাহিত্য-আদর্শ বা সাহিত্য-আচার বলবান্ হইতে পারিতেছে না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের নিভৃত চিন্তা প্রভৃতির মধ্যে পদ্মানদীর ন্যায় উদাত্তগম্ভীর শব্দ-নিনাদ প্রকটিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি এবং 'পাঞ্চভৌতিক ডায়ারীতে' ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি এবং আকাশ তত্ত্বের সংমিশ্রণে যে ভাষা বহিয়াছে, উহা বঙ্গভাষার ঐশ্বর্য্যরূপে তাহার সাহিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন, অনেকের মধ্যে 'খাঁটি' বাঙ্গালার স্বল্প-নিশ্বাসী দ্রুতি এবং তীক্ষ্ণতাও মার্জ্জিতভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার শক্তি-পরিচয়-প্রার্থী ব্যক্তিকে চিরকাল ইঁহাদের সমক্ষে শিষ্যভাবে উপস্থিত হইতে হইবে। সত্য বটে, বাঙ্গালায় ধর্ম্ম, সমাজ

বাঙ্গালা গদ্য।

কিংবা দর্শন সম্বন্ধে কোন সমুচ্চ মৌলিক গ্রন্থ এখনও রচিত হয় নাই। তাহার কারণ, আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন বা সমাজের মূল শিকড় এখনো প্রাচীন সংস্কৃতের মধ্যেই নিহিত। সংস্কৃতের অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং টীকা টিপ্পনী করিয়াই সম্প্রতি বুঝিতে হইতেছে। কালে, পূর্ব্বপুরুষের উপার্জ্জন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া, বাঙ্গালী উহার সমসূত্রেই জগতের সমাজ ইতিহাস এবং বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে নিজের স্বতন্ত্র আসন যে অধিকার করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে নিরাশ হওয়ার কারণ নাই।

তথাপি, বলিতে হইবে, এখন যাবৎ বঙ্গীয় গদ্যের সমুচ্চ পরিণতি, কিংবা ইংরাজী ফরাসী বা জর্ম্মণ ভাষার গদ্যের সহিত সমকক্ষতা সিদ্ধ হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের পরকীয় কিংবা নিজস্ব সত্য এবং সৌন্দর্য্য বস্তুর ভাণ্ডার কোন বিশিষ্ট সাহিত্যের সমপরিমাণ হওয়া দুরের কথা, এখন যাবৎ তাহার সম-জাতিত্ব ও লাভ করিতে পারে নাই। বিশিষ্ট লেখনী সংখ্যার অভাবই উহার প্রধান হেতু। বাঙ্গালীর প্রতিভা আছে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিভা কোটী কোটী মনুষ্যসংখ্যার অনুপাতে, কি কর্ম্মশীলতায়, কি ঐকান্তিকতায়, কোন মতেই যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ, বাঙ্গালী লেখকের ভাবনা শক্তি অথবা উহার প্রসার তুলনায়, তাহার বস্তু-বুদ্ধি বা শিল্প-বুদ্ধি সমধিক দুর্ব্বল। জীবনে কিংবা জগদ্ব্যাপার বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা পরানুচিকীর্ষা, স্বাস্থ্য অপেক্ষা আলস্য-বিলাস, বিশ্বজনীনতা অপেক্ষা অতি সাধারণ বিষয়ে পর্য্যন্ত নিদারুণ সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতা, গাম্ভীর্য্য কিংবা শক্তির প্রয়োগ-নৈপুণ্য অপেক্ষা উচ্চচীৎকার এবং উল্লম্ফন, সংযম অপেক্ষা তারল্য এবং বাহুল্যই বরং অধিক বলশালী। কর্ম্মচেষ্টার তুলনায় তাহার জ্ঞান-বিবেক এবং দার্শ-নিকতার ঝোঁকটুকুই বরং অত্যন্ততা দোষে দুষিত। এ সমস্ত অত্যন্ততার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে, এ জাতি যেমন সংসারক্ষেত্রে তেমন

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে কদাপি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, ইহা বলাও বাহুল্য।

বাঙ্গালীর সমাজে এবং সাহিত্যে এখন যাবৎ বৈজ্ঞানিক যুগ বা বৈজ্ঞানিক আদর্শের প্রবর্ত্তনা হয় নাই। এই বিজ্ঞানকে আমরা সকল দিকে মনুষ্যের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করি। ধর্ম্মে এবং সমাজে সকল বিষয়েই মনুষ্যমন অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অতীতকালে এত প্রপীড়িত হইয়া আসিয়াছে যে, প্রাচীন ধর্ম্ম-তন্ত্রীয় সমাজ-আদর্শের দ্বারা যে প্রাচীন মনুষ্যজাতির যথেষ্ট উন্নতি বা মঙ্গল সাধিত হইয়াছে সে কথা শত শত বার স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, তদ্বারা দুঃখ-পাপ, আলস্য-তন্দ্রা, রক্তপাত এবং নিরয়-নরকের যতদূর সাহায্য হইয়াছে, উহার অনুপাত ও কোন অংশে কম নহে। বিজ্ঞানই (*বিজ্ঞান বলিতে ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি*) মনুষ্যের এই অন্ধতা অপনোদন করিতে সমর্থ! মনুষ্যমনের প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং মনুষ্যের পরমার্থ উভয়ই বিধান করিতে সমর্থ! এই বিজ্ঞান সকল সময় প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বরের *নামটি লইয়া নাচানাচি করে না বলিয়া, আমরা ইয়োরোপের অনেক ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর দেখাদেখি* 'বিজ্ঞান' নামটার উপরেই সবিশেষ 'চটিয়া' আছি। সকল প্রাচীন ধর্ম্মই আত্মরক্ষার্থে, কোন না কোন দিকে, বিজ্ঞানের অপবাদ রটনা করিতে বাধ্য। কিন্তু এই বিজ্ঞান গত দুইশত বৎসরের মধ্যে ইয়োরোপের অন্তরে-বাহিরে যাহা সমাধা করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, এসিয়া এতকাল পরম বিশ্বাসে ধ্যানস্থ হইয়া 'তাঁহাকে' প্রতিদিন ডাকিয়া আসিলেও যেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে ডাকে নাই। আমাদের সমস্ত ধার্ম্মিকতার মধ্যেই যেন একটা নিদারুণ

বঙ্গসমাজে বৈজ্ঞানিক যুগ প্রবর্ত্তনা লাভ করে নাই।

পাপ এবং অহঙ্কার কোথাও গুপ্ত থাকিয়া উহার সমস্ত নিষ্ঠার মহিমা হরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে, যেমন সংসার-ক্ষেত্রে, তেমন অধ্যাত্ম জগতেও, ইয়োরোপের পদানত করিয়া গিয়াছে! কোন অপরিজ্ঞাত এবং সর্ব্বনাশী শ্যেনপক্ষী যেন অতর্কিতে উহার সমস্ত সুধাটুকু হরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বিশ্বজগতের দ্বারদেশে কেবল ফকির সন্ন্যাসী এবং ভিখারী রাখিয়া গিয়াছে! চিরকাল 'নাম সত্য' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে কিছুমাত্র ডাকা হয়না, ইহা প্রকৃত আস্তিক্য বাদী এবং অনুসন্ধানী মাত্রের পরম চিন্তার স্থল। জগতের প্রত্যক্ষ-'নারায়ন'কে বা ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির সকল অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করিলে যে অব্যক্ত নারায়নেরও অবজ্ঞা করা হয়! বিজ্ঞানের মধ্যেও যে কোন দিকে গোঁড়ামী নাই, অন্ধব্যবহার যে একেবারে নাই, এমন কথা বলিব না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকাশ্যতা, প্রমাণ বাদ, এবং দিবালোক-প্রীতি যে আমাদের সমাজের স্বাস্থ্য পক্ষে এবং উদ্ধার পক্ষে সকল অবস্থাতেই কত উপকারী হইতে পারে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারক কখনও কথার দ্বারা শেষ করিতে পারেন না। আমাদের মতিগতি এবং রুচি এখনও মনুষ্যের প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তাকে পূজা করিতে যোগ্যতা লাভ করে নাই। উহার দরুণ বঙ্গসাহিত্যও অনেক দিকে সংকীর্ণতাগ্রস্ত হইয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে।

মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গসাহিত্যে শেলী-বায়রণ বা মিলটন-প্রকৃতির সাধক জন্মিয়াছেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী শক্তি সম্পন্ন কোন কবির জন্ম হয় নাই। সুতরাং শেক্স-পীয়রের হস্তে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য যেই অতুলনীয় সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, জীবনের ঘন-গভীর তত্ত্ব-রসে ওতঃপ্রোত হইয়া সর্ব্ববিধ অর্থ প্রকাশে যেই পুষ্কল ঐশ্বর্য্য এবং পেশলতা লাভ করিয়াছে, বঙ্গের অদৃষ্টে এখনও তাহা ঘটিতে

বিস্তারিত মানবত্ব সাধনের অভাব।

পারে নাই। শেক্সপীয়রের অন্তরাত্মা যেই অনুপম প্রচণ্ড শক্তি, এমন কি বর্ব্বরতার আশ্রয় করিয়া, অনির্ব্বচনীয় এবং অস্পষ্টতম অর্থ.কও অধিকার করিতে এবং ঘনমুষ্টিনিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছে, মনুষ্যের হৃদয়কে গভীর গভীরতর অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যেই সারস্বত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে, বঙ্গভাষা এখনো সেইরূপ পন্থার সম্যক পরিচয় পায় নাই। এই ভাষার শক্তি হয়ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভাব-তত্ত্বের সঙ্কেত করিতে, এবং সঙ্গীত তন্ত্রীর অনুরণ আশ্রয় পূর্ব্বক অর্থের মরীচিকা অথবা ইন্দ্রজাল সৃজন করিতে জগতের উৎকৃষ্ট ভাষার সমকক্ষ হইয়াছে; কিন্তু তদনুপাতে সুস্থ কর্ম্মঠ কিংবা মাংসল হইতে পারে নাই। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বৈষ্ণবীয় নৃত্যগীত-রীতি এবং সংকীর্ত্তন-পদ্ধতির অবলম্বনেই এ মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু, উহা কেবল স্বপ্নবিলাসের মাহাত্ম্য মাত্র, জীবন-বিলাসের নহে। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর জন্য সেই গুরুতর সাধনা এবং দায়িত্বই রহিয়াছে! বলা বাহুল্য, শেক্সপীয়র নাট্য-আদর্শের কবি। নাট্য-শিল্পের প্রধান দায়িত্ব, মানব হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর হইতে বৃহত্তম, মহত্তম এবং সূক্ষ্মতম স্থায়ী ভাবগুলিকে সমুচিত চরিত্র-মূর্ত্তি এবং ঘটনার সাহায্যে গভীর-গভীরতররূপে আকার দান! জাতি বিশেষের মধ্যে ঐ জাতীয় শিল্পীর সম্ভাবনা কেবল দৈবায়ত্ত নহে, সমগ্র সমাজকেই তৎকল্পে সাধনারত হইতে হইবে। প্রকৃত জীবন ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যলাভের সৌভাগ্য ঘটে না; হয়ত, এই সৌভাগ্য ঘটে না বলিয়া জাতীয় জীবনও বিস্ফারিত হয় না। বঙ্গসাহিত্য ভাবুক, তাত্ত্বিক বা দার্শনিক হয়ত পুরামাত্রায় জন্মাইতে পারিবে; কালে হয়ত বিশ্বসাহিত্যে এই ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন অধিকার করিতে পারিবে। কিন্তু মানবত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিশালতার ধারণা করিতে, এখনও শত শত বৎসরের একাগ্র সাধনা তাহার সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই সমাজে পাশ্চাত্য

জীবনানন্দ, এবং মনুষ্যত্বের সর্ব্বতোভদ্র প্রসারিতার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী-হৃদয়ের এই ভাবুকতা এবং দার্শনিকতা ক্রমে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে, আশা করিতেছি।

সাহিত্যে কোন বিশেষ ভাবুকতার বা বিশিষ্টতার গৌরব কেবল একদেশ আশ্রয় করিয়া, এমন কি সম্পূর্ণ অসামাজিক ভাবেও প্রকাশ পাইতে পারে। এই কারণে বিশিষ্টতা সাধারণের সম্পত্তি নহে; সাহিত্যের সাধারণ বিভাগের অন্তর্গত নহে। বর্ত্তমান কালে সভ্যজগতের সাহিত্য মধ্যে বৈজ্ঞানিক আদর্শের এবং সমাজতন্ত্রে ও নবীন-যুগ প্রবর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বত্র একটা সাধারণ অভ্যুন্নতি বা অধিত্যকা পরিচ্ছিন্ন এবং বোধ গম্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। মানবজাতির সাহিত্য মধ্যে, সাহিত্যিক মতি গতি, রুচি এবং মস্তিষ্কশক্তি বা বুদ্ধির একটা সর্ব্বসামান্য সমতল পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে! উহার নাম 'সাহিত্য সভ্যতা' দেওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যের কর্ম্মী মাত্রকেই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা এবং সাধনা ক্রমে সাহিত্যের ঐ সাধারণ সমতলে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়; উহার পরেই বিশেষত্ব সাধনার অবকাশ হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্য এখনও সকল দিকে সাহিত্যসভ্যতার ঐ সাধারণ সমতল টুকুও যেন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার দুই-চারিজন কবি, তত্ত্বানুসন্ধানী বা বিশেষত্বজীবী লেখক বিশেষ বিশেষ দিকে মহানুভবতা অর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার সাধারণ লেখক সম্প্রদায় এখনও তাহার ভাষার প্রকৃত শক্তি-পরিচয় লাভ করিতে, অথবা সাহিত্য-বুদ্ধির সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভ করিতেও যেন পারিতেছে না! সুপরিণত সাহিত্য-বুদ্ধির পরিচয় আমাদের সাহিত্যে এখনো সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় নাই। আমাদের জীবন-ধর্ম্ম-সমাজ

সাহিত্যের সাধারণ সমতল।

বঙ্গে তাহার অভাব।

এবং পরিবারের আদর্শে, জ্ঞান বিজ্ঞান এবং শিক্ষার আদর্শে, এমন কি অনুধাবনার প্রণালীতেও যেন এক বিরূপ এবং আত্মপুষ্ট সংকীর্ণতাই কার্য্য করিয়া গোড়ার দিক হইতেই সমস্ত 'বিগড়াইয়া' আসিতেছে। ইহা নিদারুণ দুর্ঘটনা বলিতে হইবে। ভিত্তি-পত্তনের মধ্যেই, অধ্যাত্ম্য ক্ষেত্রেই নিদারুণ দৈন্ত এবং অভাব থাকিয়া গেলে আমাদের আর আশা কোথায়? বাঙ্গালীর মনের স্বাভাবিক ভাবুকতা হইতে জন্মলাভ করিয়া, এই দোষ এখন বাতিকে, বাতুলতায় এবং পঙ্গুতায় পরিণত হইয়া তাহার সাহিত্যের সকল ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা গ্রাস করিতে বসিয়াছে! তাহার তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের লেখনী প্রতিপদে যেন মনোবাক্যের দুর্ব্বলতা এবং শিশুতাই প্রমাণিত করে; তাহার কবি-যশঃ-প্রার্থিগণের কণ্ঠ প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন একটা অভিমান, কপট কোমলতা, পর-পুষ্টি এবং অনার্জ্জব প্রকাশ করিতে থাকে! অধিকাংশেই যেন কিছুমাত্র শিক্ষা দীক্ষা এবং সাহিত্য-সভ্যতার জ্ঞানলাভ না করিয়াই রঙ্গভূমে দাঁড়াইতেছেন! অশিক্ষার পরম-পরিতুষ্ট অহংকারে, শ্রোতৃবর্গকেও সকল দিকে নিজের ন্যায় মনে করিতেছেন! পরিচয় লাভ মাত্র দুর্ভাগ্য পাঠকের মনোমধ্যে ইঁহাদের প্রতি যেন, (এই কপটতা এবং দুর্ব্ব্যবহার জনিত) একটা বিদ্বেষ এবং বিতৃষ্ণার ভাবই জাগিয়া উঠে; এবং উহাই প্রতি পদে মনোমধ্যে ঘনীভূত হইতে থাকে। লেখক কিংবা পাঠক কাহারও পক্ষে ইহার ফল কদাপি শুভজনক হইতে পারেনা। প্রতি পদে অন্তরটাকে খুলিয়া দেখাইবার জন্য অতি-প্রবল 'রোখ' দেখাইয়াও, *ইহাঁরা যে, পাঠকের স্নেহ লাভ করা দূরের কথা, দয়াটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন না,* তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! উহার প্রধান কারণ, ইহাঁদের মধ্যে একটা নিদানের অসামাজিক ভাব কার্য্য করিয়া সকল বাক্য-চরিত্র বিষাক্ত করিয়া দেয়। শত শত

আকুলতামিশ্রিত পৃষ্ঠা অতিবাহন করিয়াও এমন একটি কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে ইহাঁদের প্রতি অন্ততঃ ভ্রাতৃভাবের উদ্রেক করিতে পারে! বিপর্য্যস্ত চিত্ত-দৌর্ব্বল্য এবং ভাবোন্মত্ততাও এ দুর্ঘটনার হেতু।

পূর্ব্বোক্তমতে আত্মনিষ্ঠা এবং উচ্চজাতীয় সাহিত্য ও সমালোচনা প্রভৃতির অভাব গতিকেই এ দেশে সাধারণ পাঠক বা লেখকের মন বিশ্বের সাহিত্য-সভ্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে না। এ দেশে যেই টুকু সমালোচনা দৃষ্ট হইবে তাহা ভালমন্দ বিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহাদের অপর কোন কর্ত্তব্য কিংবা যোগ্যতা নাই, তাঁহারাই সাধারণতঃ সমালোচনার ভার গ্রহণ করেন বলিয়াই ধারণা জন্মিতে থাকে। উহা নানামতে একদেশদর্শিতায় সংকীর্ণ। বিশেষতঃ ভাল মন্দ বিচার মাত্রই চিরকাল আপেক্ষিক। আমাদের ভাবুকতার গতিকে এ কথা টুকুই অনেকের বোধগম্য নহে। যেমন,—অনেক সময় দেখিতে পাইবেন সমালোচক বলিতেছেন, ইংরাজী সাহিত্য এখন স্থগিত ভাব অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ উহার কিছুই উন্নতি হইতেছে না। ইহা শোনা মাত্র আমরা অমনি ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি বীতস্পৃহ হইতেছি! কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য কোন অবস্থায় আসিয়াই স্থগিত বলিয়া দেখাইতেছে; তাহার সাধারণ সমতল টুকু আরোহণ করিতেই আমাদের পক্ষে আরও কত বৎসরের আবশ্যক! কথাটা আমাদের মনেই আসিবে না। সমালোচকের মুখে, আমরা যেন 'ভাল মন্দ' দুটিকথার একটা 'চুম্বক' লাভ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। বলা বাহুল্য এইরূপে 'পরের মুখে ঝাল খাইবার' বুদ্ধি লইয়া সাহিত্যের যাত্রী হইলে পদেপদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়।

আবার, জাতীয় স্বাধীনতাই জাতীয় সাহিত্য-উন্নতির জননী। পরাধীন দেশের সাহিত্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করা দূরে থাকুক, তাহাকে পদে পদে

উপেক্ষিত, বিধ্বস্ত এবং হীনতাগ্রস্থ হইতে হয়। আমাদের সাহিত্যের আশা, উদ্যম ও পরিপুষ্টির সহিত রাজার প্রকৃত সহানুভূতি নাই। রাজার সহানুভূতি ব্যতিরেকে সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এ দেশের অন্য কোনও সাহিত্যসেবক সাহিত্যের জন্য সমগ্রভাবে প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গ সাহিত্যের অন্তরায়।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশের ভূমিতে 'বড়লোকে'র অভ্যুদয় অত্যন্ত বিরল। আমরা দেখিতেছি, আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি নিতান্ত ক্ষুদ্র; সমাজ সঙ্কীর্ণ; সহস্র বৎসরের অধীনতা-জন্য আবর্জ্জনায় এবং জঞ্জাল-জালে পরিপূর্ণ! এ সমাজ ব্যক্তিবিশেষের উন্নত জীবনের উপযোগী নহে। উহা লাভ করিতে হইলে, সমাজ গণ্ডীর বাহিরে আসিতে হয়; সংন্যাসী সাজিতে হয়। আমাদের সমাজ কেবল সাধারণের জীবনধারণের পক্ষেই উপযোগী। বাঙ্গালীর দারিদ্র্য, বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন, তাহার প্রবল ভাবুকতা-গ্রস্ত এবঞ্চ রক্ষণশীল 'ধর্ম্ম' 'জাতি' দেশাচার ও গ্রাম্যসমাজের আদর্শ, বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবার নিশিদিন তাহাকে নিপীড়িত নিষ্পিষ্ট করে, এবং তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে নিরন্তর উদরের অভাব জাগাইয়া রাখে! বঙ্গদেশের অনেক প্রতিভা এরূপে অত্যধিক প্রাচীনতা-নিষ্ঠ সমাজের ও পরিবারের অতিপ্রাচীন দেবমন্দিরের সম্মুখেই উৎসর্গীকৃত হইতেছে! তাই, সাত কোটী নর নারীর মধ্যে প্রতিভার এত 'আকাল' দৃষ্ট হইতেছে।

অপিচ, আমরা শিক্ষার জন্য যাহাদিগকে বিদেশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই, বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসে। সংসারে ডিপ্লোমার বিজয়নিশান উড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে, আমাদিগের শরীরমন কলেজগৃহের উত্তপ্ত এবং বদ্ধ বাতাসে নিঃশেষ হইয়া যায়;

সুতরাং, কেবল কঙ্কাল টুকু লইয়াই আমরা মধ্যজীবনে জগতের মধ্যাহ্ন কোলাহলে আসিয়া দাঁড়াই। বিদেশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদিগকে আশ্বস্ত করে নাই। বহু বৎসর হইল, এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি পড়িয়াছে; কিন্তু এ দীর্ঘকালের মধ্যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গীয় সাহিত্যে কেবল একখানি ছিন্ন 'ক্যালেণ্ডার' মাত্র পাঠাইয়া দিয়াছে; তন্মধ্যে ধূলিরাশির মতই অসংখ্য সংজ্ঞাবিহীন নাম বিকীর্ণ রহিয়াছে!

তথাপি, এই দুঃখদৈন্যের মধ্যেও বঙ্গভাষা যাহা সৃষ্টি, উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাও সামান্য আশাপ্রদ নহে। বাঙ্গালীর শক্তি কোথায়, বাঙ্গালী জগতের মধ্যে কোথায় দাঁড়াইবে, কোন পথে স্বকীয় পদবী খুঁজিয়া লইবে, বঙ্গসাহিত্যের এ বিকাশ হইতে অন্ততঃ তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী সাহিত্যের মধ্যেই স্বীয় শক্তির সন্ধান করিয়াছে! বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্তর দিয়া গিয়াছেন; এবং উহা কার্য্যেও দেখাইয়াছেন! হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আকস্মিক প্রতিভার প্রণোদনে "বাল্মীকির জয়ে" উহারই উত্তর অনুপমভাবে বাঙ্গালীকে দিয়াছেন!

বঙ্গ সমাজের আশা সাহিত্যে।

বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালী জাতির এবং বঙ্গসমাজের সমস্ত ভবিষ্যৎ আশাভরসা একান্তভাবে তাহার সাহিত্য-বিকাশের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন শক্তি, মনুষ্যত্ব, পৌরুষ-মহত্ব এবং ব্যাপ্তি-সাধনার উপরেই এতদ্দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে! প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখককেই তাঁহার এই মহৎ কর্ত্তব্যে এবং মহত্তম দায়িত্বে জাগরিত হওয়া আবশ্যক। যিনি লেখনী গ্রহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি-লক্ষ্য হইতে স্খলিত হইবেন, জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে, কথায় কিংবা কার্য্যে, কোন প্রকারে এ জাতির উন্নতি-পথের কণ্টক হইবেন, তাঁহার

যাহা পাপ হইবে তাহা আত্মহত্যা কিংবা নরহত্যা হইতে কোন অংশে কম জঘন্য হইবে না।

সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর-সম্বদ্ধ পদার্থ বলিয়া, বিশেষতঃ, সাহিত্য প্রকারান্তরে সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মানসপুত্র বলিয়া বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা চিন্তা করিতে বসিলে পদে পদে বঙ্গসমাজের যোগ্যতার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। বলিতে হইবে না যে, প্রবল রক্ষণশীলতা, ধর্ম্মক্ষেত্রীয় ভাবুকতা, প্রাচীনকালের 'আচার' আদর্শগত 'ধর্ম্ম'-নামের অজুহাত-সাহায্যেই কার্য্যা-কার্য্যের নির্দ্ধারনা, এবঞ্চ এ ক্ষেত্রে অনেক সময় অতর্কিতভাবেই আত্মবঞ্চনা, এ সমস্ত সমগ্র এসিয়ার হৃদ্‌রোগ! হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সকল জাতিই এ রোগে ন্যূনাধিক জড়সর! আমাদের পরিবার-সমাজ-সংসার এবং ধর্ম্মের কতকগুলি পরাচীন বিশেষত্ব গতিকেই, মানবজাতির সাধারণ মতিগতি এবং নিয়তির সহিত আমাদের সহানুভূতি নানামতে বাধিত হইতেছে! এই সমস্ত বিষয়ে সাম্প্রদায়িকভাব এবং পৌরাণিকতা, এবঞ্চ উহাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রবল ভাবুকতা আমাদের মধ্যে এত অধিক যে অনেকের পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষাতেও কুলাইয়া উঠে না! আধুনিককালের 'জাতীয়তা' কিংবা 'উন্নতি' বলিয়া কোন আদর্শের ধারণাও যেন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ। সুতরাং, আমাদের জীবনমন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্য জাতির বা 'আর্য্য'জাতির 'গ্রাম-সমাজ' এবং ধর্ম্মতন্ত্রীয় সাম্প্রদায়িক আদর্শেই শাসিত এবং সীমাবদ্ধ! বর্ত্তমান গ্রাম্য সমাজের দুর্ভেদ্য ভাবুকতা-গণ্ডীর 'সনাতন' দুর্গমধ্যে সুখাসীন থাকিয়াই, প্রাচীন আদর্শের স্মৃতি-দীক্ষাপ্রাপ্ত 'পণ্ডিত'গণ এবং 'মৌলভী'গণ এই শাসনকার্য্য সমাধা করিতেছেন! মনুষ্যসমাজের নিয়তি বা মনুষ্যজাতির ভব-জীবনের সাধারণ ইতিহাস এবং জগৎ-ব্যাপারের সাধারণ প্রকৃতি টুকু পর্য্যন্ত তাঁহারা অবগত নহেন! ইতিহাস এবং

বিজ্ঞান না জানিয়াই 'পণ্ডিত'! বর্ত্তমান মনুষ্য-সভ্যতার কিংবা মনুষ্য-অভিজ্ঞতার কোন উপার্জ্জন-ফলই আমাদের পক্ষে অবারিত নহে! সমাজের মধ্যে, ইয়োরোপীয় 'নেশন' বা পোলিটিকেল আদর্শের 'সাম্য-মৈত্রীস্বাধীনতা'র ধারণা টুকু পর্য্যন্ত আমাদের 'ধর্ম্ম'আদর্শের দরুণেই কণ্টকিত! অথচ সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই বুঝিতেছেন, এই সামান্য (?) আদর্শের মৌলিক ভেদ গতিকেই ইয়োরোপ এসিয়ার—সমগ্র পৃথিবীর রাজা হইয়া গিয়াছে! একমাত্র সাহিত্যের দ্বার এবং সাহিত্যের কল্পনা-জল্পনার ক্ষেত্রটুকুই আমাদের সমক্ষে যৎকিঞ্চিৎ অবারিত আছে! কেবল কল্পনা-অনুভূতির ক্ষেত্রেই আমরা 'মানবত্ব'আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করিতে কিংবা মনকেও বিশ্বসমতায় উত্তোলিত করিতে পারি! তাহাও সর্ব্বত্র নহে! যা' হোক, ঐটুকু করিতে পারিলেই, আমরা কালক্রমে উহার মধ্যদিয়া 'বিশ্ব'আদর্শের গন্ধ সহিয়া লইতে, বা বিশ্বমানবের সভ্যতা-সমতল কালক্রমে লাভ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি! এই সমাজে কোনরূপ বিপ্লবের জন্য যেমন বর্ত্তমানে কোন অবকাশ নাই, তেমন দীর্ঘকাল শিক্ষা-সাধনা ব্যতীত, অপিচ সাধারণশিক্ষার সাহায্যে অতর্কিতে পরিবর্ত্তন ব্যতীত অপর কোনরূপ পরিবর্ত্তনের জন্যও যেন অবকাশ নাই! অবশ্য, আধুনিক আদর্শের 'জনশিক্ষা' বা 'সাধারণতা' বাচক কোন সংজ্ঞাও আমাদের প্রাচীনতন্ত্রের 'ভেদ' আদর্শ, পরিবার এবং গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরোধী! তবু উহাই কালবশে আমাদের অদৃষ্টে আপতিত হইয়াছে বলিয়া, তন্মধ্যেই যৎকিঞ্চিৎ আশা! উহার গতিকেই দেশে স্বচিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বাত্মবোধ এবঞ্চ স্বাধীনতার ভাব বাড়িয়া যাইতেছে এবং উহার ভিতর দিয়াই মানব সভ্যতার নিয়তি এবং উন্নতির আদর্শ আমাদের সমাজ মধ্যে কার্য্যকর হইতে পারিবে! ওই আগন্তুক আদর্শের সমস্ত আগন্তুক ব্যাধি-বিপত্তি কিংবা অপরিহার্য্য সমস্যা

সমূহ সমাধান পূর্ব্বক, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি উভয়ের পরমার্থও সাধিত হইতে পারিবে!

বাস্তবিক এতদ্দেশে, বর্ত্তমানে, সাধারণশিক্ষা-দান এবং উহার পর স্বাভাবিক নির্ব্বাচন-নিয়তির উপরে নির্ভর ব্যতীত অন্ত কোণ পন্থা আছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতে পারিতেছেন না! কোমড় বাঁধিয়া, কিংবা বিস্তারিতভাবে দলবন্ধন পূর্ব্বক, ধর্ম্মের অথবা সমাজের কোন 'সংস্কার'-চেষ্টা এতদ্দেশে প্রাচীনকাল হইতেই নিস্ফল হইয়া আসিয়াছে! অশোকযুগের গ্রামীনের সহিত, এ দেশের শতবৎসর পূর্ব্বকার গ্রামবাসীর প্রকৃত কোন পার্থক্য ছিল না বলিলেই হয়! কিন্তু, এ কয়বৎসরে অতর্কিতে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে! তাহার স্বরূপ-ইতিহাস রচনা করিবার জন্ত, এখন যাবৎ এতদ্দেশে কোন বিশেষ প্রচেষ্টা না হইলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের গত দশবৎসরের অভিজ্ঞতাই ঐ ক্ষেত্রে সবিশেষ সাহায্য করিবে! ইয়োরোপীয় সভ্যতা অভিনব শিক্ষা-পথে, নব প্রতিষ্ঠিত নগর সমূহকে কেন্দ্র করিয়াই, গ্রামনিষ্ঠ 'সনাতন' ভারতীয় সমাজকে ধীরে ধীরে এবং সুস্থিরভাবে টানিতেছে! এ ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নগর-প্রাধান্তের উপরেই নির্ভর করিতেছে! একবার নগরে পদার্পন করিলেই হইল—কাহারও নিস্তার নাই! ইয়োরো-পীয় শিক্ষা-দীক্ষা এবং উহার সমাজ-সভ্যতার 'সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতা' আদর্শের এতই শক্তি! উহার পোলিটিকাল বা রাষ্ট্রীয় সাম্য এবঞ্চ স্বাতন্ত্র্য-আদর্শের সহিত মনুষ্য-হৃদয়ের এতই সহজাত সহানুভূতি! এই শিক্ষার পথে, সুতরাং সাহিত্যের পথেই যে আমাদের সমাজে এবং ধর্ম্মেও সনাতন 'ভেদ' আদর্শের সমস্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ কুফল কালক্রমে নিবারিত হইবে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এখন কি, নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন ব্যতীত, এবং উহাদের দ্বারা ব্যতীত, ভারতের ভাবী উন্নতি যে

কোন দিকে ব্যাপক হইতে পারিবে না, তাহাও চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। আপাততঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই যে আমাদের মধ্যে, স্থলবিশেষে অভূতপূর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা এবং রক্ষণশীলতা উপপন্ন হইতেছে তাহাও সত্য—আমাদের সমাজ হয়ত কোনকালে এত রক্ষণশীল এবং অসহন ছিল না। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান কালে উচ্চ-উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই যে বিরূপ সাম্প্রদায়িকভাব এবং সংকীর্ণ স্বার্থ-পরতা সমধিক দৃষ্ট হইতেছে তাহাও স্বীকার করিতে হয়! তাঁহারাই—বিশেষতঃ, তাঁহাদের 'কলম-পেশা' ব্যক্তিরাই ভারতীয় সমাজ-উন্নতির প্রবল বিরোধী পক্ষ! সুতরাং, এ ক্ষেত্রে সাধারণের মধ্যে, শিক্ষা দীক্ষা (culture) এবং ইয়োরোপীয় সমাজের 'সাম্যমৈত্রী-স্বাতন্ত্র্যে'র আদর্শ পরিব্যাপ্ত না হইলে, উচ্চ-উচ্চতর শ্রেণী আপনাদের সনাতন দাবী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য না হইলে, ভারতীয় মনুষ্য সমাজ যে কখনো তাহার সমাজ কিংবা সাহিত্যকে কোন দিকে ইয়োরোপের সমকক্ষতায় উত্তোলন করিতে পারিবে না, তাহাও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ফলতঃ, ভারতবর্ষ তাহার অনুপম অধ্যাত্ম সম্পদ্ এবং ঋষি-উপার্জ্জিত 'প্রয়াণ'-বিস্তার মাহাত্ম্যবিষয়ে যেমন জগতে অসঙ্গ উচ্চতা লাভ করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, তেমন উহার সমাজতন্ত্রও (অনেক সময়, নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত নিদ্রার গতিকে) বিশ্বমনুষ্যের সম্মিলন-তন্ত্র হইতে নানাদিকে মূলেই প্রভিন্ন হইয়া গিয়াছে; এবং এ ক্ষেত্রে জীবনপথে তাহাকে একেবারে একাকী এবং 'এক ঘরে' করিয়াই রাখিয়াছে! সুতরাং, এ ক্ষেত্রে সমস্ত স্বীকৃত মাহাত্ম্য এবং স্বাধীন বিশিষ্টতা রক্ষা পূর্ব্বক, কি করিয়া তাহাকে মনুষ্য সমাজের যাবতীয় আধুনিক অভিজ্ঞতা এবং উপার্জ্জনের ফলভাগী করিতে পারা যায়, এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের পক্ষে উহাই জলন্ত সমস্যা এবং দায়স্বরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সাধারণ মনুষ্যসমাজ যে সমস্ত বিষয়কে, 'সম্মিলন' আদর্শের ক্ষেত্রে, 'স্বত ঃ-সিদ্ধ' এবং 'স্বীকার্য্য' রূপে ধরিয়া লইয়াই নির্ব্বিতর্কভাবে এবং অনায়াসে অগ্রসর হইতেছে, আমাদের পক্ষে, ঐ সমস্ত বিষয়কে মানিয়া লইতে কিংবা বুঝিয়া লইতেও, অনেক সময় জীবনীশক্তির এবং চিন্তা শক্তির (অন্য জাতির দৃষ্টিতে অনর্থক) অপব্যয় করিয়াই চলিতে হইবে! সুতরাং, এ সমস্যার সমাধান টুকু ও দীর্ঘকাল দূরেই থাকিয়া যাইবে।

উপসংহার।

বঙ্গসাহিত্য কোন পথে চলিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তাহার পক্ষে কোন পথ অবলম্বনীয়, তাহা অতীত ও বর্ত্তমান কালের সাহিত্যিক গণের আলোচনায় এ প্রবন্ধের স্থানে স্থানে যথাসম্ভব সঙ্কেতিত হইল। বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের গ্রন্থাদি জগতের সাহিত্য এবং তাহার বিশ্বজনীন আদর্শের হিসাবেই আলোচিত হইল। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক গ্রন্থই বহুমূল্য, অনেক গ্রন্থকারই সবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁহাদের কাহারও প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা কিংবা অবজ্ঞার প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। *আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধিতে যাহা সাহিত্যের ধ্রুব এবং সার্ব্বভৌমিক আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত, তাহার আলোকেই এ আলোচনা করিয়াছি।*

এই আলোচনায় যাঁহারা আমাদের সঙ্গে যথার্থভাবে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশীয় পরিবেষজাত এবং পরম্পরা-গত একট উত্তরাধিকার সম্পর্ক এবঞ্চ ঋণ-সম্পর্কের ধারা এত প্রবল যে

বঙ্গসাহিত্যের অতীত।

উহার যথোচিত সদ্ব্যবহার ব্যতীত কোন উন্নতিই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষার ক্ষেত্রে এই বিধি আরও বলবান। বঙ্গসাহিত্যের কাব্যবিভাগে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে, আমরা এই সত্যের একটা পরিস্ফুট

দৃষ্টান্ত লাভ করিয়াই আশ্বস্ত হইব। মধুসূদনে ভাবরসের যে একটা সরলোজ্জ্বল প্রবাহ ছিল, হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া তাহাই একদিকে দৃঢ়-নিটোল এবং সংযত হইবার চেষ্টা করিয়াছে! নবীন চন্দ্র বৈষ্ণবীয় 'চরিত' কবিগণের, এবং রবীন্দ্র নাথ বৈষ্ণব 'গীতি' কবিগণের দ্বারাই সমুদ্দীপ্ত! উভয়ে ঊনবিংশশতাব্দীর বক্ষে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বগণের পদ্ধতিকেই যুগোপযোগী বিশেষত্বে অনুসরণ করিয়াছেন। নবীন চন্দ্রের মধ্যে যেমন বৈষ্ণবী ভাবুকতার বহির্ম্মুখ উচ্ছ্বাস এবং চাঞ্চল্য টুকুই প্রবল, রবীন্দ্র নাথে তেমনি উহার অন্তর্ম্মুখ উচ্ছ্বাস এবঞ্চ চাঞ্চল্য টুকুই সুদীর্ঘকাল প্রবল থাকিয়া, উভয়ের মধ্যেই ঘন পরিণতি লাভের অবকাশ খুঁজিয়াছে। উভয়েই ভাব-প্রকাশের রীতিকে অতি-পুষ্পিত অথবা অতি-পল্লবিত করিয়াই অনুসরণ করিয়াছেন। নবীনের মধ্যে যেমন অর্থের ঘনতা বা পরিপূর্ণতা অপেক্ষা বরং উহার রসতারল্য এবং চাঞ্চল্যই আধিক্য লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র নাথের মধ্যেও অনেক স্থানে বাস্তবিক ঘনতা অপেক্ষা ও বাক্যের 'সঙ্গীত' লক্ষণ, রসাভাস, সুর, ছন্দ তাল এবং বোলচালই বরং অতিরিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার গদ্যও, উক্ত লক্ষণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং, বঙ্গীয় কবিতা বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর (১৮৫৯—১৯১০) মধ্যে, নিজের চিরকালীয় শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণবী প্রথাকেই নিজের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করিয়া লইতে এবং নবভাবে লাভ করিতে চাহিয়াছে, বই নহে। মধুসূদন শাক্ত; হেমচন্দ্র শৈব; নবীন ও রবীন্দ্র নাথ আপাততঃ পরস্পরের বিসদৃশ বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, বৈষ্ণব। তাঁহারা ঠিক ভাগবত-আদর্শের বিনয়-নম্রতা কিংবা মধুরতার সাধক বৈষ্ণব না হইলেও, বরং উভয়ের কথায় এবং ভাবে পদেপদে অহংভাব টুকু ফাটিয়া-ফাটিয়া পড়িতে থাকিলেও, অন্তরাত্মার আভ্যন্তরীণ ভাবতত্ত্ব বিষয়ে উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই নিজ-নিজ স্বতন্ত্র সুরটুকু ঊনবিংশ-

শতাব্দীর 'বিশ্ব-সাহিত্যের' বহুকণ্ঠ 'অর্গানের' সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চাহিয়াছেন; দেশের হৃদয়গতিবশে, হয়ত অতর্কিত ভাবেই চাহিয়াছেন! প্রত্যেকেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গণের আবিষ্কৃত বাক্য-বৈভব ন্যূনাধিক আয়ত্ত করিয়া বঙ্গীয় বাণী-দেবতাকে নবনব শক্তি সাধনায় অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন!

সাহিত্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব ও দায়িত্ব।

সাহিত্যের গতি চিন্তা করিলে দেখা যাইবে; সকল জাতির মধ্যেই কোন-না-কোন সৌভাগ্যবান্ শিল্পী, হয়ত কোন বিশেষ বিষয়ে ভাষা ভাব কিংবা তত্ত্বের দিক হইতে কোন নব শক্তি কিংবা প্রণালীর আভাস পা'ন, এবং ওই দুর্ল্লভ পদার্থকে হৃদয়পাত্রে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়া যান; সহকারী শিল্পীগণ আসিয়া হয়ত ওই দুর্ল্লভের সূত্র অনুসরণ পূর্ব্বক উহাকে আরও অগ্রসর করিয়া যান; কালে হয়ত যোগ্যতম শিল্পীর হস্তে পড়িয়া উহাই চিরকালের জন্য অনতিক্রম্য নামরূপে আকারিত হইয়া সাহিত্যজগতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া যায়। উহার পর, জাতীয় হৃদয় হয়ত অন্যপন্থায় ক্রম-বিকাশ লাভ করার চেষ্টা করে। সাহিত্যের এই গতি, কবিগণের এই দায়াধিকার তত্ত্ব, জাতিবিশেষের পরম সৌভাগ্য ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। এ স্থানেই শিল্প-আত্মার অভিব্যক্তি-তত্ত্ব নিহিত! যে দেশে সাহিত্য পূর্ব্বাপর সূত্র-সঙ্গতি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায়, লেখকগণ নিজ নিজ হৃদয় গতির অতর্কিত এবং অশিক্ষিত পথে কেবল সংকীর্ণ ভাবে, কিংবা বিক্ষিপ্ত এবং ব্যামোহিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, সেই দেশের সারস্বত ব্যাপারকে কখনো সাহিত্য নামে নির্দ্দেশ করা যায় না। উহা অন্ততঃ একদিকে অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতার লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই সূত্র-সঙ্গতি এবং দায়-প্রথা অথচ স্বাধীনতার লক্ষণের উপরেই সাহিত্য সংজ্ঞার মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। নব নব অর্থক্ষেত্রে দায়সঙ্গত,

সমবেত অথচ স্বতন্ত্র এবং ঘনমূল চেষ্টার নামই সাহিত্য। জাতির মধ্যে এইরূপ বিশেষত্ব মূলক অথচ পরিব্যাপ্ত অর্থ-চেষ্টার নামই জাতীয় সাহিত্য। সাহিত্য বিশেষ ওইরূপে বিশিষ্টতা এবং জাতীয়তা লাভ পূর্ব্বক যেই পরিমাণে বিশ্বমানবের সাধারণ হৃদয়-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি অর্জ্জন করিতে পারে, সেই পরিমাণেই উহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারভুক্ত হইবার পদবী লাভ করে।

সাহিত্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারীর লক্ষণ কি? পূর্ব্বগণের দায়াদ হইবার যোগ্যতা কোথায়? যিনি পূর্ব্বগণের সকল ক্রিয়া-অভিজ্ঞতার ফলভাগী হইয়া, সরস্বতীর তরণীকে নব নব মানস ক্ষেত্রে পরিচালন পূর্ব্বক অবিজ্ঞাত রত্ন-সম্ভারে মাতৃ-ভাষার প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ করিতে পারেন; পূর্ব্বে যাহা রেখা আভাস অথবা ছায়া-ছায়া মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, তাহাকে পরিস্ফুট প্রস্ফোতিত এবং সাবয়ব করিয়া, পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ এবং উজ্জ্বল করিয়া, যিনি শিল্প-মাহাত্ম্যের নব নব ক্ষেত্রে স্বকীয় স্বাধীন হৃদয়কে স্বতন্ত্র সমুৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিই সাহিত্যজগতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী। নতুবা, কেবল অনুকরণ, অনুবর্ত্তন অনুসাধন বা উপভোগের সামর্থ্যই সাহিত্যে যোগ্যতা বলিয়া পরিগণিত নহে। যে সাহিত্যে মানবাত্মা এইরূপে দায়ভাগী অথচ ক্রম-বিকাশী হইয়া কোন দিকে অভিনবতা অর্জ্জন করিতে পারে না, সে সাহিত্যই নিজের স্থবির দশা, চরম দশা লাভ করিয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেই অপূর্ণ বলিয়া, এবং প্রত্যেকেই অনন্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র মধ্যে সামান্য স্থানাংশ মাত্র অধিকার করে বলিয়া, সাহিত্যের এই অনন্ত উন্নতি এবঞ্চ গতির আদর্শ অব্যাহত থাকিতেছে! প্রত্যেক সাধকেই স্বকীয় জীবনের বিশেষত্ব মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার অবকাশ পাইতেছেন; বহুমুখিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই মুখ্যতা লাভ করিবার অবাধ অবসর

প্রাপ্ত হইতেছেন! বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অপরাপর তরুণ কবিগণের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেই মনে হইবে, আমাদের এখনো হতাশ হইবার সময় আসে নাই।

আবার, সরস্বতীর রাজ্যে একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, শিল্পী বিশেষের প্রকৃত যোগ্যতা-নিরূপণ বিষয়ে সমকালিকের বা সহযোগীর দৃষ্টি চিরকালই ন্যূনাধিক ব্যাহত হইতে থাকে। উপযুক্ত পরবর্ত্তী আসিয়া যেই পর্য্যন্ত-না হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে পারেন, সেই পর্য্যন্ত কোনরূপ সমালোচনা বা বিচার-পাণ্ডিত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনার দোষ গুণ নির্ণয়ে পর্য্যাপ্ত হয় না; সন্তোষজনক বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। যাহা একসময়ে হয়ত অন্ধভাবে, 'নাছোড়বন্দা' ভাবে, বিপ্লব কিংবা বিদ্রোহের লক্ষণ অবলম্বনেও পরম মহার্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, 'লঘিষ্টগরিষ্ট' ভাবের বিশেষ্য বিশেষণ আশ্রয় করিয়া এবং চরমপন্থী হইয়াই চিত্ত আকর্ষণ করে, কালক্রমে তাহাই সমস্ত অতিরিক্ততা হইতে রিক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করে; তাহাই হয়ত সাধারণতার অন্তর্গত হইয়া সুগম হইয়া পড়ে। চরমপন্থিতা জীবন-কর্ম্মশীল মনুষ্যমাত্রেরই ন্যূনাধিক হৃদয়-ধর্ম্ম বলিতে হইবে। মনুষ্য হৃদয়ের ঔচিত্য-বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা নামক পদার্থটাই চিরকাল সময়গতির সাহায্যে উহার 'রাশ টানিয়া' আসিতেছে। মনুষ্যের সমাজে-সাহিত্যে শিল্পে, ধর্ম্মে বা দর্শনের ক্ষেত্রে যাহা এক-এক সময় বাতিকের ন্যায় প্রকাশ পায়, মনুষ্য-আত্মার এই কালানুগা বুদ্ধিই চিরকাল তাহার চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে। সুতরাং কাল-গতিটাই মনুষ্যমনের পক্ষে একটা পরম ঔষধ বলিতে হইবে। লৌকিক বা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিবেষের হৃদয়-জাত, দৈব-পুরুষকারের ক্রিয়া সঞ্চিত অপরিহার্য্য নিয়তির নাম-চিহ্নই "কাল"।

সুতরাং, সাহিত্যের বা কাব্য বিশেষের মাহাত্ম্য এবং বিশেষত্ব চিরকাল

জগতের অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য-সৌন্দর্য্য ও শ্রেয়ঃ নিরূপণের উপরেই নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, জাতীয়তাই বিশ্বসাহিত্য সভায় উহার একটা প্রধান পরিচিহ্ন ও আকর্ষণ। জাগতিক সাহিত্যে এই জাতীয় ভাব, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় রীতি-ব্যক্তিই সাহিত্য বিশেষকে এবঞ্চ কাব্য বিশেষকে অভিনবতায় প্রতিষ্ঠিত করে। অভিনব উপরন্তু মহার্ঘ বর্ণ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট শিল্পকৃতিই বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর নিজের কোন বিশেষ বার্ত্তা, নিজের কোন মহার্ঘ বর্ণ মাহাত্ম্য আছে কি? সেই হিসাবে বলিতে হইবে, বঙ্গসাহিত্যের নদী হয়ত এখনো স্বকীয় বিশিষ্টতা এবং জাগতিক মাহাত্ম্যের সমুদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে মাত্র। কে নিশ্চয় করিবে, ভবিষ্যৎগর্ভে কি নিহিত আছে! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত উহা স্বরূপ-মাহাত্ম্যে, উৎসাহে উচ্ছ্বাসে প্রবাহ-ঘনতায়, গভীরতায় এবং প্রকাণ্ডতায় ওই সাগরসঙ্গমের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে! বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয়তা, বিশ্ববাণী-সমুদ্রে তাহার নিজস্ব উপঢৌকন, নিজস্ব সমাচার, বঙ্গসাহিত্যের নিজস্ব বর্ণ-ধর্ম্ম, বিশ্বসমুদ্রের দেহভুক্ত বঙ্গীয় অতলস্পর্শ হয়ত তাহার সুদক্ষিণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াই মহাপ্রাণ কল্লোল তুলিয়াছে! মধুসূদন হেম বঙ্কিম নবীন ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে সেই সমুদ্রের কল্লোল এবং আশ্বাস-অনুভূতি আনিয়াছেন। এই সাহিত্য সংস্কৃতের বিশ্বপরিদৃষ্ট তুষারগিরির সহিত অভিন্ন ধারা-প্রবাহে সংযুক্ত থাকিয়া, দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্ন উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, সংপ্রতি বাঙ্গালার সজল সমতল প্রান্তরের মধ্যে দিয়া, নিজের লক্ষ্যসিদ্ধ অথচ বহুল বক্রপথে জগতের সাহিত্য-সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে! উহা বঙ্গীয় ভাগীরথীর মতই শতমুখে সমুদ্রে পতিত হইবে—যাহার

জাতীয়তার আদর্শ ও বঙ্গসাহিত্য

আপূর্য্যমান এবং অচল-প্রতিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারে জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য নদীই প্রবাহিনী হইয়া সম্মিলিত হইয়াছে; মহাসমুদ্রের সঙ্গে দিবানিশি যাহাদের আদান প্রদান চলিতেছে—

"পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ"।

বঙ্গসাহিত্য কালবশে বিশ্বসাহিত্যের সমুদ্রবক্ষে যেই উপহার লইয়া যাইতেছে, তাহার বর্ত্তমান যেমন গৌরবাবহ, তেমন ভবিষ্যৎ ও উপেক্ষণীয় নহে। বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্য মহিমাদৃপ্ত প্রবন্ধ-লেখকের বিশ্বাস, বেদ এবং

বঙ্গসাহিত্যের আশা।

উপনিষদাদির অন্তর্নিগূঢ় যেই বিশ্বপাবনী ভাব-ধারা, ভারতবর্ষীয় ভাব-ধারা বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনাদিকাল হইতে ওতঃপ্রোত ভাবে এযাবৎ প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে (যাহা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেই অকাল-দুর্য্যোগে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল), বাঙ্গালী এখনও তাহাকে জগৎ-সমক্ষে সমুচিত শিল্প-প্রকারে প্রকটিত কিংবা উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে নাই। *উহা পারিলে, বঙ্গসাহিত্য জাতীয়তার দিক হইতেও বিশ্ব সাহিত্যের* প্রলুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে! কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ নবজীবিত উনবিংশ শতাব্দীর প্রবেশমুখে দাঁড়াইয়া, তাহার আভাষ মাত্র আবিষ্কার পূর্ব্বক, ইংলণ্ডের বিক্ষেপধর্ম্মী সাহিত্য-সমাজে অচিন্তনীয় শান্তি-সংযম বিতরণ করিয়াছেন! ভারতের সাহিত্য-আত্মাই, কালিদাসাদির মধ্যস্থিত নব্য সংস্কৃতের 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য-আত্মাই, জর্ম্মনীর নব-প্রবুদ্ধ কবি-কোবিদগণের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া, নব্য ইয়োরোপ-ক্ষেত্রে নানাদিকে 'নব সাহিত্য' পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে! গ্রীক এবং নব্য-ইয়োরোপীয় সমুন্নত শিল্পাদর্শের সহিত, অনির্ব্বচনীয় ভাব-সঙ্কেত এবং পরম-প্রমূর্ত্ত বস্তুঘটনার সহিত, ভারতবর্ষীয় শান্তি-নিষ্ঠা সংযম এবং আধ্যাত্মিকতার সম্মিলন! নব্যবঙ্গের সকল কবি, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের

মধ্যে উহারই ন্যূনাধিক পূর্ব্বাভাস কোন-কোন দিকে লক্ষ্য করিতেছি! আমাদের সাহিত্যে সেই সর্ব্বতোমুখী শক্তির কবি, সেই ধ্যানের কবি, সেই যোগের কবির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার প্রাণে বিশ্বব্যাপিনী প্রসারিতার সহিত, অতল গাম্ভীর্য্য, ভাবুকতা এবং সৃষ্টি-শুভঙ্করী দর্শন-শক্তি সমন্বিত হইবে! আমরা তাঁহারই আশা করিয়া আছি! বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার শুভাগমনের উপকরণ-সংযোগ এবং নান্দী-পাঠ হইয়া গিয়াছে! বিশ্বের সকল মহৎ সাহিত্যই কি সেই আদর্শভূত অথচ অনাগত মহাকবি-মহিমার প্রাক্-বিভাসেই প্রাণিত এবং আশ্বস্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে না?

জগতের সমস্ত সাহিত্যনদী নানা দিগ্দেশ হইতে সত্যবস্তুর এবং ভাবের উপহার আনিয়া মানবজাতির হৃদয়সিন্ধু মধ্যে এক চিন্ময় মহাদেশের সৃষ্টি করিতেছে। ভিক্তর হুগোর নবগর্ব্ভবোধিণী ঈভার মতই মানব-হৃদয় একটা অপূর্ব্ব অন্ধভাবে আকুলিত হইতেছে! এখনও তাহার সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করিতে পারে নাই; এখনও আপনাকে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে অনুভবে সচেতন করিতে পারে নাই। আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

মানব হৃদয় সিন্ধু তলে .
যেন নব মহাদেশ সৃজিত হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে; মনে তার দিয়াছে সঞ্চারি
আকার-প্রকার-হীন তৃপ্তিহীন এক মহাআশা,
প্রমাণের আগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে;
অসীম অতৃপ্তি মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে!
জননী যেমন জানে জঠরের আপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পুরে।

যখন এই দেশ মানবের সমক্ষে আবিষ্কৃত হইবে, তখন সম্মিলিত মানব হৃদয়ের সমস্ত কবিতা এক অখণ্ডিত মহাকাব্যে পরিণত হইয়া সংযুক্ত প্রার্থনারূপেই অসীমের অভিমুখে উত্থিত হইবে। বঙ্গসাহিত্য বিশ্বমানবের এই মহনীয় আশায় উদ্বোধিত হউক!

বাঙ্গলা ছন্দঃ।

বস্তু-সংক্ষেপ।

কাব্যচ্ছন্দের উৎপত্তি সঙ্গীতে—বঙ্গীয় ছন্দের বিকাশে গাথা ও পাঁচালীর মজলিস—পয়ার ও লাচাড়ী বঙ্গভাষার স্বতঃসিদ্ধ এবং মৌলিক ছন্দ; সংস্কৃত হইতে ঋণ নহে—বিরাম যতিই উহাদের প্রধান শক্তি—পয়ারের বিকাশ—লাচাড়ীর বিকাশ—বাঙ্গলা ছন্দ-শক্তির সীমা—মধুসূদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ছন্দ—বঙ্গীয় ছন্দে মধুসূদন—অমিত্র চ্ছন্দ, মিশ্র ছন্দ, শ্লোকস্তবক—আধুনিক সাহিত্যে ছন্দের নূতন পন্থা—সনেট—মিশ্রচ্ছন্দের বিকাশ—বঙ্গীয় ছন্দে রবীন্দ্রনাথ—বাঙ্গালীর 'গীতি-কবিতা'—লঘুগুরু উচ্চারণ মূলক পয়ার ও লাচাড়ী—বঙ্গীয় ছন্দবিকাশের সম্ভব-সীমা—বঙ্গে স্বরবর্ণাত্মক ছন্দের রীতি—বৈষ্ণব কবিতায় স্বরাত্মক ছন্দের সন্দিগ্ধ রীতি—বঙ্গে সংস্কৃতরীতির ছন্দ-চেষ্টা—নিখুঁত সংস্কৃত অনুযায়ী ছন্দের প্রচলন চেষ্টা—বঙ্গভাষার প্রকৃতি মধ্যে সংস্কৃত-অনুযায়ী উচ্চারণের সীমা—বঙ্গভাষার সংস্কৃত প্রভাব হইতে দূরবর্ত্তী স্বতন্ত্র অক্ষরমাত্রিক ছন্দ—উচ্চারণে খামখেয়ালি অথচ স্বাতন্ত্র্য—বঙ্গভাষার উচ্চারণ সমস্যা—প্রাচীনকাল হইতে উক্ত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ—পয়ারের ক্ষেত্রে উহার সীমা—ছড়ার রীতির সীমা—বিদেশী ছন্দের ধ্বনি অনুসরণে বঙ্গীয় ছন্দের ভবিষ্যৎ—পয়ারও লাচাড়ী ছন্দের ধ্বনি গতি শক্তি—ভাব প্রকাশে ছন্দ-শক্তির সহকারিতার সীমা—প্রাচীন ও আধুনিক ছন্দ—সাহিত্য বিকাশে আধুনিকের প্রভাব—বঙ্গভাষা এবং তাহার সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য—ছন্দের বিভিন্ন অর্থ ও উহার ব্যাপকতা—কবির প্রকৃতি-যোগ এবং অন্তর্যোগ হইতেই ছন্দের উদ্ভব এবং বিশ্বতোমুখ বিকাশ।

ছন্দ নামক আপাতপ্রতীয়মান অনাদি পদার্থের যদি একটা নিদান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ভূমিকা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে বলিব, সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। মনুষ্য-মনের—মনুষ্য-কণ্ঠের আদিম উদ্ভাবনা সঙ্গীত। যখন মানুষ ভাষা পায় নাই, যখন তাহার বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, তখনও কিন্তু

মানব সঙ্গীতকে লাভ করিয়াছিল ; ইতর প্রাণীর ন্যায় অস্পষ্ট ধৃত ভাবের উৎসাহকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিল।

কাব্যচ্ছন্দের উৎপত্তি সঙ্গীতে।

সরস্বতী মনুষ্যত্বের আদি দেবতা! সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটি নামের মধ্যেই মনুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ত-পথে এই দেবতার ক্রমবিকাশ-পদবী সূচিত হইতেছে। গীর্—বাক্—বাণী—বীণাপাণি! বাক্-প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার নাম—ভাবের অস্পষ্টধৃত এবঞ্চ প্রধানতঃ গীতাত্মক অবস্থার নাম গীর্! "বাক্যের রস ঋক্, এবং ঋকের রস (essence) উদ্গীথ।" ইতর প্রাণী-জগৎ এখনো এই অবস্থায় আছে—মনুষ্যও এককালে ছিল। ক্রমে বর্ণাত্মিকা বাগ্দেবী প্রকটিত হইয়া, মনুষ্যের জ্ঞান ভাব এবং ঈষণার প্রবৃত্তিকে সম্যক্ গর্ভে ধারণ করার যোগ্যতালাভ করিয়া বাণীরূপে, মানব-সভ্যতার আদি ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত এবং কাব্য আত্ম-জাগরণ লাভ করিয়া আপন-আপন বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়া গিয়াছে। এই বাণীকে বীণাপাণি এবং পুস্তকধারিণী দেবীরূপে ধারণা করিয়াই মানব সঙ্গীত এবং সাহিত্যে তাঁহার উপাসনা করিতেছে!

আমরা দেখিব, বঙ্গীয় ছন্দের এবং বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত উন্নতির মূল কারণ সঙ্গীত। পয়ার লাচাড়ী এবং পাঁচালী—এই তিনটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যের শৈশব-ইতিবৃত্ত বহন করিতেছে। উহাদের

বঙ্গীয় ছন্দে প্রাচীন গাথা ও পাঁচালীর মজ্জালিশ।

অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে জানিলেই আমরা বঙ্গ সাহিত্যের নিদান-পরিচয় লাভ করিতে পারিব। সংস্কৃতই আর্য্যভারতের বিদ্বজ্জনের ভাষারূপে পরিণতি লাভ করে। প্রাচীন ভারত নিজের সমস্ত উন্নত জ্ঞানার্জ্জন এবং ভাবের উচ্ছ্বাসগুলি এই ভাণ্ডারে রক্ষা

করার আদর্শ রাখিত। কিন্তু তাহার গার্হস্থ জীবনের মুহূর্ত্তগুলি, অষ্টপ্রহরীয় জীবনের সুখদুঃখ-সংঘাত, আনন্দের কিংবা বেদনার *আবেগগুলি অনেক দিকে 'গাথা' নামক ভাষাপথে, অথবা 'প্রাকৃত'* ভাষার মধ্যেই নিত্যকাল ফুটিয়া ঝরিয়া এবং মরিয়া আসিতেছিল। বৌদ্ধপ্রভাব হইতেই পল্লীভাষার আদর বৃদ্ধি পায়; এবং একটি দিকের ফশলগুলিই পালীভাষা গোলাজাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল বই নহে। কিন্তু ভারতবিস্তৃত শস্যসম্ভারের তুলনায় এই রক্ষাব্যাপার কত সামান্য! উহার পর, মুসলমানের প্রভাব হইতে—ইসলাম ধর্ম্মের অনুপম 'সাধারণ' তন্ত্রের দৃষ্টান্ত এবং আরবী ও পার্শী ভাষার রাজকীয় গৌরবপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতেই ভারতের জানপদ ভাষাগুলি তলে-তলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা লাভ করে। এইরূপে, বলবান্ যুগধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, দেশে দেশে নানক কবীর তুকারাম এবং শ্রীচৈতন্য প্রমুখ যুগধর্ম্মের 'অবতার' পুরুষের মধ্য দিয়া, ভারতবর্ষ প্রাচীন সংস্কৃত-হিমগিরির মাহাত্ম্যকে আপাততঃ বিস্মৃত হইয়াই অনাদৃত প্রাকৃত হৃদয়বৃত্তির সমতলকে বিস্তারিত ভাবে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও ত দেশের গৃহস্থ-প্রাঙ্গণে রাঙ্গাদিদি 'খনা' এবং 'ডাক'এর ঠাকুরদাদা দিনরাত্রি আসর জমাইয়া বসিতেন; নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসবাদিতে পল্লীর আনন্দবাজারে গানের মজলিশ জমিত; বাসর-সভায় বিদগ্ধাগণকে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইত; ধর্ম্মকথকতার ব্যাসাসন হইতেও 'শুকদেব'কে, ফুলদুর্ব্বা-গ্রহণ-পূর্ব্বক পদতলে ভক্তিনিবিষ্ট প্রাকৃতগণের উদ্দেশে তাঁহাদের 'প্রাকৃত' ভাষাতেই বাক্যোচ্চারণ করিতে হইত! এই-সমস্তের ফলে দেশে দেশে অনুগৃহীত প্রাকৃত ভাষা উঠিতে বসিতে এবং চলিতে শিখিতেছিল। দিন দিন উহার চলৎশক্তি এবং উচ্চাকাঙ্খী অভিলাষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া, পরিশেষে এই বঙ্গদেশেই এমন অবস্থা

দাঁড়াইল যে, সে একদিন স্বয়ং ব্যাসাসনে পদকল্পতরু হইয়া বসিল ; এবং দেবভাষাকেই (স্বপ্নাতীত ভাবে) উহার কথাগুলি টীকা-টিপ্পনী করিয়া বুঝিয়া লইতে হইল! লৌকিক দেবমাহাত্মোর কীর্ত্তন এবং পাঁচালীসভার প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িয়া উঠিল যে, পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বকার কোন পূজ্যব্যক্তি আমাদের জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন—

মঙ্গলচণ্ডীর কথা গাহে জাগরণে
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে!

এই মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী সুবচনী ষষ্ঠী বঙ্গসাহিত্যের পরম কৃতজ্ঞতা-পাত্রী ; তাঁহাদের পাঁচালী-কীর্ত্তনগুলিই বাঙ্গালীহৃদয়ের গুপ্তগুহানির্গত আদিম গোমুখীধারা! ক্ষুদ্র পাঁচালীর পদ্ধতিই ক্রমে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে বিপুলতা লাভ করিয়া মহাগাথায় পরিণত হইয়াছিল! বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পূজা-গৌরবের প্রতিস্পর্দ্ধী হইয়া মাথা তুলিয়াছিল! নিজের প্রতিপত্তি রক্ষায় উপায়ান্তরহীন হইয়াই দেবভাষার পরমপূজ্য রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদিকে প্রাকৃত বাঙ্গলার পরিচ্ছদ এবং পাঁচালী-গাথার রূপ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতটিই সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্রকারগণের নিষেধ-পত্রিকা অবহেলা পূর্ব্বক বাল্মীকির আর্য্যগাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্রুবপদকে পাঁচালীগানের নিম্নভূমে নামাইয়া আনিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাঁর দেখাদেখি ক্রমে অচলপ্রতিষ্ঠ মহাভারত এবং মহামান্য শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতিও আপনাদের শুচিতা পবিত্রতা এবঞ্চ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া একেবারে সাধারণের আসরেই নামিয়া দাঁড়াইলেন ; এবং ঢোল এবং কাঁশীর সহযোগে পয়ার-প্রবন্ধে গলা ভাঁজিতে অথবা লাচাড়ীর নৃত্য-তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুর বিনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন! এ ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্রের 'হাট' হইতে তাঁহার পরম বিনয়ী

'ঝাড়্দার'গণ এই পাঁচালীর আসরেই এমন সুর সঙ্গৎ করিয়া গেলেন যে, *উহাই একদিকে প্রাচীন* ঋষিপদবীর সমস্ত মহিমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বঙ্গালীর হৃদয়কে বাহুবলে অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসিল। ইহাঁদের সমসূত্রে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রামপ্রসাদ প্রভৃতিও এই পাঁচালী-গানের আসরভিত্তি হইতেই আপনাদের স্বতন্ত্র পথে এমন এক রাগিণী বিনাইয়া গেলেন যে, উহাতেই বঙ্গসরস্বতীর আত্মসম্পূর্ণ বীণা-পুস্তকধারিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

পয়ার ও লাচারী বঙ্গভাষার স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক ছন্দ।

সুতরাং এই পাঁচালী পয়ার এবং লাচাড়ী—তিনটি কথায় প্রকৃত মর্ম্ম, উহাদের প্রকৃত শক্তি এবং ঋদ্ধি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস এখনও যেন সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই। আমরা দেখিতেছি, পায়ে পায়ে চলে অথবা উহাকে দাঁড়াইয়া গাহিতে বলিয়াই উহার নাম পয়ার; এবং নাচিয়া নাচিয়া চলে, অথবা নৃত্যসহকারে গাইতে হয় বলিয়াই উহার নাম লাচারী। এ দুইটি কথা বাঙ্গালার প্রাচীনতম গাথা এবং গানের মজলিস হইতে পরিভাষা স্বরূপে উদ্ভূত হইয়াই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কথা যখন ছন্দকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রত্যেক পাদের নাম হয় "পদ"—"শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ"। এইরূপে পদ বা পদকার হইতেই পয়ারের উৎপত্তি। পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রাকৃতভাষার লেখকগণকে কবি বলিতে যেন সঙ্কুচিত হইয়াই পদকর্ত্তা বা পদকার নামে নির্দ্দেশ করিতেন। পয়ার বঙ্গভাষার একটি আদিম ছন্দ; তারপর বলিব, আর একটি ছন্দও বঙ্গবাণীর নিজস্ব; উহাও বঙ্গভাষার হৃদয় হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালী শিশুর কণ্ঠরুচি বা শিশুভাষার অভিব্যক্তি আলোচনা করিলেই তাহার প্রধান প্রমাণটুকু মিলিবে। উহার

নাম ছড়া, বাঙ্গালার স্নেহ-তরঙ্গিণী মাতৃহৃদয়ের প্রথম তরঙ্গ। এই ছড়ার ছন্দটাই পল্লীর আসরে আসিয়া নর্ত্তনশীলা লাচাড়ীর জন্মদান করিয়াছে। সুতরাং এই পয়ার এবং লাচাড়ীকে বঙ্গবাণীর জন্মসিদ্ধি ও প্রথম প্রাপ্তি বলিয়া, উহার আদিম এবং স্বতঃসিদ্ধ কবিতার ছন্দ রূপেই বুঝিতে হইবে। তেমন, পাঁচালীও বাঙ্গালী বাণীপুত্রের আদিম কাব্যচেষ্টা—তাহার প্রথম উচ্চাভিলাষযুক্ত এবং সামাজিকগণের হৃদয়-বিজয়োদ্দিষ্ট ঝঙ্কার! খনা বা ডাকের বচন কিংবা ছড়ার ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে, উহাদের জ্ঞান-সঙ্কলনের আদর্শকে অতিক্রম করিয়া, পরিবার অথবা গার্হস্থ্য জীবনের 'আটপৌরে' গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বঙ্গকবি যখন বাহিরের দিকে প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন—তখন সরস্বতীর অপর হস্তে যে পুস্তক মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল, তাহার নাম হইল পাঁচালী। অদ্য এত দূরে দাঁড়াইয়া, বঙ্গ-কবিতার আদি চিন্তা করিতে যাইয়া দেখিতেছি, ঐ যুগল বীজচ্ছন্দ হইতেই ক্রমে বঙ্গীয় কাব্যচ্ছন্দের অশ্বত্থ বটবৃক্ষ বিপুল-আয়তন হইয়া অগণ্য শাখা প্রশাখায় অভিব্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গের কাব্যসাহিত্য উহাদের ছায়াতলে সমস্ত বঙ্গদেশের বিশাল হৃদয়কে রসানন্দে শীতল করিতে, এবং বাঙ্গালীর জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছা বৃত্তির তাবৎ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে।

সচরাচর বাঙ্গলা অলঙ্কার গ্রন্থে একটা কথা দেখা যায় যে, সংস্কৃত কবি জয়দেব হইতেই যেন বাঙ্গালী কবিগণ এই পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দ শিক্ষা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে প্রচলিত করিয়াছেন।

সংস্কৃত হইতে ঋণ নহে।

উহার ন্যায় একটা অযথার্থ কলঙ্কের কথা বাঙ্গলাকাব্যের বিষয়ে আর হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয় যে জয়দেবের—সরস মসৃণমপি। মলয়জ-পঙ্কম্

পশ্যতি বিষমিব। বপুষি সশঙ্কম্॥

কিংবা—বসতি বিপিন-বিতানে। ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরণীতলে। বহু বিলপতি তব নাম॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।

প্রভৃতি শ্লোক আপনাদের বিভক্তিচিহ্ন পরিত্যাগ করিলেই 'তাহা' দ্বিপাদ পয়ার বা ত্রিপদী লাচাড়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা এই ছন্দগুলি সংস্কৃত হইতে ধার করিয়াছি, বলিলে আমাদের ভাষার প্রকৃতি বা উহার পদগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার করা হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃত কিম্বা বৈদিক আর্য্যকবিতার প্রকৃতি চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, বৃত্তচ্ছন্দই উহাদের প্রধান শক্তি। হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণের একটা ভাঁজই বৃত্তচ্ছন্দের প্রাণ; উহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই। মাত্রাচ্ছন্দের মধ্যেই ব্যঞ্জনবর্ণের কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব দাঁড়াইয়াছে। বরঞ্চ উহাতেও সংযুক্তপূর্ব্ব স্বরবর্ণকে গুরুবর্ণরূপে ধরিয়া, উহাকে একটা ডবল বর্ণরূপে গণনা এবং পরিমাণ করার রীতিই প্রচলিত। এখন, সমগ্র বেদে একটিমাত্রও মাত্রা ছন্দ নাই; সমগ্র মহাভারতেও একমাত্র আর্য্যাশ্লোক মিলিতেছে; এবং উহার প্রক্ষিপ্ত লক্ষণটিও সুস্পষ্ট। দশম শতাব্দীতে বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থেও মাত্রাচ্ছন্দের দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না। এই ছন্দ ভারতীয় আর্য্যহৃদয়ের পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি। সঙ্গীতের রীতি হইতে, কণ্ঠগতির স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়াই মাত্রাছন্দের সৃষ্টি এবং পরিণতি। গীতি, গাথা, উদ্‌গীতি, আর্য্যাগীতি প্রভৃতি মাত্রাছন্দের নাম হইতেই উহাদের সঙ্গীতমূল প্রতিপন্ন। গীতগোবিন্দ বা গীতাবলি প্রভৃতি গ্রন্থও সংস্কৃত-সাহিত্যে অর্ব্বাচীন। সুতরাং সাহস করিয়াই বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গলা পয়ার বা লাচাড়ীর মধ্যে পাদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যে মিলনের রীতি পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাসের

উপরেই যাহার প্রধান শক্তি নিহিত আছে—তাহা কোন মতে সংস্কৃত কাব্যচ্ছন্দের প্রধান লক্ষণ নহে ; বরং সংস্কৃতের মধ্যেই বাঙ্গালা পয়ার বা লাচাড়ী-লক্ষণের ছন্দ-দৃষ্টান্ত যোগাইয়াছেন বাঙ্গালী কবি জয়দেব। পারসিক রীতি কিম্বা বাঙ্গালীর হৃদয়নিঃসৃত গীতধারার সহিত পরিচয়লাভের পূর্ব্বে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির বাহিরে, সংস্কৃত ভাষার বিপুল রাজ্যে এ জাতীয় মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্তও কদাচিৎ মিলিতেছে! বৃদ্ধা মাতামহী সংস্কৃত ভাষা বঙ্গীয় লাচাড়ীর এই চটুলতা এবং নৃত্যবিলাস যে আদবেই অনুসরণ করেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রতীয়মান। সুতরাং, আমরা যদি একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া ফেলি যে, বাঙ্গালীই সংস্কৃতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া এই চতুর্দ্দশ-অক্ষরের পদচ্ছন্দ বা ত্রিপদীর ছন্দ শিক্ষা দিয়াছে, তাহা হইলেও নিতান্ত বাহুল্য হইবে না।

যে ছন্দদ্বয়কে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অর্ব্বাচীন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, তাহারাই বঙ্গভাষার প্রধান শক্তি ; এবং এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিব,যে উহারাই বঙ্গভাষার অতীত-ভবিষ্যতের অনন্ত ছন্দের মূলাধার। সমতলগামী পদবন্ধে দ্রুত অথবা ধীরোদাত্ত পাদদ্বয়ে পরিচালিত রচনার নাম যেমন পয়ার, তেমন নৃত্যশীল পদরচনা-মাত্রেই লাচাড়ী। প্রাচীনকালে এই পয়ার বা লাচাড়ী জাতি নামে (Generic) ব্যবহৃত হইত। পদের গতি কিংবা বিরাম-যতির মূল সুরটুকু অবলম্বন করিয়াই এ দুটি বিভাগ। ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখিবেন এখনও বঙ্গভাষার সমস্ত ছন্দকে, আধুনিক কালের আবিষ্কৃত অসংখ্য মিশ্রচ্ছন্দকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই পয়ার বা লাচাড়ীর কোন-না-কোন বিভাগে সন্নিবেশ করিয়া নামকরণ করিতে পারিলেই আমরা যথার্থতা রক্ষা করিব। বিষয়টি একবার বুঝিয়া লইলেই বাঙ্গলা ছন্দ নির্ণয় করিতে

বিরাম যতিই উহাদের প্রধান শক্তি।

কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিবে না। এইস্থলে আমরা প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা পয়ারচ্ছন্দের এক একটা পংক্তি নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি। দেখিবেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণসংখ্যার উপর পয়ার প্রকৃতি কিছুমাত্র নির্ভর করিতেছে না। অমিশ্র পয়ার সাধারণতঃ পরস্পর-সংযুক্ত অথচ সঞ্চারী পদদ্বয়ের উপরেই নির্ভর করিতেছে। পাদসংখ্যাকে কচিৎ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়; কিন্তু ঐ ঘটনা ব্যতিক্রম বই নহে। বিরাম-যতিটুকুই পয়ারের প্রধান শক্তি; এবং উহার সংস্থিতি বিষয়েও কোন অপরিহার্য্য বিধি নাই বলিয়া, কবিপ্রতিভা বেশীকম স্বাধীন ভাবেই পয়ারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

এস্থলে ৯ হইতে ১৮ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের বিভিন্ন বিরাম-যতিযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল—

পয়ারের বিকাশ।

৯ গাছ রুইলে। বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে। বড় ধর্ম্ম॥—খনা।

৯ নব অনুরাগিণী। রাধা।
কছু নাহি মানয়ে। বাধা॥—বিদ্যাপতি।

৯ এ ধনি। কর অবধান।
তো বিনে। উনমত কান॥—বিদ্যাপতি।

১০ আজু কে গো। মুরলী বাজায়।
এ ত কভু। নহে শ্যামরায়॥—চণ্ডীদাস।

" মৃদুমন্দ। দক্ষিণ পবন।
সুশীতল। সুগন্ধি চন্দন।
পুষ্পরস। রত্ন-আভরণ।
আজি কেন। হল হুতাশন॥—আলাওল।

১১ আজি কেন তোমা। এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে। অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া। কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে। কি ভেল ব্যথা॥—চণ্ডীদাস।

১২ নয়ন যুগলে। সলিল গলিত।
কনক মুকুরে। মুকুতা খচিত॥—রাম প্রসাদ।

১৩ ক্ষণে ক্ষণে দশন। ছটা ছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর। আগে করু বাস॥—বিদ্যাপতি।

" আপনি জলস্থল। আপনি আকাশ।
আপনি চন্দ্রসূর্য্য। আপনি প্রকাশ॥—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

" সম্মুখে রাখিয়া করে। বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার, ভয়ে কাঁপে গা॥—চণ্ডীদাস।

" এ সখি কি পেখনু। এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি। স্বপন স্বরূপ॥—বিদ্যাপতি

১৪ কার কিছু নাহি চাই। করি পরিহার।
যথা যাই তথায়। গৌরব মাত্র সার॥—কৃত্তিবাস।

পয়ার এইরূপে চতুর্দ্দশ অক্ষরের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমে পঞ্চদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ অক্ষর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে।

১৫ সরোবরে স্নান হেতু। যেওনা লো যেওনা।
কমল কানন পানে। চেয়োনা লো চেয়োনা॥
—ভারতচন্দ্র

" যথা চাতকিনী কুতুকিনী। ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী। হিমাংশু মিলনে॥

মরি কিবা মুরহর। পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে। মিলিত হয়ে রহে॥
—মদনমোহন তর্কালঙ্কার

১৮ আদিম বসন্ত প্রাতে। উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র। বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে॥
—রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিপাদ পয়ারচ্ছন্দ এইরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

পয়ারের ধীরোদাত্ত গতি অতিক্রম করিয়া নৃত্যশীল লাচাড়ীছন্দও বঙ্গ-সাহিত্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর পূর্ব্বক বিকাশলাভ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। এই ছন্দটি বঙ্গভাষার একটা পরম বিশেষত্ব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অন্য কোন ভাষায় ছন্দের এইরূপ একটা নৃত্যশীল লীলাগতি এত শতসহস্র মুখে বিকাশ লাভ করিয়াছে কিনা আমরা অবগত নহি! সংস্কৃত ইংরাজী কিংবা পালীভাষায় উহার তুলনা দৃষ্ট হইতেছে না। লাচাড়ীর মূল, ছড়া—

যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবেন। শ্বশুরবাড়ী। কাজিতলা দিয়ে।
বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুকুর। নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের। বিয়ে হল। তিন কন্যা দান।

উহা হইতেই অক্ষরভেদে বা স্বরবর্ণের বাঙ্গলা কিংবা সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ-ভেদে কতপ্রকার লাচাড়ী উদ্ভূত হইয়া ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী ভঙ্গ-লঘুত্রিপদী, চৌপদী, লঘুচৌপদী, দীর্ঘচৌপদী প্রভৃতির জন্মদান করিয়াছে, প্রাচীন কাল হইতে তাহাকে অনুসরণ করা যায়:—

চিকন কালা। গলায় মালা। বাজান নূপুর পায়,
চূড়ার ফুলে। ভ্রমর বুলে। তেরছ চোখে চায়!
—গোবিন্দদাস।

অতি পুরাতন না—

অথির নীর। গভীর ধীর। অগাধ নাহিক থা॥
কুল কল কল। হিল্লোল কল্লোল। দেখিয়া হানিছে গা,
হেলিছে ঢুলিছে। তুলিয়া ফেলিছে। চল বল স্রোতসা,
জ্ঞানদাসের। কেবল ভরসা। ও রাঙ্গা ছ'খানি পা॥

জ্ঞানদাস।

সখি এ ভরা বাদর। মহা ভাদর। শূন্য মন্দির মোর।

—বিদ্যাপতি।

যুবতী হইয়া। শ্যাম ভাঙ্গাইল। এমতি করিল কে,
আমার পরাণ। যেমতি করিছে। তেমতি করুক সে॥

—চণ্ডীদাস।

প্রত্যেক পদের অক্ষরসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মিলনটিও ইচ্ছামত পরিচালিত হইতেছে—

আধ আঁচরে বসি। আধ অধরে হাসি। আধই নয়ান তরঙ্গ।

—বিদ্যাপতি।

হেরি হেরি ফিরি ফিরি। বাহু ধরাধরি। নাচত রঙ্গিনী মেলি।
জ্ঞানদাস কহে। নাগর রসময়। করু কত কৌতুক কেলি।
রজনী শাঙন ঘন। ঘন দেয়া গরজন। রিমঝিম শবদে বরিষে।
হাসির হিলোলে মোর! পরাণ-পুতলী দোলে।
দিতে চাই যৌবন নিছনি।

—জ্ঞানদাস।

বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াইয়া, পাঁচালী কিংবা কাব্যকারগণের মধ্যে আসিয়া অক্ষর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল; এবং এই চল্‌তির ঝোঁক হইতেই চৌপদী পঞ্চপদীর জন্ম হইয়াছিল। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নাচাড়ীছন্দ

একদিকে নিজের চরমকে লাভ করিয়াছে। ইংরাজের আমল প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও একশত বৎসর কাল বঙ্গীয় কবিগণ নানাদিকে কেবল অমিশ্রপয়ার এবং ত্রিপদী ও চৌপদী লাচাড়ীর সাধনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে উহা যেই প্রাঞ্জলতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করিয়াছিল, আমরা কেবল অক্ষরসংখ্যার বৃদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া যাইব—

কত মায়া কর। কত মায়া ধর। হেরি হেরি হর।. হারে।
জিত মরামর। হয় সেই নর। তুমি দয়া কর। যারে॥

—ভারতচন্দ্র।

এইরূপ ঢিমা তালে সন্তুষ্ট না হইয়া কবিগণ আর এক ছন্দের সৃষ্টি করিলেন; উহার একপদ অন্যপদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল বলিয়া, নাম হইল 'মাল ঝাঁপ'—

কোতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাঁকে।
ধরি বাণ। খরশান। হান হান। হাঁকে॥

—ভারতচন্দ্র।

কি রূপসী। অঙ্কে বসি। অঙ্গ খসি। পড়ে।
প্রাণ দহে। কত সহে। নাহি রহে। ধড়ে॥

—রামপ্রসাদ।

ভারতচন্দ্র চৌপদীর পদগতি আরও বর্দ্ধিত করিয়া গাহিলেন :—

বসন্ত রাজা আনি। ছয় রাগিণী রাণী
রচিল রাজধানী। অশোক-মূলে।
কুসুমে পুন পুন। ভ্রমর গুন গুন।
মদন দিল গুণ। ধনুক-হুলে।

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার :—

নয়ন কেবল। নীল উৎপল।
মুখ শতদল। দিয়া গঠিল,
কুন্দে দন্তপাঁতি। রাখিয়াছে গাঁথি।
অধরে নবীন। পল্লব দিল॥

এই চৌপদীর সাহায্যে মনের আবেগকেও অপরূপ মূর্ত্তি দান করিতে পারা গেল—

নিদ্রার আবেশে। রজনীর শেষে।
মনোহর বেশে। বঁধু আসিয়া।
প্রেম-পারাবার। করিল বিস্তার।
নাহি পাই পার। যাই ভাসিয়া

—ভারতচন্দ্র।

উহার পদচ্ছন্দে ধ্বন্যাত্মক দ্রুতগতিও অপূর্ব্বরূপে আকার পাইয়া উঠিল—

ওলো সুলোচনে। কটাক্ষ সন্ধানে।
আপনার পানে। চেও না চেও না চেও না।
উহার বেদনা। তুমি ত জান না।
অনর্থ যাতনা। পেও না পেও না পেও না।
ও যে খরতর। নয়নের শর।
কেবা আত্মপর। জানে না জানে না জানে না।
পড়িলে রূপসী। খরধার অসি।
কামার বলিয়া। মানে না মানে না মানে না॥

—মদনমোহন।

উহার পদক্রম আরও বাড়াইয়া দিয়া, নর্ম্মকৌতুকের কটাক্ষ-উল্লাসকে মূর্ত্তিমান করিতে পারা গেল—

নিত্য তুমি খেল যাহা। নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে খেলিতে চাহি। সে খেলা খেলিও হে!
তুমি যে চাহনী চাও। সে চাহনী কোথা পাও।
ভারত যেমত চাহে। সে চাহনী চাও হে!
নর্ম্মরে প্রকাশিয়া। গর্ব্বেরে বিনাশিয়া
শীতল করিলি হিয়া। বাহবা রে হাওয়া!
—ভারতচন্দ্র।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পদ আরও উচ্চাভিলাষী হইয়া পয়ার হইতে একাবলী প্রভৃতি ধার করিয়াও উল্লসিত হইতে চাহিয়াছে—

লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ,
তক্ তক্ তক্। রজনী-রাজ,
ধক্ ধক্ ধক্। গহন সাজ
বিমল-চপল গঞ্জিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু। নয়ন লোল,
হুলু হুলু হুলু। যোগিনী-বোল,
কুলু কুলু কুলু। ডাকিনী-রোল
প্রমদ-প্রমথ সঙ্গিয়া।

বলা বাহুল্য, এই চৌপদীই পরে পরে মধুসূদনের মধ্যে আসিয়া আগ্রহ-চঞ্চল পদবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে—

পিককুল কল কল। চঞ্চল অলিকুল
উথলে সুরবে জল। চল লো বনে।

উহাই নবীনচন্দ্রের মধ্যে কর্ণফুলীর তীরে বসিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়াছে—

এই কালিন্দীর তীরে
এই কালিন্দীর নীরে

এই তরুতলে, এই গভীর কাননে,
বসি এই শিলাতলে,
এই নির্ঝরিণী-কূলে
বলেছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে।

উহাই আবার ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুকরণ পূর্ব্বক উত্তাল হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—

গাইছে পশ্চিমে। পূরবে দক্ষিণে।
ভারত-সাগর। আনন্দে তরল।
নাচিয়া নাচিয়া। নীলিমা অসীমে।
দেয় করতালি। তরঙ্গ চঞ্চল।

উহাই হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া 'হতাশের আক্ষেপ' গান করিয়াছে; এবং নিজের বিশ্বতত্ত্বধ্যানী শৈবী প্রতিভার সাধর্ম্ম্য অবলম্বনে হিমাদ্রি-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া মহাশূন্যে দৃষ্টিপাত করিয়াছে—

হেরিত উপরে। নীলকান্তি ধরে।
শূন্য ধুধু করে। ছড়ায়ে কায়।
হেরিত অযুত। অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া। ছুটিছে তায়॥

এই পয়ার এবং লাচাড়ী ন্যূনাধিক অমিশ্রভাবে যেমন আদিবঙ্গে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম ভাবসাধক-কবি চণ্ডীদাসের মধ্যে, তেমন ভাব-ছন্দের অপূর্ব্ব বাণী-সাধক কবি বিদ্যাপতির মধ্যেও বিকাশ পাইয়াছিল; যেমন বাঙ্গালী-জীবনের অপূর্ব্ব পরিদর্শক কবিকঙ্কণের মধ্যে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় শব্দমন্ত্রসাধক ভারতচন্দ্রের মধ্যেও নানাপথে বিকশিত হইয়া আধুনিক যুগসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল; এবং উহারাই মধু হেম নবীনের মধ্যে আসিয়া নানা মিশ্রপথে আধুনিক ভাবসাধনায় অবহিত

হইয়াছে। কিন্তু এই চৌপদী আরও অগ্রসর হইয়া বঙ্গবাণীর পদগতি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে—ভারতচন্দ্রেই তাহার উদ্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইবে। তবে, এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। হয়ত বঙ্গীয় ছন্দগতির পক্ষে এই চৌপদীই শেষ সীমা! তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—

জট জালিনি। শিরমালিনি। শশিভালিনি।
সুখশালিনি। করবালিনি গো!
শিব-গেহিনী। শিব-দেহিনী। শিব-রোহিণি।
শিব-মোহিনি গো!

এস্থলে ছন্দের আভ্যন্তরীণ সুরটুকু যেন অতিরিক্ত টানে ছিন্ন হইয়া একেবারে গদ্যে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একমাত্র পংক্তি ধরিয়া যেমন ছন্দের প্রকৃতি স্থির করিতে হয়, তেমন ইহাও নিশ্চয় যে, এই পংক্তি একনিশ্বাস-সাধ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না—উহার অক্ষরসংখ্যা যদৃচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত করা যায় না। বঙ্গভাষার প্রকৃতি এবং বাঙ্গালি-কণ্ঠের অপিচ তাহার ফুশফুশের শক্তির সঙ্গে বাঙ্গলাছন্দের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। সভ্যজগতের সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাগুলির মধ্য হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইতে পারা যায় যে ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষর-বৃদ্ধির পরীক্ষা-ব্যাপার যথেচ্ছ চলিতে পারে না। তবে বঙ্গীয় ছন্দের উচ্চাভিলাষ যে এস্থলেই শেষ হয় নাই, তাহা আমরা মিশ্রচ্ছন্দের বেলায় দর্শন করিতে পারিব।

ছন্দ শক্তির সীমা।

বলিতে হয় যে, এই অমিশ্র পয়ার এবং লাচাড়ীর বিভিন্ন পদগতি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের মধ্যে আসিয়াই পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা লাভ করে; এবং তাঁহার দ্বারাই উহাদের সংযোগ এবং সম্প্রসারণের সাহায্যে নব নব ছন্দের পরিস্ফুট মূর্ত্তি আবিষ্কার করার পথ পরিষ্কৃত হয়।

কিন্তু তাঁহার পরেও একশত বৎসর পর্য্যন্ত মদনমোহন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রের নেমিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই চলিতেছিলেন।

মধুসূদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ছন্দ।

প্রচলিত ছন্দের সংমিশ্রণে যে কত অগণিত অনন্ত ছন্দের ধারণা করা যাইতে পারে, উহার সুস্পষ্ট উপলব্ধি কিংবা সমুচিত অনুসরণ এই যুগে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; তখনো বঙ্গবাণীর ছন্দ-প্রতিভা আধুনিক কালের উপযোগী জীবন কিংবা শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গভাষা এ দীর্ঘকাল যেন প্রকৃত কবি-প্রতিভার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। হৃদয়ের যে পরিমাণ আবেগ গভীরতা বা উন্মাদনা হইতে জাতিবিশেষের সরস্বতী নব নব পদ-পন্থার আবিষ্কার পূর্ব্বক প্রবাহিণী হইতে পারে, উহাঁদের কাহারও মধ্যে তাহার সঙ্কুলান ছিল না বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রাচীন রীতির বিবরণী (narrative) কবিতা রচনায় তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক নিয়মের ভাবুকতার রং ধরিলে বা আন্তরিকতা লাভ করিলে কবির ভাষা যেমন নিজের সহকারী ছন্দ আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যায়, ইহাঁদের ভিতর সে দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না।

শত বৎসরের পর এই শৈলগুহারুদ্ধ ছন্দনির্ঝরে বঙ্গভাষার মধ্যে সর্ব্ব প্রথম নবজীবনের কলকল্লোল আনিয়াছিলেন মধুসূদন দত্ত! বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা পয়ার একদিকে অত্যন্ত কঠিন রচনা; বিরামের যতিটুকুই উহার একমাত্র পরিচালনী শক্তি বলিয়া, উহাকে হৃদয়-ভাবের অনুগত গতি প্রদান করিতে না পারিলে এবং কেবল অক্ষরসংখ্যা বা বাহ্যিক মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, এই পয়ার অতি সহজেই 'একঘেয়ে' হইয়া পড়ে। সকল প্রাচীন কবির মধ্যেই উহার দৃষ্টান্ত আছে।

বঙ্গীয় ছন্দে মধুসুদন অমিত্রচ্ছন্দ।

তাঁহারা যে ইহা টের না পাইয়াছিলেন, এমন নহে ; এ কারণেই তাঁহারা পরম্পরাক্রমে পয়ার এবং লাচাড়ীর শরণ লইতে বাধ্য হইতেন। বিরামের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শব্দের বাহ্যিক মিলনকে অবহেলা করিতে পারিলেই এ সমস্তার ভঞ্জন হয় ; মধুসূদনই সর্ব্ব প্রথম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মধুর হৃদয় ইংরেজীর মধ্য দিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়া বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণ অভিনব ঐশ্বর্য্য—এমন কি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্তরঙ্গ জীবনটুকুই উপহার আনিয়া দিয়াছে। পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য কবিগণের মধ্যে মিলটনের সমুদ্রচ্ছন্দা হৃদয়ের সহমর্ম্মিতা লাভ করিয়াছিলেন বোধ করি কেবল আমাদের এই মধুসূদন! মিলটন যে জগতের ছন্দ-কবিগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, ইহা সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। শেরার বলিয়াছেন, প্যারাডাইস লষ্টের ছন্দ is the very essence of Poetry। বলা বাহুল্য, অমিত্র চ্ছন্দ সমস্ত ছন্দের মূলাধার। মেঘনাদবধের ছন্দও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গলা পয়ার এবং লাচাড়ী ছন্দের হৃদয়নিহিত আত্মাশক্তিকে ধারণা করিয়াই বিলসিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন এখনো আমাদের দেশে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। এস্থলে অমিত্র ছন্দের বিস্তারিত আলোচনার সময় নাই। এক কথায় বলিতে পারা যায়, মধুসূদন উহার দ্বারা সমুচিত দৃষ্টান্ত পথেই বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন যে, কাব্যের ছন্দ প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষরের বাহ্যিক মিলনের মধ্যে নহে—উহার মূল কবির হৃদয়ে ; এবং উহার প্রধান তত্ত্ব unity in varity, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন। প্রাচীন কালে যখন কবিতা ও সঙ্গীত অবিশিষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল তখন উভয়েই কেবল বৃত্তগতি বা metreএর উপর নির্ভর করিত। ক্রমে উভয় কলা নানা দিকে বিশিষ্ট হইয়া, স্বতন্ত্র মূর্ত্তি লাভ করিয়া, পরস্পর হইতে বহু দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীত যেমন সুরের আস্থায়ী অন্তরা

আভোগ এবং সঞ্চারী গতি এবঞ্চ ঐক্যতানের নির্ভরেই বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, কাব্যও তেমনি এই সুরকে বাগর্থের রাজ্যে আনয়ন পূর্ব্বক উহার মাহাত্ম্যকে কবি-হৃদয়ের ভাব বা কল্পনাবিভবের এবং রসাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাল যেমন সুরের সহকারী মাত্র, কাব্যের ক্ষেত্রে বাহ্যিক মিলনাত্মক ছন্দটাও সহকারী বই নহে; উপরন্তু এ ক্ষেত্রে উহার প্রভুত্বের অনুপাতও অনেক কম। মধুসূদনের দৃষ্টান্তের পর হইতেই বাঙ্গালার কবিগণ পয়ার এবং লাচাড়ীকে নিজ নিজ ভাবগতিক বিমিশ্রপথে পরিচালন পূর্ব্বক নব নব বস্তুসাধনায় মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছেন; ছন্দের 'বাঁধা গৎ' বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন। এই ব্যাপারের মাহাত্ম্য স্বল্পকথায় শেষ করা যায় না। আমরা উপস্থিতক্ষেত্রে মধুসূদন হইতে কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকের বিচারের জন্য রাখিয়া অগ্রসর হইব—

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ
রাবণ—বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নত ভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি;
নীরব সচীববৃন্দ অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষপুরবাসী রক্ষ—আবালবনিতা-
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী—আঁধার রে এবে
গোকুল ভবন যথা শ্যামের বিহনে।
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

যদৃচ্ছভাবে উদ্ধার করিয়াছি। তৃতীয় চরণের অলঙ্কারটি মধুসূদনের কাব্যচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইলেও, তদ্ভিন্ন এস্থলে অন্ত কোন অলঙ্কার বিশেষ প্রভুতা দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু ছন্দ! কবির হৃদয়গত ভাব-মূর্ত্তিই অপরূপ ছন্দগতি অবলম্বনে পাঠকের হৃদয়ে নিজকে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে! বাঙ্গলা পয়ার এবং লাচাড়ী এই কতিপয় পংক্তির মধ্যে বিরামযতির শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, অক্ষরসংখ্যাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল কমা সেমিকোলন দাঁড়ীর উপরেই নির্ভর করিতেছে! কখন ধীর গতিতে, কখন দ্রুতপদে চলিয়া, কখন বা একেবারে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইয়া, আমাদের মনে কি অপরূপ রেখাবিন্যাস করিয়া চলিয়াছে! এবং শেষের দুটি চরণের প্রবাহ সাহায্যে আমাদের মানসনেত্রের সমক্ষে সমগ্র শোভাযাত্রার ধীর বিষণ্ণ প্রবাহ-মূর্ত্তিটুকু কি অনুপম ভাবে অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে!*

* এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মধুসূদনের এই চতুর্দ্দশাক্ষরচরণযুক্ত অমিত্র পয়ারকে আরও স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক বোলমাত্রায় এবঞ্চ একেবারে মাত্রা-অধিকারের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবাহিত করার চেষ্টাও চলিয়াছিল। উহাকে রঙ্গালয়ের মধ্যে আনিয়া (সম্ভবতঃ কণ্ঠস্থ করার সুবিধা সম্মুখে রাখিয়াই) গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা জন্মিয়াছে কি না সে বিষয়ে পাঠমাত্রেই সন্দেহ হইতে থাকে। গিরীশ বাবুর অভিনেয় নাটক রচনার শক্তি অসাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, তাঁহার কবিত্বশক্তি—ভাবকে কাব্যরসাত্মক ছন্দে আকার দান করার শক্তি, যথোচিত ছিল না বলিয়াই ধারণা জন্মে। অমিত্র ছন্দের মূল তত্ত্ব, যাহা মধুসূদনের মধ্যে এত উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, উহার যথার্থ ধারণা আমাদের অভিনেয় নাটকগুলির মধ্যে কদাচিৎ মিলিতেছে! এ কালের অনেক অভিনেয় নাটকের মধ্যে এমনও দেখা যায়, যে পর্য্যন্ত গদ্যে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে সে পর্য্যন্ত উহা বেশ চলনসই ভাবেই চলিতে থাকে; কিন্তু যেই ভাবের কোন একটা উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হওয়া, অমনি পাত্রগণ অমিত্র ছন্দের বুলি গ্রহণ করিলেন, আর সমস্ত রস বিচিকিৎস ভাবেই নিহত হইয়া গেল! অনেক স্থলে বিপরীত হাস্যরসই উদ্রিক্ত হইয়া পড়ে! ইহার প্রধান কারণ হয়ত লেখকের শক্তির অভাব। কিন্তু ইহা জোরের সহিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বেচ্ছাচারী অমিত্র পয়ার এখনো বাঙ্গালার কবিতার আমল লাভ করিতে পারে নাই।

মধুসূদনের পর হেম নবীন প্রভৃতি কবিগণ কতমতে এই পয়ার এবং লাচাড়ীর মিশ্র পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং পরিশেষে বঙ্গদেশের অতুলনীয় সঙ্গীতচ্ছন্দের কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়া এই মিশ্রচ্ছন্দ যে কত শত সহস্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই মিশ্রচ্ছন্দের নানা পরিণতি অনুসরণ করিয়া একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে পারা যায়। তবে, এ স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, বাঙ্গলায় শ্লোক-স্তবক বা Stanzaর প্রচলন। উহা হইতেই বাঙ্গালী কবির হৃদয় স্বাধীন-ভাবে পরিচালিত হইবার পক্ষে অনন্ত সম্ভাব্য-তার ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দ চারিটি চরণেই আবদ্ধ ছিল, বৃত্ত এবং জাতি ছন্দ "তভজ" প্রভৃতি দশটি "গণের" সাহায্যে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য দখল করিয়া আছে—

মিশ্রচ্ছন্দ ও শ্লোক-স্তবক।

আধুনিক সাহিত্যে ছন্দের নূতন পন্থা।

"সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।"

সংস্কৃত ছন্দ চারি চরণের এই দেওয়াল-দেওয়া কারাগার অতিক্রম করিতে পারে না; গ্রীক এবং লাটিন ছন্দও এই প্রকারে "মিটারের" পাশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য ছিল। অমিত্র ছন্দ বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অপিচ ইয়োরোপীয় সভ্যতার নব জীবনের (Renaissance) আবিষ্কার— অভিনব স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে জাগ্রত ইটালীর আবিষ্কার। তৎপূর্ব্বে ফরাশি দেশে উহার কথঞ্চিৎ উদ্ভাবনা ঘটিয়া থাকিলেও ইটালিই ইয়োরোপকে এই শিক্ষা দিয়াছিল; তদ্ব্যতীত, ইটালি ইয়োরোপকে (এই ষ্ট্যাঞ্জার পন্থায়) উহার কাব্যছন্দকে 'মিটারের' অপরিবর্ত্তনীয় ছাঁচ হইতে মুক্তি-লাভ পূর্ব্বক যদৃচ্ছ ভাবগতির অনুসরণে লীলায়িত হইবার রহস্যও শিক্ষা

দিয়াছে। গ্রীক লাটিনকে নানা দিকে আত্মসাৎ করিয়া আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির সৃষ্টি এবং উন্নতি—উহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিও ষ্ট্যাঞ্জার পরিচয় লাভ করিয়াই আধুনিক জীবনের বহু-বিমিশ্র ভাবগতি এবং আন্তরিকতাকে সমুচিত বাক্যে প্রকাশ পূর্ব্বক নিত্য নব-নব ছন্দ প্রয়োগে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের বঙ্গভাষাও প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃতকে আত্মসাৎ করিয়াই গঠিত; মধুসূদনের মধ্যে আসিয়াই উহা নিজকে ইয়োরোপীয় সমস্ত আধুনিক ভাষার সমধর্ম্মী বলিয়া আত্মপরিচয় লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে বসিবার জন্ত উচ্চাভিলাষ অনুভব করিয়াছিল। মধুসূদন যেমন চতুর্দ্দশ চরণের কবিতাবলিতে আধুনিক ইয়োরোপের 'সনেট'কে ধারণা করিয়াছেন, তেমন তাঁহার "রসাল ও স্বর্ণলতিকা", "মেঘ ও চাতক" এবং "আশার ছলনা" ও "বঙ্গভূমির প্রতি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র কবিতায় এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যেও বাঙ্গালার শৃঙ্খলবদ্ধ ত্রিপদী-চৌপদীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতায় দীক্ষিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র 'অবকাশ-রঞ্জিনীর' মধ্যে, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র তাঁহার কবিতা-

মিশ্রছন্দের বিকাশ।

বলীর "লজ্জাবতী লতা" "পদ্মের মৃণাল" এবং পিণ্ডারীয় "ওড্"গুলির মধ্যে এই ষ্ট্যাঞ্জাকেই সর্ব্বাপেক্ষা সতর্কভাবে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-নাথের "স্বপ্ন-প্রয়াণ", বিহারীলালের "শারদামঙ্গল" ও "বঙ্গসুন্দরী", সুরেন্দ্রনাথের "মহিলা" বঙ্গীয় পয়ার এবং লাচাড়ীকে নব নব ষ্ট্যাঞ্জার মূর্ত্তি মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ইহাঁদের পর, রবীন্দ্রনাথ যে শক্তি লইয়া বাঙ্গালার আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহা বিশেষভাবেই সঙ্গীত-অধিকারের শক্তি। তাঁহার অগণিত ছন্দের মূল রহস্ত এই মনে হয়, যেন ছন্দটাই তাঁহার মনে সর্ব্বাগ্রে কবি-প্রতিভার ভাবোদ্দীপনায় সুররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরে পরে

বাক্যচ্ছন্দে আকারপ্রাপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ একটি মৌলিক এবং অসাধারণ ছন্দপ্রতিভার পুণ্য-সঙ্গম হইতে বঙ্গবাণী যে অত্যল্প কালের মধ্যেই এক অভিনব গীতিকবিতার ফসলে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবে, এবঞ্চ নিজের বৈষ্ণবী কাব্যকলাকেও সঙ্গীত এবং কবিতার মধ্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া অভিনব ভাবগত-কবিতার সৃষ্টি করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইয়োরোপের সমক্ষে নিজের একটা বিশেষ উপার্জ্জন উপস্থিত করিতে পারিতেছে। গ্রীক লাটিনের ওড্, ইটালির সনেট, জাপানের তানকা, পারস্যের "গজল" এবং "রুবাই" প্রভৃতি জাতীয়-বিশেষত্ব-জ্ঞাপক কবিতার ন্যায়, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও "বাঙ্গালী গীতিকবিতা" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র ভাবগতিক কবিতা-মূর্ত্তি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিতে পারিতেছেন। আমাদের এই গীতিকবিতা বিজাতীয়ের দৃষ্টি সমক্ষে, বাক্যচ্ছন্দের ন্যূনাধিক দেশীয় মাহাত্ম্যটুকু বাদ রাখিয়াও, কেবল ভাবের স্বাতন্ত্র্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে।

বঙ্গীয় ছন্দে রবীন্দ্রনাথ।

বাঙ্গালীর গীতিকবিতা।

আমরা এতক্ষণ কেবল লঘু-গুরু-বিচারহীন পয়ার এবং লাচাড়ীর দৃষ্টান্তই দর্শাইয়া আসিলাম। ইহা ব্যতীত বঙ্গভাষায় আর এক প্রকার পয়ার এবং লাচাড়ী আছে; অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ-কবিতার প্রকৃতিমধ্যে এই লক্ষণ বিকশিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বর-মাত্রিক ছন্দ। আমরা জানি সংস্কৃত ছন্দ মাত্রেই স্বর-মাত্রিক; স্বরবর্ণ ই সংস্কৃত ছন্দের নিয়ামক, ব্যঞ্জন বর্ণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে বই নহে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে স্বরের

লঘুগুরু উচ্চারণ মূলক পয়ার ও লাচাড়ী।

নামই অক্ষর; সংস্কৃত শাব্দিকগণের মতে এই সমস্ত স্বর অবিনশ্বর ধ্বনি; এবং উহাদের বিকাশেই যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া, একমাত্র বর্ণ হইতেই—শব্দব্রহ্ম হইতেই সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। যা হউক, এই স্বরবর্ণ ই সংস্কৃত ছন্দের প্রধান শক্তি! রুদ্রজামল বলিয়াছেন—

"স্বরা অক্ষরসংজ্ঞাঃ স্যু র্হলস্তদনুযায়িনঃ।

বাঙ্গালা ছন্দও মূলতঃ স্বরমাত্রিক সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদ অনেক দিকে পরিহার করিয়া, স্বর-পরিস্ফুট ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনের উপর এত অধিক জোর দিয়াছে যে, ব্যঞ্জনকে বাদ দিলে বঙ্গীয় ছন্দের অস্তিত্বই দাঁড়াইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতিবশে বৃত্তছন্দই তাহার প্রধান ঐশ্বর্য্য; উহার দ্বারা সংস্কৃতে অতি বিস্ময়কর ছন্দ-সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। সচরাচর অলঙ্কার-শাস্ত্রে ৩৫০টি ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দের আদি-দার্শনিক পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াছেন, উহার ছন্দসংখ্যা (১৬৭৭৭০১৬) এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার ষোলটা হইতে পারিবে। স্বরবর্ণের লঘু গুরু এবং হ্রস্ব দীর্ঘতার মাহাত্ম্য হইতে এই অভাবনীয় ঘটনার সম্ভব হইয়াছে! অথচ বেদে সাতটির অধিক ছন্দ নাই। এই অল্পসংখ্যক মৌলিক ছন্দ হইতেই এত সমস্তের উৎপত্তি! এখন, বঙ্গভাষা স্বরের লঘু গুরু উচ্চারণ অগ্রাহ্য করার দরুণেই তাহার পক্ষে সংস্কৃত ছন্দের এই অনন্ত মাহাত্ম্য অর্জ্জন করা অসম্ভব। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে, সংস্কৃত উচ্চারণের *রীতি প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে আদিকাল হইতেই কবিগণের মধ্যে অশ্রান্ত চেষ্টা পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল।* এই চেষ্টা কোথাও একেবারে নিষ্ফল হইয়া, কোথাও বা চলন-সই সুফল প্রসব

বঙ্গীয় ছন্দের সীমা।

করিয়া পরিশেষে বঙ্গভাষার মধ্যে ন্যূনাধিক স্বাধীনভাবের একটা স্বর-বর্ণাত্মক ছন্দরীতি স্থির করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ বিদ্যাপতি এবং ভারতচন্দ্রের মধ্যেই, এ চেষ্টার দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাঁরা প্রাচীন বঙ্গীয় ছন্দের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের ছন্দের কাণ এত তীক্ষ্ণ যে, দেখিবেন বাঙ্গালার এই স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রধান লক্ষণগুলি তাঁহাদের মধ্যেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ধারাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম, সংস্কৃতনিয়মে লঘু গুরু উচ্চারণ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা; দ্বিতীয়, নিখুঁত সংস্কৃত ছন্দের প্রচলন।

বঙ্গে স্বর-বর্ণাত্মক ছন্দের রীতি।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাই সংস্কৃতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী। এমন কি, বিদ্যাপতি পাঠ করিতে বসিয়া স্বরবর্ণকে অনেকটা সংস্কৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ করিতে না পারিলে, দীর্ঘ বর্ণকে অথবা সংযুক্তপূর্ব্ব-বর্ণকে দীর্ঘরূপে উচ্চারণ পূর্ব্বক গণনার সময় উহাদিগকে দ্বিমাত্রা বলিয়া না ধরিলে, এক কথায় বাঙ্গলা উচ্চারণ নানাদিকে বিস্মৃত না হইলে, তাঁহার কবিতার প্রধান রসটাই আমাদের রসনা হইতে দূরবর্ত্তী থাকিয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে প্রধান কথা এই যে, বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ব্রজবুলি ব্যবহারের—সংস্কৃত এবং অর্দ্ধ-হিন্দি-মিশ্র অপ্রচলিত ভাষা ব্যবহারের—প্রধান কারণটাও হয়ত এ স্থলেই মিলিবে। তাঁহারা সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণের আবছায়া রক্ষার উদ্দেশ্যেই যেন 'আটপৌরে' ব্যবহার হইতে দূরবর্ত্তী একটা ভাষা কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু, স্বীকার করিতে হইবে, বিদ্যাপতির চেষ্টা সকল দিকে সফল হয় নাই। তবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চরণের

বৈষ্ণব কবিতায় স্বরাত্মক ছন্দের সন্দিগ্ধ রীতি।

মধ্যে যে-স্থলে সফল হইয়াছে, উহারাই অনেকসময়ে ভাব ভাষা এবং ছন্দধ্বনির ঐক্যতান ঘটনার দিক্ হইতে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া প্রতীতি হইবে।

বিদ্যাপতির দুইটি অতুলনীয় পয়ারপংক্তি গ্রহণ করুন—

| | | |
"কি কহব রে সখি। আনন্দ ওর।
| | | |
চিরদিন মাধব। মন্দিরে মোর॥"

ইহা একটা ষোড়শাক্ষরমাত্রিক পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত। ইহার প্রধান শক্তি দীর্ঘ বর্ণের এবং সংযুক্তপূর্ব্ব বর্ণের সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণ; উপরন্তু দীর্ঘ মাত্রাকে দ্বিমাত্রা বলিয়া গণনা। এই গণনার নিয়ম সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রে আছে—

'এক মাত্রো ভবেদ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।'

এইরূপ আর কতিপয় পংক্তি—

লোচন জনু থির। ভৃঙ্গ-আকার
মধু মাতল কিয়ে। উরই ন পার!
নীর ক্ষীর দুঁহু। করই সমান।

বলা বাহুল্য, এইরূপে বিদ্যাপতির মধ্যে সংস্কৃতরীত্যনুযায়ী দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয় এমন পয়ার ছন্দ যথেষ্ট আছে। লাচাড়ী ছন্দেরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন—

পাঁচ বাণ অব। লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা।

ইহার প্রথম দুই চরণে আটটি করিয়া অক্ষর, তৃতীয় চরণে বারটি। এ দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ বর্দ্ধিত করা যায়—

চন্দন-তরু যব, সৌরভ ছোড়ব।
শশধর বরিখব আগি।

চিন্তামণি যব, নিজ গুণ ছোড়ব,
কি মোর করম অভাগি!

কিন্তু, উহাদের নিকটবর্ত্তী পংক্তিগুলি ধরুন—

সোহি কোকিল। অব লাখ ডাকহু
লাখ উদয় করু চন্দা।

অথবা—

সিন্ধু নিকটে যদি। কণ্ঠ শুকায়ব।
কো দূর করব পিয়াষা।

এই সমস্ত চরণের উচ্চারণে খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইতে না পারিলে চলিবে না।

এইরূপে, বিদ্যাপতি কেন সকল বৈষ্ণব কবির কণ্ঠেই সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা রীতির মধ্যস্থলে অস্থির ভাবে দোলায়মান হইতে দেখিবেন।

[বঙ্গে সংস্কৃত রীতির ছন্দ চেষ্টা]

বাঙ্গলা ছন্দ কোন্ পথে স্বাধীন ভাবে সংস্কৃতের ছন্দধ্বনিকেও যথাসাধ্য অর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে, এই প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা সতর্ক ভাবে কাহারও মনে না জাগিয়া থাকিলেও, অতর্কিতে সকলেই যেন সংশয়ারূঢ় হইয়া এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিয়াই চলিতেছিলেন। সংস্কৃতমূলক শব্দের উচ্চারণ-বিষয়ে কিছুমাত্র অপেক্ষা না থাকিলেও, বাঙ্গলা বিভক্ত্যন্ত পদের উচ্চারণ-সমূহ তাঁহাদের সমক্ষে অনতিক্রম্য অন্তরায় উপস্থিত করিতেছিল—বাঙ্গলা পদের উচ্চারণ সংস্কৃত অনুযায়ী হইতে গিয়া সময় সময় নিতান্ত অস্বাভাবিক ঠেকিতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও একস্থলে এইরূপ সন্দিগ্ধ রীতির দৃষ্টান্ত আছে,—

আধই হৃদয়ে। হাড়ের মালা,
আধ মণিময়। হার উজালা,

আধ গলে শোভে। গরল কালা,
আধাই সুধা। মাধুরী রে।
এক হাতে শোভে। ফণিভূষণ,
এক হাতে শোভে। মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ। ধুতুরা ভক্ষণ,
আধই তাম্বুল পূরি রে।

বলা বাহুল্য, এই ছন্দকে কোন্ নিয়মে পাঠ করিলে উহার মাধুর্য্য (melody) বা পদগতির সৌষ্ঠব (rythm) রক্ষিত হইবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত যখন স্বয়ং ভারতচন্দ্রের মধ্যেই মিলিতেছে—এবং এই দোষ অতর্কিত নহে—তখন, দেখিবেন, বিষয়টি কত গুরুতর আকারে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। উহার ফল এই দাঁড়াইল যে, তাঁহারা মাত্রাচ্ছন্দে বাঙ্গালা পদ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিতে, অথবা বাঙ্গালা পদের ইচ্ছানুরূপ বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টিত হইলেন। এইরূপে যে-ছন্দ জন্মপরিগ্রহ করিল উহাকে ঠিক বাঙ্গলা বলা যায় কি না সন্দেহ; সংস্কৃত ভাষাই কেবল নিজের অনুস্বার বিসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিল বই নহে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা পদের বেশী তফাৎ রহিল না। গোবিন্দদাস গাহিলেন—

ঈসৎ হসিত বদনচন্দ,
তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্দ।
বিম্ব-অধরে মূরলি ঘুরলী
ত্রিভুবন মনোমোহিনী।
কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ-
নিচয়রচিত মুকুট
মকর-কুণ্ডল-দোলনী।

সুন্দরী রাধে আওএ বনি
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি।
আভরণধারিণী নব-অনুরাগিণী
রস-আবেশিনী তরঙ্গিণী রে!
অঙ্গতরঙ্গিণী অধর সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব-নব-রঙ্গিণী রে।
নব-অনুরাগিণী নিখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী-রূপিণী রে।
রাস-বিহারিণী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিত-মোহিনী রে।

ইহার পর ভারতচন্দ্র আসিয়া বাঙ্গালা শব্দ এককালে পরিহার করিয়া হ্রস্বদীর্ঘ নিয়মের নির্ম্মল মাত্রা-ত্রিপদী এবং চৌপদী গাঁথিয়া গেলেন—

নগনন্দিনি। সুরবন্দিনি। চিরনন্দিনি। গো।
জয়কারিণি। ভয়হারিণি। ভবতারিণি গো।
জয়তি জননি অন্নদা।
গিরিশ-নয়ন-নর্ম্মদা।
অখিল ভুবন-। ভক্ত ভক্ত। ভুক্তি-মুক্তি-শর্ম্মদা॥
তরুণ কিরণ। কমল-কোষ। নিহিত চরণ চারদা।
ভব-নিপতিত। ভারতস্য। ভবজলনিধি-পারদা॥
জয় স্মরারিনাশন। বৃশেষবাহন। ভুজঙ্গভূষণ। জটাধর,
জয় হিমালয়ালয়। মহামহোময়। বিলোকনোদয়। চরাচর॥

বলা বাহুল্য, সংস্কৃত রীতির উচ্চারণজনিত ধ্বনিগৌরবে মুগ্ধ হইয়া ভারত-চন্দ্রের প্রদর্শিত পথে আধুনিক কালেও বহু কবি মাত্রিক নাচাড়ী রচনা করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই তাঁহাদের অগ্রণী।

ইহার পর এই দিকে আর একটিমাত্র কার্য্য ছিল; তাহা একেবারে সংস্কৃত বৃত্তছন্দকে বাঙ্গলায় প্রচলিত করার চেষ্টা। অবশ্য, ভারতচন্দ্রের মধ্যেই উহার উৎসাহ মূর্ত্তিমান না হইয়া পারিত না; উহা হইতেই ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার সমকালীন রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় তূণক তোটক ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতির প্রবর্ত্তন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের সময় পর্য্যন্ত, উপরন্তু একালেও বহু লেখকের মধ্যে এতজ্জাতীয় উৎসাহ থাকিয়া-থাকিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত না তুলিলে বাঙ্গলা ছন্দের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে—

নিঁখুত সংস্কৃত অনুযায়ী ছন্দের প্রচলন চেষ্টা।

তূণক—

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুলস্থুল কূলকূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া
ঘোর বেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা,
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরে দক্ষ অরে দক্ষ দেরে সতীরে।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।

তোটক—

শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে,
তুঁহি পঙ্কজিনি মুঁহি ভাস্কর লো।

ছন্দ-সন্নিবিষ্ট বাক্যের এই ধ্বনি এই আবেগ এবং এই শক্তি বঙ্গভাষায় এখন পর্য্যন্ত অতুলনীয় বলিতে হইবে। উহার গুণকীর্ত্তনে আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইমাত্র বলিব যে, সংস্কৃতরীতির ধ্বনিগৌরব বা পদলালিত্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই বহু লেখক—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বলদেব পালিত, ভুবনমোহন চৌধুরী প্রভৃতি পরেপরে আরও অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গলায় অবতারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুষ্টুপ্ পজ্ঝটিকা শশীবদনা মালিনী মন্দাক্রান্তা শিখরিণী শার্দ্দুলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বারংবার পরীক্ষিত হইয়াছে; বাঙ্গলাছন্দের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। উপরোদ্ধৃত সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যের চরণগুলি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাশব্দকে সংস্কৃত ছন্দে বসাইতে গিয়া ব্যাকরণের বিশুদ্ধি বিষয়ে পরম অপ্রমত্তবুদ্ধি ভারতচন্দ্রকেও স্থানে স্থানে প্রমাদ ঘটাইতে হইয়াছে; তিনিও হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব উচ্চারণের "কারসাজি" করিয়াই চলিয়াছেন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বারা বরং সংস্কৃতের বৃত্তছন্দকে বাঙ্গলার পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই যেন ধারণা জন্মিতে থাকে। যে কয়টি কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারা যায়, ভারতচন্দ্র যেন তাহার শেষ পর্য্যন্তই দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তোটক যেমন বিলাতী সাহিত্যের পরম শক্তিশালী anapest, তূণক তেমন তেমনি trochee। উহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বাঙ্গলা ছন্দের

বঙ্গভাষার প্রকৃতি মধ্যে সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণের সীমা।

শক্তি অপরিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিত। কিন্তু নিয়তির নিদারুণ পরিহাস এই যে, আর্য্যচ্ছন্দের মহিমান্বিতা ভাগীরথী আমাদের কর্ণরুচি হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন; এখন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইলে দুরবগাহ বালুচর এবং মরুকঙ্কর ব্যতীত আর কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গালায় আনিতে গিয়া ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, লেখকগণ প্রাণপণে বাঙ্গালা শব্দের 'পাশ কাটাইতে' চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও অপরিহার্য্যস্থলে বাঙ্গলাপদ নিতান্ত বেগতিক না হইয়া পারে নাই। দৃষ্টান্ত উদ্ধারপূর্ব্বক একটা সাধুচেষ্টা—অথচ দৈব-দুর্ব্বিপাকে নিদারুণ নিষ্ফলতার প্রতি আপনাদের হাস্য উদ্দীপ্ত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। আধুনিক কালে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার একজন সংস্কৃত-অভিজ্ঞ অথচ শক্তিশালী কবি। তাঁহার পরীক্ষাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বৃত্তের ক্ষেত্রে অতিশয় সুন্দর বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার রচনা হইতেই কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি—

প্রচণ্ড সূরয অস্তাচল-গত;
প্রতপ্ত ধরণী ধীরে প্রশমিত।
শীতল মৃদু মৃদু দক্ষিণ বাতে
পুষ্পিত কানন রম্য দিনান্তে॥
বিহঙ্গ-গানে কুসুমের বাসে
সুশ্যাম কুঞ্জে নবচন্দ্র হাসে।
বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত
মধু ক্ষরে রে উপজাতি নিত্য।

বসন্ততিলক যথা—

উৎফুল্ল পল্লবদলে কুসুমের পুঞ্জে
সপ্তচ্ছদে মদভরা সিত পুষ্পকুঞ্জে।

শেফালিকা-তরুতলে মুচুকুন্দ মুঞ্জে
নাগেশ্বরে মদনমত্ত দ্বিরেফ গুঞ্জে।

মালিনী—

বিহগ শিশির-পাতে ধুনিলা আর্দ্র পাখা,
শ্বসিল পবন কুঞ্জে মর্ম্মরে শুষ্ক শাখা,
অবিরত বনবালা পীড়িতা হে অনঙ্গে,
বিরচিল কবি গাথা মালিনী সর্গভঙ্গে।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—

গাহে কোকিল চূত-চম্পকবনে ঢালে সুধা চন্দ্রমা,
হাসে কিংশুক পাটলা বিকশিয়া শোভা সুবর্ণোপমা,
পুষ্পামোদভরে সমীরণ সদা ক্রীড়াবেশে কম্পিত,
আনন্দে কবি বর্ণিলা বিরচিয়া শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

স্বীকার করিব যে, বঙ্গভাষায় 'গোঁড়া' সংস্কৃতের ছন্দধারণার এ গুলি উত্তম দৃষ্টান্ত। বিজয়চন্দ্রের সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলার নিয়মে অন্ত্যব্যঞ্জনের মিল রক্ষাপূর্ব্বক বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি, কিংবা অকারন্ত পদের সহিত দেখা হইলেই কি সন্দেহ হইতেছে না—এ সমস্ত বাঙ্গালা উচ্চারণ কি? এই সমস্ত ছন্দ-উদাহরণের মধ্যে অনেক শব্দকেই এমন সংস্কৃত ধরণে উচ্চারণ করিতে হয়, যাহা বাঙ্গলা উচ্চারণ নহে। সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিটি বেশ ভালরূপে জানা না থাকিলে এ ছন্দ পড়া যায় না; বাঙ্গলা ধরণে উচ্চারণ করিয়া পড়িলে পদেপদেই ছন্দের পতন হয়। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উপযোগিতাবিষয়ে কুতূহল সার্থক করা ব্যতীত উহাদের অন্ত মাহাত্ম্য যেন প্রবল হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গলা উচ্চারণের ধাতু ঠিক বজায় রাখিয়া, সংস্কৃত ছন্দ-রচনায় দুই-এক স্থানে কৃতিত্ব দেখাইতে

পারিয়াছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাহার দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সে সব ছন্দের সংস্কৃতপ্রকৃতি না জানিয়াও বাঙ্গলা উচ্চারণে পড়িয়া গেলে ছন্দের স্বরূপটি আপনা হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

কিন্তু এই চেষ্টা এবং বিফলতাবোধ হইতেই বঙ্গসাহিত্য একদিকে অশেষ লাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছিল। আমরা এই সূত্রে বাঙ্গলা পয়ার এবং লাচাড়ীর অপর একদিকের বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই উপসংহারে উপস্থিত হইব। বাঙ্গলায় সংস্কৃত রীতির স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য আদিকাল হইতে যে চেষ্টা হইয়াছে, এবং সেই চেষ্টার শিলাতলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক কবি 'মাথা

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত প্রভাব হইতে দূরবর্ত্তী স্বতন্ত্র মাত্রিক ছন্দ।

খুঁড়িয়াছেন'—তাহা আমরা দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব হইতে বহুদূরে, বাঙ্গালীর গৃহকোণ হইতেই বঙ্গভাষায় আর একটি স্বাধীন অথচ অক্ষরমাত্রিক ছন্দ-বিকাশের ধ্রুবচেষ্টা অতর্কিতে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। বৈষ্ণব কবিগণ এবং পরবর্ত্তী সভ্য কিংবা সভাসদ কবিগণ উহার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি করিতে পারেন নাই—সাধু বাঙ্গলা উহাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন কবি পদ্যের ভাষাকে গদ্য হইতে নানাদিকে পৃথক করিয়া তুলিয়াছিলেন; সংস্কৃত শব্দের সংপ্রসারণ এবং বিপ্রকর্ষণ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্য হইতে accent নামক পদার্থটি যেন নির্ব্বাসিত করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত বৃত্ত-অনুকরণের বহিঃক্ষেত্রে বাঙ্গালা পদ্য কেবল কতকগুলি 'ঝারাঝুরা' ব্যঞ্জন বর্ণের সমষ্টি হইয়া পড়িতেছিল। লিখিত গদ্য অথবা কথিত ভাষা হইতে বহু দূরবর্ত্তী এই যে পদ্যভাষায় সৃষ্টি, ইহার তুলনা অন্য কোন দেশে সুলভ নহে; মধুসূদন তদ্বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ভাবের বাধ্য হইয়াই, মেঘনাদবধের মধ্যে সময়সময় তুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দের বজ্র-করতাল বাজাইতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্গভাষা যে পরিমাণে লঘুগুরু বা উদাত্ত অনুদাত্ত উচ্চারণ অনুসরণ করিতে পারে, তাহার পরিচয় হয়ত এই পরিত্যক্ত রীতিতে,—'ঘোরো' রীতিতে বা পূর্ব্বকথিত ছড়ার মধ্যেই মিলিবে।

উচ্চারণে খাম খেয়ালী অথচ স্বাতন্ত্র্য

ছড়া আমাদিগকে যেমন লাচাড়ীছন্দ শিখাইয়াছিল, তেমনি উহা আমাদের ভাষায় একটা accent মূলক উচ্চারণপদ্ধতিও গোপনেগোপনে জাগাইয়া রাখিতেছিল; উহার দিকে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হয় নাই, তেমন বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও, উপরে উদ্ধৃত দুই চারিটি স্থল ব্যতীত, উহার বিশেষ আমল নাই। এ স্থলে বলিয়া ফেলা উচিত যে, সময় সময় খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া চলিলেও উহাই স্বাধীন বাঙ্গলা উচ্চারণ। আমরা যেমন সংস্কৃত নিয়মের অনেক দীর্ঘ বর্ণকে অনুদাত্ত উচ্চারণ করিতেছি, তেমনি অ-কারান্ত উচ্চারণের বাহুল্য বলিয়া সংস্কৃত শব্দের বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ আছে আমরা হলন্ত বা ওকারান্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত অভিযোগও অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছি; মোটের উপর, সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্বর ব্যতীত আমাদের মধ্যে বাঁধাবাঁধি দীর্ঘ উচ্চারণ নাই বলিলেও চলে। আমরা এইরূপে হলন্ত উচ্চারণ করিয়াহ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা বা accent উৎপাদন পূর্ব্বক, একদিকে ভাঙ্গিয়া অন্যদিকে গড়িতেছি বই নহে। বাঙ্গালার লিখিত এবং উচ্চারিত ভাষার মধ্যে এই বিরোধ, 'সংস্কৃত বর্ণবিন্যাস বনাম বাঙ্গালা উচ্চারণ', ক্রমে সমস্যা-

বাঙ্গালার উচ্চারণ সমস্যা।

আকারে উপস্থিত হইতেছে। অবশ্য, কালে ইহার একটা কূল মিলিবে। যাহোক, উচ্চারণের এই প্রাকৃত রীতিই ছড়ার প্রাণ। প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা বরং কবিওয়ালা ঝুমুর খেউড় এবং পাঁচালী গায়কগণের মধ্যেই উহা সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। দাশরথি যখন গাইতেন—

দিহু পুরুত মন্ত্র পড়ায় অর্দ্ধেক তার ভুল,
কিন্তু নাপিত দাড়ী কামায় অর্দ্ধেক তার চুল।

তখন তিনি খাঁটি বাঙ্গলার accent মূলক লাচাড়ীই ব্যবহার করিতে-ছিলেন। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যকারগণের মধ্যেও এ প্রণালী নানাদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রহসন এবং প্রাকৃত ভাবের লেখাগুলিতে উহার পরিচয় আছে। রবীন্দ্র-নাথ তাঁহার কড়ি ও কোমল এবং মানসীতে স্থানে স্থানে উহার আশ্রয় লইয়াছেন। ক্রমে এই প্রণালী সমধিক স্থিরতা এবং পরিমার্জ্জনা লাভ করিয়া তাঁহার ক্ষণিকা খেয়া ও আধুনিক রচনা-গুলির মধ্যে, এবং দেখাদেখি বহু তরুণ কবির মধ্যে, তরল নর্ম্ম-কৌতুক বা ছড়াকাটার লক্ষণ অতিক্রম পূর্ব্বক 'তত্ত্ব'-ভাবেও প্রকাশ পাইতেছে।

প্রাচীন কাল হইতে উক্ত স্বাতন্ত্রের বিকাশ।

আমরা মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার গতি অনুসরণ করিতেছি—

যেমন কর্ম্ম। তেমনি ধর্ম্ম। বুড়ো শালিকের। ঘাড়ে রোঁয়া।

—মধুসূদন।

হায় কি হলো। বঙ্গদর্শন। বঙ্কিম্ দিলে ছেড়ে।
হায় কি হলো। দেশটি গেল। সাপ্তাহিক জুড়ে।

—হেমচন্দ্র।

রাত পোহালো। ফর্সা হলো। ফুটলো কত ফুল॥
এলো চুলে। বেনে বউ। আল্‌তা দিয়ে পায়।

—দীনবন্ধু।

সাতটি চাঁপা। সাতটি গাছে। সাতটি চাঁপা ভাই।
রাঙা-বসন। পারুল দিদি। তুলনা তার নাই॥
পা ছড়িয়ে। বস্‌রে হেথায়। সারা দিনের শেষে,
তারায় ঘেরা। আকাশ-তলে। সব-পেয়েছির দেশে।

—রবীন্দ্রনাথ।

সদাই তখন। কাব্যরসে। ভরে থাক্‌ত মন্‌টা,
পয়ার্‌ লিখেই। কেটে যেত। জিওমেট্রি্র ঘন্‌টা।

—বিজয়চন্দ্র।

এই-সমস্ত লাচাড়ী কি উপায়ে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত উচ্চারণ করিয়া উহাদের স্বরমাত্রার সংখ্যা এবং তন্মধ্যে সৌষ্টব রক্ষা করিতেছে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে দিগক্ষরা এবং একাবলী পয়ারেও প্রসারিত করিয়াছেন—

আজ বুকের বসন। ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই। প্রভাতখানি,
আকাশেতে। সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল। তাহার বাণী।
সপ্ত ঋষি। গগন-সীমা হতে
কখন কোন্‌। মন্ত্র দিল পড়ি।
তিমির রাতি। শব্দবিহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল. অবতরি।
এক মনে তোর। একতারাতে
একটি যে তার। সেইটে বাজা;
ফুলবনে তোর। একটি যে ফুল
তাই দিয়ে তোর ডালি সাজা।

—রবীন্দ্রনাথ।

ওই দুধ-পাথরের। পরে রাখ
রক্তকমল। পা দুটি,
এস দুধ-পাথারের। লক্ষ্মী আমার
ক্ষীর-সাগরের। পদ্মটী। —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

তার গঙ্গাজলী। ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে। দিঘীর জল। —সত্যেন্দ্র।

দুখের বেশে এসেছ বলে। তোমারে নাহি। ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা। সেথায় তোমা। নিবিড় করি। ধরিব হে।
—রবীন্দ্রনাথ।

ক্রমে ইহার পুতন নূতন শক্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাকে মিশ্রছন্দেও অনুপম ভাবে অবতারিত করিতে পারা যায়—

আদি অন্ত। হারিয়ে ফেলে,
সাদা কালো আসন মেলে
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়ালী।
আমরা যে সব। রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ। ভেসে আসি
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালী।
মোদের কিছু। ঠিক ঠিকানা। নাই,
আমরা আসি। আমরা চলে যাই।

—রবীন্দ্রনাথ।

বলিতে পারা যায় যে, এই খোশখেয়ালী এবং ঠিকঠিকানা-বিহীন ছন্দই বাঙ্গলার একটা অপরূপ শক্তি। এই জঙ্গ্‌লাকে লাভ করিবার জন্য কোবিদগণ এবং কালোয়াৎগণও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন—

আবার মোরে। পাগল করে। দিবে কে?
হৃদয় যেন। পাষাণ হেন। বিরাগভরা। বিবেকে।
আবার প্রাণে। নূতন টানে। প্রেমের নদী
পাষাণ হতে। উছল স্রোতে। বহায় যদি,
আবার দুটি। নয়নে লুটি। হৃদয় হরে। নিবে কে?
আবার মোরে। পাগল করে। দিবে কে?

—রবীন্দ্রনাথ।

বঙ্গ-নির্ঝরিণীর এই তরল মধুর কুলু কুলু সুরের শক্তিটুকুই উচিত বিজ্ঞানীর হস্তে পড়িয়া উত্তাপে আলোকে বা তাড়িতে পরিণত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। এই অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শিশুকে দোলা দিতে জানিলে উহার দ্বারা হৃদয় মন বাঁধিতে পারা যায়—

ঝুলিয়ে দোলা। দুলিয়ে দে।
নরম আঁচে। সদ্য দুধের। ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে।
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক
এসেছে ঐ ঐন্দ্রজালিক,
অরাজকের আপন রাজা। রাখবে হৃদয় মন বেঁধে।
—সত্যেন্দ্রনাথ।

অথবা মনকে ইঙ্গিত এবং ঈষারার রাজ্যে লইয়া গিয়া তদ্গত অবসাদে আবিষ্ট রাখিতে কিংবা ঘুম-পাড়ানিয়া মাসীর ছায়া-নাট্যে ঘুরাইতে পারা যায়—

দিনের শেষে। ঘুমের দেশে। ঘোমটাপরা। ঐ ছায়া
ভুলাল রে। ভুলাল মোর প্রাণ,
ওপারেতে। সোনার কূলে। আঁধারমূলে। কোন মায়া
গেয়ে গেল। কাজ-ভাঙানো গান।
অস্তাচলের। তীরের তলে। ঘন গাছের। কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন। ছায়ার মত যায়,
ডাকলে আমি। ক্ষণেক থামি। হেথায় পাড়ী। ধরবে সে
এমন নেয়ে। আছেরে কোন্ নায়।

রবীন্দ্রনাথের এই পথে মেয়েলী ছড়ার ঘুম-নগরের রাজকুমারীর দেখাটাও কোন তরুণ কবি লাভ করিয়াছেন—

দেখা হল। ঘুমনগরের। রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যা বেলায়। ঝাপসা ঝোপের ধারে।

আবার নিপুণ নর্ত্তকের হস্তে পড়িলে এই পাগলী নাচাড়ী ছন্দ 'তুলকি চালে' এবং 'নৃত্য তালে' নাচিতে পারে; কলিকাতা সহরের উড়ে বেহারার কাঁধে চড়িয়াও তাল দিতে পারে :—

পাল্কী চলে রে
অঙ্গ ঢলে রে!
"আর দেরী কত
আরো কত দূর?"
"আর দূর কিগো
বুড়ো শিবপুর,
ওই আমাদের!
ওই হাটতলা
ওরি পেছু খানে
ঘোষেদের গোলা।"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

মন নাচিতে আরম্ভ করিলে এই ছন্দ দেহটাকেও নাচাইয়া পাছে পাছে তাল ঠুকিতে পারে—

মম চিত্তে। নিতি নৃত্যে। কে যে নাচে,
তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ। তাতা থৈ থৈ।

—রবীন্দ্রনাথ।

একেবারে মাথার মধ্যেই 'ঘুরপাক লাগাইয়া দিয়া' ভোলানাথী নৃত্য করাইতে পারে—

আমার ঘুর লেগেছে। তা ধিন। তা ধিন।
তোমার পিছন পিছন। নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে। তা ধিন্ তা ধিন্!
তোমার তালে আমার। চরণ চলে,

শুনতে না পাই। কে কি বলে,
তোমার গানে আমার। প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল। সেই জেগেছে।
—তা ধিন তা ধিন্।

—রবীন্দ্রনাথ।

কেবল একতালা তেতালায় নহে, এই পাগল ব্রহ্মতালেও নাচিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পথে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরবাসিনী লাচাড়ী ছন্দ হিমালয়পর্ব্বতবাসী পাগলা-ঝোরার মতই বিগলিততুষারভঙ্গভীষণ রুদ্র ছন্দে ছুটিয়াছে—দিন দিন উহার নূতন নূতন সঙ্গী জুটিতেছে—

পিছল পথে। নাইকো বাধা। পিছনে টান। নাইকো মোটে,
পাগলা ঝোরার। পাগল নাটে। নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে। ধাপে ধাপে। ঝাঁপিয়ে পড়ে। উচ্চ হতে
চড় চড়িয়ে। পাহাড় ফেড়ে। নৃত্য করে। মত্ত স্রোতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ।

বাঙ্গলা লাচাড়ী ছন্দ এইরূপে নৃত্য করিতে থাকুক্। বলা বাহুল্য, উহা এ যাবৎ কেবল নৃত্য করিতেই সবিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে;

পয়ারের ক্ষেত্রে উহার সীমা।

পয়ারের ক্ষেত্রে এই accent লইয়া গিয়া বিশেষ প্রতিভা দেখাইতে পারে নাই। হয়ত এই বিশেষত্ব কেবল লাচাড়ীর ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে। ইহা নিশ্চয় যে বিদ্যাপতি যখন অন্তর্যোগের পরম অনুভূতি রসোজ্জ্বল মুগ্ধ কণ্ঠে গাইয়াছিলেন—

শ্যাম পরশমণি। কি দিব তুলনা,
সে অঙ্গ-পরশে আমার। এ অঙ্গ সোনা!

তখন একরূপ অতর্কিতে এই accentএর ছন্দচেষ্টাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে এবং সকল পরবর্ত্তী কবির মধ্যে এই চেষ্টা কার্য্য করিয়া কতদিকে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা মোটামোটি দেখিয়া আসিলাম। ইহাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছেন—

নিম্নে যমুনা বহে। স্বচ্ছ শীতল
উর্দ্ধে পাষাণ তট। শ্যাম শিলাতল।

অথবা— সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।

তখন ভারতচন্দ্র বা মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে শব্দের সংপ্রসারণ বা বিপ্রকর্ষণ-প্রণালী পরিহার করিয়া সতর্কভাবে বাঙ্গালা পয়ার ছন্দকে স্বরমাত্রিক শক্তিদান করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রণালীকে ক্ষুদ্র কবিতা কিংবা খণ্ডশ্লোকের স্বল্প পরিসর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত করিতে কিংবা উহাকে অমিত্রচ্ছন্দে অথবা দীর্ঘ দীর্ঘতর পয়ারচ্ছন্দে প্রসারিত করিতে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। বঙ্গীয় পয়ারের প্রকৃতির মধ্যে ঐ শক্তি আছে কি না, উপযুক্ত প্রতিভা কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্বে কাহারও মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই। ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাব্যতার অজানা রাজ্যে কোনরূপ খুঁটি গাড়িতে, কিংবা কবিপ্রতিভার সম্বন্ধেও কোনরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এস্থলে কেবল অভাব নির্দ্দেশ করিয়াই বিরত হইতেছি।

এস্থলে জানিয়া রাখাও আবশ্যক যে, বাঙ্গালা-নিয়মের এই উচ্চারণ গতিক ছন্দ, এই ছড়া বা এই doggrel অনেক দিকে বঙ্গভাষার আর্য্য-প্রকৃতিকে, এবং সংযুক্ত বর্ণের সম্পর্কহীন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণকেও

অবহেলা করিতেছে! প্রাচীন ছড়ার এই 'ঘোরো' রীতি বা 'কথাবাত্রার' প্রণালী একদিকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের বহুনিন্দিত (অপিচ, বহু-কদর্থিত) 'কাব্যভাষার থিওরী'টাই যেন অনুকরণ করে বলিয়াই মনে হইবে। উহার বাক্যভঙ্গীর মধ্যে যে কিঞ্চিৎ প্রাদেশিকতা বা গ্রাম্যতা অথবা 'সহুরে চরমপণ্ডিতার' গন্ধ আছে, তাহাও অস্বীকার করার যো নাই। বঙ্গীয় কাব্যভাষার এই রীতি হাস্যরস অথবা জুগুপ্সা উদ্রেকের স্থল ব্যতিরিক্ত কেবল ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষেত্রে, প্রাকৃত আদর্শের বালক বনিতা কিংবা পাগলের রীতি মধ্যে, অথবা ফকিরী ঢংএর বোলচালের ক্ষেত্রেই সবিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে! আধুনিক কালের অনেক খণ্ড-কবিতা লেখক এই রীতিকে দুরন্ত উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়াই যেন অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন! উপরন্তু, অনেকের মধ্যে উহা ভাবের ঘনতা-আদর্শকে যেন অগ্রাহ্য করিয়াই কেবল শব্দের ধ্বনিকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়াছে! আটপৌরে বাক্যরীতির সস্তা অভিনবতা এবং আপাতিক মিষ্টতার জোরেই প্রশস্তি লাভ করিতেছে! বঙ্গের সাধুভাষা কিংবা সাধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই রীতি (যেমন প্রাচীনকালে তেমন এ'কালেও) কেন যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, তাহাও বিচার স্থল। বলা বাহুল্য এই উচ্চারণ রীতি বাঙ্গালার 'সাধু' আদর্শ সমক্ষে কখনো নিজের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কিংবা পরিব্যাপ্ত ভাবে গুণি-সম্মতি লাভ করিতে পারিবে কি না, সে সন্দেহটাও অমূলক নহে।

ছড়া-রীতির সীমা।

যাহোক এস্থলে পুনরুক্তি করিয়াও বলিব যে এই *পয়ার এবং লাচাড়ী—বিরাম-যতি কিংবা বর্ণের উদাত্ত-অনুদাত্ত উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল পয়ার এবং লাচাড়ীই বঙ্গবাণীর নিজস্ব ছন্দ। নিজের ইচ্ছাসুখে

উহাকে অমিশ্র কিম্বা বিমিশ্রভাবে পরিচালিত করিয়া ভাবযোগ সাধন করাই বঙ্গীয় ছন্দ-সাধকগণের সর্ব্বপ্রধান স্বত্ব এবং দায়িত্ব। এ দুইটিকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কোন নবতর ছন্দ সম্যক-ভাবে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই মূল প্রকৃতিকে যথাসম্ভব মানিয়া চলিতে জানিলে, বাঙ্গালী সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানব-হৃদয়জাত ছন্দকেই তন্মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পরন্তু, এ ক্ষেত্রে কার্য্য যে একেবারে আরব্ধ হয় নাই তাহা নহে। সংস্কৃতের বা যে-কোন বিদেশী ছন্দের মূল jiltটুকু ringটুকু—উহার ধ্বনিটুকু ধরিতে জানিলে এই মূল ছন্দ-দ্বয়কে আরও কত দিকে প্রসারিত করিতে পারা যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ, বাঙ্গালার এই accentমূলক ছন্দের শক্তি কম নহে। তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিটুকু এইরূপে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

বিদেশী ছন্দের ধ্বনি-অনুসরণে বঙ্গীয় ছন্দের ভবিষ্যৎ।

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্
কই গো কই মেঘ্ উদয় হও।
সন্ধ্যার্ তন্দ্রার্ মুরতি ধরি' আজ্
মন্দ্র-মন্থর্ বচন্ কও।
সূর্য্যের্ রক্তিম্ নয়নে তুমি মেঘ্
দাও হে কজ্জল্ পাড়াও ঘুম্।
বৃষ্টির্ চুম্বন্ বিথারি' চলে যাও
অঙ্গে হর্ষের্ পড়ুক ধূম্।

একটি ইংরাজী ছন্দকে এইরূপে আকার দান করা হইয়াছে—

ওই সিন্ধুর্ টিপ্ সিংহল্ দ্বীপ্
কাঞ্চন্‌ময়্ দেশ্?

ওই　　চন্দন্ যার্ অঙ্গের্ বাস্
　　তাম্বুল্-বন্ কেশ্!
যার্　　উত্তাল্ তাল্-বৃন্তের বায়্
　　মন্থর্ নিশ্বাস্।
আর্　　উজ্জ্বল্ যার্ অম্বর্ আর্
　　উচ্ছল্ যার্ হাস্।

অক্ষর সংখ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল accentএর উপর নির্ভর করিলে বাঙ্গালা পয়ার বা লাচাড়ীর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলতর হইবে তাহা উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি দেখিলেই বিশ্বাস হয়। *

পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দের ধ্বনি, গতি, শক্তি।

এই পয়ার এবং লাচাড়ী বাঙ্গালা ছন্দের পুরুষ ও স্ত্রী। আমরা মিশ্র ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া এবং উহাদের অর্থকেও স্বার্থে ব্যবহার করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহারে উপনীত হইতেছি; বাঙ্গলা পয়ার লাচাড়ীকে চিরকাল বলিতে পারে—

* তবে, এস্থলে একটা পরম সঙ্কটের বিষয়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যকীয় মনে করিতেছি। ছড়ার প্রকৃতি এবং প্রাদেশিকতার ঝোঁক হইতে বঙ্গভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণ পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, পদ্যে এবং গদ্যে, কেবল বাঙ্গলা শব্দের স্বরবর্ণ বিষয়ে নহে, আদ্যশব্দের উচ্চারণেও উহা নিদারুণ ভাবে চঞ্চল এবং বিশৃঙ্খল হইতে আরম্ভ করিয়াছে! একদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিকতা যেমন পদান্ত অবর্ণের লোপ করিয়া অকারান্ত পদমাত্রকেই ইংরাজীর নিয়মে হলন্ত উচ্চারণ করিতে অগ্রসর; অন্যদিকে এইরূপ উদাত্ত-অনুদাত্ত উচ্চারণের গতিও 'সাধু' বাঙ্গলা এবং 'খাঁটি' বাঙ্গলার কণ্ঠরুচি মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আনয়ন করিতেছে। বিদেশীর পক্ষে এখনই খাঁটি বাঙ্গলা পাঠ করা দুঃসাধ্য হইয়া গিয়াছে। এই স্রোত চলিতে থাকিলে উহা যে ক্রমে আমাদিগকে, আদ্য বর্ণমালার নির্ব্বাসন পূর্ব্বক নূতন বর্ণচিহ্নের আবিষ্কার করিতে বাধ্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত, ইংরাজীর ন্যায় উচ্চারণের অভিধানই প্রস্তুত করিতে হইবে। লেখক।

তোমরা হাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাও
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি ?

কিন্তু কেবল কোমলকান্ত পদাবলীতে শব্দ-কবিতা রচনা করিয়া নহে, এই লাচাড়ী রুদ্র তাল বাজাইয়াও পাঠকের মনের সমক্ষে অপরূপ বিদ্যুৎবিভার 'ঝিলিক' দিয়া যাইতে পারে :—

বজ্র হাতের। হাততালি সে। বাজিয়ে ফিরে চায়,
বুকের ভিতর। রক্তধারা। নাচিয়ে দিয়ে যায়।
ভয় দেখিয়ে। হাসে আবার। ফিকফিকিয়ে সে!
আকাশ জুড়ে। চিক্‌মিকিয়ে। চিক্‌মিকিয়ে রে!

বাঙ্গলা ছন্দের এই অভ্যন্তরতত্ত্ব-বিজ্ঞানে সুপ্রগল্‌ভ হইয়াই কবিহৃদয় গাইয়াছে—

কখনো উড়িব উধাও পদ্যে
কখনো নামিব গভীর গদ্যে
নাগর-দোলায় দুলিয়া!

গদ্যপদ্যের আভ্যন্তরীণ ধ্বনিতত্ত্বকেই বঙ্গভাষা 'ছন্দ' নামে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার পূর্ব্বক সংস্কৃত 'ছন্দঃ' শব্দ বা গ্রীক 'মিটর' এর অর্থকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী কবি উহার রসপানে একেবারে উন্মত্ত হইয়াই জোরের সহিত বলিয়াছে—

ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

বিশ্বহৃদয়ের সমস্ত ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উর্ব্বশী বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক অতুলনীয় মিশ্রচ্ছন্দে গাইয়াছে—

> সুরসভা মাঝে যবে নৃত্য কর পুলকে উচ্ছ্বসি
> হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী,
> সিন্ধু মাঝে ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে তরঙ্গের দল,
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কেঁপে উঠে ধরার অঞ্চল,
> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষে দিশাহারা
> কাঁপে রক্ত-ধারা !

কিন্তু হায়, ভাষা ও ভাবের এই মিলন-নৃত্য কতক্ষণ! মৃত্তিকার সীমাকারাবদ্ধ মানব-কবির পক্ষে এই যোগধারণার স্থিরতাই বা কতক্ষণ !

> দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
> অয়ি অসম্বৃতে !

জড়তার কারাবদ্ধ কবির ছন্দ এইরূপে হঠাৎ কাটিয়া যায়—তাহার উর্ব্বশীর তালভঙ্গ হয়। পয়ার এবং লাচাড়ীর আদিম ছন্দকে নব নব পথে সার্থকভাবে ধরিবার জন্য কবিহৃদয় নিত্যকাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—এবং পরম নিষ্ফলতায় চিরকাল অতৃপ্তি অনুভব করিতেছে! তবে এই অতৃপ্তি বোধের মধ্যেই সাহিত্যের সমস্ত উন্নতি এবং গতির তত্ত্ব নিহিত। কবিগণের উৎসাহ সমক্ষে সেই পরম করুণাময় অপ্রাপ্য এবং অব্যক্ত নিত্যকাল দাঁড়াইয়া আছেন বলিয়াই মনুষ্যজাতির সাহিত্যহৃদয় এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই ! ভাব ভাষা এবং ছন্দের এই চরম অপ্রাপ্যের অভিমুখে—মহামিলনের অভিমুখেই চিরকাল সাহিত্যের গতি ; এবং কবি-সমাজের অধ্যাত্মলোক হইতে ইহা চিরকালের দীর্ঘনিশ্বাস—

ভাব প্রকাশে ছন্দের সহকারিতার সীমা।

এ পারে সে। ফুটল না গো। ফুটল না
ওপারে যে। গন্ধে করে। মাৎ।

কিন্তু মনুষ্যের বিশ্বাস আছে, তৃপ্তি এবং সফলতার সেই অজানা ফুল ওপারে ফুটিয়াছে—

স্বর্গভুবন। মত্ত তারি সুগন্ধে
ফুটেছে সে! মন্দারেরি সাথ ;
ইন্দ্র তারে। বক্ষে ধরে। আনন্দে
অনিন্দ্য সে। পায়ের পারিজাত!

মানবজন্মের প্রধান স্বত্বভূত চরম অপ্রাপ্তি-বুদ্ধির দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে এই ছন্দের চিন্তা শেষ করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ছন্দের লঘু গুরু-ভেদ বা সংস্কৃত বর্ণের জাতিভেদ আমরা অনেক দিকে হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার যে বড় বেশী কারণ নাই, তাহা বোধকরি এতক্ষণে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

প্রাচীন ও আধুনিক ছন্দ ও তাহার প্রভাব

ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি যে গ্রীক এবং লাটিন ভাষার দশপাশবদ্ধ মিটরের গতি বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াই পরম স্বাধীনতায় ,এবং সাধারণের হৃদয়গতি পথে অপরূপ বিস্তীর্ণতা শক্তি এবং প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়াছে। ইটালী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের 'নবজীবন'-যুগের সময় হইতেই ইয়ে.-রোপীয় কাব্যের ভাব-ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ নানামুখে অপূর্ব্ব-ধারায় প্রবাহিত হইয়াই দেশে দেশে, একদিকে যেমন জাতীয় বিশিষ্টতা অন্যদিকে তেমন বিশ্বজনতাকেও উদ্দেশ্য করিতেছে। প্রাচীন ছন্দ অনেক দিকে একটি চিরস্থায়ী পদার্থ; উহার ছাঁচের মধ্যে পড়িতে হইত বলিয়াই প্রাচীন সাহিত্যের ভাবপ্রকাশ অনেকদিকে একঘেয়ে। তাই, উহার উন্নতির

ধাপগুলিও পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং প্রাচীনকালে সাহিত্য ধীর গতিতেই উন্নতিসাধন করিয়াছিল। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন আদর্শের ছাঁচ অস্বীকার করিয়া, নানাদিকে দুর্জ্জয় স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়াও মোটের উপর অল্পকালের মধ্যে আশাতীত এবং অভাবনীয় উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষেও সমস্ত আধুনিক ভাষা এবং উহাদের কাব্যসাহিত্য, জগতের যুগধর্ম্মবশে বিশেষতঃ ইংরাজীর সাহায্যে লোকায়ত হইয়া পড়ার দরুণ উহাদের মধ্যে আর্য্য-সংস্কৃতের বর্ণজাতিভেদ এবং ক্লাসিক-বিধিবন্ধন নানাদিকে শিথিল হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আধুনিকের ভাব-গঙ্গা প্রাকৃতজনের সমতলে আসিয়া যে তরঙ্গ যে আবেগ যে উচ্ছ্বাস এবং সময়-সময় যে গভীরতা লাভ করিয়াছে, পরাচীনতার উচ্চ-পূজ্যশিখরে অবস্থান করিলে ঐ ঘটনা কদাপি সম্ভব ছিল না। বঙ্গভাষা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য।

যাহা হারাইয়াছেন তাহা পরম গৌরবময় হইলেও, যাহা লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে লাভ করিবার আশা রাখেন, উহার মাহাত্ম্যও কোন অংশে সামান্য নহে। প্রাচীন মন্দাকিনীই এখন লোকপাবনী হইয়া বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে ভাবের অনন্ত উপাদান পরিগ্রহ পূর্ব্বক শতমুখে সাগরগামিনী হইতেছেন! তাঁহার এই গতি রোধ করা এখন কোন ঐরাবতের সাধ্য নহে। তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রাচীনতার পূজ্যশিখরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াও সর্ব্বথা অসাধ্য এবং অসম্ভব। ভাষার বাহ্যিক দিক্ হইতে ভাবের 'চলাচল' শক্তির প্রতি কোনরূপ বিরোধ কিংবা প্রতিষেধ না থাকিলেই হইল। আমরা দেখিতেছি বঙ্গভাষা 'গণশৃঙ্খল' ছাড়াইয়া ফেলিয়া, হৃদয়সঞ্জাত ভাবের ছন্দকেআপন গর্ব্ভে ধারণ করার পথে সমধিক অগ্রসর হইয়াই গিয়াছে। বঙ্গভাষা নানাদিকে ইয়োরোপীয় আধুনিক ভাষাগুলির সমধর্ম্মী হইয়া

আপন কৌলিন্সের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই অনুপমা সরস্বতী আমরা লাভ করিয়াছি; এখন যথোচিত শক্তিসঙ্কুলান এবং তদ্গত সাধনার উপরেই আমাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। আমরা আর্য্যগৌরবময় ভারবি রচনা করিতে পারি নাই, কিন্তু মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার ধারণা করিয়াছি। রামায়ণ বা মহাভারত আমাদের শক্তিবহির্ভূত থাকিলেও, আমরা ত "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রচনা করিতে পারিয়াছি! আমরা পুষ্পদন্তের ন্যায় হৃদয়কে শিখরিণীর উদাত্ত-মহিমাময় পাদপন্থায় পরিচালিত করিয়া মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতে পারিব না সত্য; শঙ্করের ন্যায় প্রাণের আনন্দলহরীকে শান্তগভীর পদতরঙ্গেও আকারদান করিতে পারিবনা; মন্দাক্রান্তার পৌরুষতরঙ্গিত উচ্ছ্বাসে হৃদয়কে প্রবাহিত করিয়া চিরবিরহের করুণ কাকলীও বিনাইতে পারিব না:—বাঙ্গলা ছন্দের উর্ব্বশীর সেই গৌরব-সৌভাগ্য চিরতরে অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। আমরা উপনিষদ্ রচনা করিতে পারি নাই; শ্রীমদ্ভাগবত যোগবাশিষ্ঠ কিংবা ভগবদ্গীতা আমাদের হৃদয়মনোবুদ্ধির সাধ্যসীমা হইতে চিরতরে দূরান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আমরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছি, তাঁহাদের পদপন্থা অনুসরণ করিয়া শক্তিসঙ্গীত ও ব্রহ্মসঙ্গীত—বা আমাদের আধুনিক যুগের উপনিষদ রচনা করিয়াছি; হৃদয়-রাজার চরণে নৈবেদ্য এবং গীতাঞ্জলি নিবেদন করিয়া সোনার তরীতে আরোহণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতের উদ্দেশে খেয়া দিয়াছি। আমাদের সাধনা বহু পরিমাণে একদেশী হইলেও, ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বলতর বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি। বিশেষতঃ, হতাশ্বাসের পক্ষে এই প্রসঙ্গে মনে রাখাও আবশ্যক যে, ন্যূনাধিক সঙ্গীত-ক্ষেত্রের এই ছান্দসিক বিশেষত্বই সাহিত্যের সর্ব্বস্ব নহে। স্বদেশ অথবা স্বজাতি-সীমার বহির্ভাগে কিংবা বিশ্বসাহিত্যের দরবার-ক্ষেত্রে উহার মাহাত্ম্য

অধিক নহে। ওই ক্ষেত্রে বরং ভাবকে—আইডিয়াকেই মুখ্য বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক, পদচরণের আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতাকে গৌণভাবে গ্রহণ করার বিচার-প্রণালীই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ভাব এবং ছন্দ যে স্থলে অচ্ছেদ্যরূপে প্রকটিত হইয়া ভাষান্তরের সমক্ষেও নিজের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারে, তাহাই কাব্যাধিকারের মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া গৃহীত। ছন্দের মাহাত্ম্য যে স্থলে ভাবকে ন্যূনাধিক তরল করিয়াই বর্দ্ধিত হয়, সাহিত্যদার্শনিকগণ উহাকে decadent কবিতা, অধঃপতিত কবিতা বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। ছন্দের লীলানৃত্যের দিকে অতিমাত্রায় লক্ষ্য রাখিলে-যে ভাবকে জলীয় করিয়া, উহারা সাহিত্য-লক্ষণ ন্যূনাধিক ক্ষীণ করিয়াই উপস্থিত করিতে হয়, উহার দৃষ্টান্ত সকল ছন্দকবির মধ্যেই মিলিবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ শ্রেষ্ঠতার স্থলে, চিরকাল নিজের দিক হইতে এই সমস্যা নির্ব্বিবাদে ভঞ্জন করিয়াই অগ্রসর হন। এই ছন্দের বিষয়ে এস্থলে আর একটা কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খণ্ডিত শ্লোক বা খণ্ডকবিতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন ছন্দের মাহাত্ম্য দাঁড়াইতে পারে, তেমনি সমগ্র গ্রন্থকে, সমগ্র রচনাকে, এমন কি কবিজীবনের সমস্ত ভাব এবং কর্ম্মচেষ্টাকে বেষ্টন পূর্ব্বক পরিণতি এবং সঙ্গতি লাভ করিয়াও একটা পরম ছন্দ সাধিত হইতে পারে। এই ছন্দ লেখকের হৃদয় হইতে, তাঁহার সমগ্র জীবন-চরিত্র হইতে নিজের চরিত্র এবং সুর সংগ্রহ করিয়াই সাহিত্য-জগতে নিজের বিশেষত্বে স্থির হইয়া যায়! শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ছন্দশিল্পী ক্ষুদ্র বাক্য-ছন্দ অপেক্ষাও কৃতিত্বের এই বৃহৎ-ছন্দকেই কাব্যের মধ্যে প্রাণপণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন—ইলীয়ড বা ডিভাইন কমিডী, প্যারেডাইস লষ্ট, হ্যামলেট, রামায়ণ বা শকুন্তলা কিংবা আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহও—এই

ছন্দের বিভিন্ন অর্থ ও উহার ব্যাপকতা।

অধ্যাত্মচ্ছন্দ সাধন করিয়াই মনুষ্যের মনোরাজ্য চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়াছে।

উপসংহারে যেমন আদিবন্ধের, তেমন চরমের কথাও এই যে, বিশ্বজগৎ ছন্দোময়। ভারতীয় ঋষিশিষ্যের চক্ষে বিশ্বজগৎ ধ্বনিময়—কবির চক্ষে উহা রাগিণীময়। এই বিশ্বরাগিণীই জগৎপ্রকটিতা ঈশ্বরীয় ইচ্ছারূপে—মহামায়ারূপে নানাভাবে ঋষি-সাধক-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-কবি বা শিল্পীর হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাবকম্পন জাগ্রত করিতেছে! আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে রাগ রাগিণী আলাপ করার জন্য যে ভিন্ন-ভিন্ন শুভ এবং সহকারী কাল নির্দ্ধারিত আছে, উহা অনেক স্থলে মনুষ্যহৃদয় এবং বহিঃপ্রকৃতির গভীর সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই উদ্ভাবিত। সংগীতকলার ক্ষেত্রে যেমন রাগরাগিণী এবং তালের, কাব্যকলার ক্ষেত্রে তেমনি ছন্দেরও ভিন্নভিন্ন-প্রকার সহযোগিতা, বিভিন্ন ভাবোদ্দীপনার সময়ে হৃদয়ঙ্গম হয়। ছন্দের যোগ একটা খামখেয়ালী কথা নহে। জাতীয় হৃদয়ের পরাৎপরা বাক্‌প্রকৃতি হইতেই জাতীয় বাণিচ্ছন্দের উদ্ভব।

কবির প্রকৃতি-যোগ এবং অন্তর্যোগ হইতে উহার উদ্ভব এবং বিশ্বমুখ বিকাশ।

সুতরাং, কবি যত অধিক পরিমাণেই প্রকৃতির সহিত তান-লয় সিদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় ততই স্বভাবসঙ্গতে এই পরাপ্রকৃতির মহাকাশ হইতে যথাযুক্ত ছন্দটুকু সংগ্রহ করিয়াই বিলসিত হইতে থাকিবে। বাস্তবিকপক্ষে ছন্দের আবিষ্কার কিংবা ধারণাও এইরূপে লয়ানুভবসিদ্ধ বা অতর্কিত না হইয়া পারে না; গণিতের প্রণালীর সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। প্রকৃতির বশেই আনন্দের ছন্দ যেমন নাচিয়া নাচিয়া চলে, বিষাদের ছন্দও তেমনি গম্ভীর পদবন্ধে অথবা উদাত্ত উচ্ছ্বসিত নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়া এবং আপনার সরস্বতী লাভ করিয়াই অবলীলাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া

আসে। পয়ার এবং লাচাড়া ছন্দের এই ধীরতরঙ্গিত উদাত্ত-উচ্ছ্বাসিনা অথবা তরতরগামিনী পদগতি, শব্দধ্বনির সেই ঘূর্ণা ঝোলনা এবং দোলনা, উহার 'একহারা' অথবা তরঙ্গভঙ্গ-গভীর উচ্ছ্বাস, উদাত্তমন্দ্রে ছাপিয়া উঠিতে-উঠিতে অকস্মাৎ অসীমে আত্মহারা হইবার প্রয়াস, সমস্ত তালমান রাগিণীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া অকস্মাৎ মহাকাশে মিলাইয়া যাইবার জন্য উল্লাস, এই সমস্ত হৃদয়ের ভাব হইতে সঞ্জাত হইতে না পারিলে, ভাবের আত্মজা হইয়া তাহারই পরিচর্য্যায় রত না হইলে, প্রকৃত কবিতার জন্ম হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকৃতি-যোগ লাভ করাই প্রথম কথা! কবি এই স্থলে বিশ্বজগতের নিত্য-সত্য ছন্দের দ্রষ্টামাত্র, স্রষ্টা নহেন। সরস্বতীর বাণী কিংবা বীণাপাণি উভয় মূর্ত্তিই কবিপ্রতিভার শতদলবাসিনী। অতএব, সাহিত্যের দিক হইতে আপাততঃ ইহাও বলিতে পারা যায় যে, কবির হৃদয়-গুহাগত ভাব-কম্পন হইতেই নিত্যকাল ছন্দের উৎপত্তি। বিশ্বজগতের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া কবিহৃদয় যতই নৃত্য করিতে শিখিবে, তাহার সিন্ধু-শৈল-আকাশের এবং মানবচিত্তের অনন্ত ছন্দ-মুখর অনন্ত বিকাশের সঙ্গে কবির আত্মা যতই ঐকাতানে আপনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া এবং চরমের অখণ্ড ঐক্যের দিকে যতই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিবে, বিশ্বসংসাররূপ প্রণবসঙ্গীতের চরমস্থ লয়বিন্দুর দিকে যতই নিজের ভাবগতি স্থির রাখিতে পারিবে, ততই সাহিত্য সঙ্গীত এবং যাবতীয় ললিত কলায়, কবির কথায় চিন্তায় কণ্ঠে এবং লেখনিতে, ভিতর কিংবা বাহিরের চরিত্রধারণায়, এবঞ্চ তাঁহার সমগ্রজীবনেও নব নব ছন্দের নব নব ভাবমূর্ত্তি আকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চরমার্থের অভিমুখে অগ্রসর করিবে। ওমিতি ক্রমঃ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বঙ্গ-বাণী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গ-বাণী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাব্যের অভ্যন্তরে হেমচন্দ্র। *

জন্ম-১২৫৪ সালের ৬ই বৈশাখ ১৮৩৮ ইং; চিন্তাতরঙ্গিনী, ১৮৬১; বীরবাহু, ১৮৬৯, ৩১ শে বৈশাখ; কবিতাবলী, ১৮৭২; আশাকানন, ছায়াময়ী, দশ মহাবিদ্যা, বৃত্রসংহার; চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮; মৃত্যু, ১৩১০, বাং ১০ই পৌষ, ১৯০৪ইং।

বস্তু-সংক্ষেপ।

হেমচন্দ্রের আবির্ভাব সময়ে বঙ্গসাহিত্য—হেমচন্দ্রের সহৃদয়তা—ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ—স্বদেশপ্রেম ও চিন্তাতরঙ্গিনী—স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় সঙ্গীত—স্বদেশ-প্রেম ও বীরবাহু—কবি-প্রতিভার জাগরণ ও আশাকানন—কল্পনার অতিমানব ক্ষেত্র ও ছায়াময়ী—ছায়াময়ী ও খ্রীষ্টীয় অশুভবাদ—ছায়াময়ীর প্রতিবাদ, দশমহাবিদ্যা—কবিত্ব শক্তির পরিণতি ও বিষয় নির্ব্বাচন—বৃত্রসংহার—বঙ্গসাহিত্যে বৃত্রসংহারের স্থান—বৃত্রসংহারে বাণী—বৃত্রসংহারের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দোষ গুণ—খণ্ড কবিতায় হেমচন্দ্র—অনুবাদ ও সাহিত্য-আদর্শ—সরস্বতী সেবার পরিহার; শেষজীবনের অনুতাপ—শেষ জীবনের অন্ধতা—মিল্টন ও হেমচন্দ্র—অশরীরী হেমচন্দ্র।

কাব্যের অভ্যন্তরে হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্রের আবির্ভাব সময়ে বঙ্গসাহিত্য

বঙ্গসাহিত্য তখন সবে মাত্র সমুদ্রের তত্ব পাইয়াছে; তাহার উন্মুক্ত নেত্রে আকাশের অসীমতা প্রকাশিত হইয়াছে; ও তাহার পায়ের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। একদিকে মহাত্মা রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, অন্যদিকে মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে এই নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি এই অজ্ঞাত রসের প্রথম প্রেরণায় আকুল হইয়াছে; ও বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বত্র একটা অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। উহা ভাল কি মন্দ,

* এই প্রবন্ধ ১৩১০ সনের চৈত্র সংখ্যার নব্যভারতে প্রথম প্রকাশিত

তখনও প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বঙ্গসাহিত্যের এবম্বিধ অবস্থায় কবি হেমচন্দ্রের আবির্ভাব।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর যে উত্তেজনা আনিয়াছিলেন, তাহা অনেকাংশে সামাজিক; কিন্তু ঈদৃশ উত্তেজনাতেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হয়। বিশেষতঃ, তাঁহারা আপন উদ্দেশ্য সাধনে সাহিত্যকেই প্রধান অস্ত্রস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। উভয়ের গ্রন্থাবলী এবং কার্য্য প্রণালীর মুখ্য অথবা অবান্তর ফলে বঙ্গসাহিত্য এখন পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতেছে।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, তাহা বহুপরিমাণে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্ক এবং শিক্ষার ফলেই উদ্ভূত। দেশের লোক উহাকে খ্রীষ্টানী ভাব বলিয়াই ধরিয়া লয়; কারণ দেশের প্রচলিত সমাজ তন্ত্রে উহার তিষ্ঠিবার অবকাশ মাত্রও ছিল না। কিন্তু; উভয়ের কেহই খ্রীষ্টান ছিলেন না; খ্রীষ্টান হইলে তাঁহাদের কোন চেষ্টাই সমাজে স্থায়ীভাবে কার্য্যকরী হওয়ার উপযোগী হইত না। কিন্তু বিধাতা বুঝিলেন, কবি খ্রীষ্টান হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য কোনরূপে বিঘ্নিত হইতে পারিবে না; বরং প্রণোদিত হইবে। তাই তিনি মধুসূদনকে খ্রীষ্টান করিয়া, অবাধ গতিতে সমস্ত দুঃখ-দৈন্য বিপদের মধ্যদিয়া, জগতের সমস্ত জাতীয় বিজাতীয় বড় বড় ভাবের তীর্থে স্নান করাইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে তুলিয়া ধরিলেন! এই উদ্ধত স্বভাবশিশুও সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষার পায়ের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিল; প্রাচীন শৃঙ্খলার আদর্শ এবং প্রচলিত সাহিত্য-শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া এমন গান আরম্ভ করিয়া দিল যে, দেশের লোক যুগপৎ মুগ্ধ, ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া গেল! এইরূপে বঙ্গসমাজ জগতের সমাজের সহিত একাত্মতা দেখাইতে এবং বঙ্গসাহিত্য সমস্ত সভ্যজগতের সাহিত্যের সহিত শোণিত-সম্পর্ক স্থির করিতে চেষ্টিত হইয়া গেল।

হেমচন্দ্র আসিয়া ভূলুণ্ঠিত মধুসূদনকে মাথায় তুলিলেন; তুলিয়া বঙ্গবাসীকে বলিলেন—তোমরা ইহাঁকে অকারণ তুচ্ছ করিয়াছ; তোমাদের দেশে এত বড় কবি আর জন্মে নাই। এই কার্য্যে হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অকৃত্রিম মহত্ত্ব পরিদৃষ্ট হইবে। প্রতিযোগী কবির প্রতি এইরূপ নির্ভয় সহৃদয়তা সাহিত্যসংসারে দুর্লভ। কবিগণ স্বভাবতঃ আত্মপ্রিয়, তাঁহারা আপন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠস্বপ্ন আদর্শে আপন রুচির অনুবর্ত্তনে, নিজ নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং উহাকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মধুসূদনের মৃত্যুপলক্ষে হেমচন্দ্র "স্বর্গারোহণ" নামক যে কবিতা প্রকাশ করেন, তাহা বঙ্গীয় কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। উক্ত কবিতার প্রধান সৌন্দর্য্য হেমচন্দ্রের সহৃদয়তা। পাঠক দেখিবেন, কতদূর প্রেম, কতদূর সৌহার্দ্দ, কতদূর উদারতা প্রতিযোগীর জন্য এইরূপ মহনীয় স্বর্গলোক নির্দ্দেশ করিতে পারে; এবং এইরূপ অনাবিল মর্ম্মস্পর্শী উচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করিতে পারে! কেবল মধুসূদন কেন, সহযোগী সাহিত্যিকের প্রতি তাঁহার অনসূয়া ও সহৃদয়তা বঙ্গীয় লেখকগণের আদর্শ-স্থানীয়; আলো ও ছায়া রচয়িত্রীকে বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত করিতে গিয়া হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার কথা নহে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ সহৃদয়তা কয়জনে দেখাইতে পারিয়াছেন!

হেমচন্দ্রের সহৃদয়তা

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর নিকট যে অভিনব সমাচার আনিয়াছিলেন, যুবক হেমচন্দ্রের কবি-হৃদয় তাহা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। পূর্ণ-গঠিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে যুবক প্রথমতঃ বঙ্গ সাহিত্যে আত্ম পরিচয় করিয়াছিলেন, তাঁহার কবি-হৃদয় চিরদিন সে আদর্শেই স্থির ছিল;

ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ,

বয়সের অথবা অভিজ্ঞতার পরিণতি সহকারে সেই আদর্শের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এইস্থানে বলিয়া রাখাও আবশ্যক যে, হেমচন্দ্র ধর্ম্মবিষয়ে দ্বৈতবাদী হিন্দু; উপাসনা প্রণালীর কোনরূপ সংস্কার অথবা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ উক্ত মতের সহিত নির্ব্বিরোধে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার "কাশী বিশ্বেশ্বরের আরতি," "অন্নদার শিবপূজা," "বঙ্গে দুর্গোৎসব," "দশ মহাবিদ্যা" পাঠে বুঝা যাইবে, তাঁহার ধর্ম্মমতও প্রচলিত সাধারণ ধর্ম্মমত অপেক্ষা কত পৃথক ছিল।

স্বদেশপ্রেম ও চিন্তাতরঙ্গিনী

এইরূপ চরিত্রভিত্তি লইয়া নবীন যুবক সর্ব্বপ্রথম "চিন্তা-তরঙ্গিনী" প্রকাশ করেন। এই কাব্য অনেক বিষয়ে বায়রণের ম্যানফ্রেডের সমধর্ম্মী; রচনা প্রণালী ভারতচন্দ্রের এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুগত। এই কাব্যে একজন নব্যবঙ্গীয় যুবক স্বদেশের এবং সমাজের দুর্দ্দশা মোচন করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে; কিন্তু, স্বদেশ ও স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় উহা অসম্ভব এবং নিজকেও অসমর্থ বুঝিয়া, আত্মহত্যা পূর্ব্বক নিষ্ফল জীবনের পর্য্যবসান করে। যুবকের মনোভাব—

কি হবে থাকিয়া হেথা প্রাণের কমল!
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু;
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু।
প্রীতিবারি সমাজেতে ঢালিলাম কই!
স্বার্থ দ্বেষ পরহিংসা নাশিলাম কই?
কই আপনার মন নিরমল হ'ল?
কই ধর্ম্ম পথে মন স্থির হয়ে র'ল?

এই কাব্যের লক্ষ্য কি? লক্ষ্য নবীন কবি বলেন নাই; বলিতে সাহস করেন নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে কবি যে নীতিসূত্র বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে গ্রন্থের গতি কিম্বা প্রকৃত ফলশ্রুতির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। উহা কেবল সাধারণের চক্ষু হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়কে আবৃত রাখার উদ্দেশ্যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে! কবির বক্তব্য প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মহত্যা নহে—আত্মোৎসর্গ! ন্যায় সত্যের এবং দেশের জন্য আত্মহত্যা মানব সমাজে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য মাত্র না রাখিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নির্ভরে যে আত্মহত্যা, তাহাই আত্মোৎসর্গ! দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঈপ্সিত উন্নতি অসম্ভব হইলেও অকুতোভয়ে জীবন দান কর, কিছু না কিছু অগ্রসর হইবে।

জয় ত মোদের নয়—
জয় সে সত্যের জয়!

আজি হোক্—কালি হোক্, শত অসি-শক্তি আসি
—কে পারে রোধিতে তারে?—শতধা কাটিবে ফাঁসি।

আমরা দেখিব, "চিন্তা-তরঙ্গিণীর" এই অল্পায়ুঃ এবং অপরিণত যুবক পুরুষটীই পরে শ্মশান হইতে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া বঙ্গদেশময় জাতীয় সঙ্গীতের ভেরী বাজাইয়াছে; হতভাগিনী বিধবা এবং কুলীন মহিলার জন্য অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া গিয়াছে; সমাজের শক্তি-স্বরূপা রমণীজাতির দুরবস্থায় ক্ষোভেরোষে সমাজস্থ পুরুষগণের জন্য হৃদয়ভেদী ধিক্কারের প্রজ্বলিত বৃশ্চিক দংশন রাখিয়া গিয়াছে; এবং পরিশেষে, জীবন-সায়াহ্নে, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির পূর্ণ এবং অপূর্ণ শতসহস্র আশা এবং উদ্যমের মধ্যে সম্মিলিতভারতের মহিমান্বিত ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন দেখিয়া

স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় সঙ্গীত

"জীবন সার্থক আজি রে আমার" গাইতে-গাইতে আলোক রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে !

'চিন্তা-তরঙ্গিণী'র পরেই "বীরবাহু"। নবীন কবির দৃষ্টি এই গ্রন্থে জাতীয় স্বাধীনতার দিকে আকৃষ্ট ; তাই একটা মনগড়া হিন্দুরাজা করিয়া তদ্দ্বারা একটা মনগড়া পাঠান রাজাকে পরাস্ত করাইয়া হিন্দু-সূর্য্যের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করিতে হইয়াছে ; এই কাব্য "চিন্তা-তরঙ্গিণী" হইতে ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর ; কিন্তু অচতুর হস্তের চিহ্ন সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কবির কল্পনা-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন বরুণ-কন্যাগণের আত্মকথা—

স্বদেশপ্রেম
বীরবাহু

সাগরে সাগরে ভ্রমণ করি
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি ;
এই উপবনে আসিয়া বসি,
শ্রম নাশি পুনঃ সাগরে পশি।

হলো বহুদিন, প্রভাত কালে
সকলে পশিনু জলধি জলে ;
সারাদিন জলে ধরিনু মণি—
ভানু অস্ত যা'ন, আসে রজনী।

দেখিয়া তপন মূরতি শোভা
আমরা কজনে হইনু লোভা।
ধরিব বলিয়া ধাইনু পাছে—
যত দূরে যাই, না পাই কাছে !

ক্রমশ নামিছে—দেখিতে পাই!
না পারি ধরিতে, যতই যাই!
প'ড়ে অই ফেরে পোহায় রাতি—
পাতাল পুরেতে না জ্বলে বাতি!
আমাদেরি কাছে আছিল মণি—
আঁধারে সকলে যাপে রজনী।

পরিণত বয়সেও হেমচন্দ্র ইহাপেক্ষা স্নিগ্ধোজ্জ্বল কবিতা লিখিতে পারেন নাই।

"বীরবাহু" প্রকাশের পর হেমচন্দ্রের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

কবিপ্রতিভার জাগরণ— আশাকানন

মনুষ্য হৃদয়েও প্রতিভার উদ্বোধন এবং জাগরণ আছে। অকস্মাৎ এমন সময় আসে, যখন 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' হয়, এবং সে

"আমি ঢালিব অমিয়া ধারা'
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,

আমি জগত জুড়িয়া বেড়াব গাইয়া
আকুল পাগল পারা!"

গাইতে গাইতে জগতের দিকে অভিযান করে! "বীরবাহুর" পর হেমচন্দ্র মহতী আশায় এবং আপন সামর্থ্যে উদ্বুদ্ধ হইলেন; সাহিত্য-জগতে আপনার স্থান অধিকার করিতে উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কেবলমাত্র ভারতের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত রহিল না; তিনি পৃথিবীর পত্তনে নিজের বাস্তব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। "আশা-কানন" বিশ্বসংসারের হৃদয়-গাথা। কেবল একবার মাত্র যশঃ-শৈলে, বাল্মীকির

সহিত সাক্ষাতে, হেমচন্দ্র দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভারতবর্ষের কাহিনী তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছেন; এবং আশার সম্মোহন দর্পণে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন—

ভারত জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে;
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব্ব তেজ হাস্যাননে!

ঘেরিয়া তাহারে নব আর্য্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝারিয়া কলঙ্ক ধূলি!

এই কাব্যে হেমচন্দ্র ভাষার সৌন্দর্য্য এবং ভাবের গাঢ়তায় যেন অকস্মাৎ বহু পরিমাণে অগ্রসর! ইতিমধ্যে 'জাতীয়' এবং 'বিবিধ' ভাবের কোন কোন কবিতা লিখিত হইয়া থাকিবে; ও কবি দেশীয় এবং বিদেশীয় কবিদিগের কাব্য সম্পত্তি বহুপরিমাণে অনুধাবন এবং আয়ত্ত করিয়া থাকিবেন। "আশা-কাননের" উদ্দেশ্য বিষয়ে হেমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "আশা-কানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য; মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজিতে এইরূপ রচনাকে এলীগরি কহে। প্রধান বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, সাদৃশ্য সূচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান বিষয় পরিব্যক্ত করা ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশ্য সূচক বিষয়ের বিবৃতি; কিন্তু প্রকৃতার্থে গূঢ় বিষয়ের তাৎপর্য্য বোধক।" ইংরাজ কবি চসারের "House of Fame" এবং পোপের "Temple of Fame" এর সঙ্গে এই কাব্যের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ, কবি "আশা-কানন" রচনার পূর্ব্বে এই দুটি কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন।

"আশা-কাননে" হেমচন্দ্রের হৃদয় কি রূপে বিশ্বমানবের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, "চিন্তাতরঙ্গিণী"র মনোভারাক্রান্ত যুবাপুরুষ কিরূপে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে। "সাহস" বলিতেছে—

এই পথে যাও কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে,
না কর অন্তরে ভয়!
কে বলে ক্ষণিক মানব জীবন?
জগতে প্রাণী অক্ষয়!

প্রাণিরঙ্গভূমে ভ্রম' তীব্র তেজে
শরীরে অক্ষয় ভাব,
মৃত্যু তুচ্ছ করি, জীব রঙ্গে মজি,
দৈত্যের বিক্রমে ধাব',

ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে এ মহীমণ্ডলে
জীবাত্মা বিধির সৃষ্টি;
সেই ধন্য প্রাণী, নিত্য থাকে যার
সেই পথে দৃঢ় দৃষ্টি।

কিন্তু, হেমচন্দ্র "আকাকাননের" শেষাঙ্কে নিরাশার ভীষণ মরুক্ষেত্র দেখিয়াছেন! বিশ্ব সৃষ্টির অধ্যাত্ম রাজ্যে চিরপ্রদীপ্ত অগ্নি কুণ্ড দেখিয়া তাঁহার আশার স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে! হেমচন্দ্র কি এই স্থলে স্বকীয় সংসার-জীবনের শোচনীয় পরিণতির ছবিই কবির চক্ষে দেখিয়াছিলেন? কে জানে! কিন্তু ঘটনা-পরম্পরা অপ্রত্যাশিত ভাবেই মিলিয়া যাইতেছে!

"আশা-কাননের" পরেই "ছায়াময়ী"। ইহজগতের মরুক্ষেত্র, পরজগতের অনন্ত নরকের সঙ্গে অপূর্ব্ব ভাবে

কল্পনার অতি-মানব ক্ষেত্র ও ছায়াময়ী

মিশিয়া গিয়াছে! বলা বাহুল্য, ইটালীর কবি দান্তের "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক কাব্যের ছায়া-অবলম্বনে এই কাব্য প্রণীত। "ডিভাইনা-কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বী অনন্ত-নরকবাদী কবির বিরচিত; সুতরাং উহাতে মানবাত্মার অনন্ত নরক যন্ত্রণা বিবৃত হইয়াছে। অনন্ত নরকবাদ ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। পরলোক, আত্মার পুনর্জ্জন্ম এবং অসংখ্য জীব-যোনিতে মানবাত্মার সংসরণ, ও পরিশেষে ক্রমোন্নতিবশে পরমাত্মায় নির্ব্বাণ—ভারতীয় ঋষিগণ এই মতেই সংসারকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং, "ছায়াময়ী" সর্ব্বাংশে ভারতীয় বিশ্বাসের অনুকূল নহে। ইয়োরোপে, বিশেষতঃ ইটালীতে দান্তের কাব্য অপরিসীম অর্চ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত যেমন সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ অপেক্ষাও ভারতীয় আর্য্যজাতির সমাজে এবং ধর্ম্মে এক পরম একত্ব আনয়ন করিয়াছে, বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন লোকনিবহকে একই সূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সমপ্রাণতার দিকে অগ্রসর করাইতেছে, মহাকবি দান্তের কাব্যও সেইরূপ নব্য ইটালীয় জাতিকে সংহত, গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে! এই কাব্যের মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্য বিষয়ে দ্বৈধমত হইতে পারে না। "ছায়াময়ী" অনুবাদ হইলেও ইহার অনেক স্থল পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। হেমচন্দ্রের ভাষা এবং ছন্দোবন্ধ উভয়ই এই কাব্যে বৈচিত্র্য এবং বিস্তার লাভ পূর্ব্বক অতি-মানব ক্ষেত্র অবলম্বনেই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে! বাস্তবিক "বৃত্রসংহার" কাব্যের রচয়িতার শিক্ষা, চিত্তস্থৈর্য্য, নিপুণতা, শক্তি এবং উদ্দাম কল্পনার পূর্ব্বাভাষ "ছায়াময়ী"তে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ছায়াময়ীতে" সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত! এই চিত্রে কুত্রাপি অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে, ষড়রিপুর এই অনিবার্য্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ও স্খলিতপদ দুর্ব্বল মনুষ্যের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরক যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানিনা। কিন্তু হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপম ভাবে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন।

'চিন্তা-তরঙ্গিণী' 'আশাকানন' 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হেমচন্দ্র জগতের অশুভদর্শী কবি। এই উক্তি সমীচীন নহে। হেমচন্দ্র অদৃষ্টবাদী; প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকদার্শনিকগণ ও কবিগণ এবং ভারতীয় ঋষিগণের অনেকেই অদৃষ্টবাদী ছিলেন। তবে মঙ্গলই জগতের নিয়তি এবং জগতের ঈশ্বর মঙ্গলময়, ইহা বেদপন্থী ঋষিমাত্রের দৃঢ় ধারণা ছিল। যাঁহারা জীবাত্মার কোটী-কোটী বার সংসরণ অর্থাৎ জন্ম পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন, এবং যাঁহাদের জীবনও সেই আদর্শে পরিচালিত, তাঁহাদের নিকট এক জীবনের দুঃখ-কষ্ট কিছুই নহে। হেমচন্দ্র বীরপুরুষ; তাঁহার হৃদয় প্রাচীনদিগের ধাতুতেই গঠিত। সে হৃদয়ে কোনরূপ ভীরুতা, কিম্বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ছিল না। ইহজগতের অন্তর্লোকে যাহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তিনি অকুণ্ঠিত এবং অব্যাকুল ভাবে "আশাকাননে" তাহা দেখাইয়াছেন; পরে "ছায়াময়ী" প্রকাশ করিতে গিয়া, নিজের সঙ্গে তাহার মত যে সম্পূর্ণ মিলিতেছে না, সে কৈফিয়তও দিয়াছেন।

ছায়াময়ী ও খ্রীষ্টীয় অশুভবাদ

'ছায়াময়ী' প্রকাশ করিয়া হেমচন্দ্র অনন্ত নরক-বাদ এবং স্বকীয় বিশ্বাসের মধ্যে এক তুমুল আত্মিক সংগ্রামে পড়িয়া গেলেন। বিশ্বজগতের যবনী অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক একবার প্রকৃত রহস্য কি করিয়া বুঝিয়া লইবেন, সে

আশায় আকুল হইলেন। হেমচন্দ্র প্রকৃত মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী; সমগ্র মানবজাতির উন্নতি সম্বন্ধে এত ভাবনা ভাবিয়াছেন, আমাদের দেশে এমন কবি আর নাই। এই আকুলতার ফল "দশমহাবিদ্যা"। "দশমহাবিদ্যার" মানসী মূর্ত্তি হেমচন্দ্রের হৃদয় কখন কল্পনা করিয়াছিল, জানি না; দেখা যাইতেছে, উহা বৃত্রসংহারের পরে প্রকাশিত হইয়াছে! কিন্তু, এই কাব্য "আশাকানন" ও "ছায়াময়ীর" সঙ্গেই সমসূত্রতায় সম্বদ্ধ; এবং উহা যে হেমচন্দ্রের পরিণত কল্পনার এবং বিশ্বাসের ফল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আমাদের সহিত্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু। উহা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত নহে। সুতরাং, সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহার সদর দরজা ভিতর হইতেই অর্গলাবদ্ধ আছে। এই কাব্যে 'ছায়াময়ার' আগন্তুক বিষাদ-ভারাক্রান্ত কবির প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস, কবিত্ব-গৌরবের সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীঃ ধারণ করিয়াছে! উহা একদিকে খ্রীষ্টীয় নরকবাদের প্রতিবাদ; কবি প্রথমাবস্থায় নারদ সাজিয়া দুঃখময় জগতের মধ্যে মঙ্গলময়ীকে—জগদীশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাকে, আকুল ভাবে খুঁজিতেছেন! কোথাও যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না! তখন মনুষ্য-হৃদয়ের সেই তৃষ্ণা-কাতর চিরন্তন প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে—

ছায়াময়ীর প্রতিবাদ ও দশমহাবিদ্যা

কহ ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তারি
দরশন পুনঃ লভিব!
সে রাঙ্গাচরণ মনের মতন
সাধনে আবার পূজিব!

তখন শিব দেখাইলেন—বিশ্বের আবরণ খুলিয়া দিলেন! সুখে-দুঃখে, পতনে-স্খলনে, শতসহস্র আশা ও হতাশার মধ্যে জগতের অন্তস্তলে যে মহা-মায়ার ছায়া, যে মঙ্গল নিয়তি কার্য্য করিতেছে, উন্মার্গগামী মনুষ্য-হৃদয়কেও যাহা হিরণ্য-রজ্জুতে আনন্দময়ী পরা শান্তির সঙ্গে বন্ধনপূর্ব্বক ধারণ করিতেছে, নারদকে দয়াপরবশে তাহাই দেখাইলেন—

বিশ্ব আবরণ হবে নিবারণ,
দেখিবে এখনি নিমেষে!
বিশ্বরূপ ধরা বিশ্বরূপ হরা
খেলেন আপন হরিষে।

দেখিবে এখনি অনন্ত মূরতি
অপার আনন্দে মাতিয়া—
বিদ্যারূপে দশ ভুবন পরশ
করেছে আকাশ জুড়িয়া!

মহাযোগী যায় দেখিতে না পায়
সেরূপ দেখিবে নয়নে।
এই ভবলীলা যে বা বিরচিলা
দেখিবে সে আদি কারণে!

ভব-লোকের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া নারদ দিব্যচক্ষে অনবগুণ্ঠিত দশটী মহাভুবন দেখিতে পাইলেন! দেখিলেন, মহাকাশ উজ্জ্বল করিয়া প্রাণিগণ ভুবনে ভুবনে অভিযান করিতেছে—

বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ু পথে চলেছে,
হৃদয়দর্পন-ছায়া বদনেতে ফুটেছে।
প্রতি জনে-জনে তার ছাঁদে ছাঁদে গুরুভার
নানা পাশ নানা ফাঁসে গলদেশে পড়েছে;
বিবিধ শৃঙ্খল হার করে পদে বেঁধেছে—
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ু পথে চলেছে!

এই প্রাণিগণ কে?

সকল হইতে দুঃখী এই প্রাণিগণ!
মাটীর শরীরে ধরে দেবের বাসনা;
মিটেনা মনের সাধ, হৃদয়ে বেদনা!
আধ ভাঙ্গা সাধ যত পরাণে জড়ায়;
অসুখে, কতই দুঃখে জীবন কাটায়।
দেবতুল্য বাসনায় ঊর্দ্ধদিকে গতি,
পশুতুল্য পিপাশায় সদা দগ্ধ মতি!

ইহারা মানব! কিন্তু, ইহারা এ কষ্ট কেন সহ্য করিতেছে? এ কষ্টের কি শেষ নাই? এখানেই পূর্ব্বোক্ত অশুভবাদিতার আপত্তি উঠিতে পারে—কিন্তু,

"না হও নিরাশ অরে ভক্তিমান্"
ভূতেশ কহেন নারদে,
"দুঃখেরি কারণ নহে জীব লীলা,
মোচন আছে রে আপদে;

কণামাত্র তার হেরিলে নয়নে
অনাস্থার অঙ্গ জগতে;
পূর্ণ সুখ ইহজগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে।

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী—
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা,
শোক দুঃখ তাপ সকলি দমন—
এমনি বিধানে যোজনা।

পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি;
অনন্ত অসীম কাল আছে মাঝে;
অনন্ত জীবিত মণ্ডলি।

এই বলিয়া শিব নারদকে মহাবিদ্যার দশ মহাপুরী দেখাইলেন। নারদ বুঝিলেন, এক অনবচ্ছিন্ন মঙ্গলনীতির নির্ভরে বিশ্ব-সৃষ্টি পালিত হইতেছে! ক্রমবিকাশের প্রণালী অবলম্বনে,সভ্যতা এবং স্বাধীনতার অনুপাতে সুখ-দুঃখ জগতে-জগতে বিভাজিত হইতেছে!

জগত অশুভ নয়, কালেতে হইবে লয়
জীব-দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।

"দশমহাবিদ্যা" রচনা করিয়া হেমচন্দ্রের হৃদয় শান্তি লাভ করিল। অতঃপর তিনি আর এই ক্ষুরধার দুর্গম পথে লেখনী চালনা করেন নাই;

শক্তির পরিণতি ও বিষয় নির্ব্বাচন

তিনি সমধিক উচ্চ আশায়, মহৎ লক্ষ্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন; তিনি বঙ্গ সাহিত্যে একটী 'মহাকাব্য' রাখিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা, নৈপুণ্য, লোক-চরিত্র-জ্ঞান, স্বদেশী বিদেশী মহাকবিগণের কাব্যাদির অভিনিবিষ্ট অধ্যয়ন, এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যথোচিত যোগ্যতা দান করিয়াছিল। বিষয় নির্ব্বাচন, সাহিত্যে সফলতার

প্রধান সেতু। কবি হেমচন্দ্র, যিনি মানবহৃদয়ের শক্তি সাহস অধ্যবসায় প্রভৃতি প্রবৃত্তিকেও ব্যক্তিত্ব প্রদান করেন, যিনি 'জাতীয় সঙ্গীতে'র রৌদ্র রসে স্বদেশ পরিপ্লাবিত করিতে চাহেন, যিনি অমরীর সঙ্গে মনুষ্যের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করেন, স্বকায় 'মহাকাব্যের' মধ্যে কল্পনার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াভূমির জন্য. ইতিহাসের অথবা পুরাণের কোন-জাতীয় বিষয় তাঁহার মনঃপুত হইতে পারে? যাহাতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতলে অবাধে বিচরণ করা যায়, যাহাতে অব্যাকুল ভাবে বার করুণ এবং অদ্ভুতের রসে সন্তরণ করিতে পারা যায়, হেমচন্দ্র এমন বিষয়ই নির্ব্বাচন করিলেন।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রক্ষেপ ও বৃত্রের (মেঘের) নিধনের ক্ষুদ্র রূপক লইয়া পৌরাণিকগণ একটা বৃহৎ আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন।

বৃত্রসংহার

দধিচির মহান্ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে এই আখ্যায়িকা সর্ব্বাগ্রে চিত্ত আকর্ষণ করিত; হেমচন্দ্রও আকৃষ্ট হইলেন। দেখিতে পারা যায়, অন্ততঃ "আশাকাননের" সমসাময়িক কাল হইতে উক্ত বিষয় হেমচন্দ্রের হৃদয়ে উপাদান সংগ্রহ করিতেছিল, যথা,

ইন্দ্রাদি দেবতা দনুজ দৌরাত্ম্যে,
পরিহরি স্বর্গ পুরী।
ধরি ছদ্মবেশ করিলা ভ্রমণ
আসিয়া পৃথিবী পরি।
স্বার্থ পরবশ আশা না আইসে
অমরাবতীতে থাকে।

বলা বাহুল্য, হেমচন্দ্র পরে এই কল্পনা-সূত্র কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করেন। বৃত্রসংহারকাব্যে আশার পরিবর্ত্তে সুরবিরহিত স্বর্গলোকে মদন এবং রতিকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে।

"বৃত্রসংহারের" বিস্তারিত আলোচনা এই প্রসঙ্গে সম্ভব নহে। স্থূলতঃ বলিতে পারা যায়, কবি এই কাব্যে স্বকীয় শক্তি-সামর্থ্যের চরম সীমা দেখাইয়াছেন! সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, দৈন্য-জড়িমা এবং স্বসমাজ ও স্বদেশের সমস্ত সীমা-সংকীর্ণতা দূরে রাখিয়া, বিশ্বজনীন ভাবে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত চরিত্রসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন; কল্পনার আলোকচ্ছটায় কখন বা স্বর্গহইতে মর্ত্ত্যে, কখন বা মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে পাঠকের অজ্ঞাত এবং অভাবনীয় সৌন্দর্য্য-লোক আবিষ্কার করিয়াছেন!

রসের এবং ভাবের উদ্দীপনায়, কিংবা উহার স্থিরীকরণে অসাধারণ সংযম এবং একাগ্রতা এই কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কুত্রাপি কবির দৃষ্টিমধ্যে চাঞ্চল্য অথবা দুর্ব্বলতার পরিচয় নাই! সকলদিক বিবেচনা করিলে, এই কাব্যকে বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ, সুগঠিত এবং সুলিখিত কাব্য বলা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে বৃত্র সংহারের স্থান।

"বৃত্র-সংহার" কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর। চরিত্রগুলি একএকটী বিশেষ-বিশেষ স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত; কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। ভাবের আলম্বন বা উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ গৌরবান্বিত; চরিত্র সমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমান ও অসাধারণ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষার বিষয়েও কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কবি অবশ্য ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের সৌকুমার্য্য বিষয়ে সর্ব্বত্র অল্পাধিক উদাসীন—স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিষ্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। আবার, কোথাও এক-একটা পদের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়া উঠিবে! বৃত্রসংহারে

এইরূপ এক-একটি পদ মণিখণ্ডের মতই কঠিন অথচ উজ্জ্বল! কোথাও হয়ত একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র অবস্থার সংস্থান গতিকেই মনের মধ্যে ত্বরিতভাবে আলোকের দ্বার খুলিয়া যাইবে! এইরূপ পদ এবং ঘটনাসংস্থানের দৃষ্টান্ত "বৃত্রসংহার" হইতে অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; উহারা শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত। তবে, কবি সূক্ষ্মশিল্পী নহেন; "বৃত্র-সংহারে" চরিত্রের কিংবা ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কচিৎ পরিদৃষ্ট হয়! যে অবস্থায় কবিকণ্ঠ ক্রমশঃ কোমলে-মধুরে নামিয়া আসিয়া, পরিশেষে শ্রোতৃমণ্ডলীকে হঠাৎ ভাবের অতলস্পর্শের সমক্ষে উপস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং মনোময় গুহায় বিলীন হইয়া যায়, "বৃত্রসংহারে" সে অবস্থা বিরল। কবির কণ্ঠ সর্ব্বত্র উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেছে! স্থানে স্থানে স্বর হয়ত কাটিয়া গিয়া কর্কশতায় পরিণত হইতেছে, তথাপি শ্রোতৃবর্গ গায়কের শক্তি এবং স্বর-সাধনায় বিমুগ্ধ হইয়াই শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছে! অলৌকিক বিষয়ের আশ্রয় পূর্ব্বক মহাকাব্য-লেখক মাত্রেরই এ দোষ দৃষ্ট হইবে; কি মিল্টন, কি দান্তে, কেহই এ দোষের হাত এড়াইতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্র রচনাধর্ম্মে. গাম্ভীর্য্যে এবং সংযত অর্থগৌরবে বঙ্গভাষার ভারবি। সংস্কৃত সাহিত্যে "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" ন্যায়, বৃত্রসংহার চিরকাল বঙ্গভাষায় একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট-পদ অধিকার করিয়া থাকিবে। হেমচন্দ্র যেই-প্রকৃতির বিষয়ে লেখনী চালন পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করিয়া গেলেন, সেই পথে হেমচন্দ্রকে অতিক্রম করা পরবর্ত্তীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। অপরিজ্ঞাত এবং অলৌকিক বিষয়ের রসাল ধারণায়, উহার চিত্রণে এবং স্ফুটীকরণে কবি-কল্পনার যে মাহাত্ম্য আছে, সেই মাহাত্ম্যে হেমচন্দ্রের নাম চিরকাল বঙ্গসাহিত্যে সমুজ্জ্বল থাকিবে।

"বৃত্রসংহারে" সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং মৌলিক চরিত্র শচী; শচীই বৃত্রসংহারের নায়িকা, সমস্ত ঘটনা-বৈচিত্র্যের পরিচালয়িত্রী এবং বৃত্রধ্বংসের

মূল কারণ। হেমচন্দ্র স্বকীয় কবিকল্পনার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া এই চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। শচীর সুখ-দুঃখ সমস্তই অসাধারণরূপে মহিমান্বিত! কখন বা শচীর কথায় এবং ব্যবহারে, কখন বা ঈর্ষ্যা-কাতরা ঐন্দ্রিলার অপরূপ অসূয়াবাক্যে, হেমচন্দ্র শচী-চরিত্রের যে রেখা-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে দর্শনীয় স্থল অধিকার করিয়া থাকিবে। ঐন্দ্রিলা বলিতেছে—

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি যে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা এ মহীতে
শচীর মহত্ত্ব ভুলেনা কেহ!
শুনেছি নাকি সে পরম রূপসী,
বড় গরবিনী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে?
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদে কিবা সে হরষে
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে।

ইন্দ্রিলার ঈর্ষ্যাই শচী-চরিত্রের নৈতিক গুরুত্বের প্রধান প্রমাণ! এই শচী স্বয়ং কবির হৃদয়-স্থতা রমণী-মহিমার মানসী মূর্ত্তি; অপর পক্ষে, "বৃত্রসংহার" কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী বাণীর মূর্ত্তি ও কি এইরূপ নহে? "বৃত্রসংহারের" অধ্যাত্ম লোকে যেই পরমা বাণী প্রকটিত হইয়াছেন, হেমচন্দ্র তৎপূর্ব্বে কিংবা পরে, আর তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এই কবির অন্য কাব্য সমূহের মধ্যস্থানে বৃত্রসংহার একরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মস্তক উন্নমিত করিয়া উঠিয়াছে! বৃত্রসংহারের অন্তস্তম্বে মহীয়সী বাগ্দেবতার এই অসামান্য আবির্ভাব হেমচন্দ্র যেন জাগ্রতভাবে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে হইতেছে, সেই 'বড় গরবিনী নারী গরীয়সী'

মূর্ত্তি যেন কেবল শচী-বর্ণনা নহে; কবি অতর্কিতে আপন হৃদ্‌পদ্মস্থিতা বীণাপানীর মূর্ত্তিও লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছেন! ইংলণ্ডের অল্পায়ুঃ কবি কীটসের পরম প্রতিভা-জুষ্ট খণ্ড-সঙ্গীত (Hyperion) হাইপীরীয়ণ ব্যতীত কোন আধুনিক কাব্য এই প্রাচীন ক্লাসিক সুর, প্রতিভার এই বৃহৎবিস্তারিত অথচ ধীরগম্ভীর বজ্র-ছন্দ ঘটনা করিতে পারে নাই।

আমরা পূর্ব্বে মধুসূদন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রতিভার পরস্পর বিশিষ্টতা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই কবিত্রয়ের ভারতী ও পরস্পর বিভিন্ন। হেমচন্দ্রের রচনায় লালিত্য অপেক্ষা দৃঢ়তার অনুপাতই অধিক; মধুসূদনে স্বাভাবিক পৌরুষ এবং সরলতার গতিকে উভয়গুণ সমান ভাবে সংমিশ্রিত! নবীনচন্দ্রে ভাবুকতার উচ্ছ্বাসবশে ন্যূনাধিক অস্থির ভাবেই পরিচালিত! মধুসূদন চিত্রকর, অনতিসূক্ষ্ম-তুলি সঞ্চালনে তিনি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলেন; উজ্জ্বলতায় এবং সহজ-তায় উহা সর্ব্বাগ্রে চিত্তাকর্ষণ করে। হেমচন্দ্র ভাস্কর; সুদৃঢ় লৌহদণ্ডের সাহায্যে, বাহুবলে, তিনি যেন পাষাণগাত্র হইতেই প্রাণী-প্রতিমা প্রকটিত করিয়া উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। নবীনচন্দ্র যাদুকর; সত্য এবং কল্পনার, প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত ভাবের সংমিশ্রণে, আত্ম-বিস্মৃত ভাবুকতার তরঙ্গ বৈচিত্র্যে, উজ্জ্বলতায় এবং দ্রুতগতিতে তাঁহার রচনা মনে মোহ উৎপাদন করে।

বৃত্রসংহারের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দোষগুণ

তথাপি, "বৃত্রসংহার" বঙ্গীয় পাঠকসমাজে আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; তাহার কারণ, প্রধানতঃ বঙ্গে প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের সংখ্যাহীনতা। সুখের বিষয়, এই সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের হৃদয় এখনও উচ্চাঙ্গের কবিতা কিংবা প্রতিভার বৃহৎ সৃষ্টিশক্তির ধারণার

জন্য এবং উহাতেই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উপযুক্ত হয় নাই। আমরা কবিতার মধ্যে ক্ষণিক আমোদই খুঁজিয়া থাকি; ভাবের বস্তু-গত মূর্ত্তি-ধারণায়, উহার ঘটণাগত বিকাশে, কিম্বা আবেগের সংযমে অথবা গাম্ভীর্য্যে আমরা তৃপ্তিলাভ করি না; সংযত করুণ ভাবের পরিবর্ত্তে উৎকট আর্ত্তনাদ এবং বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন, সংযত বীররসের পরিবর্ত্তে উন্মত্ত প্রলাপ এবং বিকট গর্জ্জন শুনিতে পাইলে আমরা শিশুর মতই পরিতৃপ্ত হই। দ্বিতীয় কারণ, বৃত্রসংহারে জাতীয়তার অভাব। সাহিত্যে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র জাতীয়তা নাই সত্য; কিন্তু তাহারা প্রাচীন আর্য্যজাতির সঙ্গে আপনাদের রক্ত-সম্পর্ক স্থির করিয়া বসিয়া আছে। রামায়ণ, মহাভারত কিম্বা পুরাণবর্ণিত আর্য্য-বীরত্বের উদাত্ত গাথা তাহার হৃদয়কে পুলকে পূর্ণ করে! রাক্ষস অথবা দৈত্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সাধারণভাবে তাহার সহানুভূতি থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত রাক্ষস অথবা দৈত্য যখন আর্য্যের অথবা আর্য্যোপাসিত দেবতার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তখন সহস্র শৌর্য্যবীর্য্যে অথবা মহত্ত্বে মণ্ডিত হইলেও তাহার চরিত্র-কাহিনী বাঙ্গালীর মনে স্থায়ীভাবে সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। হেমচন্দ্রের কাব্যানুরাগী পাঠক বঙ্গদেশে যে পরিমাণে অল্প, তাঁহার প্রভাব ও সেই পরিমাণে পরিমিত। সাহিত্যে কবির প্রভাব বুঝিতে হইলে, কবির আশ্রিত কিংবা উপজীবী উপকবির সংখ্যা ও তাহাদের অনুচিকীর্ষা পর্য্যালোচনা করিলেই অনেকটা স্থির করা যায়। হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত আদৃত হইয়াছে; দুই এক স্থানে হয়ত অন্তরঙ্গভাবে অনুকৃত ও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কবিতার সবিশেষ কোন অনুকরণ হয় নাই। তাঁহার ছন্দে ও সবিশেষ বৈচিত্র্য নাই; এক মাত্র রসের উদ্দীপনাতেই হেমচন্দ্র কবি। অবশ্য, প্রগাঢ় শান্তরসের দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্রে বিরল। কিন্তু হেমচন্দ্রের রচনার ধর্ম্ম কিংবা উদ্দীপন-প্রণালী এ পর্য্যন্ত

বঙ্গসাহিত্যে ক্লান্তিত্বের সহিত অনুসৃত হয় নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ভাষায় বলা যায়—হেমচন্দ্র রচনার মধ্যে উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থায়ী ভাব পরিস্ফুট করিতেই চেষ্টিত ছিলেন; পরবর্ত্তী কবি ও কবিতা-লেখকগণের মধ্যে অনেকস্থলে বরং ব্যভিচারী ভাবের এবং ভাবুকতার, কেবল ছন্দঃ-কাব্যের অথবা 'সঙ্গীত-চিত্র' তন্ত্রীয় ইঙ্গিত-কাব্যের প্রাধান্যই নিয়ত লক্ষিত হইতেছে।

অতঃপর হেমচন্দ্রের ক্ষুদ্র কবিতাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। এ সমস্ত কবিতা-সৃষ্টির কোন স্থান বা কাল নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে না। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়া ইহারা সংগ্রহাকারে প্রকাশিত। কিন্তু এই কবিতাবলী একদিকে কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র সরল; তাঁহার বাক্যভঙ্গীর মধ্যে কোথাও কোন বক্রতা নাই; সর্ব্বত্র ভিতরের মানুষটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দুই শ্রেণীর খণ্ড কবিতা পরিদৃষ্ট হইবে। এক শ্রেণীর কবিগণ ভাবাবিষ্ট হইলে ভাবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রবেশ করেন; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, সে সৌন্দর্য্যের কারণ-স্থান কোথায়, তাহা খুঁজিবার জন্য প্রয়াসী হন। অপর শ্রেণীর কবি ভাব এবং সৌন্দর্য্যের আবেশ লাভ করিয়া, পাঠকের অভ্যন্তরে কেবল উহাকে সংক্রামিত করার উদ্দেশ্যেই লেখনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া সংস্পর্শ-ক্রমেই অপরেরা আবিষ্ট এবং মুগ্ধ হয়; এবং কবি যে স্বয়ং মুগ্ধ হইয়াছেন, পাঠকের এই ধারণা তাঁহাদের কাব্যের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য করে। হেমচন্দ্র শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। এই শ্রেণীর কাব্য-রসিকের সমক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী চিরদিন নিশিগন্ধার মতই সৌরভ প্রদান করিবে।

খণ্ড কবিতায় হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্রের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক কবিতাগুলির সবিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। ইংলণ্ডে কেম্পবেলের জাতীয় সঙ্গীতের মতই উহারা মহত্ত্বে ঔদার্য্যে এবং সবলতায় বঙ্গের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। এই কবিতাগুলির সঙ্গে বায়রণের যৌউর (Giaur) নামক কাব্যের সাধর্ম্ম্য লক্ষিত হইবে। তবে বায়রণ বিদেশী; গ্রীক জাতির প্রতি উত্তেজনাপূর্ণ ধিক্কার-ভাবেই তাঁহার কবিতা অনুপ্রাণিত। হেমচন্দ্রের কবিতায় স্বদেশী এবং স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং সমদুঃখকাতরতার অশ্রুবারি সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই কবিতাগুলির অন্তর্গত অশ্রুধারা,উহাদের রৌদ্র রসময়ী ঋজুতা হৃদয়ের এবং জীবনের স্বাস্থ্যকল্পে পরম বলশালী।

খণ্ড কবিতার মধ্যে 'গঙ্গার উৎপত্তি' একটী উৎকৃষ্ট বর্ণাত্মক কবিতা। 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' এবং 'দূর কাননের কোণে পাখী এক ডাকিছে' কবিতাদ্বয়ে যে মদিরময়ী নির্ম্মল বিহ্বলতা আছে, তাহাতে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—ইহা কবির আত্ম-জীবনের কোন প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত কি? 'যমুনা-তটে' এবং 'জীবন-মরীচিকায়' এমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আছে যে, মনে হয়, উহা কবির মর্ম্মতল হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়াই কবিতাগুলি এত আলোকে অশ্রুতে এবং সৌরভে ওতঃপ্রোত! সহৃদয়তা, বন্ধু-প্রেম, সমাজে উৎপীড়িত নারী জাতির প্রতি সহানুভূতি, স্বদেশানুরাগ, জগতের সর্ব্বত্র সভ্যতা এবং ন্যায়ের বিস্তৃতিতে অপরিসীম সহানুভূতি,নিয়তিতে নির্ভর,সর্ব্বত্র সাধুতা এবং বীর প্রকৃতি-সুলভ কঠোরতায় হেমচন্দ্রের কবিহৃদয় ওতঃপ্রোত ভাবে গঠিত করিয়াছিল! মানুষটা স্বরচিত কাব্যের মধ্যে গঙ্গাপ্রবাহের মত পবিত্র এবং উদার ভাবে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়! বঙ্গদেশে এই-প্রকৃতির কবি আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

কবি শেষে দারিদ্র্য যাতনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরিদ্র

পরাধীন দেশের কবি ; এই দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরস্বতীর সেবায় গ্রাসাচ্ছাদনও মিলিত না। তাই হেমচন্দ্র লক্ষ্মীর সেবাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ; তিনি মনকে সমগ্রভাবে সরস্বতীর চরণে অর্পণ করিতে পারেন নাই ; "দশমহাবিদ্যা" প্রকাশ করিয়া ষোল বৎসর কাল হেমচন্দ্র একরূপ নীরব ছিলেন। ইতিমধ্যে দুই-চারিটী ক্ষুদ্র সামান্য কবিতা এবং রোমিও-জুলিয়েতের অনুবাদ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে, যখন এত করিয়াও লক্ষ্মীমাতা অনুকূল হইলেন না, এবং ভারতীও বিমুখ হইলেন, তখন সে দরিদ্র এবং অন্ধ অবস্থায় হেমচন্দ্র তীব্র যন্ত্রণায় যে নৈরাশ্যের নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহা মানব-চরিত্র-পাঠকের এবং বঙ্গদেশীয় সকল সাহিত্য-সেবীর অনুধাবনের বিষয় হইয়াছে! 'কেন মজিয়াছিলাম, কেন সারদাকে ভুলিয়াছিলাম, এখন যে উভয়কে হারাইলাম!'

প্রতিদিন কল্পনারে
পাই যদি পূজিবারে,—
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি!
এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপরাধ
নিও না দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল.
কমলা ঠেলিলা পায়.
রোষ কৈলা সারদায়,
শুষ্ক আশাতরু মম বিনা ফল ফুল।

শেষ জীবনের অন্ধতা

এই বলিয়া হেমচন্দ্র জন্মভূমির নিকটে, স্বদেশ স্বজাতির নিকটে করুণভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; সেই যৌবনের বীর-হৃদয় রুদ্রতেজোময় হেমচন্দ্র কি এই? তিনি চক্ষু হারাইয়াছিলেন, নিতান্ত দৈন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন

তাহার কারণ কি এই নৈরাশ্য? না; হেমচন্দ্রের বীর-হৃদয় সমস্ত সাংসারিক আপদ-বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মীর সেবায় হেমচন্দ্র হৃদয়ের আলোক হারাইয়াছিলেন, প্রাণের স্পর্শমণি হারাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল; কবি হেমচন্দ্রের বহু পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল! "আশাকাননের" শেষ ভাগে যে ভীষণ মরুক্ষেত্র দেখিয়া ছলেন, উহা তাঁহার প্রাণেই এ সময়ে জ্বলিয়াছিল। মানস-চক্ষু বহুপূর্ব্বে হারাইয়াছিলেন, তাই যখন বাহিরের চক্ষু দুইটীও নিবিয়া গেল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ তাঁহার নিকটে একেবারে অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল--

ধরা শূন্য জল স্থল অরণ্য ভূমি অচল,
না রহিবে কিছুরই বিচার;
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশ দিক ঘোর অন্ধকার,
বিভু, কি দশা হবে আমার!

এ ক্রন্দন প্রকৃত প্রস্তাবে বহিশ্চক্ষুর জন্য নহে, অন্তশ্চক্ষুর জন্য! হেমচন্দ্রের এই 'বিভু কি দশা হবে আমার' কবিতার সঙ্গে একবার মিল্‌টনের শেষ কবিতার তুলনা করুন; দেখিবেন, একটা অপূর্ব্ব সত্যের উপর আলোক-পাত হইবে। মিল্টন ও হতভাগ্য, অন্ধ; কিন্তু মিল্টন অন্ধাবস্থাতেই প্যারেডাইস-লষ্ট্ রচনা করেন। বহির্জগৎ যখন মিল্‌টনের নয়ন হইতে সরিয়া গেল, বাহিরের চক্ষুর্দ্বয় যখন মুদ্রিত হইয়া গেল, তখন এই মহাকবির অন্তশ্চক্ষু যেন আরও বিকশিত হইয়া উঠিল! মিল্টন অনন্ত আলোক-রাজ্যে দিবারাত্রি বাস করিতে লাগিলেন

অন্ধ আমি বিগত যৌবন,
সবে কহে, ভবেশের ভ্রূকুটি-আহত!
শোকতপ্ত, মনোবল হয়েছে বিগত;
তবু আমি নহি ক্ষুণ্নমন!

এত দুর্ব্বলতা মাঝে কত বল স্বামি !
নয়নে দেখি না বলে না হই কাতর ;
দীন নিরাশ্রয় তবু, তোমারত আমি
অহে পিতা অখিল ঈশ্বর !

অহে দেব করুণা নির্ঝর !
মানুষ সরিলে দূরে তুমি আস' কাছে,
স্বজনেরা ছাড়ি গেলে তবে কর্ণে বাজে
তোমার রথের চক্রস্বর !

তব জ্যোতিস্ময় মুখ স্নেহেতে আনত
মম পানে ; পূত জ্যোতি তার
আমার বিজন বিশ্বে ঝরি' অবিরত
নাশিতেছে আমার আঁধার।

নত শিরে, বিশ্বাসে নির্ভরে,
ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়, পেরেছি বুঝিতে —
এ আঁখি নিয়েছ তুমি, দিয়েছ দেখিতে
তোমারেই— কেবল তোমারে !

আর মম নাহি কোন ভয়,
এ আঁধার সে ত তব স্নেহপক্ষ ছায়া ;
পবিত্র হয়েছি তাহে ; নিকটে আমার
নাহি আসে কলুষের মায়া !

অহে দেব, মনে হয় আসিয়াছি চলে—
যে দেশে মানব কভু ফেলেনি চরণ!
দাঁড়ায়েছি জ্যোতির্ম্ময়, তব হস্ত তলে।
মানবের আঁখি যার লভেনি দর্শন!

কত দৃশ্য এ আঁধারে আসে, যায় চলে!
অপরূপ জ্যোতিমূর্ত্তি ঘিরে চারিধার!
অমর অধর হ'তে সঙ্গীত উথলে—
প্রিয়তম, কি পবিত্র মাধুরী তাহার!

কি দুঃখ তাহায় দেব, খুলেছে যখন
দৃষ্টিহীন-দৃষ্টিপরে ত্রিদিবের দ্বার!
লাগিছে স্বর্গের বায়ু ললাটে আমার—
এ ধরণী রহে যদি আঁধারে মগন!

সেই সে পবিত্রতর জগতের মাঝে
ভূমানন্দে উঠে ভরি' আমার অন্তর;
কোথা হতে আসে ছুটি ভাবের লহর!
মহান্ সঙ্গীত ধ্বনি অযাচিতে বাজে!

দাও মোরে বীণাটী আমার!
হৃদয়ে দেবের প্রেতি হইছে সঞ্চার,
অপার্থিব অগ্নিজ্বালা জ্বলিয়াছে বুকে—
যাহে মম নাহি অধিকার!

প্যারাডাইস্‌লষ্ট-রচয়িতার চিত্ত সমুন্নতি এবং চরিত্র-ভিত্তি কতদুর দৃঢ়, তাহা উপরোক্ত কবিতার প্রতি ছত্রে প্রকাশিত হইতেছে। মিল্‌টন অন্ধকারে অচল অটল সুমেরু শিখরের মতই দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার শিরোদেশ দেবাধিষ্ঠানে আলোকমাণ্ডত হইয়াছে! হেমচন্দ্রের শেষ কবিতায় যে নৈরাশ্যমিশ্রিত অশ্রুজল বহিয়াছে, তাহা "বৃত্রসংহারের" কবির নয়নাশ্রু বলিয়া প্রথমে বিশ্বাস করা যায় না। মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়। কেবল হেমচন্দ্রের দুঃখে নয়, একজন মহামহিম পুরুষকে ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে দেখিলে ক্ষোভ ও দুঃখ উভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের চিত্ত-সমুন্নতি মিল্‌টন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। ইহার জন্য একা হেমচন্দ্র দায়ী নহেন; আমরাও দায়ী; আমাদের সমাজের ও সাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থা দায়ী।

মিল্‌টন ও হেমচন্দ্র

আমরা এই প্রবন্ধে স্থূলতঃ হেমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ, তাঁহার কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মতে তাঁহার কাব্য-জীবনেরও আলোচনা করা গিয়াছে। তাঁহার বাস্তব জীবন কাব্যজীবন হইতে পৃথক ছিল কি না, সেই বিষয় বলিবার আবশ্যক মনে করি নাই। কারণ কাব্যে ও গ্রন্থাদিতে নিমগ্ন এবং প্রকটিত হইয়া যে হেমচন্দ্র বর্ত্তমান আছেন, সেই অশরীরী হেমচন্দ্রই আমাদের পরিচিত, তিনিই অমর। তিনি এই বিশ্বসংসারের স্থায়ী অধিবাসী। তিনিই এখন হইতে আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী। তিনিই অনন্তকালের জন্য মনোজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া বাঙ্গালীর জীবনকে গঠন

অশরীরী হেমচন্দ্র।

করিতে থাকিবেন। অন্ত আমাদের সমক্ষে তিনি বিদেহ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার সহৃদয়তা অন্ত আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। হইতে পারে, তাঁহার সাংসারিক জীবন অপর সাধারণ লোকের স্থায় ছিল; হয়ত তিনি সকল সময়ে জীবনকে আপন ইচ্ছার এবং আদর্শের অনুরূপ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। সংসারের হেমচন্দ্র প্রকৃত হেমচন্দ্র নহেন। আমাদের দর্শন বলেন, মানুষের একটা সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহা জ্ঞানময়। আমরা যে বিষয় দীর্ঘদিন চিন্তা করি, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহার ধ্যান করি, এই বিজ্ঞান দেহে তাহার ছায়া পড়ে। মৃত্যুর সময়ে চিরজীবনের বলবতী প্রবৃত্তির ধর্ম্মই প্রবল হয়; শরীর পড়িয়া থাকে, এবং ওই ধর্ম্মকে সূক্ষ্মদেহে লইয়াই জীবাত্মা পরলোকে চলিয়া যায়। সংসারের ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা চরমের ধর্ত্তব্য নহে। আমরা বিজ্ঞান-দেহী প্রকৃত হেমচন্দ্রকে দেখিতেছি! তাঁহার কতদিনের, কত রাত্রির গভীর ধ্যান যোগের ফল, বিন্দুং হৃদ্ পদ্মের ব্যয়পথে কত পরিশ্রম কত অন্বেষণের পুরস্কার, মানবের চক্ষু যাহার এখনও সন্ধান পায় নাই এমন কত দুর্গম ক্ষুরধার পথে ভ্রমনের ইতিহাস, আমরা তাঁহার কাব্যাদিতে পাইতেছি! তিলোতিলে শরীর পাত হইয়া যে অশরীরী হেমচন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনিই চির কালের জন্ম আমাদের আকাশ স্বদেশ এবং সমাজ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন!

নবীনচন্দ্রের কবি-ধর্ম্ম। *

১২৫৯বাং ১৮৫২ইং—জন্ম; ১৮৭৫—পলাশীর যুদ্ধ; ১৮৮০—রঙ্গমতী; ১৮৮৬—রৈবতক; ১৮৯৬—কুরুক্ষেত্র; প্রভাস; ১৮৯৫—অমিতাভ; ভানুমতী; শ্রীমৎ ।—খৃষ্ট; মার্কণ্ডের চণ্ডী—আমার জীবন চরিত; ১৩১৫বাং ১৯০৮ইং—মৃত্যু।

বস্তু সংক্ষেপ।

নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—চরিত্রের বীর-ধর্ম্ম—কবির প্রতি বিভু-করুণা—'কবিধর্ম্ম'—নবীনচন্দ্রের চরিত্র তত্ত্ব—প্রতিভার বীর-ধর্ম্ম—কাব্যে আত্ম সম্পর্ক—নবীনচন্দ্র ও বায়রণ—নবীনের পাশ্চাত্য ঋণ সামান্য—শিল্পাদর্শে পৌরাণিক ঋষির শিষ্য—নবীনচন্দ্রে ভারতীয় বিশেষত্ব—স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি—ভাবুকতা ও ভাবশক্তি—বীরাদর্শ এবং কাব্যে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য—অবকাশ রঞ্জিনী ও যুবক কবি—পলাসীর যুদ্ধে প্রতিভা ও দেশানুরাগ—রঙ্গমতী ও দেশানুরাগ—পরিণত দেশানুরাগ ও পন্থা নির্ণয়—ধর্ম্মাদর্শ, রৈবতক প্রভৃতি—আদর্শ পথে সাধনা—কবিত্ব ও কাব্য রচনা—রচনা প্রণালী—জীবন প্রণালী—চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্র।

নবীনচন্দ্রের কবি-ধর্ম্ম।

কবি নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বঙ্গদেশের অঞ্চলস্থা এই "শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা, সরিৎমালিনী" চট্টলভূমির একপ্রান্ত হইতে যে স্বাধীন স্বভাবগায়ক বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া, চল্লিশ

* এই প্রবন্ধ ১৩১৫ বাং সনের ফাল্গুণ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

বৎসর যাবৎ উদ্দাম কণ্ঠে বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিলেন, জন্ম-ভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, এই লোকে তাঁহার কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শেষ উক্তি—"আজ আমার বিজয়া।"

বিদায় নহে, প্রস্থান নহে, নির্ব্বাণ বা মুক্তি নহে—বিজয়া! আমাদের শাস্ত্র বলেন, মনুষ্যের চিরজীবনের অন্তর-ধর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রবল হয়; এবং উহার বর্ণেই বর্ণিত হইয়া জীবাত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। ইহাই "ধর্ম্মস্তমনুতিষ্ঠতি" বাক্যের লক্ষ্য; ইহাই 'চিত্রগুপ্তের' কার্য্য। নবীনচন্দ্রের এই শেষ উক্তিতে প্রকৃত কবিটির অধ্যাত্ম ধর্ম্মের ছায়া কি পরিমাণে পতিত হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহাই চিন্তা করিব। তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করাই অদ্য আমাদের শোক প্রকাশের লক্ষণ হইবে। স্বর্গ-গতের উদ্দেশ্যে সভাসমিতির আহ্বান করিয়া কোনরূপ শোক প্রকাশ করা আমাদের সমাজধর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যদিচ, আমরা কালধর্ম্মবশে একটা বিদেশী প্রথাকেই গ্রহণ করিতেছি, তবে উহাকে আজ স্বকীয় সমাজের ভাবানুগত করিয়াই গ্রহণ করিব। পরলোকগত মহাত্মাদের চরিত্র-চিন্তনে ও উহার মাহাত্ম্য নিরূপনে জীবিতগণের যে কর্ত্তব্য আছে, এবং এইরূপ কর্ত্তব্য সাধনে প্রত্যেকেরই যে স্বার্থ আছে, অদ্য এই শোক সভায় তাহার অংশভাগী হইতে চেষ্টা করিব।

নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি।

মানুষের প্রকৃত জীবন অদৃষ্ট; অন্ধকারাচ্ছন্ন; বাহ্যদর্শনে তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। যাঁহারা সত্যকে কিংবা ভাবকে উপলব্ধি করেন এবং প্রকাশ করেন—স্থূল কথায়, যাঁহারা কবি বা দার্শনিক, তাঁহাদের জীবনী এই কারণেই মানব সমাজের অমূল্য সম্পত্তি। বিশেষতঃ কবিগণের

সুখদুঃখ, দোষগুণ, কিম্বা পাপপুণ্য, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর আত্মার মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়; উত্তরাধিকারী উহার অনুধাবনে আপন জীবনের পরমার্থ অর্জ্জন করিতে পারে। এই কারণে কবি-জীবনী, হয়ত শতদোষে আক্রান্ত হইয়াও, শত শত অনুশাসনের গ্রন্থ অপেক্ষা মহার্ঘ বিবেচিত হয়; এবং কবির গ্রন্থসমূহ ও শিক্ষা এবং আনন্দের যুগপৎ সংবিধান করে বলিয়া, পরম যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে; আর, কবিগণ মরিয়াও ইহলোকে অমর, বরণীয় এবং মহনীয় হইয়া থাকেন

মানুষের অন্তিমোক্তি অনেক সময় তাহার সমগ্র জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং, অদ্য আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কবির অন্তিমোক্তি ও শেষ অভিপ্রায় চিন্তা করিব। কবির শেষ মুহূর্ত্ত, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি, গৃহে লোকারণ্য: রোগী-চর্য্যার সংযতভাব চলিয়া গিয়াছে; অন্ত্যেষ্টির উপকরণ প্রস্তুত করিয়া সকলেই ব্যাকুলভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে মহাক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন! কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, কবি সেইমাত্র দীর্ঘ মোহাবসানে নেত্রোন্মীলন করিলেন; আমাকে দেখিয়া চিনিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; উৎফুল্ল মুখে কহিলেন "আজ বিজয়া।" একেবারে মৃত্যুসংবাদ প্রচার হওয়ায় সহরের বিদ্যালয়গুলির ছুটি হইয়াছিল। একান্ত দর্শনেচ্ছু ছাত্রগণ গবাক্ষপথে কবিকে দেখিয়া যাইতেছিল। তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিজয়ার সংবাদ কি সকলেই পাইয়াছে?" পুনর্ব্বার "আজ বিজয়া," কহিতে কহিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। উহারপর হইতে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীনভাবে নবীনচন্দ্র আরো দুই দিন বাঁচিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ভবপুরীর সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিলনা। এই ঘটনার পূর্ব্বদিন, নবীনচন্দ্র সহোদরকে তাঁহার শেষ অভিলাষ জানাইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃতদেহ স্রক্চন্দনে ও গৈরিক বসনে সজ্জিত করিয়া জন্ম-পল্লীতে লইয়া যাইবেন ; মুখ মৃত্যুচ্ছায়ায় বিকৃত না হইলে উহা খোলা রাখিয়াই বহন করিবেন ; তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদব্রজে শবের অনুগমন করিবেন : পিতৃ শ্মশানের পার্শ্বেই তাঁহার অন্তিম শয্যা রচিত হইবে, ও ইহ-পরকালের একমাত্র সম্বল-স্বরূপ একখণ্ড গীতা তাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং সঙ্গে দিতে হইবে !

এই অপূর্ব্ব আত্মোক্তি ও শেষ আশা যতই চিন্তা করি, ততই এ ক্ষণজন্মা পুরুষের সমগ্র জীবনের অন্তর-তত্ত্বে নব নব আলোকপাত হইতে থাকে ! বলা বাহুল্য, আমি এই আলোচনার শেষ পাই নাই ; উহার সীমা নাই ; উহা চিরকালের জন্য অনাগত শত পুরুষের ও সাহিত্যসেবীর কৌতুকস্থলী হইয়া রহিল।

মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আজ বিজয়া'। এই বাক্য তাঁহার সমস্ত জীবন মন্থনপূর্ব্বক নিজের অর্থসামর্থ্য সংগ্রহ করিয়াছে ; ও সহজে, অতর্কিতে বাহির হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের মুখচ্ছবি মৃত্যুর করাল গ্রাসেও বহুক্ষণ বিকৃত করিতে পারে নাই ; ঐ কথাটী কহিবার সময় মুমূর্ষুর সেই ম্রিয়মান মুখচ্ছবি যে অপূর্ব্ব তেজঃপ্রদীপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার এই স্বল্প জীবনের গুটিকতক উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে, আমার জন্মভূমির বরপুত্রের এই শেষ দান, চিরকাল পরম মহার্ঘতায় দেদীপ্যমান থাকিবে।

কথা একটী পাইয়াছি—'আজ বিজয়া।' 'বিজয়া' কাহার ? আমাদের

নবীনচন্দ্রের বীরধর্ম্ম।

দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন স্মরণ করি ; বিজয়ার দিনেই বিসর্জ্জন। সাধক যে প্রতিমা রচনা করে, যাহাতে দেবাধিষ্ঠান উদ্বোধিত করিয়া সাধনা করে, তাহার বিসর্জ্জন। কেন না,

চতুর্থদিনে—সিদ্ধির পরদিনে, উহা মৃত্তিকা মাত্র। নবীনচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, ঐ দিন তাঁহার সংসার সাধনার শেষ, তাই ঐ দিন তাঁহার বিজয়া। আবার, বিজয়া হর্ষ-বিষাদের দিন। হর্ষ, সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; বিষাদ, যে মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির সাহায্যে চিণ্ময়ীকে পাইয়াছে, সেই পরমপ্রিয় কমনীয় মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। নবীনচন্দ্রের আত্মাদর এমনকি আত্মাভিমান অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি কবি, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন, এই প্রতীতি, এমন কি, অভিমান তাঁহার জন্মিয়াছিল। তাই, সে দিন, ভবসাধনার অবসানে তিনি উৎফুল্ল মুখে হর্ষ বিষাদে বলিয়াছিলেন "আজ আমার বিজয়া।"

আবার দেখি. 'বিজয়া' কাহার? জিগীষু বীরের। এই অধঃপতনের দিনে বিজয়ার মাহাত্ম্য আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সৌভাগ্য সময়ে বিজয়কামী নৃপতিগণ এ দিনেই বিজয়াযাত্রা করিতেন। এই কারণেও বর্ষান্ত শুক্লাদশমীর নাম বিজয়া। নবীনচন্দ্র ভবপুরী হইতে নির্গত হইয়া অমরলোকে অভিযান করিতেছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের, প্রকৃত নবীনচন্দ্রের জীবন ঐ দিন হইতেই আরব্ধ হইতেছিল। সংসারিক দুঃখদৈন্য দুর্ব্বলতার কবল হইতে মুক্ত হইয়া, কবির আত্মা ঐ দিন আপন স্থির জীবন প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত হইতেছিল। নবীনচন্দ্র এ অর্থটাও কি চিন্তা করিয়াছিলেন? কিছু করিয়াছিলেন বই কি? এ অবস্থায় সংসারিক সাধারণ লোক বলিত—'বিদায়'; জ্ঞানী বলিত—প্রস্থান; যোগী বলিত—"নির্ব্বাণ" বা 'সমাধি'। নবীনচন্দ্র জ্ঞানপন্থী বা যোগী ছিলেন না। সংসারে তাঁহার তথাকথিত কোন বৈরাগ্য ছিল না। সাংসারিক ঋদ্ধি ও কবিকার্য্যের কৃতার্থতা, ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; এবং উহাই এই বীর প্রকৃতি, কর্ম্মশীল কবিজীবনের ধর্ম্ম সাধনা ছিল। কবিকৃত্যের ভাব বিহ্বলতার মধ্যেই তিনি অসীমের এবং আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করিতেন; কাব্যরসে বিভোর

হইয়া ভক্তের মতই ভাবপুলকিত হইতেন। উহাই তাঁহার জীবনের ও কাব্যের সাত্ত্বিকতা। স্বকীয় কাব্যের স্থান বিশেষ পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিরল ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেও দেখিয়াছি।

মনীষী কবি গেটের শেষ উক্তি "আলোক, আরো আলোক!" সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি কীটসের শেষ উক্তি—"সুন্দর—অতি সুন্দর!" বীরধর্ম্মী ভাবুক কবি নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—'আজ বিজয়া'। ইহাঁদের প্রত্যেকের শেষ উক্তিতেই, চিরজীবনের অনুসৃত হৃদয় ধর্ম্ম প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণের চক্ষে, সংসারজীবনে তাঁহারা অবস্থার নিত্যচঞ্চল প্রবর্ত্তনা বশতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের আত্মাপুরুষ সমস্ত সাংসারিক আবর্ত্ত বিক্ষোভের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যে উন্নত লোক হইতে আপন আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক সসার হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবির প্রতি বিভুকরুণা

কবিগণকে ভাবপ্রবণতা ও ভাষার সাধনা করিতে হয়; মনকে নিশ্চল বা নিশ্চেষ্ট রাখিতে গেলে কাব্য রচনা হয় না; অনন্যযোগে সত্যের অন্বেষণে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে এবং মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে চিত্ত চালনা করিতে হয়; উহাই কবি জীবনের সঙ্কট-স্থান। এই কারণে অনেকের চিত্তও অতর্কিতে চঞ্চল এবং প্রবৃত্তির রজোগুণাপন্ন হইয়া যায়; অনেকের ভাবচর্য্যা হইতে সংসারিক জীবনও সঙ্কটময় এবং বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে। হয়ত, স্বকীয় আদর্শের হিসাবে সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং অনভীষ্ট কার্য্যও অনেককে করিয়া বসিতে দেখা যায়। সাধারণ জনমানবের আপাত-দৃষ্টিতে কবির জীবন যেরূপেই প্রতিভাত হউক না কেন, এই বিশ্বভুবনরূপ কাব্যের নিদান-কবি যিনি, যিনি

অন্তঃকরণ-তত্ত্বের পরীক্ষায় ভাল মন্দ বিচার করেন, তাঁহার নিকট এইরূপ কবির প্রেতাত্মা যে পরম প্রীতি এবং কারুণ্যের পাত্র হইয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শত দোষ সত্বেও, অনেক সময় অমার্জ্জনীয় দৈন্য-দুর্ব্বলতা সত্বেও, কবিগণ সংসারে যে উত্তরোত্তর প্রীতি-পূজা প্রাপ্ত হন, অনেকসময় প্রকৃত পুণ্যচরিত্র ধার্ম্মিকের অপেক্ষাও যে লোক-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, যেরূপে সংসারে মরিয়াও অমর থাকিয়া যান, বিভু-করুণার তাহাই যথেষ্ট নিদর্শন নহে কি ?

কবির ধর্ম্ম

পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃত-কবির নিকট আপন কবিকর্ত্তব্যই প্রধান ধর্ম্ম। সকল প্রকৃত কবিই স্বকীয় প্রাণের ভাব-তন্ময়তার ভিতরে সত্যশিবসুন্দরকে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন উপাসনা প্রণালীর একান্ত অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই। প্রকৃত কবি যুগপৎ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ! তাঁহাদের হৃদয় সহজেই আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক রসময়ী কবিতায় প্রমূর্ত্ত করে ! অনেকেই যুগপৎ যোগী ও ভোগী ! নবীনচন্দ্রও শ্রেষ্ঠ-কবি-হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহদানটি তিনি কি প্রকারে স্বকীয় জীবনে এবং কবি-কৃত্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, জীবন-সাধনাকে কি রূপে মহিমময়ী বিজয়ার দিকে, সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অদ্য সংক্ষেপে চিন্তা করিব।

নবীনচন্দ্রের চরিত্র ও অন্তস্তত্ত্ব

নবীনচন্দ্রের আন্তরিক চরিত্র বেগবান, ভাবপ্রবণ, সুখে বিহ্বল, দুঃখে অসহিষ্ণু এবং যুগপৎ অভিমানী ও সরল ছিল। কোনরূপ ভণ্ডতা, আত্মজুগুপ্সা, অপহ্নব অথবা 'বক'-ধর্ম্ম ও তাঁহার মধ্যে ছিল না। আমাদের শাস্ত্র এই সকলকে রজঃসত্বগুণের ধর্ম্ম বা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। বস্তুতঃ, এই কবির হৃদয় রজঃপ্রধান সত্বগুণে পূর্ণ ছিল। তাঁহার

'শেষ আশার' "স্রকচন্দন এবং গৈরিক বসনে" সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার জীবনের অন্তঃস্থিত বীরাদর্শটিই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কবি হইতে পারে না ; নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিতে যে সাত্ত্বিকতার পরিচয় আছে, তাই উহাও রাজসিক উপকরণ সাহায্যেই প্রকট এবং সমুজ্জল হইয়াছে। তাই, গীতা অধ্যয়ন করিতে গিয়া নবানচন্দ্র গীতার কর্ম্মযোগই ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন ; অধ্যাত্মযোগ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আত্মপ্রকৃতি যাহার অনুরূপ বা নিকটবর্ত্তী, তাহাই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে। অন্তঃকরণ-তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য না ঘটিলে হৃদয় কোন বিষয়ে প্রকৃত কাব্য-প্রয়াসে প্রেরিত হইতে পারে কি ? তাই, কবি নবীনচন্দ্রের সমগ্র জীবনের পরিণত চিন্তার ফল রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসের মূল উদ্দেশ্য ও 'ধর্ম্ম সংস্থাপন' নহে, 'ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন'! কবি নবীনচন্দ্র কর্ম্মী ; জ্ঞানপন্থার ধ্যান ধারণা সমাধি তাঁহার কোন কালেও মনঃপূত ছিল না ; রজোগুণাপন্ন অর্জ্জুন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে ভৈরব-রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই আত্মরূপ—এই স্থানে আত্মরূপই বিশ্বরূপ। উহার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি! কেন না, তিনিও স্বয়ং কর্ম্মী। মানুষের পরমার্থ কর্ম্মে, কর্ম্মেই মনুষ্যত্ব, এবং ঐ কর্ম্মের ফলটি ভক্তিযোগে ভগবানে অর্পন পূর্ব্বক স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব-বিহীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ—ইহা নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম। এই প্রাচীন ধর্ম্ম উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় তমোমিশ্র রাজসিক ভাবের প্লাবনযুগে, সুষুপ্ত ভারতে নূতন করিয়া প্রচার করাই নবানচন্দ্রের দীক্ষা। স্বকীয় প্রকৃতির প্রবল স্বাধর্ম্ম্যবশেই তিনি এই দীক্ষা লাভ করেন। দেশের কবি-সমাজে এই সুমহৎ কর্ত্তব্য গ্রহণে তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ও বীরধর্ম্মাপন্ন ছিল। এই কারণে সমধিক সূক্ষ্ম-দর্শন বা সূক্ষ্মতার প্রকাশ অপেক্ষা, উঁহার দ্রুতগতি এবং বিপুল শক্তিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করে। এই কারণে নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিও সর্ব্বত্র ভাবের বিপুল উচ্ছ্বাসে, ভাষার ঝঙ্কারে এবং উদ্গতজ্জ্বালা প্রাঞ্জলতায় 'অবকাশ-রঞ্জিনী' হইতে অপ্রকাশিত 'চৈতন্য' পর্য্যন্ত, তাঁহার চরিত্রের সমস্ত সদ্‌গুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে! নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচয় মাত্রে, যেমন অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও তাঁহার সমস্ত গুণ এবং দোষের পরিচয় পাইয়াছে; তেমনি, নির্ব্বিশেষ সরলতার দরুণ, তাঁহার সমস্ত কাব্যের গুণ বা দোষও অত্যন্ত-সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভায় বীরধর্ম্ম

এই কারণে, কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, নবীনচন্দ্র সবিশেষ সূক্ষ্ম দর্শন করিতেন না; ব্যায়ত-দর্শন তাঁহার কবিতার মূল তত্ত্ব। ইংলণ্ডীয় কবিগণের মধ্যে কেবলমাত্র বায়রণ, বিশেষতঃ সেক্সপীয়রই এ গুণের বহুলভাবে অধিকারী ছিলেন। তবে সেক্সপীয়র প্রোক্ত উভয় গুণেরই সমান অধিকারী; বলা বাহুল্য, সাহিত্য-জগতে তাঁহার সদৃশ এতদুভয়ের সমুচ্চ এবং সমানুপাত শক্তিযুক্ত কবি বিরল। বৃহৎ ভাবকে বৃহৎ দৃষ্টিপূর্ব্বক বৃহৎ নাম-রূপে বুঝিতে, দ্রুতবেগে বড় বড় তুলিকা সঞ্চালনে তাহার রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে, এবং তৎসঙ্গে পাঠকের অনন্যতন্ত্র সহানুভূতি জাগ্রত করিতে নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাই, সাধ্য বিষয়ে বিহ্বল ঐকান্তিকতা এবং প্রাঞ্জল ও রস-সমুজ্জ্বল ভাষা নবীনচন্দ্রের লেখনীর নিত্যসহচরী ছিল। অন্যদিকে, করুণরাগিণীর আলাপ করিতে যাইয়া অকস্মাৎ নিজের সমগ্র প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে, হাস্যরস জমাইবার সময় অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া বিহ্বল ভাবে হাসিয়া ফেলিতে, মহিমার কথা সমুচ্চ কণ্ঠে আলাপ

করিবার সময়ে অতর্কিতে স্বয়ং আত্মহারা হইয়া বিমুগ্ধ এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িতে, একমাত্র কবি নবীনচন্দ্রেই সম্ভবে। সাহিত্য-শাস্ত্রে নাকি ইহা অসঙ্গত—আর্ট বা শিল্পকলার বিরুদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মানে কে? 'পলাশীরযুদ্ধ', 'রঙ্গমতী', কিংবা রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে কবি যে স্থানেই শাস্ত্র অবহেলা পূর্ব্বক যবনিকার মধ্য হইতে স্বয়ং-মুগ্ধভাবে নগ্নদেহে বাহির হইয়া আসিয়া অভিনেতৃগণের সঙ্গে মাতিয়া গিয়াছেন, সেস্থানেই উক্ত কার্য্যের ফল কবির সাপক্ষে আশাতীত ভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সামাজিকগণ, কবির এই অনৌচিত্য বিচার করিবার জন্য অবকাশ চাহে নাই; কবির অকৃত্রিম সরলতায় এবং ব্যক্তিগত সংস্পর্শে মুগ্ধ হইয়া, আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, নবীনচন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান সৌন্দর্য্য এই সরলতা ও আত্মসম্পর্ক। (Personal element)

কাব্যে আত্ম-সংস্পর্শ।

পাঠক যেন অন্তরে-অন্তরে জানিতে চায়, কবি একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন, না সত্য প্রদর্শন করিতেছেন? কবি স্বকৃতির মধ্যে আছেন কি? নিজের কথা নিজে বিশ্বাস করেন কি? এ সকল প্রশ্নে আশ্বাস পাইলে পাঠকগণ যেন প্রীত হয়; এবং কবিকৃতির মাহাত্ম্য ও উক্ত কারণেই সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক বাড়িয়া যায়! নবীনচন্দ্রের বেলায় এ তথ্যের বহু সমর্থন হইয়া গিয়াছে। বায়রণের কবিতাতেও Personal element প্রবল ছিল। তবে, বায়রণের অভিমান, সমাজ এবং নীতি-দ্রোহিতা ও বিদ্বেষভাব এত প্রবল ছিল যে, উহাতেই তাঁহার কবিতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বরং বিপক্ষ আচরণ করিয়াছে; পাঠকের হৃদয়ে উহা বহুস্থলে এমন বেদনাদায়ক হইয়া গিয়াছে যে, বায়রণের তীব্র মুগ্ধকরী কবিত্ব শক্তিও কুলাইয়া উঠে নাই।

নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও প্রথম-প্রথম বায়রণের কোন কোন দোষ যে ছিল না, এমন নহে। তবে

নবীনচন্দ্র ও বায়রণ। বয়সের প্রৌঢ়তায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের শান্তিনিষ্ঠ সমাজ-সংসর্গের ফলেই নবীনচন্দ্রের কবিতা হইতে, ঐ সমস্ত দোষ ক্রমে নিরাকৃত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মতন পরিণতবয়স্ক ও সুস্থিত হইতে পারিলে, ইংলণ্ডের বায়রণও নবীনচন্দ্রের ন্যায় শ্রেয়ো-মুখী সমাজ-বুদ্ধি এবং শান্ত-বুদ্ধির অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেন কিনা, চিন্তার বিষয়। পরন্তু, উভয় কবির জীবন, প্রতিভার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিচার করিতে বসিলে, উভয়ের নানা সাধর্ম্ম্য চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। জগতের অশুভবাদী এবং বিদ্বেষধর্ম্মী Manfred, Cain অথবা Heaven and Earth না হইয়া কোন্ শুভাদৃষ্ট-গুণে বাঙ্গালার বায়রণের (?) প্রতিভা রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের এবং বুদ্ধ-চৈতন্যের নিষ্ঠা-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পরম কুতূহল এবং প্রণিধানের বিষয়। বায়রণ অতিপ্রদীপ্ত, উপরন্তু ধ্বংসশীল উল্কাশিখার মতই স্বকীয় প্রকৃতির অমিতাচার ও স্বাভাবিক অসদ্ব্যয় ফলে, যেন অকালে নিবিয়া গিয়াছিলেন! আর, ভারতবর্ষীয় নবীনচন্দ্র অপেক্ষাকৃত মিতকর্ম্মা এবং সুরক্ষিত থাকিয়া, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত, নিজের জীবনকে বিশ্বাসে এবং ধর্ম্মবুদ্ধি-বশে বিকশিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন! এ কবির ধর্ম্ম এবং সমাজ-জীবন যে ভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুধাবনও প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর সবিশেষ কৌতুকাবহ হইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের এ কবি বিস্তৃত অধ্যয়নশীল পণ্ডিত কিংবা কোন বিষয়েই ধৈর্য্যশালী অধীতী ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোনরূপেই বহুপ্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর

গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম! সেক্সপীয়রের গ্রীক এবং লাটিন বিদ্যার বিষয়ে কোন কবি যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষা এবং দর্শনের জ্ঞান বিষয়ে ও উক্তরূপ সাক্ষ্য নির্ভয়ে দেওয়া যাইতে পারে। যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকটে তিনি বহু পরিমাণে ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Child Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, এ কথা তিনি আমার কাছেই স্বীকার করিয়াছেন। অবকাশরঞ্জিনী এবং পলাশীর যুদ্ধের পর, বায়রণের সহিত তাঁহার আর কোন সামঞ্জস্যই দেখিতে পাইতেছি না।

নবীনচন্দ্রের পাশ্চাত্য-ঋণ সামান্য।

তিনি যে স্বকীয় প্রতিভার অদৃষ্টগত সামঞ্জস্যের দরুণ বায়রণের সমভাবাপন্নকবি, এ ধারণা আমাদের দৃঢ়মূল হইয়াছে। স্বকীয় মানসিক শক্তির বিপুল প্রেরণা এবং স্বাভাবিক প্রতিভা বশেই কবি চকিতবেগে নিজের কাব্য-বিষয় দর্শন করিতেন এবং অবলীলাক্রমে কবিতা চয়ন করিয়া যাইতেন! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষা, ইতিহাস, দর্শন এবং কাব্য চর্চ্চা, ও সমসাময়িক বঙ্গসমাজের প্রাকৃত আবহাওয়া হইতে পরিমিত জীবনীরস সংগ্রহ পূর্ব্বক এই স্বভাবকবি, আমাদের দেশের অযত্ন-সম্বৰ্দ্ধিত বটবৃক্ষের মতই ঝড়ে-ও-রৌদ্রে পরিপুষ্ট হইয়া এবং প্রকাণ্ড ও মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন! এমন অনায়াস-সিদ্ধ ক্ষিপ্রতা, প্রকাণ্ডতা, নিশ্চিন্ত নির্ভয়তা সাহিত্যজগতে অত্যল্প কবির বেলাতেই পাওয়া যায়! যিনি স্বয়ং পণ্ডিত নহেন, তাঁহার কাব্য অপরকে পাণ্ডিত্য লাভে সহায়তা করিতেছে; যিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত-নিমেষে লিখিয়া যাইতেন, তাঁহারই কবিতা অন্যকে গভীর চিন্তায়

দীক্ষিত করিতেছে; শক্তিমাতার সুপুষ্কল স্নেহ এবং পক্ষপাতিতার ফল না হইলে বর্ত্তমানকালে সাহিত্য-জগতে এরূপ ঘটনার সম্ভব ছিল না। আমরা দেখিতেছি, পাশ্চাত্য কবির কিংবা কাব্যপ্রথার নিকট মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঋণ ও অনায়াসে স্থির করা যায়; কিন্তু পরিণত নবীনচন্দ্রের বিদেশীয় ঋণ নির্ভয়ে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য! 'রঙ্গমতী' রচনার পর হইতেই তিনি যেন অপরূপ নিঃসম্পর্ক ভাবে ইয়োরোপীয় সাহিত্যপ্রবাহের দূর-দূরতর দেশেই অগ্রসর হইতেছিলেন!

শিল্পাদর্শে পৌরাণিক ঋষির শিষ্য

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে একটা নূতন 'হুজুগ' উঠিয়াছে, তাহার মূল মন্ত্র—'art for art's sake;' উহার অর্থ—আত্মসন্তুষ্ট শিল্পকলা! অর্থাৎ, কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কলার একমাত্র উদ্দেশ্য অনলঙ্কৃত স্বভাব-বর্ণন, অথবা একোদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃজন। কাব্যের কোন নৈতিক কিংবা শ্রেয়স্কর উদ্দেশ্য রক্ষার নাকি আবশ্যক নাই। এই মতের ভাল-মন্দ বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। সুতরাং, এইমাত্র বলিয়া রাখিব যে, ইয়োরোপেই টলষ্টয়, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি মনীষিগণ এই মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে এই বিজাতীয় মত স্পর্শ করে নাই; মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই উহার প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃষ্ট হইবে। নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষের পৌরাণিক ঋষি-সেবিত সাহিত্য-গঙ্গা হইতেই স্নান-পূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রে ভারতীয় বিশেষত্ব

এই নবীনচন্দ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবপুঞ্জের বংশধর! দৈব-ক্রমেই বর্ত্তমানকালে ভারত সমুদ্রের তলদেশ হইতে এই ঝটিকাজুষ্ট এবং কবিধাত্রী চট্টল ভূমির উপকূলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন! যাঁহারা পৃথিবীর 'অন্ধকার'

যুগে ভারতীয় সাহিত্যে সুবিপুল রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছেন এবং পরকালে যাঁহারা এ দেশে চৈতন্যচরিত, চৈতন্য ভাগবত এবং সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসারপুথি' গান করিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহাদেরই শোণিত-সম্পর্ক এবং সবর্ণ-সম্বন্ধ দেখিতেছি! মধুসূদন ও হেমচন্দ্র শক্তিধর কবি হইয়াও বিদেশীয় প্রভাবের দরুণ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য-হৃদয়ের মর্ম্মস্থান চিনিয়া লইতে পারেন নাই; এবং তাহাদের সুবৃহৎ কাব্যদ্বয় অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসাবে, হয়ত মহৎ হইয়াও, যেন বঙ্গসমাজের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই! স্বভাবকবি নবীনচন্দ্রের বিষয়-নির্ব্বাচন, বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে সুবিহিত হইয়াছিল কি না, বঙ্গদেশের পাঠক-সাধারণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

নৈসর্গিক কবিত্ব শক্তি

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জগন্মাতা জন্মকালে যে শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই কবিকে প্রেরণ করেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাই অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র প্রকৃতি-দত্ত শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; কোন উন্নতি বিধান কিংবা নূতন অর্জ্জন যেন করেন নাই! 'অবকাশরঞ্জিনী'র নবীনচন্দ্রে এবং 'চৈতন্যে'র নবীনচন্দ্রে মৌলিক কোন পার্থক্যই নাই! এই দীর্ঘজীবনে কবি স্বকীয় প্রারব্ধের দ্বারা জন্ম-স্বত্বের গুণগত কোন হ্রাস বৃদ্ধিই যেন করেন নাই! রচনার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং শক্তি একই-জাতীয়! ইহাতেই দেখা যাইবে, এই কবির কবিত্ব শক্তির মূল মস্তিষ্কে নহে—বিশেষভাবে হৃদয়ে! এ ক্ষেত্রে, প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের সহিত নবীনচন্দ্রের সবর্ণ সম্পর্ক আরও পরিস্ফুট! ভাবে গদ্‌গদ এবং প্রেমে মুগ্ধ নবীনচন্দ্র কেবল হৃদয়ের সামর্থ্যেই কাব্যরচনা করিয়াছেন; জীবন-পথেও প্রতিনিয়ত হৃদয়ের

দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছেন। স্বকৃতি কিংবা পর-কৃতি তিনি হৃদয়ের দ্বারাই বিচার করিতেন! ভাবুকতার উদ্দীপনপূর্ব্বক কেহ তাঁহার হৃদয়-স্পন্দন জাগাইতে পারিলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন, এবং অকপটে অতিশয়োক্তি-বহুল প্রশংসা করিয়া ফেলিতেন! বঙ্গদেশের অনেক নবীন সাহিত্যিকেই কবির এই অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও অনসূয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যাত্রার আসরে কিংবা অভিনয়মঞ্চে কোনমতে ভাবের উদ্রেক করিতে পারিলেই, সর্ব্বাগ্রে, নবীনচন্দ্রকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করা কত সুসাধ্য ছিল, তাহা এ দেশের সকলেই জানেন।

ভাবুকতা ও ভাবশক্তি

এই হৃদয়-ধর্ম্মের গতিকেই নবীনচন্দ্র কখনও নিজের অন্তরতত্ত্বে নিবিষ্ট দৃষ্টি করেন নাই; ভিতরের মানুষটীর প্রতি সবিতর্ক দৃষ্টি যেন নবীনচন্দ্রের প্রণালী বিরুদ্ধ! তাঁহার 'আত্ম-জীবনী'র যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিটা কোথায়? পলাশীর যুদ্ধ কিংবা রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র-প্রণেতা বাল্যজীবনের কোন্ স্থানে আপন প্রাণরস প্রাপ্ত হইতেছে? উহার বর্ণিত ঘটনাবলীতেও কেবল একটা উদ্ধত, দুর্দ্দান্ত, সুখ দুঃখে অতি-প্রবণ স্বভাবশিশুকেই দেখিতেছি! কবি আত্মজীবন বিবৃত করিতে যাইয়া যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এত সরল, নির্ভীক এবং স্বাভাবিক যে উহাতেই অতর্কিতে তাঁহার চরিত্রের মূল বর্ণ প্রকাশ করিতেছে! এ জাতীয় কবির রচনা-রীতিই তাঁহাদের চরিত্রের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। উহা জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র; জীবন গঠনের বা দর্শনের নহে। জার্ম্মণীর গ্যেটে যেমন শৈশব হইতেই আপনার কবি জীবনের প্রতি কাণ্ডারীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন, এবং নিজকে সর্ব্ববিধ ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া জাগ্রৎভাবে বাছিয়া নিয়াছেন; নবীনচন্দ্র তেমন কখনও করেন নাই। তিনি অতর্কিত কবি। কথাটা

সম্পূর্ণ অর্থবাচক হইল না। নবীনচন্দ্র নিজের অদৃষ্ট এবং জীবনদেবতার সানুগ্রহ বিধান বশতঃই কবি। ঘটনাবিধান বিপরীত হইলে, এমন কি পিতার মৃত্যুর পর সংসার যে তাঁহাকে করাল বক্ত্র বিবৃত করিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল, উহা পরাবৃত্ত না হইলে, এবং উক্ত রাজকীয় পদ লাভান্তে জীবনোপায় সুবিধাজনক না হইলে, তিনি কি হইতেন, বলা যায় না। মনীষী কার্লাইল স্বকীয় 'বীর-পূজা' নামক গ্রন্থে যে সমস্ত শক্তিধর সর্ব্বতোভদ্র পুরুষকে 'বীর' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও সে-জাতীয় 'বীর' ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। কবিপ্রতিভার প্রবর্ত্তনা তাঁহার সমগ্র চরিত্রের অনেকগুলি প্রবল প্রবৃত্তির অন্যতম মাত্র; যেটি যে দিকে ছুটিত অপর সমস্তকে অভিভূত করিয়াই ছুটিতে পারিত! দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি প্রিয়-পুত্রকে এ ক্ষেত্রে অনুপমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বীরাদর্শ ও কাব্যে বিশিষ্ট লক্ষ্য

প্রকৃতি পরম আনুগুণ্যে নবীনচন্দ্রকে হৃদয়ে এবং কার্য্যে কবি করিয়া তুলিয়া ছিলেন; কেবল কবি নহে, কল্পিতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কম্পনে ঝঙ্কৃত-- কেমন কবিও নহে; তাঁহার সমস্ত জীবনকে সমগ্রতাভাবে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যে অনু-প্রাণিত, সমস্ত কার্য্যচেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট মঙ্গল-লক্ষ্যে প্রেরিত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় উহা পরিস্ফুট হয়।

অবকাশ রঞ্জিনী ও যুবক নবীনচন্দ্র

অবকাশরঞ্জিনীর ক্ষুদ্র কবিতা সমূহে কিশোর বয়স্ক ও যুবক নবীনচন্দ্রের অন্তস্তত্ত্বের পরিচয় পাই। স্বাধীন এবঞ্চ উদ্ধত স্বভাব-শিশু, পরিবারের ও স্বদেশের প্রেমে বিগলিত, সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবুকতায় উন্মত্ত, সৌহার্দ্দে সকরুণ, কৃতজ্ঞতায় নতশির এবং সর্ব্বপ্রকার নীচতার

প্রতি একান্ত অক্ষমাশীল নবীনচন্দ্র এ দুটি কাব্যের প্রতি ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। পরিণত বয়সেও তাঁহার চরিত্রের এ সমস্ত মূল বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। নবযুবক যে স্থানে 'কীর্ত্তিনাশা'র তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—

কীর্ত্তিনাশা! বৃথা নাম বৃথা অভিমান;
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?

যে স্থলে, সর্ব্বধ্বংশী কাল-স্রোতেও অক্ষতদেহ তিনটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া, বিহ্বল হইয়া গিয়াছে; সে স্থলে, সেই ভাবমুগ্ধ পরম-ঔদ্ধত্যের মধ্যেই ভবিষ্যৎ কবির পরিচয় পাই; সে স্থলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পলাশীর যুদ্ধের' বিভাবনী শক্তি জাগরিত হইয়াছে!

পলাশীরযুদ্ধে প্রতিভা

তারপর 'পলাশীর যুদ্ধ' কেবল প্রতিভার স্বেচ্ছা-দৃপ্ত সঙ্গীত! আপাত-দর্শনে, উহার কোন লক্ষ্য নাই, কোন নৈতিক ভিত্তি নাই; উহা কেবল আনন্দ প্রকাশ! কবির হৃদয় আনন্দে নাচিতেছে! কবি হৃদয়ের মধ্যে আত্ম প্রতিভার সমুদ্র কল্লোল ও কামান গর্জ্জন শুনিতেছেন—গান ত অপরিহার্য্য; এখন যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই চলুক! বাস্তবঃ উদ্দেশ্য-ভারাক্রান্ত নহে বলিয়া পলাশীর যুদ্ধ নববসন্তের উল্লাসমত্ত কোকিল কণ্ঠের ন্যায় উজ্জ্বল মধুর রসাল; এক শ্রেণীর কাব্য-রসিকের নিকট চিরকাল হৃদয়গ্রাহী; চিরকাল কবির পরবর্ত্তী সিদ্ধ-লক্ষ্য গ্রন্থাবলী অপেক্ষাও সমাদৃত!

প্রেম ও দেশানুরাগ

কিন্তু পলাশীর-যুদ্ধের উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থা-বৈগুণ্যেই প্রকটিত হইতে পারে নাই। আমরা দেখিব, প্রেম—স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-প্রেম সর্ব্বত্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভার উদ্দীপক শক্তি এবং

অবলম্বন। মধুস্দনে যে স্বদেশপ্রেমের অভাব, অন্ততঃ অস্ফুটতা; সহৃদয় হেমচন্দ্রে নানাস্থানে যাহার কিংকর্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস; নবীনচন্দ্রে তাহারই সমুল্লসিত লক্ষ্যে স্ফূর্ত্তি এবং প্রয়াস! বুঝি, ঐ জন্যই, নবীনচন্দ্র কখনও 'মানবত্বের' ভূমি পরিহার করেন নাই, কখনও অনৈতিহাসিক কিংবা অতিমানব ঘটনাঅবলম্বন পূর্ব্বক কাব্য-প্রণয়নে নিযুক্ত হন নাই। 'পলাশীর-যুদ্ধের' অন্তঃস্থলেও স্বদেশ-প্রেমই কার্য্য করিয়াছে; কবি উহাই উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি গঠন-প্রয়াসী কবি; বায়রণ কিংবা ভলটেয়ারের ন্যায় ধ্বংস-প্রয়াসী নহেন। অধিকন্তু, 'পলাশীর যুদ্ধে' কবি কেবল 'সেরাজুদ্দৌল্লা-বধ' লিখিতে অগ্রসর হন নাই; কোনরূপ 'বধ' কিম্বা 'সংহার' লক্ষ্য করিয়া, এই কবি কেবল 'আত্মসন্তুষ্ট-শিল্প-কলার' আদর্শে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরাধীন দেশের কবি নবীনচন্দ্রের সতর্করুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস 'পলাশীর যুদ্ধের' প্রধান সৌন্দর্য্য! এই কাব্যের স্থল বিশেষের জন্য কবিকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন-প্রকৃতি নবীনচন্দ্র তজ্জন্য নিজের সেবক-বৃত্তিকে চিরকাল ধিক্কার দিয়া আসিয়াছেন; সময় সময় নিজের অবস্থানিয়ন্ত্রণায় নিদারুণ যাতনা অনুভব করিয়া গিয়াছেন।

রঙ্গমতী ও দেশানুরাগ

তৎপর রঙ্গমতী! এই কাব্য কবির আত্মপ্রতিভার প্রতিকৃতি। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি, প্রত্যক্ষ ভাবে, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে আপন বীণাপাণিকে স্থাপন পূর্ব্বক, যদৃচ্ছসঙ্গীতে নিজের হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন! কোন বাধা নাই, অপর কেহ শুনিতেছে কিনা, বিচার করিতেছে কিনা, যেন, সেই দিকে কবির কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই! আপনার আনন্দ-দণ্ডে প্রবাহিনী আমাদের কর্ণফুলীর মতই, কবি-হৃদয় সমস্ত ছন্দোবন্ধ এবং শাস্ত্র-বিধান

উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছে! এই স্বাধীনতার মধ্যেই কবির প্রকৃত অন্তরের তত্ত্ব আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, এই কাব্যের নায়ক প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং নবীনচন্দ্র; বীরেন্দ্র প্রভৃতি বাহ্যিক উপলক্ষ মাত্র। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েতের' ন্যায় এই গ্রন্থ কবির প্রথম যৌবনোল্লাসের অধ্যাত্ম প্রতিকৃতি।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই জাতীয়, ভাবমুগ্ধ কবির পক্ষে, ছন্দোবন্ধ যেমন একদিকে নিয়ন্ত্রণারূপে কার্য্য করে, অন্যদিকে তেমনি, কবির স্বেচ্ছাচারকে সীমাবদ্ধ করিয়াও মহদুপকার সাধিত করে। মিলটন 'প্যারেডাইস্-লষ্ট' কাব্যের ভূমিকায় মিত্রচ্ছন্দের আদর্শকে নিগৃহীত করিয়া একভাবে সমুচ্চ সাহিত্যের বিশেষ অপকার করিয়াছেন। মিলটনের প্রতিভা একদিকে যেমন সমুদ্রের ন্যায় বিপুল উচ্ছ্বাসযুক্ত এবং সামর্থ্যময়; অন্যদিকে, তেমনি, আপন প্রকৃতির স্বপ্রতিষ্ঠ সংযমবশে নিয়ন্ত্রিত এবং নিগৃহীত; মিলটনের পক্ষেই অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতা সুখগ্রাহ্য হইতে পারিয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধের' ছন্দ-আদর্শ উল্লঙ্ঘন করিয়া নবীনচন্দ্র, পরবর্ত্তী কাব্যাদিতে, এক দিকে যেমন স্বাধীনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি, ছন্দের সংযত ধ্বনিগৌরব এবং সংযত শৃঙ্খলাকেও হারাইয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত আধুনিক নবীন সাহিত্য-সেবার প্রণিধানের বিষয় হইয়া থাকিবে।

পরিণত দেশানুরাগ ও পন্থানির্ণয়

রঙ্গমতীতে এই অধঃপতিত জাতির নিপীড়িত কবি হৃদয় স্বাধীনতার লোকপাবনী মূর্ত্তির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়াছে; স্বদেশের, স্বজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা পরিদর্শন করিয়া অশক্ত আকুলতায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে। রঙ্গমতীর মধ্যেই রৈবতক কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসের মূল

উদ্দেশ্যের সূত্রপাত দৃষ্ট হইবে। কবি অতঃপর দীর্ঘজীবন উহার অনুধাবনেই ব্যয় করিয়াছেন এবং ঐ কাব্যত্রয়ের বিপুল আয়তনের মধ্যে, সর্ব্বপ্রযত্নে, স্বজাতির উন্নতি-সমস্যার পূরণেই চেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মাদর্শ

কবি ধর্ম্মের মধ্যেই এতদ্দেশের, এই বিশাল হিন্দু-বৌদ্ধ-মোস্‌লেম-খ্রীষ্টান-নিষেবিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উদ্ধার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই, কিরূপে এই বিভেদ-বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান" প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, এতসমস্ত পার্থক্যের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করিতে পারা যায়, উহার আদর্শ স্থাপনেই কবি-হৃদয় এত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস সে উদ্দীপনার ফল। ভারতবর্ষের অতীত যুগ হইতে, আর্য্য সাহিত্যের গুহারুদ্ধ ভাবের প্রবাহকে নব পরিচ্ছদে পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত করিবার ইহাই হেতু; "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রচিত হইবার আধ্যাত্মিক কারণ। চণ্ডী ও গীতার অনুবাদ, খ্রীষ্ট অমিতাভ চৈতন্য রচনা ও মহম্মদের অনুকল্পনা উহারই অবান্তর ঘটনা মাত্র।

আমাদের সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে কবি 'চৈতন্য' রচনা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশের কবিগণের মধ্যে চৈতন্যের ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উদ্দাম তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিতে কিঞ্চিৎ যোগ্য ছিলেন, একমাত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র একদিকে যেমন ক্লিওপেট্রা ও জরৎকারুর চরিত্রকে অনুপম ভাবে বুঝিয়াছিলেন; অন্য দিকে তেমনি, শৈশবে সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, স্বকীয় হৃদয়-সাধর্ম্মে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকেও বুঝিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসের শ্রীকৃষ্ণে গৌরাঙ্গেরই পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম। চৈতন্যে উহাই হয়ত সংহত হইতেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মহাকালের আহ্বান আসিয়া

পড়িয়াছে; এবং কবি স্বদেশের হৃদয়ে অসম্পূর্ণকর্ম্ম-সন্তাপ রাখিয়াই মহাপ্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইরূপে স্বদেশানুরাগে এবং বিশ্বজনীন প্রেমে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এই ভাব-মুগ্ধ, শক্তিমান্ কবি-হৃদয় আমরণ একনিষ্ঠ থাকিয়া আপন ভাবে মনুষ্য-সেবায় জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন! ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের-সাধনা। কাহারও মুখাপেক্ষা করেন নাই; সম্মিলনের আদর্শ সংস্থাপন করিতে যাইয়া, স্বসমাজের প্রবল ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি বঙ্গ সাহিত্যে প্রাচীন 'মহাভারতে'র মুক্তবায়ু, ও ভারত-সমুদ্রের কল-কল্লোল প্রবাহিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ কিংবা অভিমান আহত হইতেছে কিনা, তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই।

আদর্শপথে সাধনা

কোন প্রাচীন পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যে এক অদ্ভুত প্রণালীর সমালোচনার রেখা-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। "কাব্যেষু মাঘঃ, কবিঃ কালিদাসঃ।" কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? না, মাঘের শিশুপাল বধ। আর, কবি কে? না, কালিদাস। কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাস্য নহে; কারণ বক্তা অপর কাহাকেও কবি বলিয়াই জানেন না; বহু কবির অস্তিত্ব বিষয়ে কোন আশঙ্কাই হয় নাই। কবি কাহাকে বলিবে?—না, কালিদাস। কালিদাস উৎকৃষ্ট কাব্যকার না হইতে পারেন, তবু, তিনিই কবি। উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ও যাঁহার নিকট কবির "সার্টিফিকেট" পাওয়া গেল না, এমন সমালোচকটি কে? বাস্তবিক, কথাটার বিস্তর সারবত্তা আছে। উৎকৃষ্ট কাব্য নানা কারণে হয়। কিছু শক্তি, বিস্তর শ্রম ও 'মধ্যরাত্রিতে তৈল খরচ',

কবিত্ব ও কাব্য রচনা

অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র, এত সমস্তের মিলনেই শিশুপাল বধের মত উৎকৃষ্ট (?) কাব্য রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া, কবি! কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে হয়ত কেবল একজন।

এই ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে, ব'লতে পারা যায়, পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট কাব্যের সংখ্যা অনেক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কবির সংখ্যা 'হাতের কড়ায়' গণিয়া লওয়া যায়। আরও দেখা যাইবে, তাঁহাদের অনেকেই, হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য একটাও লিখিয়া যাইতে পারেন নাই! ঐ হিসাবে নবীনচন্দ্রের লেখা বিচার করিতে বসিলে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই ধারণা হইতে থাকে—এই একজন প্রকৃত কবি! জগতের কবি-গণনায় যাঁহার নাম বাদ পরিবে না, তেমনই একজন কবি। তাঁহার কাব্য হয়ত, রসজ্ঞ পাঠকের মন সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; স্থানে স্থানে হয়ত 'আপশোষ' রাখিয়া যাইবে—কিন্তু তবু কবি। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র বা বায়রণ যেমন শত শত ভুল ভ্রান্তি সত্বেও চিরকালের শরণ্য এবং বরেণ্য কবি—সেই জাতীয় একজন কবি! সাহিত্য জগতে এমন কবি দুর্লভ—যাঁহার কবিত্ব শক্তি ঝড়ের মত—কোন বাধা বিচার নাই, ভাষার ব্যাকরণের ছন্দের অলঙ্কারের মুখাপেক্ষা নাই, যাহার চাল চরিত্রেও কোনরূপ সংযম নিরোধ নিবৃত্তি নাই, ভিতরে বাহিরে কোনরূপ ভয় বিক্ষোভ নাই, যে স্বকীয় শক্তিদম্ভে উচ্ছ্বসিত আস্ফালনে ছুটিয়াছে এই ভারতবর্ষের বিশ্ববরেণ্য শিখর-শিরোদেশ হইতে নিঃসারিত গঙ্গার ন্যায় ছুটিয়াছে—অথচ সুস্থির লক্ষ্যে, ভারত মহাসমুদ্রের দিকেই ছুটিয়াছে!

রচনা প্রণালী

নবীনচন্দ্রের রচনা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেও তাহাই বুঝিব। কোনরূপ নিয়ম সংযম শৃঙ্খলা, বিচার বিতর্ক নাই; সংশোধন প্রসাধন গোপন নাই; প্রবাহের মত তরতর বেগে ছুটিয়াছে!

সময় সময় এক বৈঠকেই এক একটা 'সর্গ' উৎসারিত হইয়া তদবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রগত হইবার জন্য গিয়াছে! নবীনচন্দ্রের কোন লেখায় কখনও নকল-নবীশের আবশ্যক পড়ে নাই। নবীন চন্দ্রের চিন্তা এবং রচনা সমগতিক ছিল। বীণাতন্ত্রীর কম্পনগুলিই যেমন সঙ্গীত, তাঁহার ভাবাহত হৃদয়ের স্পন্দনগুলিই তেমনি কবিতা রূপে প্রকটিত; তাঁহার হৃদয়-শোণিতের সাহায্যেই তাঁহার কাব্যাদি লিখিত। আত্মজীবনীর পিতৃ-বিয়োগাধ্যায়ের এবং কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের স্থলবিশেষের হস্তলিপি এক অপরূপ পবিত্র ও সযত্ন-রক্ষণীয় পদার্থ। নবীনচন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত বড় বড় অশ্রুবিন্দুপাতে স্থানে স্থানে মসীলিপি ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে!

নবীনচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিয়াও তাহাই দেখিব; সম্পূর্ণ স্বাধীন—এমন কি, স্বেচ্ছাগতিক জীবন!

জীবন প্রণালী

শৈশব হইতেই উহার কোন অভিভাবক নাই। শৈশবে জননী অন্তরালে সরিয়া গিয়া, বালকটিকে সম্পূর্ণ রূপে, প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; অতি-স্নেহময় পিতাও স্বকীয় হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া, বালকের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া দিয়া তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে নিজের ইষ্টদেবতা ভোলানাথের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন! বালক সমবয়স্কের সামন্ত সৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাইয়া, শিক্ষকদিগকে পাড়াপ্রতিবেশীকে বিধিমতে উৎপীড়িত করিয়া, দম্ভে এবং অহঙ্কারে উৎকণ্ঠ হইয়া দেশময় ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর, সাক্ষ্যভূমি হইতে পিতার প্রস্থান—ক্ষণকালের জন্য সংসারের বিভীষিকা মূর্ত্তির প্রকাশ—তাহাতেই জাগরণ, প্রকৃত কবি নবীনচন্দ্রের জাগরণ! সেইদিন, দুঃখের দীক্ষায়, পবিত্র পিতৃভক্তির অশ্রুজলে আমাদের চট্টলভূমির এক-প্রান্তে যে কবি জাগিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যকুঞ্জ সেই অকৃত্রিম

স্বভাবকবির উদ্দাম সঙ্গীতেই এতদিন মুখরিত হইতেছিল; এবং আজ তাঁহারই সার্থক জীবনের 'বিজয়াযাত্রা' সমাহিত হইয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রামে নবীনচন্দ্র!

আমরা, তাঁহার স্বদেশীগণ, তাঁহার আত্মীয়গণ, তাঁহার ভাবুকতামুগ্ধ অনুরক্ত গণ, আজ আমাদের হৃদয়-বেদনা কিরূপে প্রকাশ করিব? আমাদের হৃদয় কি প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতেছে না, এদেশের জ্যোতিঃ চলিয়া গিয়াছে; আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ্, আমাদের সাহিত্যের রসকৌমুদী-নির্ঝর নবীন চন্দ্র আর ইহজগতে নাই! আমাদের জন্মভূমির কোন ব্যক্তি সাহিত্য-সেবা করিতেছে জানিলে, যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইত; জন্মভূমি যাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ছিল; যিনি যত্র-তত্র সগর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন; এই দেশের শৈল-নদী-সাগরকান্তারের মাহাত্ম্য-প্রতিভা যাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র শতমুখে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছে; জন্মভূমির যে বাৎসল্য-মুগ্ধ শিশু, প্রতি বৎসর দূর প্রবাস হইতে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে অনুপম ভাষায় ডাকিতেন :—

মা! মা! মা! কত কাল পরে
ডাকিলাম ও মা পরাণ ভরে!
শৈল-কিরীটিনী,
সাগর-কুন্তলা
সরিৎমালিনী—হেরিলাম তোরে!

জন্মভূমির সেই প্রিয়তম পুত্র যখন ভবলীলার শেষ বুঝিয়া, দূর দেশ হইতে জন্মভূমির বক্ষে, পিতৃশ্মশানে অন্তিম শয়নের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, এবং অবশেষে যখন যোগীবেশে জন্মভূমির বক্ষেই সংসার-সন্তপ্ত বক্ষঃ রাখিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, তখন কি এই বহুপ্রাচীনা অচলাভূমি,

তাঁহার শৈলনদী সমুদ্র কান্তার সমস্ত মর্ম্মে মর্ম্মে পরম শোকাবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে নাই? যে কবি যৌবনের প্রারম্ভে গাহিয়াছিলেন—

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধুপ্রান্তে সুসজ্জিত জলদ মালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়!
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া,
ঊর্ম্মির উপরে যেন ঊর্ম্মি সাজাইয়া!
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ
উচ্চস্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন!

জন্মভূমির সেই হৃদয়ঙ্গম সন্তান আজ কোথায়? আজ তাঁহার অভাবে এই ভূমি কি আপনার বিপুল সঞ্চিত ভাবোদ্দীপনী শক্তি ও অমরত্ব-বিধায়িনী স্নেহ-করুণা লইয়া শূন্য-প্রতাক্ষায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন না? এই ভূমি চিরকাল কবিভূমি,সাধু যোগী ফকির দরবেশের ভূমি! এ-ভূমিই অতীতকালে আপনার মহনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং জ্ঞান গরিমায় 'রম্যভূমি' ও 'পণ্ডিত বিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল; এবং ভারতবর্ষের গৌরব বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ্য-বিতাড়িত অবস্থায় স্বকীয় নিভৃত শৈলকন্দরে আশ্রয় দানে রক্ষা করিয়াছিল! এই ভূমিই পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বাঙ্গালী জাতির জাগরণ যুগে, নবদ্বীপচন্দ্রের বঙ্গবিজয়ী ভক্তিসংকীর্ত্তনে, আপনার শান্ত নিভৃত গুহাসদন হইতে স্বভাব-সুকণ্ঠ মুকুন্দ দত্ত ও ভক্তশ্রেষ্ঠ পুণ্ডরীককে প্রেরণ করিয়াছিল! এই ভূমিই বঙ্গসাহিত্যের নিদানস্বরূপে, রামায়ণও মহা-ভারতের পরম পাবনী আর্য্যধারা বঙ্গভাষার অঞ্জলি ভরিয়া আপনার দরী-কন্দরে রক্ষা করিয়াছিল; শতশত কবির হৃদয়-রত্নাকর হইতে সুবৃহৎ'জাগরণ'

ও 'মনসার পুঁথি' সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল! এ ভূমিইত মোসলেম-যুগে সংস্কৃত পারশীক উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষার এবং উহাদের ভাবরীতির মহামিলন সংঘটনে,বাঙ্গালার সাহিত্য-মঞ্চে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার জন্য, কবিবর আলাওলকে সমুদ্দীপ্ত করিয়াছিল! এই ভূমিই পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে,পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যসভ্যতার সম্মিলন স্থলে,ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য-ধর্ম্ম-রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্কটযুগে, প্রাচীন মহাভারতের চিরন্তন আদর্শকে নবপরিচ্ছদে পুনঃপ্রচার করিবার চেষ্টা-করে, আপনার শৈলনদী-সমুদ্রের প্রতিভায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া এই নবীনচন্দ্রকে বঙ্গদেশের সাহিত্যরঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল। জন্মভূমির এই শেষ আশা এবং প্রযত্ন সফল হইয়াছে কিনা, কিংবা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহার বিচার করিবার কর্ত্তব্য আমাদের নহে। আজ আমরা জননীর প্রিয়পুত্র এবং প্রিয়তম আত্মীয়কেই শ্মশানানলে ভস্মীভূত করিয়া শূন্য-হৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অন্তর্জীবন।

১৮৩৮ খ্রী অঃ ২৭শে জুন ; ১৭৬০ শঃ ২রা চৈত্র—জন্ম।

১৮৪৩—মেদিনীপুর স্কুলে প্রবেশ ; (কাঁথির নদীতট বৃক্ষাবলীর মধ্যে কপালকুণ্ডলার অঙ্কুর)।

১৮৫১—হুগলী কলেজে প্রবেশ ; ললিতা ও মানস (ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব)

১৮৫৮—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ উপাধি অর্জ্জন।

১৮৬১-৬২—দুর্গেশনন্দিনী।

১৮৬৭—কপালকুণ্ডলা।

১৮৭০—মৃণালিনী।

১৮৭২—বঙ্গদর্শনের প্রকাশ।

১৮৭৩—*বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা (বঙ্গদর্শনে)।*

১৮৭৪—চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয় (ঐ)।

১৮৭৫—রজনী। (ঐ)

১৮৭৪–৭৬—কমলাকান্তের দপ্তর। (ঐ)

১৮৭৮—কৃষ্ণকান্তের উইল। (ঐ)

১৮৮০—রাজসিংহ।

১৮৮১–৮৩—আনন্দমঠ ; মুচিরাম গুড়ের জীবনী।

১৮৮২—দেবী চৌধুরাণী।

১৮৮৩–৯২—নবজীবন ও প্রচারে কৃষ্ণচরিত্র ; মানব ধর্ম্ম ; ও গীতার টীকা।

১৮৯৩—মৃত্যু।

১। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের বিশেষত্ব—সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনই আলোচ্য—দুর্গেশ নন্দিনী ও প্রতিভা শিশুর খেলা—কপাল কুণ্ডলা ও প্রতিভার মহাপ্রাণ উচ্ছ্বাস—অর্দ্ধপরিচিতা প্রতিভা সুন্দরী—দেশ-দীক্ষা ও মৃণালিনী—বঙ্গদর্শন ও বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর—পরিবারতত্ত্বে দৃষ্টি ও বিষবৃক্ষ—সাহিত্যে বিশেষ-জ্ঞান—বিষ-বিজয়ের আদর্শ ও চন্দ্রশেখর—ভারতীয় শিল্পাদর্শ—সূক্ষ্ম দাম্পত্য আদর্শ—দাম্পত্যধর্ম্মে প্রায়শ্চিত্ত ও কৃষ্ণকান্তের উইল—পরিবার তত্ত্বের ত্রিগাথা ; স্থগিতভাব, দেশজীবন ও রাজসিংহ—স্বদেশ প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্মের আনন্দমঠ—হৃদয়গত আদর্শের প্রকাশ—শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ফলশ্রুতি-আদর্শ—নিষ্কামতার আদর্শ—পৌরাণিকতা ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রসার—দেবীচৌধুরাণী ও হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা—নিষ্কাম সংসারধর্ম্ম—ভারতীয় ধর্ম্মের সন্ন্যাসাদর্শ—বঙ্কিমের মনোদৃষ্টির দ্বৈত গতি ও শিল্পাদর্শ ; শিল্পক্ষেত্রে দার্শনিকতা ও ধর্ম্মবাদের সীমা—নিষ্কাম আদর্শের অতিরিক্ত অনুসরণ—পৌরাণিক দার্শণিকতা এবং সীতারাম—সংশয় ও অনবস্থা—শিল্পে ব্যাভিচার—সাহিত্যকৃতার পরিহার—ঋষিকৃত্য, 'প্রচার' ও নবজীবন।

২। ভারতীয় ধর্ম্মের পূর্ব্বাপর আদর্শে বঙ্কিমের কার্য্যসূত্র—সেশ্বর ও নিরীশ্বর ধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মে নিরীশ্বর-সংন্যাস ও মায়াবাদ প্রভৃতির সংসর্গ ফল—নিরীশ্বরাদর্শ সমন্বয়ের সামাজিক ফল—নিরীশ্বর বৈরাগ্যবাদ ও হিন্দু সমাজে তাহার ফল—হিন্দু সমাজে যুগে যুগে মহাপুরুষগণের চেষ্টা ও ন্যূনাধিক বিফলতা—হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান কালের জাগ্রত ভাব

ও চেষ্টা—বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে ধর্ম্মও সামাজিক সমস্যার প্রসার—বঙ্কিমের কার্য্যসূত্র ও 'অনুশীলন ধর্ম্ম'—গীতার ঈশ্বর বাদ ও ভারতীয় ঋষির ধর্ম্ম পন্থা ; গীতাদর্শের পুনঃবর্ত্তন চেষ্টা—বঙ্কিমের ধর্ম্মাদর্শ ও বর্ত্তমানে তাহার সঙ্গতি।

৩। বঙ্কিমের ধর্ম্মাদর্শ পরিণতি ও গীতা—বঙ্কিমের কবিত্ব—উপন্যাসে শিল্পত্ব—শিল্পের 'চরিত্র' লক্ষণ—চতুরঙ্গ লক্ষণ—বঙ্কিমের উপন্যাসে শিল্প-গুণ—সাহিত্যশিল্পের শক্তি—ভারতীয় শিল্পাদর্শ—বঙ্কিমচন্দ্রে ভারতীয় শিল্প-লক্ষণ—উপসংহার।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের বিশেষত্ব

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার বঙ্গভাষার পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু, ওই পদগৌরবে বঙ্গ ভাষা স্বেচ্ছভাবে চলিতে পারিতেছিল না ; বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, 'মেঠো' গ্রাম্য পথে, পুষ্করিণীর ঘাটে, দিদিমার রূপকথার সভায় যাতায়াত করিবার জন্য তাহার সাহিত্যের ক্ষমতা, যোগ্যতা বা অবসর ছিল না। সে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারিত, দার্শনিক গবেষণা করিতে পারিত, উহা কেবল মাতামহী সংস্কৃত ভাষার জোরে। এক কথায় এক পুঁথি ব্যক্ত করিতে, কটাক্ষে তাক্' লাগাইয়া দিতে, হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, পারিত না। তাহার জন্য, সমুচিত দৃষ্টান্তে ঐ সমস্ত শিখাইবার জন্য, প্রতিভার আবশ্যক ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা।

কথা কহিতে, কথা শিখাইতেও প্রতিভার আবশ্যক। বলিতে কি, প্রতিভার প্রধান পরিচয় এই কথায়। একই অভিধানের শব্দ, সকলেই হয় ত জানি ; কিন্তু কেহ প্রতিভার লক্ষণযুক্ত কথা কহিতে পারি না, এ স্থলেই পার্থক্য। কথার বাঁধুনীতে অনির্ব্বচনীয়তা আছে, বিশিষ্ট পরিচিহ্ন ও ছন্দ আছে—বর্ণ আছে। সেই বর্ণ, যাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয়, তাহারই প্রাণের বর্ণ—অভিধান ব্যাকরণের বাহিরে। বঙ্কিম চন্দ্রের কথায় এইরূপ বর্ণ আছে। বঙ্কিম চন্দ্রের কথা হাসিতে, নাচিতে, ছুটিতে

কাঁদিতে জানিত ; প্রেম করিতে, কলহ করিতে, যুদ্ধ করিতে জানিত ; ঘৃণা করিতে,আস্ফালন করিতে, ভাত ও বিস্মিত শান্ত এবং স্তিমিত হইতেও জানিত, বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব শক্তিমতী এই সরস্বতী! বিশ্বভাবে, সমগ্র হৃদয় রসে বিভোর হইবার শক্তি ইহার আছে ; অথচ ইহার মধ্যে কোনরূপ প্রাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণতা নাই ; তাই, বঙ্গসাহিত্যে ইহার আবশ্যক ছিল। রাম-মোহন তর্ক করিতে, নিরস্ত করিতে, ধ্যানস্থ করিতে জানিতেন ; কেশবচন্দ্র উদ্দীপ্ত করিতে, অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন ; বিদ্যাসাগর বুঝাইতে, কাঁদাইতে জানিতেন ; সঞ্জীবচন্দ্র দেখাইতে, দীনবন্ধু হাসাইতে জানিতেন ; বঙ্কিমচন্দ্র ন্যূনাধিক সমস্ত এবং তাহারও অধিক জানিতেন। লেখক বঙ্কিম-চন্দ্র পূর্ণ-গঠিত—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে কোন অযথা দৌর্ব্বল্য বা প্রাবল্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব, অর্থ ও ছন্দ পরস্পরকে ব্যভিচরিত করে না বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধ এই সরস্বতী—শ্রেষ্ঠ কাব্য-শিল্পীর উপযুক্ত। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমের আবশ্যক ছিল।

আমরা অদ্য এই পূর্ণবয়স্ক ও সম্পন্ন শিল্প-প্রতিভার সংসর্গ করিব ; শিল্পীর ও শিল্পের অন্তস্তত্ত্বে দৃষ্টি করিব। স্বকীয় রচনা হইতে কোন শিল্পীই সূত্র-সম্পর্কহীন পদার্থ নহে। প্রত্যেক অকৃত্রিম কবির কাব্য এবং জীবন অপরিহার্য্য ভাবে, কার্য্য-কারণ-সূত্রে সম্বন্ধ। শিল্পী

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনই আলোচ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের সংসর্গ করিতে, তৎসঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় করিতে আনন্দ আছে, পুণ্যও আছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট ভাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। আমরা সেই পীঠস্থানে যথাযোগ্য ভক্তির সহিত তীর্থযাত্রা করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মা যেই ভাব-সাধনা করিয়াছিল, তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। দোষ দর্শনের

আবশ্যক নাই,—কেন না, দোষ দর্শনে পুণ্য নাই। মনুষ্য-কৃতি মাত্রেই ন্যূনাধিক দোষাবহ না হইয়া পারে না। উত্তরাধিকারীর যাহা পরম স্বত্ব—পূর্ব্ববর্ত্তীর রিক্থ ভোগ, তাহাই অন্য লাভ করিতে চেষ্টা করিব। বঙ্গসাহিত্যে শিল্পীর সংখ্যা পরিমিত, সর্ব্বত্র বরং ভাবোন্মত্তের সংখ্যাই বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র একজন সম্পূর্ণ শিল্পীর দৃষ্টান্ত বলিয়াই নানাদিকে বঙ্গের তরফ হইতে বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য। বাঙ্গালী আমরা, এই সৌভাগ্য-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিব।

দুর্গেশনন্দিনী ও প্রতিভা শিশুর খেলা

দুর্গেশনন্দিনী গ্রহণ করুন—নবপ্রবুদ্ধ প্রতিভা শিশুর খেলা! কিন্তু অকাল-জাগ্রত নহে। পূর্ণগঠিত শিশু, হৃদয়ের নব রসে বিহার করিতেছে! উহা একটা test শিল্প—আত্মপরীক্ষার চেষ্টা। দুর্গেশনন্দিনীর অন্য উদ্দেশ্য নাই—উহা প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যায়ামক্রীড়া মাত্র—শক্তিমান্ ব্যক্তি, অজ্ঞাত বলে বলীয়ান ব্যক্তি আস্ফালন করিতেছে! প্রতিভা কি করিবে, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি, শিল্পর-চর্য্যার উদ্দেশ্য কি, এইরূপ কোন প্রশ্ন যুবকের মনে উদিত হয় নাই। বলিতে পারেন—তখনও তাঁহার আদর্শ art for art's sake.

কপালকুণ্ডলা

তার পর কপালকুণ্ডলা। সমুদ্র-তীরবাসিনী প্রতিভার আনন্দ-স্ফূর্ত্তি এই কপালকুণ্ডলা! কবি আপনাকে চিনিয়াছেন; আপন হৃদয়ের প্রতিভা মূর্ত্তির পরিচয় পাইয়াছেন কিন্তু সে তখনও বন্য—অসামাজিক—সামুদ্রিক। কবি সমাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে মনুষ্যের বন্য এবং মগ্ন মূর্ত্তিটি চিনিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে তাহার স্থান কোথায়? কিন্তু তাঁহার লেখনী সেই নবপরিচিত মানুষকে না দেখাইয়া পারে নাই। কবির লেখনীর স্বতঃস্ফূর্ত্তি যে অপরিহার্য্য ছিল, তাহাও আমরা বুঝিতেছি।

কপালকুণ্ডলার চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমের সবিশেষ শিল্প-কারুকার্য্য নাই; তাঁহার অনুভব শক্তি কবি-জনোচিত প্রবল, ইহাই আমরা দেখিতেছি। স্বয়ং কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পাঠকের যথানুরূপ সহানুভূতি জন্মে না; পাঠক তাহার দুঃখদুর্গতি দর্শনে যথোচিত মতে ব্যথিত হয় না! এ গ্রন্থে Poetic justice নাই; প্রকৃত স্থায়ী ভাব-ব্যক্তি বা ফলশ্রুতি নাই। উহা আগুন্ত অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ—কিয়ৎ পরিমাণে গ্রীক অদৃষ্টবাদ। ভারতবর্ষে এইরূপ অদৃষ্টবাদের আদর নাই। কিন্তু, তবু কপালকুণ্ডলা 'ভাল লাগে'। তাহার হেতু কি? লেখকের প্রতিভা-পরিচয়। এই লেখকের প্রতিভায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার শক্তি আছে; তাই শত দোষ অসঙ্গতি সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা সজীব! যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে—গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, আগুল্ফলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশী-মধ্যস্থা সেই অকপট নিসর্গ-বর্ব্বর প্রমদা মূর্ত্তি মানস-পটে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে, সে তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। Elemental বা আদিম বন্য মানব-প্রকৃতি বর্ত্তমান সমাজে কত অসঙ্গত, কত 'খাপছাড়া'! উহার সঙ্গে কত বিষয়ে আমাদের অন্যোন্য ভাব নাই—সহানুভূতি নাই! কপালকুণ্ডলার মরণ অনিবার্য্য; তাহাকে মারিয়াও শান্তি নাই, রাখিয়াও সুখ নাই। অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাস! তথাপি তাহার নির্দ্দোষ বর্ব্বরতা ও নিদারুণ অদৃষ্ট আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে!

অর্দ্ধ পরিচিতা প্রতিভা সুন্দরী

কপালকুণ্ডলা স্বয়ং কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিচিতা। তিনিও উহার ছায়ামাত্র দেখিয়াছেন; এবং ঐ ছায়াচিত্রই আঁকিয়াছেন। আপন হৃদয়-সিন্ধুর তারে অপরিচিত বিবিক্ত দেশে তিনি এই অর্দ্ধ-উলঙ্গ নিসর্গসুন্দরীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, নিজেও চিনেন নাই—পাঠককে তাহার সন্ধান দিয়াছেন মাত্র—উহা অধ্যাত্মভাবে তাঁহার স্বকীয় অর্দ্ধপরিচিত প্রতিভাসুন্দরীর মূর্ত্তি! নবীনচন্দ্রের

যেমন পলাশীর যুদ্ধ, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—উভয়ের কোন অর্থ নাই,—Purpose নাই। তবু সুন্দর—অদৃষ্টপূর্ব্ব একক সৌন্দর্য্য। কপালকুণ্ডলা tale নহে—উপন্যাস নহে; উহা গদ্যরীতির কাব্য—নাটক—গ্রীক নাটক। কবি নিজে যাহা বুঝেন নাই, আমাদিগকে তাহা বুঝাইবেন? তবু উহার প্রাণ আছে—প্রতিভার প্রাণ। উহা অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—উহাকে ভাল লাগে। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিভাজীবনে একবার বই মিলে না। তাহার পরেই কবি আত্ম-প্রবুদ্ধ হন, সেই আধ-আলো আধ-ছায়াময় উষা মুহূর্ত্ত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়; তাহার পর স্ফুট প্রকাশ! জাগ্রৎ ভাবে, তীব্র উদ্দেশ্য-গম্ভীর গ্রহণ-বর্জ্জনের ক্ষেত্রে, প্রকৃত শিল্প-ক্ষেত্রে প্রবেশ! সেক্সপীয়রের প্রতিভাও এই উষাস্বপ্ন দেখিয়াছে—'নিদাঘ নিশিথের স্বপ্ন' দেখিয়াছে, কবি সেক্সপীয়র! সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে অনির্ব্বচনীয়, যিনি চিরজীবন অনুপম ভাবে সত্য ও স্বপ্নের সামঞ্জস্যপুরে—আদিম বর্ব্বরতা ও বিনির্ম্মল ধ্যান-শান্তির মিলন-পুরে বাস করিয়া গিয়াছেন এবং পরিশেষে প্রস্পেরোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মায়াদণ্ড ভূপ্রোথিত করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই পরম মায়াবী সেক্সপীয়র!

বঙ্কিমচন্দ্র ও কবি প্রতিভা-সম্পন্ন; তাঁহার প্রতিভা গল্পকথকের প্রতিভা নহে। ক্ষুদ্র খুঁটিনাটির মধ্যে বাক্যজাল বিস্তার পূর্ব্বক পাঠকের মনকে আবদ্ধ রাখাও তাঁহার art নহে। একমাত্র উদগ্র তুলিস্পর্শে তিনি এক একটী ভাব চিরতরে চিত্তে মুদ্রিত করিয়া যান। তাঁহার ভাব-সংযম, তাঁহার প্রকাশের সংহতি-শক্তি অসাধারণ। উহা শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত।

মনে হয়, এই লক্ষণ—প্রতিভার এই নিজোদ্দেশ্য শিল্পস্ফূর্ত্তির লক্ষণ যদি চিরস্থায়ী হইত, বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত জীবন যদি এ অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, তবে কেমন হইত? একদিকে নিঃসন্দেহে সুন্দর মধুর, প্রকাম্য

ও অনির্ব্বচনীয় হইত বই কি; কিন্তু উহা অসম্ভব। জীবন গতিশীল, সংসার জোর করিয়া 'খোঁচাইয়া' কবি-প্রতিভার কপালকুণ্ডলাকে নিজের অনুরূপ করিয়া তুলিবে; নতুবা তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। ইংরেজের মত শক্তি-প্রচণ্ড জাতি—জাতীয় জীবনে এলিজাবেথ যুগ—এবং যুগস্বামী সেক্সপীয়রের সহযোগ জগতে আর দ্বিতীয়বার ঘটে নাই। কবিবিশেষেও এই নবজীবনাবস্থা সুলভ নহে। পলাশীর যুদ্ধ কবিজীবনে দ্বিতীয়বার রচিত হইতে পারে না—কপালকুণ্ডলাও নহে। কবি কীট্সের এইরূপ নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্য বুদ্ধি ছিল; নবেলের ক্ষেত্রে এমিলীব্রণ্টীরও ছিল; কিন্তু উভয়েই অল্পায়ু; কেহই সমর্থ বয়সে (the year which brings the philosophic mind) পদার্পণ করেন নাই; করিলে কি হইত, তাহা অনিশ্চিত। দেখিতেছি, সুইনবার্ণ অতিজীবী হইয়াও আর দ্বিতীয় আটলাণ্টা লিখিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পলাশী, কিম্বা দ্বিতীয় কপাল-কুণ্ডলাও লিখিত হয় নাই।

এই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের প্রত্যেক রেখা পরিদৃষ্ট হইতেছে। পলাশীর যুদ্ধের পরে যেমন রঙ্গমতী, কপালকুণ্ডলার পরেও তেমনি মৃণালিনী। স্বদেশের, স্বসমাজের দিকে, মনুষ্য সমাজের দিকে কবির দৃষ্টি গিয়াছে। প্রতিভা জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছে। ইহার পর সে সামাজিক, দোষে গুণে সামাজিক; যাহা অপরিহার্য্য ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতিভা আত্মীয়া গিরিজায়ার মুখে বলিতেছে —

সময়ে চলিনু আমি, হায়ে না ফিরাও রে!

কপালকুণ্ডলা tale বা উপন্যাস নহে, আমরা বলিয়াছি। উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব কি? লেখক ও পাঠকের পরস্পর সহানুভূতি ও সহচারিত্ব। উভয়ে একই সমভূমে অকপট দাক্ষিণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। লেখক পাঠককে চারিদিক দেখাইয়া, 'কথাবার্ত্তা' কহিতে কহিতে, স্বয়ং

কাঁদিয়া হাসিয়া, পাঠককে তাঁহার সহানুভাবক করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কথাবার্ত্তার প্রণালার প্রধান গুণ, পাঠকের নিজের শ্রম সামান্য; লেখকের নিজত্বও যৎসামান্য। পাঠকের নির্ভর বা সহানুভূতি লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য; শিল্পরীতির আদর্শ কিংবা সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য রক্ষায় তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস প্রণালী ইহার সাক্ষ্য দিবে! বলা বাহুল্য, কপালকুণ্ডলা সে জাতীয় কথাবার্ত্তার গ্রন্থ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের মনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিয়া যাইতেছেন, সকল পাঠক তাহা বুঝিল কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই। এই নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক আত্মনিষ্ঠা কেবল মাত্র কাব্যে—নাটকেই সঙ্গত। পাঠক স্বয়ং আসিয়া কবির অনুসাধনা করিবেন। কবির পাঠকের দিকে মোটেই লক্ষ্য থাকে না—থাকিলে কাব্য হয় না।

প্রতিভার দেশ দীক্ষা ও মৃণালিনী

কপালকুণ্ডলার পর মৃণালিনী উপন্যাস হইতে চলিয়াছে; লেখক দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার উচ্চকণ্ঠ নামাইয়া আনিয়াছেন। মৃণালিনী তিলোত্তমার ভগিনী; হেমচন্দ্র জগৎসিংহ ও নবকুমারের, গিরিজায়া বিমলার, মনোরমা কপালকুণ্ডলায় বঙ্গায় সংস্করণ—সামাজিক মিশ্রসংস্করণ; সর্ব্বোপরি দেশদর্শন ও দেশানুরাগের একটা নূতন বাতাস গ্রন্থখানির মধ্যে বহিতেছে—দেশের জন্য ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থ উৎসর্গিত হইতেছে। কিন্তু, এই অনুরাগের কোন ফল হয় নাই। হেমচন্দ্রের বীরবাহু ও নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতীর ন্যায়, এই দেশানুরাগ কেবল অশক্ত নিরুদ্ধেশ্য উচ্ছ্বাসে ব্যয়িত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালী কবি কি করিবে? পলিটিক্স্ বা রাজনীতির ক্ষেত্রে সে নিজের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে

না ; অথচ দেশানুরাগ ত প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই আছে! প্রতিভা জাগিয়া উঠিয়া সর্ব্বপ্রথম দেশের দিকে দৃষ্টি না করিয়া পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে এই দেশানুরাগের ফল কি হইল? দীর্ঘদিন চিন্তা করিয়া একটা পন্থা অবলম্বন করে নাই কি? প্রতিভা তাহা না করিয়া পারে না। তাহার কর্ম্ম করা আবশ্যক ; সর্ব্বোপরি, দেশে প্রতিষ্ঠাযোগ্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। দেশের তখনকার অবস্থায় শিক্ষা নাই, আলোচনা নাই, চিন্তা নাই ; কোনদিকেই বাঙ্গালীর মন খুলে নাই ; বঙ্গভাষা, বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পরম শক্তিনিদান সারস্বতকুণ্ড প্রজ্বলিত হয় নাই ; ঘরে ঘরে সাহিত্যের গার্হস্থ অগ্নিসেবা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অভাবের দিকে বঙ্কিমের দৃষ্টি না যাইয়া পারে না ; তাহার ফল 'বঙ্গদর্শন'। সমস্ত বঙ্গদেশকে যেন প্রতিভা নখদর্পণে দর্শন করিতে, আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার আশাসমুদ্ভাসিত, একোদ্দিষ্ট প্রযত্নের নাম হইল 'বঙ্গদর্শন'। চিন্তা করিয়া দেখুন, রামমোহন রায়ের পর সাতকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে আর একটী ব্যক্তি মাথা তুলিয়া বঙ্গদর্শন করিতেছে! কি দেখিতেছে? বাঙ্গালার সমাজ, পরিবার, রাজা-রাজ্য, সাহিত্য-সঙ্গীত, শিল্প-ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, সমস্ত অণুবীক্ষণে ও দূরবীক্ষণে দর্শন করিতেছে।

ইহার ফল কি? বঙ্কিমচন্দ্র কেবল দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী এবং দার্শনিক, উভয় ; প্রাচীন 'বঙ্গদর্শন' তাহার সাক্ষ্য দিবে। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে যুগান্তর সূচনা করিয়াছে। মনে জ্ঞানে যুগান্তর ব্যতীত জীবনে কর্ম্মে যুগান্তর ঘটিতে পারে না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূচনা হইয়াছে, তাহার চক্র এখনো নিজের সম্পূর্ণ আবর্ত্তন সমাধা করিয়া ফিরে নাই ; কে জানে কতদিন লাগিবে!

বিষবৃক্ষ বঙ্গদর্শনে বাহির হইতে থাকে। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টচক্রে পড়িয়া বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল। জীবনের মধ্যে এই বিষবৃক্ষ রোপণের নিদারুণতার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, মনে হয়। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতেও 'সংশয়' এই বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল; তাহার ফল সৌভাগ্যক্রমে ফলিতে পারে নাই। কপালকুণ্ডলায় অদৃষ্ট জয়ী হইয়াছে। বিষবৃক্ষে কতক অদৃষ্ট, কতক মানুষ স্বয়ং এই বৃক্ষ রোপণ ও সংবর্দ্ধন করিয়াছে; এবং কপালকুণ্ডলা ও মনোরমা কুন্দনন্দিনীরূপে উপস্থিত হইয়া, উহার ফল খাইয়া মরিয়াছে; নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী অনেক ঘুরাঘুরি করিয়া কোনমতে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে; এ গ্রন্থে আরও একাধিক ব্যক্তি এই বিষফলের আস্বাদ লইয়াছে। পারিবারিক জীবন ভিন্ন জাতীয়জীবন গঠিত হইতে পারে না, পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রথম সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলেন। জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিব, যত বড়, যত গভীরদর্শী, বিস্তৃতদর্শী কবি শিল্পী বা দার্শনিক হউক না কেন, মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনের দুই চারিটী কথামাত্র ভাল করিয়া, পরকে বুঝাইবার উপযুক্ত করিয়া বুঝিতে পারে; অনুরূপ শক্তি এবং সৌভাগ্য ঘটিলে উহার প্রকাশ দ্বারেই অমরত্ব অর্জ্জন করিয়া যায়। ওই বিশেষজ্ঞানের জন্যই অন্য মনুষ্য তাহাদের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হয়—জগতে সর্ব্বত্র এইরূপে বিশিষ্ট অর্জ্জনেরই জয়! পরিবারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ একজন বিশেষজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিল্পী। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের প্রথম পারিবারিক উপন্যাস।

দেশের পরিবার-তন্ত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিষবৃক্ষ।

কিন্তু, এ ক্ষেত্রে এতদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর শিল্পকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা করিতেছিল; তাঁহার অন্তর্লোকে

বিশ্ব-বিজয়ের আদর্শ ও চন্দ্র-শেখর

কপালকুণ্ডলার কল্পনাশক্তি ও বিষবৃক্ষের সূক্ষ্মদৃষ্টি একত্রে সমুচিত অভিব্যক্তি খুঁজিতেছিল; নবকুমার, হেমচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ, এই তিন ব্যক্তি সদ্‌গুণ-সাকল্যে একত্র হইয়া একবার রণজয়ীর অভিনয় প্রদর্শন করিতে চাহিতেছিল—প্রতাপ প্রদর্শন করিতে চাহিতেছিল। সুতরাং নিরীহ কুন্দনন্দিনীকে তাহার 'নীরবমাধুরী' বর্জ্জনে, শৈবলিনারূপে পরম রূপসী ও বিলাসিনী মূর্ত্তিতে, প্রতাপের প্রতিকূলে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। ইহার ফল চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রশেখরে প্রতাপ মরিয়াছে; কিন্তু ওই মরণের নাম প্রকৃত প্রস্তাবে 'রণজয়', বিলাসিনী শৈবলিনীর বিষবৃক্ষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য চন্দ্রশেখরের উন্নতলক্ষ্য, স্থিরসংযত প্রীতিমূর্ত্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। পুনশ্চ, শৈবলিনীর তরফেও দাম্পত্য-আদর্শের মানসিক ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিতে হইয়াছে। দাম্পত্য আদর্শে মানসিক ব্যভিচার করিলেও গুরু প্রায়শ্চিত্ত! চন্দ্রশেখর উপন্যাস—গার্হস্থ্যজীবনের বিষবৃক্ষ বিজয়ের ইতিহাস! কবিরাজ এ স্থলে বিষব্যাধির সুস্পষ্ট প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। তবু চন্দ্রশেখরেও কিঞ্চিৎ অদৃষ্ট আছে; শৈবলিনী তাহা *চন্দ্রশেখরকে শুনাইয়া দিয়াছে—"আমরা (প্রতাপ ও শৈবলিনী) এক বৃক্ষে দুই ফুল ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়াছিলেন কেন?"* লালসাবিলাসিনী শৈবলিনীর পক্ষে গ্রন্থকীট চন্দ্রশেখরও সামান্য 'অদৃষ্ট' কি?

ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী; আমাদের পরম আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ইয়োরোপীয় উপন্যাসাদর্শের অনুকরণ করিতে যান নাই। স্বকীয় অন্তঃকরণতত্ত্বের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবশে, কতকটা জাগ্রত ভাবেই তিনি ইয়োরোপীয় সংশ্রব যথাসাধ্য পরিহার

করিয়া চলিতেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রণয়-পূর্ব্বক বিবাহের প্রতিষ্ঠা নাই—প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দিনীতেও, তাই বঙ্কিম একান্তভাবে প্রণয়পূর্ব্বতার অবতারণা করেন নাই। আবার, ভারতবর্ষীয় দাম্পত্য আদর্শে পরিণয় কেবল চুক্তি নহে; এই আদর্শে ব্যভিচার করিয়া দম্পতি নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিশেষে পুনর্মিলিত হইতে পারেন না। দাম্পত্য তন্ত্রে, যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগে না। রাণী ভবানী সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব মৃৎপাত্রের ন্যায়, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগে না" জুড়িয়া দিলেও, রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্ত্তিনীর' মত সেই অতীত-পাপছায়া দম্পতির মিলনমধ্যস্থলে জাগিয়া থাকে। এই তত্ত্ব নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইতে পারে; কিন্তু ইহা অধ্যাত্মজীবনের চিরন্তন সত্য। উহাকে উপেক্ষা করার যো নাই।

দাম্পত্যাদর্শে সুক্ষ্মদৃষ্টি ও কৃষ্ণকান্তের উইল

চন্দ্রশেখর লিখিতে লিখিতেই বোধ করি, বঙ্কিম প্রাচীন প্রাচ্য ঋষির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাই, নিদারুণ নির্দ্দয়ভাবে কৃষ্ণকন্তের উইলে উহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইলের বিশেষত্ব

কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, শ্রেষ্ঠ পারিবারিক উপন্যাস। উহার পরিসর ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, একটী মাত্র বঙ্গীয় পরিবার। উহার মধ্যে, কপালকুণ্ডলা কিম্বা চন্দ্রশেখরের ন্যায় কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের অবকাশ নাই। কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই বঙ্কিম যে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। উহা বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দী, ইংরাজি সাহিত্যেও তাহার প্রতিদ্বন্দী নাই। দাম্পত্য প্রেমের এই পরম সূক্ষ্ম

আদর্শ প্রাচ্য ঋষির আবিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এই আদর্শে ইংরাজী সাহিত্যে Rita একটী নবেল লিখিয়াছেন; Sarah Grandএর বহুপ্রসিদ্ধ Heavenly Twinsও এই আদর্শ জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু উভয় গ্রন্থ বঙ্কিমের পরবর্ত্তী—তাঁহারা বঙ্কিমের পন্থায় চলিয়াছেন কিনা, জানিবার আবশ্যক নাই। ইয়োরোপে এ জাতীয় উপন্যাস এবং নাট্য কাব্যের একরূপ পথপ্রদর্শক, নরোয়ের কবি ঈবসেন; তিনি তখনও এ জাতীয় গ্রন্থ হস্তে আসরে নামেন নাই। কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে; এবং ইহাও সত্য যে, ইংরাজী 'নবেলিষ্ট'গণ প্রাচ্য অথবা সাধারণের অপরিচিত মাহাত্ম্যের কোন গ্রন্থ পাইলে ব্যাঘ্রের মতই উহার তত্ত্বকে গ্রাস করিতে চাহেন। তন্মধ্যে কোন অভিনব শিল্পতত্ত্ব কিংবা আদর্শ পাইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে ইয়োরোপীয় সাহিত্য-জগতের বিস্ময়ভূমি হইতে পারা যায়; এই সুযোগ খুঁজিয়া ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকগণ অপরিচিত প্রাচ্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে কোন সাহায্য পাইয়াছেন কিনা, জানি না; উভয়েই রমণী,তাঁহাদেব পক্ষে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রণালীতে দাম্পত্য-ধর্ম্মের এই সমস্যা-লক্ষণ স্ফূর্ত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাই হোক, বঙ্কিমের কৃতিত্ব কোনমতেই ক্ষীণ হয় না। কথিত গ্রন্থদ্বয় হইতে শিল্পগৌরবে, সামগ্র্য-সমাধানে এবং আদর্শের সাধন বিষয়েও কৃষ্ণকান্তের উইল শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র কি দেখাইয়াছেন? পাঠক, বঙ্কিমের আদর্শ এবং তাঁহার মৌলিক ভাব-প্রবাহের গতি ও উদ্দেশ্যযুক্ত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিবেন—বিষবৃক্ষে রমণী কুন্দনন্দিনী বিষফল খাইয়া মরিয়াছেন; পুরুষ নগেন্দ্রনাথ নানা পাকচক্রে সারিয়া উঠিয়াছেন, হতভাগিনীর শ্মশানক্রিয়া সমাধা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সূর্য্যমুখীর সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছেন; চন্দ্রশেখরে রমণী শৈবলিনীকে দাম্পত্যধর্ম্মের মানসিক ব্যভিচারের দরুণেও মৃত্যুবৎ

কঠোর প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে; যেরূপে হউক, বিজয়ী প্রতাপকেও মরিতে হইয়াছে। চন্দ্রশেখর রচনার শেষেই, সূত্রসঙ্গতিবশে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যেন এক অলৌকিক অনুভাসে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব সমুদিত হইয়াছে! উহা তাঁহার নিজস্ব; কৃষ্ণকান্তের উইলের সর্ব্বস্ব। দাম্পত্য ধর্ম্ম ও উহার দায়িত্ব কি পরস্পর নহে? ব্যভিচারে কি কেবল রমণীরই প্রায়শ্চিত্তবিধি, পুরুষের নহে? দাম্পত্য আদর্শ হইতে স্খলিত হইলে, বিষবৃক্ষের ফল খাইলে কি পুরুষকেও মরিতে হইবে না? চিরকালের জন্য সত্বচ্যুত হইতে হইবে না? এই চিন্তার ফল কৃষ্ণকান্তের উইল।

এ গ্রন্থে কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী আসিয়া, প্রচ্ছন্নকুলটাবৎ লালসালিপ্সাময়ী বিধবা রোহিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত; নগেন্দ্রনাথ মূলে সদ্‌গুণ-গরিষ্ঠ গোবিন্দলালের মূর্ত্তিতে উপস্থিত

পরমসূক্ষ্ম হইয়াছেন। সূর্য্যমুখী কৃষ্ণাঙ্গী ভ্রমররূপে,

দাম্পত্য আদর্শ। অপূর্ব্ব আদর্শপ্রাণা ও ভারতীয় 'পতিপ্রাণা' মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছেন। গোবিন্দলাল ব্যভিচার করিল, রোহিণীকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার দাম্পত্যরাজ্যে ফিরিতে চাহিল! ভ্রমর পতিপ্রাণা সত্য, কিন্তু তাহার পাতিব্রত্যে ও পরমার্থে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। যে পতি ব্যভিচার করিয়াছে—নরহত্যা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ইহজন্মে আর ভ্রমরের শারীরবন্ধন ঘটিতে পারে না। ভ্রমর স্বামীকে বলিয়াছিল - "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি"। ভ্রমর নির্ম্মমভাবে গোবিন্দলালের প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইল—মরিল—গোবিন্দলালও মরিতে বাধ্য হইল।

ইহা একটা চরমপন্থীর কথা, সন্দেহ নাই; এবং প্রবল পুরুষজাতির অসন্তোষ-জনক। কিন্তু, ধর্ম্মের আদর্শ—

প্রায়শ্চিত্তের আদর্শ

পবিত্রতার আদর্শ একবার মানিয়া লইলে, ধর্ম্মলঙ্ঘনে সমুচিত প্রায়শ্চিত্তই বিহিত। যে বঙ্কিমচন্দ্র পাপমতি শৈবলিনীর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ছাড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পাপিষ্ঠতর গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান সঙ্গত ও স্বাভাবিক। "ভীমা পুষ্করিণী"র জলে নিমজ্জন ব্যতীত গোবিন্দলালের অন্য প্রায়শ্চিত্ত ছিল না।*

পরিবার তন্ত্রের ত্রি-গাথা

আমরা এইস্থলে, এই পরম দাম্পত্য-তত্ত্বদর্শী শিল্পীর ত্রি-গাথার— বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইলের আত্মাভ্যন্তরে, কবির মনোগতির এবং আদর্শের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে পারিতেছি। তিন গ্রন্থই পরম্পরাসম্পৃক্ত বিষফল-ভক্ষণের ও প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস। ভারতীয় কবির পক্ষে ভারতবর্ষীয় আদর্শে যাহা সঙ্গত ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। অতঃপর বঙ্কিম আর এই সূত্রে দাম্পত্য-ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করেন নাই, —এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বা ধ্বংসনিয়তির দিকে ও মুখ্যভাবে দৃষ্টি রাখেন নাই। এই ব্রাহ্মণশিল্পীর মর্ম্মেতিহাস পরম কৌতুকাবহ। তাঁহার মনোগতি অতঃপর কোন্ সূত্রে কোন্ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছে, অগ্রসর হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখিব।

কৃষ্ণকান্তের উইলের তত্ত্বাদর্শে উপনীত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় যেন এক সমস্যায় পড়িল---অতঃপর কি করিবেন ? তিনি দীর্ঘজীবন পারিবারিক আদর্শই চিন্তা করিয়াছেন;

স্থগিতভাব; দেশজীবন ও

পরিবারের উন্নতিতেই সমাজের ও দেশের উন্নতি, এই ধারণায় লেখনীতৎপর হইয়া-

* বঙ্কিম পরকালে গোবিন্দ লালের নিরতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন! কিন্তু সংসার সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যু অক্ষুন্ন আছে। লেঃ

প্রেমাদর্শ; রাজসিংহ

ছিলেন। অতঃপর তাঁহার আর কি বক্তব্য আছে? এই ইতস্ততঃ-ভাবের সময় তিনি পূর্ব্বরচনা রাজসিংহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন—উহার পুনর্গঠন করিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনাতে যে ঐতিহাসিক-সূত্রের জন্ম, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী এবং চন্দ্রশেখরে যাহার সূক্ষ্মতন্তু প্রসারিত না হইয়া পরে নাই, নব সংস্করণ রাজসিংহে উহারই অনুসরণ। কিন্তু, অনুসরণ করিয়া কবি কোথায় গিয়াছেন? পারিবারিক আদর্শে, দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শেই উপনীত হইয়াছেন। সকল রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ এবং অস্ত্রঝনংকারের মধ্যস্থিত একটী কথা, একটী ঘটনাই কেবল আমাদের মনে চিরতরে বিদ্ধ হইয়া যায়—'বাদসাহজাদী প্রেম জানে না'। সেই প্রেমের রাজ্যে বাদশাহজাদীর কি গতি—কি পরিণতি, নব সংস্করণ রাজসিংহের উহাই মেরুদণ্ড।

কিন্তু, ইহা প্রকারান্তরে পরিচিত ক্ষেত্রে বিচরণ মাত্র; গঠনের ক্ষেত্রে সবিশেষ অগ্রসর হওয়া নহে। ততোধিক, এই রাষ্ট্র-সংঘর্ষের মধ্যে কবির স্বদেশ-প্রেম জাগ্রৎভাবে আত্মপন্থা খুঁজিয়াছে—দাম্পত্য প্রেমের শুভ্রপন্থাও খুঁজিয়াছে—ভারতীয় আদর্শ খুঁজিরাছে; তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। বর্ত্তমানে এই পন্থা কি?

স্বদেশ প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্মের আদর্শ

এ চিন্তার ফল আনন্দমঠ। এই গ্রন্থে স্বদেশ-প্রেম ও দাম্পত্য ধর্ম্ম সমঞ্জসিত আদর্শ অন্বেষণ করিয়াছে। আনন্দমঠ রচনার সময় বঙ্কিমের বয়স ৪৩ বৎসর। স্বকীয় শিল্প-প্রতিভার স্বুবর্ণ-যুগের চরম রেখা তিনি অতিক্রম করিতেছিলেন; স্থবির গাম্ভীর্য্য এবং দার্শনিক উদ্দেশ্য-পরিপকতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছিলেন। এ গ্রন্থ শিল্প-সমাধান এবং

প্রাণশক্তিতে কৃষ্ণকান্তের উইল হইতে অগ্রসর না হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদগত আদর্শের হিসাবে উহার সামর্থ্য অসাধারণ। শিল্পক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমের সন্দেহ এবং ব্যভিচার-ভূমি বঙ্কিম চিরতরে পরিহার করিতেছিলেন; ইয়োরোপীয় সমাজ নীতির সম্পর্কও অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাই উক্ত প্রেম আনন্দমঠে, তাঁহার মানস-সূত্র-সঙ্গতে, যেন অতর্কিত ভাবে অথচ স্থির সংস্কারে ভারতবর্ষীয় সংন্যাসাদর্শ খুঁজিয়াছে। তাই বঙ্কিম একদিকে নিষ্কামকর্ম্ম সংন্যাসের মধ্যেই দেশানুরাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্যদিকে,ভারতবর্ষীয় সংযম-নিষ্ঠা, উন্নত জীবন-সাধনা এবং দম্পতির পরস্পর-প্রাণতায় স্থির আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; পরিশেষে আদর্শের তুহিন-শীর্ষে—সংসারের মর্য্যাদা-শিখরে—অনন্তলক্ষী ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং পরম আনন্দোচ্ছ্বাসে এই আনন্দমঠের উপসংহার করিয়াছেন। সংসারে এবং সংন্যাসে, গৃহে এবং বনে আনন্দমন্দির প্রতিষ্ঠার নামটাই 'আনন্দমঠ।'

বঙ্কিমের হৃদয়গত আদর্শের প্রকাশ

এই গ্রন্থের শেষে ব্রাহ্মণের হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইদানীং চন্দ্রশেখরের শেষে, প্রতাপের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বেও একবার এইরূপ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন; অতঃপর, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারামের শেষেও এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার অবসর খুঁজিয়াছেন; উহা পৌরাণিক ব্রাহ্মণেরই রীতি। তাঁহারা আত্মজীবনের এবং স্বকীয় হৃদয়ের সম্ভাব পুণ্যসমুচ্চয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া—শিল্প-মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া, পরিশেষে পরমভক্তিভাবে উহাকেই প্রণাম পূর্ব্বক উপসংহার করেন। পৌরাণিক একদিকে অদ্বৈতবাদী,অন্যদিকে মূর্ত্তিপূজক। ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তিপূজক চিরকাল আপনার মন হইতে ব্রহ্মের—বৃহতের মানবিক মূর্ত্তি কল্পনা পূর্ব্বক উহারই পূজা করিয়া আসিতেছেন; উহা

প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মবিশেষণ, আত্মোন্নয়ন বা আত্মপূজা। পূজ্য পদার্থের বিচার করিলেই, আমরা এ ক্ষেত্রে পূজকের অধ্যাত্ম-পরিচয় লাভ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপকে, নিশা এবং প্রফুল্লকে, জীবানন্দ এবং শান্তিকে জয়ন্তীকে পূজা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন হৃদয়-জীবনাদর্শ এই পূজার মধ্যে দেখিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের সময় হইতেই যেন সুস্থির আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এ সমস্ত উপন্যাস কেবল প্রতিভার উদ্দাম প্রলাপ নহে, প্রত্যেকের বিশিষ্ট মঙ্গলাদর্শও বর্ত্তমান।

শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় ফলশ্রুতি' আদর্শ

এই স্থলে ভারতের একটা পরমোন্নত অথচ মৌলিক সাহিত্যাদর্শের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত মনে করি। ভারতীয় সাহিত্য উহাকে আবিষ্কার করিয়া সকল দিকে তদ্গত ভাবে অনুসরণ করিতে পারে নাই সত্য; অন্তর-বাহিরের ভাগ্য-বিপ্লবে নানামতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইয়োরোপে দুইপ্রকার সাহিত্য রীতি প্রচলিত। প্রথম, গ্রন্থের ভাষায় ভাবে, সত্যনির্দ্দেশে, চরিত্রাঙ্কনে সর্ব্বথা প্রাকৃতের (real) অনুসরণ। দ্বিতীয় ঐ-ঐ বিষয়ে সমুন্নত-আদর্শের (ideal) অনুসরণ। ইয়োরোপীয় গ্রন্থ নিচয়কে স্থূলতঃ এ দুটি বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ উক্ত উভয় আদর্শকেই ন্যূনাধিক সম্মুখে রাখিয়া, এক স্বতন্ত্র অথচ সুস্পষ্ট তৃতীয় আদর্শ স্থির করিয়াছে; উহা গ্রন্থটীরই চরিত্র বা ফলশ্রুতি। প্রাকৃত অথবা অতি-প্রাকৃত আদর্শের সত্যশিব-সৌন্দর্য্যের দর্শন এবং নিরূপণ কবির প্রধান কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু, কাব্য মাত্রেই স্বতন্ত্র একটা বাক্যশিল্প বলিয়া উদ্দেশ্যহীন সৌন্দর্য্য নিরূপণ উহার মাহাত্ম্যবিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। কাব্য কেবল সত্য-ভাব-

সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ গ্রন্থ নহে। প্রত্যেক কাব্যের সমাধান মধ্যেই কবির একটী স্বতন্ত্র বক্তব্য বা শুভ অভিপ্রায় থাকা আবশ্যক। কাব্যের প্রত্যেক বাক্যের, দৃশ্যের, সর্গের বা অঙ্কের সহিত সমগ্রগ্রন্থের সমাধান বিষয়ক সূত্র-সামঞ্জস্য থাকার নামই 'ফলশ্রুতি'। এই আদর্শের ব্যভিচার বশতঃ, প্রকাশ্যভাবে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বিদ্যাসুন্দরের ফলশ্রুতি কামেন্দ্রিয়ের পোষকতা করিয়া ভয়াবহ হইয়া গিয়াছে! 'লণ্ডনরহস্যগ্রন্থ' অনেক সচ্চরিত্রের অবতারণা করিয়া থাকিলেও রেনল্ডের হৃদয়তার পরিচায়ক হইয়াছে ও পাঠকের পুণ্যহানিকর হইয়াছে। এই আদর্শের জাগ্রৎ ধারণার অভাবেই সেক্সপীয়ারের অনেক নাটক শিল্প-মূর্ত্তি এবং মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম দর্শনে পরম গৌরবাবহ হইয়াও বলটেয়ারের কথিতরূপে 'বর্ব্বর' নামেরযোগ্য হইয়াছে; এবং টলষ্টয়ের বিরাগভাজন হইয়াছে। অন্য দিকে, ভট্টিকাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য হইতে পারে নাই। এই আদর্শত্রয়ের যথাযোগ্য সামঞ্জস্য আছে বলিয়া গ্যেটের ফাউষ্ট আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য! এই ফাউষ্টের যেমন একটা সমুচ্চ উদ্দেশ্য বা ফলশ্রুতি আছে; তেমনি সমগ্র গ্রন্থের ঘটনাগতি. সত্যসৌন্দর্য্য দর্শন ও চরিত্রসৃজন প্রভৃতিও গ্রন্থ-ফলশ্রুতির সহিত নির্ব্বিরোধে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ফাউষ্টে সংস্কৃত কাব্যাদর্শের প্রভাব,কালিদাসের প্রভাবও অনুভবগম্য হইয়াছে। কেবল উহার আদ্যন্তে কবির মঙ্গলাচরণ আছে বলিয়া নহে। গ্রন্থের পাদ্যান্ত সংস্কার বিরূপ. 'বেসুর' কিংবা ব্যভিচারী হইলে কাব্যের মধ্যস্থিত সহস্র সৌন্দর্য্যের প্রাণসূত্রটিই ছিন্ন হইয়া যায়। গ্রন্থ-সামগ্রীর শ্রেয়োনিষ্ঠ ফলশ্রুতি ব্যতিরিক্ত মিষ্টতম কাব্যও 'মাতালের প্রলাপ' মাত্র—সত্যবাদী মাতাল হইলেও উহা যথেষ্ট নহে।

আনন্দমঠে দেশানুরাগ দ্বারা প্রণোদিত নিষ্কাম ডাকাইতি আছে।

নিষ্কামতার আদর্শ

এ জাতীয় ডাকাইতি স্কট, লীটন, এবঙ্ক বায়রণেও দেখিতে পাই। 'আনন্দ' সন্ন্যাসীর দলও ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী গ্রন্থাদি পাঠে উৎসাহিত হইয়াই স্বদেশীয় প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শিল্পীর দৃষ্টি দান করিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অন্যদিকে গোবিন্দলালের মৃত্যু-প্রায়শ্চিত্তের পর, দাম্পত্য প্রেমের 'গঠন' আদর্শেও প্রেরিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ এ ক্ষেত্রে উভয়দিকেই নিষ্কাম তন্ত্রে উপনীত—ভারতবর্ষীয় নিষ্কাম তন্ত্রে। এই সূক্ষ্ম আদর্শ হইতে স্খলনের প্রায়শ্চিত্তও দেখিতেছি—ভবানন্দ উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

এইরূপে, নিজের শিল্প-সামর্থ্য ও সমাধান শক্তির চরম অভ্যুন্নতি শিখরে দাঁড়াইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন! আনন্দমঠ ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক আদর্শের—সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ আদর্শের শিল্প।

অতঃপর বঙ্কিমের প্রতিভা আর কত দূর অগ্রসর হইতে পারে? দেশানুরাগ এবং দাম্পত্যের আদর্শকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে?

পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রচার

নিষ্কাম নিস্ত্রৈগুণ্য পথে অতিরিক্তভাবে অগ্রসর হইলে সে ক্ষেত্রে আর কার্য্যাকার্য্য কি? 'কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'! শিল্পসংসারের ক্ষেত্রে কবির নীরব হওয়াই ভাল; কেন না, ইহার পর সে আর একদেশদর্শী—একদেশাবর্ত্তী না হইয়া পারে না। তাহার বুদ্ধিগত আদর্শের দিকেই যে একান্ত লক্ষ্য, শিল্প-সৌকর্য্যের দিকে নহে। সুতরাং, অতঃপর তাহার শিল্প উন্নত কিংবা উৎকৃষ্ট জাতীয় হইতে পারিলেও নৈসর্গিকতার অথবা সার্ব্বজনীনতার প্রত্যাশা করিতে পারে না।

-পৌরাণিকতা অতিরিক্ত হইলে রোগে পরিণত হয়; ব্রাহ্মণ আদর্শও অত্যন্ত হইয়া ব্রাহ্মণ্য বা Brahmanism হইয়া পড়ে। কিন্তু, আনন্দমঠের পর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র নীরব হন নাই। পারিবারিক প্রেম ও দেশানুরাগের মধ্যে তিনি যে নিষ্কাম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উঁহাকে আরও সূক্ষ্ম ভাবে—অত্যন্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন—তাহার ফল দেবীচৌধুরাণী।

দেবীচৌধুরাণী ও ডাকাইত; নিষ্কাম ডাকাইত। আবার, দেবীচৌধুরাণী

দেবীচৌধুরাণী এবং হিন্দু সম্প্রদায়িকতা

'হিন্দু' গৃহিণী-কর্ত্তব্যের নিষ্কাম আদর্শানুসারিণী প্রফুল্লমুখী। এ ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ কিংবা ব্যবিচারের আঘাত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। রমণী প্রফুল্লমুখী সপত্নীর এবং সংসারের দাবি-সাপক্ষ্যে আত্মস্বার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র নিষ্কাম প্রেম বা গৃহিণী কর্ত্তব্য-বুদ্ধির 'হিন্দু' আদর্শেই শিক্ষিতা হইয়াছেন! কবিকে প্রফুল্লের প্রতিযোগী সপত্নীর সংঘটনা করিতে হইয়াছে! তৎকল্পে, ব্রজেশ্বর রায়কে ভারতীয় পারিবারিক আদর্শে অত্যন্ত-পিতৃভক্ত করিয়া খাড়া করিতে হইয়াছে! এই সমস্ত নির্ব্বিশেষ আদর্শবাদিতার ফল। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যেন হিন্দু পারিবারিক আদর্শকে নিষ্কাম বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; এবং পরিশেষে সেই আদর্শে পরিকল্পিত মূর্ত্তির সমক্ষে ভক্তিভরে প্রণত হইতে চাহেন! ইহাকেই অতিরিক্ত পৌরাণিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। আনন্দমঠের স্বার্থকামনাবিরহিত প্রেম দেবীচৌধুরাণীতে ঈর্ষা-অসূয়া এবং ঐশ্বর্য্যমোহমত্ততার সংগ্রাম-বিজয়ী মূর্ত্তি অবলম্বনে উপস্থিত; এ উদ্দেশ্যেই দেবীচৌধুরাণী রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্য সম্পাদন করিয়াছেন। সর্ব্বমনোমত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন কিনা, বলা যায় না; কিন্তু 'হিন্দু' আদর্শবাদীগণের তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই।

সন্ন্যাসিনী প্রফুল্লমুখী নিষ্কাম গৃহিণী-আদর্শে শিক্ষিতা এবং পরীক্ষিতা হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে—দেবী-চৌধুরাণী মরিয়াছে। কঠোর তপস্যার এবং বৈরাগিনীর অবস্থাতেও প্রীতিতন্ত্রীয় গৃহ-জীবনের এবং স্বামীসঙ্গের জন্য প্রফুল্লের রমণীহৃদয়ের সরল দীর্ঘনিশ্বাসটি আমাদের হৃদয়কে পরম সহানুভবে ও কারুণ্যে পূর্ণ করে! অসিভল্ল-চর্ম্মবর্ম্মের এবং বৈরাগীর 'ভেক'ভেক্ষোর অন্তরালস্থিত তাহার মনুষ্যহৃদয়টী—রমণীহৃদয়টী প্রতিবাক্যে আমাদের মনকে পুলকিত করে! পরিশেষে, যখন এই পূজাগৌরবান্বিতা রাজ-রাজেশ্বরীকে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া ব্রজেশ্বরের খিড়কিপুকুরে প্রফুল্লমুখে 'বাসন মাজিতে' দেখিতে পাই, এবং অমৃত-মিষ্ট-স্মিত কটাক্ষে 'দেবী চৌধুরাণীর' মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই, তখন সে-মুহূর্ত্তে কবির সহযোগে তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক নতশির হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠে; ওই মূর্ত্তি চিরকালের জন্যই মনে মুদ্রিত হয়; এবং এই ব্রাহ্মণ-শিল্পীর প্রতি সাধুবাদ স্বতঃপ্রবাহিত হইয়া যায়! ইহা গ্রন্থখানির প্রকট শক্তি, সন্দেহ নাই।

নিষ্কাম সংসারধর্ম্ম

দেবীচৌধুরাণীতে সন্ন্যাসিনী সংসারজীবনে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, একটা আদর্শের সৃষ্টি বা গঠন; প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা ধ্বংস নহে। ভারতবর্ষীয় সংন্যাস-আদর্শের দিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট। এই সংন্যাস ভারতীয় ব্রহ্ম-বাদীগণেরও আদর্শ। প্রাচীনকালের নিরীশ্বরগণের, আরণ্যক অথবা বৌদ্ধগণের আদর্শ হইতে ব্রহ্মবাদীর আদর্শ কত বিভিন্ন, তাহা আমরা পরে দেখিব। এই নিরীশ্বর সংন্যাসের ও ব্রাহ্মসংন্যাসের বিভিন্ন আদর্শের

ভারতীয় ধর্ম্মে সংন্যাসাদর্শ

অমৃত কিংবা হলাহল ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকট অভ্যুত্থানের পর হইতেই ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের জয় পরাজয়, গৌরব অগৌরব, সামাজিক সুখ দুঃখ, মুখ্য ভাবে এই আদর্শ-দর্শন এবং উহার সাধন-সমর্থনের উপরেই নির্ভর করিয়া আসিতেছে। আমরা যথাস্থানে তাঁহার যথোচিত আলোচনা করিব। এখন, এই আদর্শের গত 'চুল চেড়া' সূক্ষ্ম; ইহার এক হাতে সুধা, অন্য হাতে গরল—একই জ্ঞানবৃক্ষের দুটি ফল! ভারতবর্ষে মানুষ বহুকাল ধরিয়া এই জ্ঞান-ফল খাইয়া আসিতেছে—কেহ বাঁচিতেছে, কেহ মরিতেছে! গীতা প্রাচীন ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের উপস্থাপন পূর্ব্বক নিরীশ্বর নৈষ্কর্ম্মবাদের সঙ্গে একটা সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিষ্কাম আদর্শের বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি-পথে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই 'সংন্যাসতত্ত্ব' উপস্থিত হইয়াছিল। শিল্পী ক্রমে অতি-জাগ্রত হইয়া দার্শনিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

সেশ্বর ও নিরীশ্বর নিষ্কামতা

আনন্দমঠে ইহার সূত্রপাত; দেবীচৌধুরাণীতে নিশা ও প্রফুল্লের মধ্যে প্রকারান্তরে এই উভয় সংন্যাসাদর্শের প্রচ্ছন্ন সংগ্রামই দেখিতে পাই। ব্রহ্মবাদিনী নিশা বলিতেছেন, "তোমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর আছেন, আমাকে কাঁদাইবার জন্য কেহই নাই।" নিশা প্রবল ব্রহ্মানুরাগবশে জগতের অন্য বিষয়ে বিরাগিণী হইয়া ভক্তি-যোগীর একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল তাহা পারে নাই—চাহে নাই বলিয়াই প্রফুল্লকে নির্ব্বাণ এবং বৈরাগ্যের-আদর্শ পরিহার পূর্ব্বক সমুচিত সাধন-লোকে ফিরিতে হইয়াছিল। তবু দেবীচৌধুরাণী বিজয়ের ইতিহাস; পতিযোগিনী প্রফুল্লমুখী বিজয়িনী, এবং

কবির আন্তরিক পূজাভাগিনী হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থে একরূপ সতর্কভাবে ব্রাহ্মণ্য আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

আদর্শের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মনোগতি প্রায়ই যেমন উভয় দিক বিচারে—দ্বৈতবিচারে—জয় পরাজয় বিচারে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে, উহাদের আভ্যন্তরীণ নিয়তির মধ্যে আমরা সর্ব্বত্র এই দ্বৈতগতির প্রকট পরিচয় লাভ করি। বঙ্কিমের

বঙ্কিমের মনোদৃষ্টির দ্বৈতগতি ও শিল্পাদর্শ

প্রথম রচনা দুর্গেশনন্দিনীর পর হইতেই আমরা সর্ব্বত্র পারিবারিক জীবনের এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে সন্দেহ ব্যভিচার বা সকাম-নিষ্কামত্বের ফলাফল -সূত্রই পরিদর্শন ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বত্র (অতর্কিতে ?) ক্রমান্বয়ে এই জয়পরাজয়, এবং বিষামৃতের ফলটুকুই প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্যশিল্পী —ব্রাহ্মণশিল্পী বলিয়াই 'আত্মসন্তুষ্ট শিল্পকলা' তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে নাই। আবার তিনি জগতের মঙ্গলকামী দার্শনিক বলিয়া তাঁহার শিল্পশক্তি সচেতন ভাবেই সমাজের মঙ্গলমুখী। সুতরাংতাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদিতে পাশ্চাত্য সত্যসৌন্দর্য্য-আদর্শের বহির্ভূত অথচ উহার সহিত সমঞ্জসিত একটা তৃতীয় আদর্শ পরিস্ফুট না হইয়া পারেনাই।

বলা বাহুল্য,সাহিত্যের ক্ষেত্রে—উপন্যাসের ক্ষেত্রে নীতিবাদিতার কিংবা মঙ্গলবাদিতার একটা সীমা আছে; ঐ সীমা উলঙ্ঘন করিলেই রচনা শিল্প নামের অযোগ্য হয়—নীতি শাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র হইয়া যায়। সাহিত্য না হইয়া পুরাণ হইয়া যায়। আমরা দেখিব, বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে শিল্পমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া দার্শনিকতায়,

শিল্পক্ষেত্রে দার্শনিকতা-পৌরাণিকতার সীমা

নিরবাচ্ছিন্ন নীতি-বাদ এবং পৌরাণিক প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করিতে-ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম স্ফুটপ্রবুদ্ধশিল্পী, তাই তিনি স্বকীয় শিল্পশক্তি এবং প্রতিভার হ্রাস বুঝিতে পারিয়া যেন একদিন বিরত হইয়াছেন; সাহিত্য-কলার ক্ষেত্র হইতে এককালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

নিষ্কাম আদর্শের অতিরিক্ত অনুসরণ

দেবীচৌধুরাণীতে বধূ প্রফুল্ল সন্ন্যাসিনী হইয়াও সংসারে সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি। সংসারেই তিনি নিজের চরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, এবং সংসারও তাঁহার পদস্পর্শে সুখ সৌভাগ্যে চরিতার্থ হইয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মানুসরণে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। এইত বধূধর্ম্ম—নিষ্কাম নারীধর্ম্ম! সধবা রমণীর জন্য সংন্যাস নহে; বাসনারবশীভূত, দেহধারী মনুষ্যের জন্যও নহে—বঙ্কিমের যেন ইহাই বক্তব্য। প্রফুল্ল ও নিশার উক্তি-প্রত্যুক্তিতে শিল্পের ক্ষেত্রে ভগবৎগীতার শ্লোক গুলি একরূপ অনধিকার প্রবেশ করিয়াই আমাদিগের এ বিশ্বাস জন্মাইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কি করিতে পারেন? এই পন্থা অনুসরণ করিয়া কোথায় যাইতে পারেন? উপরোক্ত আদর্শের ব্যভিচার কতদূর মারাত্মক হইতে পারে, অতঃপর তিনি যেন উহা দেখাইতেই অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল সীতারাম।

পৌরাণিকতা ও দার্শনিকতা এবং সীতারাম

সীতারাম গীতার শ্লোক ললাটে ধরিয়া নিজের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিতে করিতে উপস্থিত! উহা দার্শনিকের উদ্দেশ্য—পৌরাণিকের উদ্দেশ্য।

সীতারাম বহুগুণধর বীর চরিত্র। আবার, ভারতীয় পারিবারিক আদর্শের চরমপরিস্থিতা দেখাইবার অভিসন্ধিবশাৎ, বহুপত্নীক সীতারামের মধ্যেও সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা ছিল; নিজের পরিত্যক্ত স্ত্রীর দর্শন মাত্র সীতারাম মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া

সংশয় এবং অনবস্থা

গেল। এই দিকে বধুধর্ম্মিণী শ্রী সংন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একদিকে হৃদয়বশে সীতারামের প্রতি অনুরাগিনী, অন্যদিকে সন্ন্যাসাদর্শের বাধ্যতায় এবং জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী ভয়ে বিরাগিনী। এইরূপে সংসার ও সংন্যাসের আদর্শ-সংঘর্ষে সীতারাম-গ্রন্থের ঘটনা-প্রবাহ পরিচালিত ও মুখরিত হইয়াছে। পরিশেষে ধ্বংস—সীতারামের সংসার পুরীর ধ্বংস! সংন্যাস আদর্শানুসারিনী স্বীয় পত্নীর প্রতি বাসনা-গত ব্যভিচার ফলেই গৃহস্থ সীতারামের সর্ব্বনাশ! আবার ধ্বংসই বা কিরূপে বলিব? সীতারামও সন্ন্যাসী হইলেন—আদিদেব পুরাণ পুরুষকে চিনিলেন—জটাকৌপীনধারী হইলেন! শ্রী জ্যোতিষের বাক্য সার্থক করিয়া 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইলেন সত্য, কিন্তু সীতারামের জীবন-সম্পর্ক হইতেই চিরতরে অদৃশ্য হইলেন—পলায়ন করিলেন। প্রকৃত সন্ন্যাসিনী [বধূধর্ম্মের অব্যভিচারিণী?] জয়ন্তীও কবির শেষ পূজা-প্রণতি লাভপূর্ব্বক সরিয়া পড়িলেন!

আমরা এই ব্যাখ্যার অনেক স্থলে, প্রশ্ন চিহ্ন বা সন্দেহ চিহ্ন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কুতূহলী পাঠকও নিবিষ্টমনে গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে বসিলে বহুস্থলে এইরূপ সন্দেহে অভিনিবেশ করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি, গ্রন্থের ফলশ্রুতি কি—নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। একটা বিষয় স্থির হইবে—কবি গ্রন্থ-ঘটনায় গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন; অনেক স্থলে গীতাধর্ম্মের সঙ্কেত বা symbol স্বরূপেই ঘটনা গতি বিগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে।

কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন—সংসার ভাল, না সংন্যাস ভাল? ইহার কোন নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যাইবে না। বধূর পক্ষে সংন্যাস বিপদাবহ, ইহাই বোধ করি কবি বলিতে চাহেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানির কোন একোদ্দিষ্ট শিল্পাদর্শ বা ফলশ্রুতি আত্মপ্রকাশ করিতে কিংবা উজ্জল হইতে পারে নাই। কবি তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে সুস্থির আদর্শ-স্থানে উপনীত হইতে পারেন নাই! এ গ্রন্থের ঘটনা নিয়তির মধ্যে সেইরূপ কোন সুসঙ্গতি নাই; অন্যদিকে শিল্পী প্রকট রূপে পৌরাণিক ও দার্শনিক হইয়া পড়িয়াছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরূপ বিপরিণতি দীর্ঘজীবী কবি এবং লেখকের পক্ষে অনেক দেখা গিয়াছে। নবীনচন্দ্রেও ইহার পরিচয় পাই। নবীনচন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাব্য 'চৈতন্য' দেখুন। প্রবাসী পুত্রের জন্য স্বস্ত্যয়ন রূপেই কাব্যখানি লিখিত; প্রত্যেক সর্গের শেষেই আশীঃ-প্রক্রিয়ার মুদ্রা আছে। এ সমস্ত কলা-দেবতা বীণাপাণির রাজত্ব মধ্যে একেবারে 'ধর্ম্মের ঢক্কা' নিনাদপূর্ব্বক বিদ্রোহ ঘোষণা বই নহে! জর্ম্মণীর ঋষিকবি গ্যেঠের শেষ বয়সের দ্বিতীয়ভাগ ফাউষ্টকাব্যে এইরূপ দার্শনিকতার এবং শিল্পব্যভিচারের ভূরি ভূরি পরিচয় আছে। গ্যেটের ন্যায় সতর্ক কবিও কলাব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোঠে পরিশেষে কেবল ধ্বনিরূপণে, সঙ্কেতে এবং ব্যাখ্যানেই নিযুক্ত থাকিয়া ফাউষ্ট শেষ করিয়াছেন। কোন প্রবীন সমালোচক বলিয়াছেন :—

"As Goethe grew older and colder, the balance between those two elements of art would not be preserved. Hence arose Goethe's last manner. He has passed from representing character to representing the ideal (in Tasso, Iphyginia and first part of Faust). He is now to pass from the ideal to the symbol * * * They are mere mass of symbols, hieroglyphics and sometimes even mystification."

সীতারাম রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন—উহা যে শিল্প হইল না, কাব্য বা উপন্যাস হইল না বুঝিলেন।

সাহিত্যকৃত্যের পরিহার।

বঙ্কিমচন্দ্র জাগ্রত মানুষ, তিনি যে জীবনের শিল্পীযুগ পার হইয়া আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুতরাং তিতিক্ষা—সাহিত্যকলার ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিম চিরতরে অবসর গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অবসর গ্রহণ সাহিত্য-সেবীর পরম কৌতুহলাস্পদ। পশ্চাতে দৃষ্টি করুন—১৮৬১ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেই হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত, এই কয়েক বৎসরমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কার্য্য। উহার পর আরও একাদশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র ভবলোকে ছিলেন—শিল্পের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই।

সম্ভবতঃ ১৮৮৪ ইংরাজীতে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়।

ঋষিকৃত্য, প্রচার ও নবজীবন

সীতারাম 'প্রচারে' প্রথম বাহির হইতে থাকে। পত্রিকাদ্বয়ের সংজ্ঞার্থ বিবেচনা করিবেন, আগে 'বঙ্গদর্শন' পরে 'নবজীবন' ও 'প্রচার'! এই নামকরণের কর্ত্তা ও সম্ভবতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

'নবজীবনের' সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নবজীবনের আরম্ভ; উহা কবির ধর্ম্মজীবন বিষয়েই প্রযুক্ত। যে যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বঙ্গদেশ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, যিনি সীতারামের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে, কবিকৃত্যের জয়ন্তী প্রতিভাকে বিদায় দিয়াছেন, তাঁহারই উত্তর জীবন। এ জীবন কি হইতে পারে?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণকবি উত্তরকালে ঋষিত্ব লাভ করেন। কবিকৃত্য ও ঋষিকৃত্যের মধ্যে পার্থক্য দর্শন বা পরস্পর শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ, এ

প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। পরম সাদৃশ্য এই যে, কবি ও ঋষি উভয়েই উপদেষ্টা—উভয়ের কার্য্যই সমাজের মঙ্গল লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। কবির উপদেশে বিশেষত্ব কি? উহা প্রাচীন সাহিত্য-দার্শনিক একমাত্র বাক্যে অনুপমভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—"কান্তা সম্মিতোপদেশ যুজে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিজীবনে প্রবেশ করিলেন—প্রচার আরম্ভ করিলেন। সীতারাম লেখকের উত্তরকালে এই জীবন অপরিহার্য্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফলেই এ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বীয় জীবন, স্বীয় হৃদয়, স্বীয় মস্তিষ্কই এ ক্ষেত্রে তাঁহার গুরু। তাঁহার শেষ জীবনে এক সংন্যাসীর প্রভাব কার্য্য করিয়াছিল, শুনিতে পাই। উক্ত সংন্নাসীপুরুষ, কোন্ জাতীয় কোন্ তন্ত্রায় সন্নাসী ছিলেন, জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরজীবন যে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের অপরিহার্য্য পরিণতি—উহাই দেখিতেছি এবং উহা দেখিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি। 'প্রচার' পত্রে গীতার ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণচরিত্র, এবং 'নবজীবনে' মানবধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাই সারস্বত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কার্য্য। এই কার্য্যের স্বরূপ ও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে উহার বিশেষত্ব সংক্ষেপতঃ চিন্তা করিয়াই আমরা প্রসঙ্গসূত্রের গ্রহণ এবং উপ সংহার করিব।

২

ভারতীয় ধর্ম্মের পূর্ব্বপর আদর্শ ও বঙ্কিমের কার্য্যসূত্র

এই নবজীবনের ক্ষেত্রে—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য কি, সেই কার্য্যের বিশিষ্ঠতা কি, ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বাপর আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি কোথায়, এই প্রবন্ধ সূত্রে তদ্বিষয়ে বাহুল্যের স্থান নাই। বর্ত্তমানে এইমাত্র বলিয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করিব যে, যাঁহারা নিবিষ্ট মনে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শন গুলির

অধ্যয়ন এবং অনুচিন্তন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে ধর্ম্মের এবং উহার সাধন প্রণালীর বিষয়েও দুইটি বিশিষ্ট পন্থা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এক সেশ্বর; অপর নিরীশ্বর। 'নিরীশ্বর ধর্ম্ম' বলিয়া একটা পদার্থ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন আশ্রম ভেদের আদর্শ, বেদের 'যাগযজ্ঞতন্ত্র', পুরাণদর্শনাদির 'পূজা' এবং ভাগবতী 'ভক্তি মুক্তি' প্রভৃতি এই সেশ্বর আদর্শ হইতেই উপজাত হইয়াছিল; অন্যদিকে দুঃখবাদ, মায়াবাদ, বাসনা-মুক্তি, জন্মান্তর-মুক্তি, বৈরাগ্য বা সংসার হইতে পলায়নের আদর্শ প্রভৃতি ও প্রধানতঃ নিরীশ্বর ভাব হইতেই উৎপন্ন। ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন কর্ম্মবাদ, মায়াবাদ, মুক্তি এবং বৈরাগ্যের সেশ্বর ও নিরীশ্বর আদর্শ, পরস্পরে মিশ্রিত হইয়া এমন খিচড়ী পাকিয়া গেল যে ভারতবর্ষের সমাজ-দার্শনিক কিংবা ধর্ম্মচিন্তক মাত্রের পক্ষে উহা প্রবল সমস্যা-আকারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পরিস্ফুট ভাগবত আদর্শের মধ্যেও এই নিরীশ্বর বাদের কোন-না কোন লক্ষণ অতর্কিতে উঁকি দিতেছে!

সেশ্বর ও নিরীশ্বর ধর্ম্ম

আমরা জানি, বৌদ্ধমত মনুষ্যমনের প্রাথমিক বিজ্ঞান আদর্শ হইতে, এই প্রাচীন নিরীশ্বর বাদের শাখারূপেই উপজাত হইয়া সার্দ্ধ সহস্র বৎসর ভারতের ধর্ম্মজগতে এবং দেবভীতি মুদ্রিত মনুষ্যনেত্রের সমক্ষে অভাবনীয় মঙ্গল্য শক্তিরূপেই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। উহা দেব-ভীতিবিমূঢ় মনুষ্যনেত্রে প্রথম বিজ্ঞানের সূর্য্যালোক রূপে মনুষ্য অদৃষ্টে, তাহার ধর্ম্ম-গোঁড়ামীর ক্ষেত্রে অতুলনীয় শুভফল প্রসব করিয়াছে। কিন্তু উহাও স্বয়ং একটা 'ধর্ম্ম' আদর্শে পরিণত হইয়া নানাদিকে গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে; এবং ভারতীয় জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসে উহার মত

সমূহ নিদারুণভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য অষ্টম শতাব্দীতে এই নিরীশ্বর আদর্শকে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মায়াবাদ শূন্যবাদ জন্মান্তর বাদ ও কর্ম্ম-মুক্তি প্রভৃতিকে, অধ্যাসবাদ ও 'জগৎ মিথ্যা' বাদে আত্মস্থ করায়, নিরীশ্বর 'জ্ঞান' বাদী সন্ন্যাসীগণ, বিশেষতঃ বৌদ্ধসন্ন্যাসীগণ সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু ধর্ম্মের বর্ত্তমান সন্ন্যাসীদলের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। *সূক্ষ্মদর্শীগণ বলিবেন এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ কিংবা অবান্তর ফলেই, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু-উপাসনা এবং হিন্দুর সমাজ-শক্তি আজ নিরীশ্বর কর্ম্ম বৈরাগ্যে এবং আলস্য-বিলাসের অত্যধিক বিষসংক্রমনে নির্জ্জীব ও মৃতপ্রায়! উহার ঘনফলেই আমরা অষ্টমশতাব্দী হইতে ক্রমাগত জগতের অন্য জাতি সমক্ষে জীবনযুদ্ধে হটিয়া আসিতেছি! সংসারে যেমন আমাদের পরাজয়, অধ্যাত্ম জীবনেও বরং তদপেক্ষা অধিক—আমরা অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক! কেবল নাস্তিক নহি, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মজগতে প্রকৃত প্রস্তাবে 'নিহিলিষ্ট'! আমাদের আন্তরিক বিশ্বাসে এবং কর্ম্মে কতদূর ব্যবধান! আমরা জীবন-নিয়তির বাধ্য হইয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা কর্ম্ম করিতেছি, মায়াবাদের অধীন হইয়া তৎসমস্তের জন্য প্রত্যহ অনুতপ্ত হইতেছি! কর্ম্মে এবং বিশ্বাসে, জীবনে এবং জীবনের আদর্শে এত বিভিন্নতার নাম 'নরক' ভিন্ন আর কি হইতে পারে! এখন এ দেশে ধার্ম্মিকের আদর্শ, নামাদিকে কেবল জীবন হইতে পলায়নেই

সেশ্বর ধর্ম্মে নিরীশ্বর সংন্যাস-আদর্শের সংসর্গফল

* এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা লেখকের 'বাণীপন্থায়' 'ভারতীয় সাহিত্যের অভিব্যক্তি নামক' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পরিসমাপ্ত! ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন বৈরাগ্যে, জগতের প্রতি অবিশ্বাসে এবং ঘৃণায়, প্রীতিনীতি হীন দাঢ্যে এবং শুষ্কতায় আমাদিগকে জীবনের ক্ষেত্রে অলস ও শিথিলমতি, এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নিষ্ঠানির্ভর-হীন শুষ্কজ্ঞানী এবং কেবল যুক্তি-কৌশল-প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে!

গীতার সেশ্বর আদর্শ

শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতায় পুরাণ ঋষিজনাগ্রহভাবে, অথচ ঋষিযোগ্য সরল-ভাবে ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বর ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা সিদ্ধ করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভগবদ্বুদ্ধিষ্ট কর্ম্মযোগ সাধনার পন্থা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভারতীয় ধর্ম্মের চিরন্তন সমস্যার সমাধান করেন; সংসার ও সংন্যাসের মধ্যে পরম সমন্বয় বিধান করেন। গীতা ভারতীয় সেশ্বর ধর্ম্মপন্থার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ! জগতের সমস্ত ভক্তি-ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত উহার সুসঙ্গতি আছে। এই গীতা দেশে প্রচলিত ছিল বটে; শাস্ত্র-নির্দ্দেশে অপরিহার্য্য রূপেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিত না; বুঝিতে চাহিত না। সমাজের পরিচালকগণ গীতার মহান্ কর্ম্মভক্তিযোগ এবং ঈশ্বরবাদ ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতে চাহিলেও, তাঁহাদের চেষ্টা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। দেশের লোক চরমপন্থী সন্ন্যাসীর, জটাকৌপীনধারী দুর্গম্য অবধূত-মূর্ত্তির ও তাঁহাদের চালচলনের সমক্ষে ভয়াবিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গীতার ধর্ম্মাদর্শকে নিতান্ত 'সোজা কথা' মনে করিতেছিল তাহারা একটা জবরদস্ত mystery খুঁজিতে ছল! এই দেশের হৃদয় নিরীশ্বর আদর্শে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তন চেষ্টা ও নিস্ফলতা

সন্ন্যাসীর 'ভেক' না দেখিলে, এই দুর্ভাগ্য দেশে মানুষ কোন কথা শুনিতেই চাহে না! আমরা জানি, চেতন্যদেবকে এই কারণে একরূপ

বাধ্য হইয়া, সংন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সঙ্কট, জীবনে এবং জীবনাদর্শে এই বিরোধ, জীবন-মূলে এই শৈথিল্য, এই ব্যভিচার, এই প্রচ্ছন্ন ও অতর্কিত নাস্তিক্য! ইহাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ; সর্ব্বক্ষয়কারী আধ্যাত্মিক কারণ। এ দেশের মনুষ্যত্ব জীর্ণ-বৃদ্ধ-বাতুল হইয়া, পিতৃদ্রোহী-আত্মদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী হইয়া গিয়াছে; বিশ্ববিধাতাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে! ভক্তগণ বলিবেন, ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের ফল-স্বরূপেই তাহার সাংসারিক অধঃপতন! সেশ্বর এবং নিরীশ্বর বাদের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ বা আশ্রয়ণীয়, তাহা প্রদর্শন করা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে; আমরা ব্রহ্মবাদী বা বিশ্বাস-ভক্তিবাদী সেশ্বরগণের উদ্দেশ্যেই প্রসঙ্গ করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন; সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য-পর্য্যালোচনাস্থলে আমরা অন্য প্রসঙ্গের আশ্রয় করিব না। ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও নিরীশ্বর বাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, এবং উভয়ের একাকার সংসর্গ সাধারণ-জনতার অশিক্ষা গতিকে সমাজ-জীবনে কিরূপ হলাহল প্রসব করিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কার্য্যের স্থান বা সঙ্গতি সূত্র কোথায়, উহার সঙ্কেত-কল্পেই আমরা এইটুকু বাহুল্যের আশ্রয় করিতেছি বই নহে। ফলতঃ ভারতবর্ষের এই দুরন্ত হৃদ্‌রোগের ফল সমাজে সাহিত্যে ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। বীরধর্ম্মী এবং ঈশ্বরভক্তি বলে বলীয়ান্ স্বল্পসংখ্যক মুসলমান আক্রমণ কারীর সমক্ষে, ভারতবর্ষের বিশ কোটি দার্শনিক পণ্ডিত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেও পারে নাই! ইহার প্রধান হেতু চরিত্রের মধ্যে, হৃদ্‌রোগে! তৎপরে, মুসলমানের অধঃপতনে, বীরব্রতী এবং ভক্তিমার্গী পাশ্চাত্য জাতি এ দেশে প্রবেশ করিয়াছেন। মুসলমানের সংসর্গে নানক কবীর তুকারাম রামদাস শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির উত্থান হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই নাস্তিক্যের বিরুদ্ধে (এবং এই সমাজের মধ্যস্থিত প্রাচীন সং দায়তন্ত্রীয়

ভেদ-আদর্শের বিরুদ্ধেই) হইয়াছিল। উহার ফল সম্পূর্ণ ফলে নাই, কিংবা এখনো ফলিয়া আসে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের ও পাশ্চাত্যসভ্যতার আদর্শ-সংশ্রবে আসিয়া, ভারতে সংপ্রতি দুইটি প্রবল শুদ্ধ-শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। পঞ্জাবে দয়ানন্দ সংপ্রদায় ও বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসংপ্রদায়! খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরাক্রমশীল (militant); উহাদের দৃষ্টান্তে এই সম্প্রদায়দ্বয় ও ভারতীয় উপাসনা প্রণালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই চলিতেছে, অর্থাৎ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছে। এখন, একেশ্বর বাদ ভারতবর্ষে অজ্ঞাত পদার্থ নহে; অতি সাধারণ হিন্দুও মনেমনে অনুভব করে যে, সে বহুবাদী নহে, বা মৃৎমূর্ত্তি পূজক নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে, সতর্ক দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে, তাহার সমক্ষে কেহ আত্মহত্যা করিয়াও বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না যে উপাসনার মূল ভিত্তি বিষয়ে সে নিতান্তই ভ্রান্ত। তাই এ ক্ষেত্রে, যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মের, যেমন মহম্মদীয় ধর্ম্মের, তেমন এ দুইটী সংপ্রদায়ের পরিবর্ত্তনচেষ্টাও হিন্দুর মনোদ্বারে যেন বিফল হইয়া পড়িতেছে! তবে, সর্ব্বসাধারণের আধ্যাত্মক্ষেত্রে সমুন্নত ভাবভক্তিসংযোগ, জন্মগত পৌরোহিত্য, সামাজিক ভেদ-আদর্শ. ও পারিবারিক নানা অনীতি দুর্নীতি বিষয়ে নানারূপ যুগোপযোগী সংস্কারচেষ্টায় বিশিষ্টতা লাভ পূর্ব্বক এই সংপ্রদায়দ্বয় বলশালী হইয়াই অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃত অধ্যাত্মসিদ্ধির বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিশেষ মাহাত্ম্য লাভ করিতেছে বলিতে পারিনা—যাহা প্রকৃত আস্তিক্য-প্রণালী তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্তধর্ম্ম সবিশেষ ফল দেখাইতে পারে না। ফলতঃ, বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরবিষয়ে অ-জিজ্ঞাসাবাদী হইলেও বুদ্ধের বা বুদ্ধদেবের লোকপাবন চরিত্রের উপাসনাশীল বলিয়া তদ্বিরুদ্ধেও যে কোন সেশ্বরধর্ম্মই সবিশেষ প্রাবল্য দেখাইতে পারিতেছে না তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। প্রত্যুত, এ দুইটি সংপ্রদায়ও একরূপ অতর্কিতে ভক্তির আদর্শ সাহায্যে, এতদ্দেশের অন্তর্লোকে বহুবিস্তৃত নিরীশ্বর

বৈরাগ্য, বাসনা মুক্তিবাদ, বা জগতের প্রতি অবিশ্বাস আদর্শের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতেছে বই নহে; এবং এই জীর্ণ সমাজের অন্তর্জগতে শাক্ত তেজ বিস্তারিত করিতেছে! অধ্যাত্মক্ষেত্রে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিরোধ নাই, যত বিরোধ নাস্তিক্যের সঙ্গে। নাস্তিক্য, প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য, ধর্ম্ম-নামের সনন্দ প্রাপ্ত বৈরাগ্য-যুক্ত নাস্তিক্য, আস্তিকের পক্ষে সর্ব্বথা ভয়াবহ। অশিক্ষিত জনসাধারণ সতর্কভাবে ধর্ম্মক্ষেত্রীয় উদারতা বা Toleration সিদ্ধ করিতে পারে না বলিয়াই ভয়াবহ! ইয়োরোপের আধুনিক 'নেশন' আদর্শ ভারতের ক্ষেত্রে নানাদিকে অসম্ভব বলিয়াই, নাস্তিক্য, এবং আস্তিক্যকে পরস্পরের সাবধান-পরিজ্ঞাত ভাবেই চলিতে হইতেছে।

যুগগতি এবং যুগধর্ম্মের, বিশেষতঃ উক্তসমস্ত ভক্তি-ধর্ম্মের আদর্শসংঘর্ষে প্রপীড়িত হইয়া ভারতীয় হিন্দু সমাজ জাগিতেছে; অন্ততঃ চিন্তাশীলগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ কি? আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়? আমরা সর্ব্বত্র হটিয়া যাইতেছি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য; বৈজ্ঞানিকের বা জড়বাদীর নাস্তিক্য নহে; অত্যন্ত সাংসারিকতাজনিত অন্ধ নাস্তিক্যও নহে। তাহা হইলে অন্ততঃ সাংসারিকভাবেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতাম। নিরীশ্বর বৈরাগ্যপন্থী, সর্ব্বধ্বংসী এবং সর্ব্ব-অস্বীকারী নাস্তিক্য, নিরীশ্বর মায়াবাদ, নিরীশ্বর ভ্রান্তি-বাদ—অহঙ্কারান্ধ জ্ঞানবৃক্ষের বিষাক্ত ফল! এই ক্ষেত্রে অসতর্কভাবে রফারফি করিতে গেলেই ধ্বংস—সমস্ত সমাজের অপরিহার্য্য রাজযক্ষ্মা ও মৃত্যু।

ভারতীয় সমাজ জীবনে হৃদ্‌রোগ

এই রাজযক্ষ্মার বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলগণ জাগিতেছেন; আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও এই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাহার

ফল বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। এই রোগ-পরিচয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমধিক উদ্বুদ্ধ; প্রকৃত দার্শনিকের ভাবেই উদ্বুদ্ধ! আমরা প্রাচীন ঋষিগ্রন্থাদির দিকে দৃষ্টি করিতেছি—আশ্বাস পাইয়াছি। এই নিরীশ্বর আদর্শ যে আমাদের ছিল না; বেদপন্থী কোন ধর্ম্মেই ছিলনা! ইহা আগন্তুক ও সংসর্গ জনিত; আমাদের দুর্ভাগ্যজনিত! বৌদ্ধবিরোধ যুগে শাস্ত্রগুলি, প্রাচীনতর শাস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত এমন নিশ্চিন্ত নির্ভীকভাবে বিবর্ণিত হইয়াছে, নিরীশ্বরতার সহিত তাহার স্বস্থলে নামিয়াই এমন ব্যাকুলভাবে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভাবিলে দুঃখ হয়। একেত আর্য্যজাতির প্রাচীন ভেদতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার গতিকে ভারতীয় মনুষ্যের জীবন নানা মুনির নানামতের টানাটানির মধ্যে পড়িয়াই জড়সর। জিজ্ঞাসু, মাত্রের পক্ষে কেবল বাহ্যিক 'আচার' বিষয়ক কার্য্যাকার্য্য-নির্দ্ধারণাই একটা দুরন্ত সমস্যা! তন্মধ্যে আবার, এই সমাজের হিতকামা ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই এখন এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যকে সর্ব্বদৃশ্য মুদ্রাপরিচিহ্নে বিশেষিত করার সময় আসিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কি করিয়াছেন? এই সমাজ-হিতৈষী, নবজীবন-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণতনয়ের কার্য্য কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিকৃত্য; গীতা-পরিচয় ও 'মানবধর্ম্মের ব্যাখ্যা'

ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার পৌরাণিক-আধার গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কোন ধর্ম্ম উপস্থিত করিয়াছেন—মানবধর্ম্ম—বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম—অনুশীলন ধর্ম্ম। এই শেষোক্ত কথাটার অর্থচিন্তা করিবেন, অনুশীলন ধর্ম্ম! চিত্তবৃত্তির অনুশীলনে, সামঞ্জস্য এবং সম্পূর্ণতা বিধানেই ধর্ম্ম! চিত্তবৃত্তির একান্ত নিরোধ না করিয়া, শূন্যতা বিধান না করিয়া, নির্বীজ সমাধি সাধন না করিয়া,

কর্ম্মবাসনার একান্ত ধ্বংশ না ক'রিয়া, উহার অনুশীলনই ধর্ম্ম! এইরূপে, সম্পূর্ণতা বিধানের পথেই সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে! সেই অনন্ত পূর্ণ পদার্থের অভিমুখে, সংসার পথে এবং অধ্যাত্ম পথে, ভক্তি-কর্ম্মযোগ সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে! চিন্তা করুণ, বিষয়টি কতদূর পৃথক্ হইয়া গেল! বৈরাগ্যবাদ হইতে, বাসনা-মুক্তি হইতে বিপরীত ব্যবহিত হইয়া গেল কি না? ইহাই গীতার আদর্শ—প্রকৃত আস্তিক এবং ব্রহ্মবাদীর আদর্শ!

এইরূপে গীতায় সংসার হইতে বৈরাগ্য-পলায়ন এবং জীবনের দায়িত্ব বিষয়ে ভীরু-ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে; কর্ম্ম সংন্যাসের পন্থাও নিন্দিত হইয়াছে! ব্রহ্মবাদীর সংন্যাসের অর্থ গীতা করিয়াছেন—ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মফল ন্যাস! সংসার হইতে, কর্ত্তব্য হইতে পলায়ন সংন্যাস নহে; ঈশ্বরের আনন্দ-রূপের সহিত জ্ঞানে এবং কর্ম্মে ভক্তির দ্বারে যুক্ত থাকাই যোগ। ধ্যান-পন্থার উচ্চ উচ্চতম সোপান গুলিও এ সূত্রেই সবদ্ধ। সর্ব্বত্র, যেমন কর্ম্মপথে, তেমন জ্ঞানপথে, স্বসিদ্ধ ঈশ্বরানুভূতিই ব্রহ্মজ্ঞান—ইহাই পরমার্থ! এই ঈশ্বরবাদের সহিত পরমাত্ম-বাদের কিংবা ব্রহ্মবাদের অথবা প্রাচীন আশ্রম আদর্শের কিছুমাত্র বিরোধ নাই—ইহাই প্রাচীন আর্য্য ঋষির অদ্বৈতবাদ। বেদোপনিষদের ব্রহ্মবাদী ঋষি হইতে বাদরায়ণ প্রভৃতি দার্শনিকগণ, রামানুজ প্রভৃতি সাধকগণ, জগতের সমস্ত আস্তিক্যবাদী সাধুগণ সজ্ঞানে বা অতর্কিতে এই ধর্ম্মপন্থাই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। এ স্থলে বলাবাহুল্য হইবে না যে, কেবল বিশ্বাস (faith) লাভ বা অর্চ্চনার প্রণালীই ভারতীয় ধর্ম্ম-আদর্শের পক্ষে যথেষ্ট নহে; ভারতীয় ধর্ম্মে ব্রহ্মসাধন বলিয়া একটা চরম অর্থের নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্রহ্মবাদীর পক্ষ হইতে বলিতে পারা যায়, ঐ 'অনুভূতি' সাধনাই একমাত্র পন্থা—ধর্ম্মসাধনের অন্য পন্থা নাই! "তমেব বিদিত্বা (জ্ঞান এবং

প্রাপ্ত উভয়ার্থে) অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়ণায়"। উহা অত্যন্ত কঠিন কাজ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বলিবেন যে, কোন Negative p[illegible] কিংবা 'নেতি নেতি'র প্রণালী বা বৈরাগ্য ঘৃণা অথবা দুঃখবাদের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই পন্থায় যাওয়া যায় না। পরমার্থ পথিকের আদৌ আনন্দ বোধ স্বতঃসিদ্ধ হওয়া চাই। জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায়, সর্ব্বসুখদুঃখে নিষ্ঠা এবং নির্ভর বশাৎ আনন্দযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঈশ্বরের মিষ্টতা বোধ করিবার সৌভাগ্য ব্যতীত, পরম ভক্তি-তন্ময়তার স্বতঃসিদ্ধি ব্যতীত 'পথিক' হওয়া যায় না। মিষ্টতা বোধ না ঘটিলে যুক্ত হইবে কেমন করিয়া ? কেবল জিজ্ঞাসা কুতুহল বা curiosityর দ্বারা তাহা ঘটে না ; আর্ত্ততা, অর্থিতা ভয় ভীতি কিংবা বিরাগের ফলেও ঘটে না। যাহার মিষ্টতা বোধ জন্মে নাই, ব্রহ্মপ্রয়াণ-পথে তাহার কিছুমাত্র যোগ্যতা জন্মে নাই—অধিকার জন্মে নাই ; আত্ম বঞ্চনা না করিয়া তাহার পক্ষে এই সত্য বুঝিয়া লওয়াই বরং শ্রেয়। যে জগৎকে বিষাদ জ্ঞানে ত্যাগ করিতেছে—সে ঋষি-উদ্দিষ্ট পরমার্থের একমাত্র পন্থা হইতেই পলায়ন পূর্ব্বক অহঙ্কারে, দুরাকাঙ্খা এবং দুর্বৃত্তির পাপনিরয়ে এবঞ্চ অন্ধকারেই ডুবিতেছে। বিশ ত্রিশ বৎসর বিভ্রান্ত ভাবে ভিক্ষালব্ধ-ব্রতী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কিছু মাত্র চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে নাই, প্রীতি পবিত্রতা মধুরতা কিংবা ঔদার্য্য লাভ করিতে পারে নাই—গহন কর্ম্মবিপাকে ঘুরিতেছে, এ দেশের সন্ন্যাসীর দলে এইরূপ ব্যক্তির অভাব নাই। উহা নিরীশ্বরবাদের ফল। আমাদের সন্ন্যাসীগণের অনেকেই নিরীশ্বর ; এবং তাঁহাদের আদর্শ-সংসর্গেই ভারতবর্ষের হৃদ্‌রোগ এবং অধঃপতন।

ধর্ম্মের এবং সমাজের ক্ষেত্রেও সংপতি যুগগতিক অনুকূল বায়ু বহিতেছে। বঙ্গদেশে রামমোহন কেশবচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ

প্রভৃতির অভ্যুদয় উহার প্রমাণ! সমস্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হইয়া মানবধর্ম্ম, মানবসভ্যতা, মানব সমাজ ও মানব-নিয়তির সহিত সহানুভূতি সিদ্ধি করিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি! নবজীবন এবং প্রচারের পর হইতে হিন্দুর অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকে একরূপ কোণায় রাখিয়া এই যে 'গীতা গীতা' বলিয়া মাতামাতি আরম্ভ হইয়াছে, উহার প্রধান হেতু, ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী কর্ত্তৃক 'বিশ্ব'-আদর্শের পরিচয় এবং উহার সহিত নিজের জীবন-আদর্শের সঙ্গতি-সাধনের চেষ্টা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আস্তিক্য-ভক্তি-নিষ্ঠ এবং লোকহিত পরায়ণ কর্ম্মযোগীর আবির্ভাব ও এ দেশে আরম্ভ হইয়াছে! এ-জাতীয় মহাত্মাগণই চিরকাল আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। বঙ্কিমবাবুর কার্য্যও এ ক্ষেত্রে ঋষিকৃত্যের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে! তীক্ষ্ণদৃষ্টি—ঋজুদৃষ্টি—সত্যে দৃষ্টি—অকুটিল বাক্যবিন্যাস—এই ব্যক্তির সংসর্গ নানা দিকে বাঙ্গালী পাঠকের শুভদায়ক হইবে! বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ঐ চরিত্রকে সর্ব্বথা মনুষ্য জীবনের আদর্শ রূপে স্থাপন করিয়াছেন! চিন্তা করুণ, ভারতীর ব্রহ্মবিদ্যা প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয়বিদ্যা—উহা রাজবিদ্যা! যাঁহারা প্রকৃত সংসারের রাজত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, লোক-গরিষ্ঠ মহোন্নতি শিখরে দাঁড়াইয়াছিলেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের রাজত্ব আত্মশক্তিবলে অধিকার করিয়াছিলেন—বিশ্বামিত্র, জনক, দাশরথি রাম ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি—তাঁহারাই ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠাপক! সরল ব্রাহ্মণগণ এক বাক্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বলোক-দৃশ্য আদর্শ-পদে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা ঈশ্বরের পার্থিব অবতার বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন! বিশ্বামিত্রের গায়ত্রী হিন্দু ব্রহ্মবাদী মাত্রেরই একাশ্রয়রূপে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষকে সনাতন ব্রহ্মপ্রয়াণ-পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন! বঙ্কিম-চন্দ্র ও সারস্বত-ক্ষেত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ত্মানুবর্ত্তী হইয়াছেন, বই নহে!

এখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঋষি-কার্য্যকে, এই অধ্যাত্ম-সূত্রী কর্ম্ম-যোগের তত্ত্বকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকার্য্যের সমন্বয়ে চিন্তা করুন। সীতারাম আমাদিগকে বিষম সংশয়ের মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছিল। শ্রীর জীবন, সীতারামের প্রতি তাহার ব্যবহার, সীতারামের জীবন ও উহার শেষ ফল, সর্ব্বোপরি গ্রন্থটির ফলশ্রুতি আমাদিগকে বিষম দ্বৈধঅবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিম চন্দ্র কি বলিতে চাহেন? তিনি নিজেই যেন তখন ঠিক পান নাই, কি বলিবেন? ভারতবর্ষে সংন্যাসের আস্তিক্য এবং নাস্তিক্য আদর্শে যে খিচড়ী পাকিয়া গিয়াছিল, তিনি প্রথম প্রথম উহার প্রভেদ-পরিজ্ঞানে নিজেও যেন সমর্থ হন নাই। নিজের অধ্যাত্ম-জীবনে এইরূপে সংশয়-প্রেড়িত হইয়াই বঙ্কিম প্রাচীন ভারতের ঋষিপদে প্রবেশ করেন; শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতার অর্থ এবং প্রতিপাদ্যের সন্ধান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ অর্থটি পরম মহার্ঘ মনে করিয়াই বাঙ্গালীকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন। উহার পর আর সাহিত্য-কলার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ঋষি-কৃত্যও পরম মহিমান্বিত হইয়াছে; লোক-শ্রেয়োনিষ্ঠ এবং সার্থক হইয়াছে।

ধর্ম্মাদর্শের পরিণতি ও গীতা

৩।

বঙ্কিমচন্দ্র কবি; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী পরিচালন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার রচনায় কবিত্ব শক্তি—কল্পনী, দীপনী ও রসনী শক্তি—অসাধারণ। তাঁহার ভাষা এবং রচনারীতি সর্ব্বত্র ঋজু, সংযত, সংহত অথচ ভাবার্থের প্রকাশ ধরিত্রশক্তি মতী; প্রচলিত অথচ গৌরবান্বিত; অনাবিল অথচ গভীর।

বঙ্কিমের কবিত্ব

তাঁহার গদ্যপ্রবাহে সময় সময় ভাবোচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের সুর পাওয়া যায়; অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা, এই গদ্য! বৃহৎবিস্তারিত এবং ভাবার্থ-দীপ্ত ঘটনা কিংবা অবস্থার পরিকল্পনায়, সবল সরলতায় ও সরসতায়—এবং সমুজ্জ্বল ব্যঞ্জনা-সঙ্কেতে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় গদ্যক্ষেত্রে অতুলনীয়।

উপন্যাস কেবল কপোল-কল্পিত গল্প বা গদ্য জল্পনা মাত্র—অনেকে এইরূপ মনে করেন। ইয়োরোপে এখন এই আদর্শ বহুমতে অনুসৃত। বাক্যজাল বিস্তার পূর্ব্বক দীর্ঘ বিস্তারিত বিবরণ-পথে কালহরণ করিতে পারিলেই যেন উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল! আমরা দেখিয়াছি, সাহিত্য এখন লৌকিক ও নিতান্ত লোকায়তিক হইয়া পড়িয়াছে। তাই, সাধারণের বোধগম্য এবং আপাত-রম্য করিয়া যাহা-তাহা লিখিলেই চলিয়া যায়। ইংরাজীতে, সমস্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, এ সুযোগে, অনেক মসীজীবী ব্যক্তিই উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসিয়া আসর জমাইয়াছেন। এখন ঐ সাহিত্যে "একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি" বলিলেই, লোকে বুঝে "উপন্যাস লিখিয়াছে"। হাল কোদাল হাতুড়ি কিম্বা বাটখাড়ার ন্যায় সরস্বতীদেবীর খাশ লেখনীও একটা ব্যবসায়-যন্ত্রে পরিণত! যাহারা সরস্বতীর অন্তঃপুরে 'উকি দিয়া' দেখিবার সৌভাগ্যও পায় নাই, তাহারাও বিশত্রিশখানি তিন-বলুম নবেল লিখিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়া যাইতেছে— অবশ্য সারস্বতী খ্যাতি কিংবা শিল্পীর 'পরমার্থ' নহে। এইরূপ এক একটী নবেলের পাঠ শেষ করিয়া, চিন্তা করিলেই দেখিবেন—হয়ত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া পরম নিবিষ্ট ভাবেই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হইয়াছিল; উহা যেন কয়েক ঘণ্টাকাল মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবৎ আবিষ্ট রাখিয়াছিল! কিন্তু উহার মধ্যে এমন একটা শব্দ, একটি পংক্তি, একটা দৃশ্য নাই, যাহা মনে মুদ্রিত হইতে পারিয়াছে!

উপন্যাসে শিল্পলক্ষণ

সমস্ত গ্রন্থ একটি ক্ষণপ্রদীপ্ত উল্কাজ্বালার মতই ইন্দ্রিয়-পথে বিস্ফুরিত হইয়া নিবিয়া গিয়াছে! ইহা কোন্-জাতীয় সাহিত্যশিল্প! এ ঘটনার কারণ চিন্তা করুন—ঐ গ্রন্থের কিছুমাত্র সারস্বত আকর্ষণ নাই, অথচ উহা ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ করিয়া পরিয়াছে—উহা "মস্তিষ্কের অহিফেন" ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপ অহিফেন-সেবীর নিকটে, বঙ্কিমচন্দ্রের এ সমস্ত উপন্যাস কিছু-মাত্র মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারিবে না। ত্বরিত পাঠকের কিংবা আমোদ-পিপাসিতের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেই এক ঘণ্টার অধিক লাগিবে না। উহারা গল্প কথাচ্ছলে কাব্য;কাব্যের রসনিষ্পত্তি এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যতীত হয়ত উহাদের অন্য মাহাত্ম্য-লক্ষণ নাই। কিন্তু যাঁহারা উপন্যাসকেও একটা সাহিত্যশিল্প বলিয়া মনে করেন, অর্থের গভীরতা, আদর্শের নৈতিক অভ্যুন্নতি,রচনার সৌষ্ঠব-সামঞ্জস্য এবং মিতাচার,রসের ঘনতা ও আন্তরিকতা, চরিত্রের সৃষ্টি এবং ঘটনা-সংস্থানের নৈপুণ্য হিসাব করিয়া যাঁহারা উপন্যাসের বিচার করেন, তাঁহাদের চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে বিলম্ব হইবেনা। ওয়াল্টার স্কটের ন্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকৃত কবিত্বশক্তি লইয়াই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণ গল্পকথকের ন্যায়, কেবল ভূয়োদর্শন, পুঞ্জীকরণ বা আমোদনের প্রণালীই তাঁহার শরণ্য ছিল না। অসামান্য কল্পনাশক্তির সাহায্যে বহির্জগৎকে হৃদয়ে আনিয়া, জারিত করিয়া, তিনি পুনর্ব্বার শিল্প-সৌকর্য্য-সঙ্গতে উহাকেই আদর্শ আকারে জীবিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন! বঙ্কিমের সৃষ্টি প্রাকৃতের অনুকরণ মাত্র নহে—তদপেক্ষা অনেক বড়—উহা শিল্পীর উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্করণ। রিয়ালিষ্টিক বা প্রাকৃত নবেল রচনার প্রধান উপকরণ observation বা সূক্ষ্ম প্রাকৃত দর্শন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেক্ষপীয়র বা স্কট, কিংবা কোন বিভাগের সমর্থ শিল্পীই উক্ত প্রণালী অবলম্বন করেন নাই;

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রূপে আপনার হৃদয় মধ্য হইতেই মানব-প্রকৃতির চিরন্তন সত্য-লক্ষণযুক্ত মৌলিক 'সংস্করণ'ই প্রকাশ করিয়াছেন—সৃজন করিয়াছেন। অথচ, তদপেক্ষা 'রিয়ালিষ্টিক' স্থলবিশেষে নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতবাদীগণও হইতে পারেন নাই; সাধারণ ঘটনার বিবরণ বাহুল্য দেখাইতে পারেন, স্বীকার করিব। বলিতে হইবে না যে, শ্রেষ্ঠ শিল্প গণ বাহুল্যকে, অতি-পুষ্পিত কিংবা অতিপল্লবিত প্রয়োগ অথবা রেখা বিন্যাসের প্রণালিকে নিত্যকাল পরিহার করিতে চেষ্টা করেন। চরিত্রের মূল তত্ত্বটি, উহার মর্ম্মকেন্দ্রটি স্থির করিয়া সুযোগের স্থানে দুটি-একটি সুস্থির রেখা-পাত করিতে পারিলেই যথেষ্ট! উহারই নাম শিল্পের ক্ষেত্রে শক্তি সংযম বা মিতাচার।

চরিত্র সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ শিল্পসাহিত্যের একটা প্রধান গুণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। চরিত্র শব্দের মৌলিকার্থ আচরণ। আমরা এই সংজ্ঞাশব্দটি সকল দিক হইতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, স্বীকার করিয়া লইব। কাব্যস্থিত প্রত্যেক বাক্যের

শিল্পে 'চরিত্র' সৃজন

যেমন একটা স্ফুট-পরিমাপক আচরণ বা অর্থ থাকা আবশ্যক; গ্রন্থের প্রত্যেক ঘটনার কিংবা দৃশ্যেরও সেইরূপ একটা বিশিষ্ট ভাবার্থ-যুক্ত আচরণ থাকা আবশ্যক; অধিকন্তু, গ্রন্থ-নিবিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরও সেইরূপ একটা স্থির-পরিচিহ্নযুক্ত এবং সত্য-অনুভাবক আচরণ থাকা আবশ্যক; সর্ব্বোপরি, সমগ্র গ্রন্থটীর মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ত্রি-বিষয়ের সামঞ্জস্যে একটা বিশিষ্ট চরিত্র বা আচরণ থাকা আবশ্যক। শেষোক্ত লক্ষণটিকে লক্ষ্য করিবেন—সমগ্র গ্রন্থের একটা চরিত্র! গ্রন্থটী প্রতিপদে ঘটনার ও নায়ক-নায়িকার শতভাব-যুক্ত চরিত্র প্রকট করিতে পারে, কিন্তু সমস্তের ঘনফল বা ঐক্যফলের নামটাই গ্রন্থচরিত্র—উহারই অন্য নাম ফলশ্রুতি।

চতুরঙ্গ লক্ষণ

এই চতুরঙ্গ সিদ্ধির নামই গ্রন্থের শিল্পত্ব। উহা শিল্পীজীবনের পরাপ্রাপ্তি, জগদ্দুর্লভ কবিজন্মের পরমা সিদ্ধি এই বিষয়টি প্রণিধান করা আবশ্যক। বাক্যার্থ, চরিত্র, ঘটনা এবং ফলশ্রুতি, এই চতুর্ব্বিধ গুণের ঐক্যে কিংবা সামঞ্জস্য বিধানেও শিল্প বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই বিশিষ্টতার মধ্যেই পুনশ্চ সাধারণ ও অসাধারণ আছে। প্রকৃত কবিমাত্রের পক্ষেই কোন-একটি গুণে গরিষ্ট হওয়া সাধারণ—সামঞ্জস্য সিদ্ধি করাই অসাধারণ। সেইরূপ অসাধারণ ব্যক্তি চিরকাল "কোটীকে গুটিক মিলে"।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকৃত মাহাত্ম্য কি তাহা বুঝিতে পারিব। অনেক স্থলে আপাতিক অবিচার, অন্যায় বিচার এবং পক্ষপাতিতার হস্ত হইতেও রক্ষা পাইতে পারিব। বিচারের ক্ষেত্রে পাঠক নিজের সংকীর্ণ রুচিবশে প্রতি নিয়ত আপাতভ্রান্ত হইতে পারেন। প্রকৃতকবি মাত্রের প্রধান গুণ অপরিহার্য্যতা—তাঁহারা পাঠ-মাত্র, তৎকালের জন্য পাঠকের হৃদয়কে অধিকার করিয়া, তাহাদিগকে সর্ব্ববিস্মৃত করিয়া তুলিতে পারেন। এই অপরিহার্য্যতা-গুণ লাভ না করিতে পারিলে কেহ আদৌ কবি-সমাজ-ভুক্ত হইতেও পারেন না।

বঙ্কিমের উপন্যাসে শিল্পত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিগুণধর-শিল্পী। কবি-প্রতিভার আর একটি বিশেষ শক্তি এই যে, উহা মনের ভাবচ্ছন্দকে বাক্যের ছন্দে আয়ত্ত করে—বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুণ পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে সাহিত্য-জগতের অন্য ঔপন্যাসিক হইতে তাঁহার স্বতন্ত্র সিদ্ধলক্ষণ প্রতীয়মান। বঙ্কিমের গদ্য কথায় কাব্যচ্ছন্দের আভাস পাই। তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র কাব্যের বিষয়া-ভ্যুন্নতি এবং গৌরব না থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের

মাহাত্ম্য অনন্ত-সাধারণ। তদ্ভিন্ন, শিল্পীমাত্রেরই প্রধান গুণ—সৃজন ও দর্শন শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বঙ্কিম কাব্য লিখিতে যান নাই—গল্প লিখিতে গিয়াছেন; এবং এই গল্পেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। সমুচিত ছন্দ এবং বিষয়-সন্নিবেশে রচিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পের এই ভাব, এই সৌন্দর্য্য, এই সত্য-ঘটনা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কাব্য পদবী লাভ করিতে পারিত; মনের মৃত্তিকায়, স্মৃতি-পটে, চিরতরে প্রতিপদে মুদ্রিত হইবার সামর্থ্য লাভ করিত। বলা বাহুল্য, কবিতা বা ছন্দ ব্যতিরিক্ত কাব্যের এই যোগ্যতা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-সামর্থ্য অসাধারণ; ছন্দের সামর্থ্য সর্ব্বপ্রকারে উহার অনুরূপ ছিল না বলিয়াই, এই সমস্ত গল্প কাব্য কিংবা নাটকের আকারে পরিণত হইয়া যায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি আমাদের সাহিত্যে অনন্তসাধারণ। সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সত্যের দর্শন, ও অনুরূপ চরিত্র সংঘটনার বিষয়ে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে একক। বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম কিংবা প্রচণ্ড ভাবুক অথবা সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালী কবি আমাদের সাহিত্যে জন্মিয়াছেন; কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক ত্বরিতগতি, শাণিত শক্তি এবং শিল্পের স্ফোট বা নিরূপণ সামর্থ্যে বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যে,কি গদ্যে কি পদ্যে,এখন যাবৎ অপরাজিত রহিয়াছেন। এ সমুদয় গুণের একত্র সমাবেশ সাহিত্যে মহার্ঘ এবং পরম মাহাত্ম্য-কীর্ত্তির আস্পদ; বঙ্কিমচন্দ্র সেই সৌভাগ্যবান্। আত্মার গুণেই সাহিত্য-রচনা গরিষ্ঠতা এবং এককতা লাভ করে; বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আত্মা ছিল। উহা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী পরমাত্ম-শক্তির অংশভূত এবং ছায়াবহ। অন্যদিকে আত্মার এই গুণ কেবল পুষ্কল বাক্যশক্তি বা সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি, স্মৃতিধৃতি অথবা বিস্তার সামর্থ্যও নহে;

সাহিত্য-রচনার শক্তি

উহাতে সর্ব্ব-সামঞ্জস্যে, একরূপ অতর্কিতভাবে, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম অপর একটি পদার্থ আছে—মানবের দর্শন বিজ্ঞান এখনো উহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই—জগৎ ব্যাপারে উহার নাম প্রাণ ; শিল্পরচনার ক্ষেত্রে উহার নাম, অনুপ্রাণন শক্তি। উহাকেই সহজন্মা এবং সৌভাগ্যজনিত, পরন্তু বিভু-কৃপা-জনিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। কি গুণে, কি কারণে ব্যক্তিবিশেষে এই সৌভাগ্যের সঙ্গম ঘটে, তাহাও কেহ বলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার অপর কোটী কোটী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই আত্মা কেন এই ব্রাহ্মণ তনয়কে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়নে উহার পরিচয় পাইবেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষঃ বৃণুতে তস্যৈষঃ।

আমরা এ স্থলে, প্রকৃত কলা-শিল্প মাত্রেরই মূলশক্তির সঙ্কেত করিয়া আসিলাম। উহা প্রাণ প্রতিষ্ঠার শক্তি—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিধাতৃ-শক্তি। লেখকের রচনা রীতিকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াই উহার প্রকাশ। এই কারণে, রীতিকেই শিল্পের প্রধান রহস্যলক্ষণ বলিয়া অনেক সাহিত্য-দার্শনিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি, রীতিই শিল্পীর সর্ব্বস্ব বলিয়া নির্দ্দেশ! বঙ্কিমের সেইরূপ একটা স্বতঃসিদ্ধরীতি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। মূল কথা এই, লেখকের প্রকৃতিসিদ্ধ হওয়া ব্যতীত রচনারীতি প্রাণযুক্ত কিংবা মনোহারিণী হয় না। ইহা শিল্পবিষয়ে সর্ব্বসম্মত সত্য। পুনশ্চ, রীতি প্রকৃতিসিদ্ধ হইলেই যে লেখকের মাহাত্ম্য-বিষয়ে যথেষ্ট হইল, এমন নহে। তৎকল্পে লেখকের স্বকীয় প্রকৃতিই মহতী হওয়ার আবশ্যক। সুতরাং, অসামান্য মনুষ্যত্ব-সাধনার উপরেই শিল্পীর মাহাত্ম্য নির্ভর করে। তাই ইহা ইচ্ছা-গম্য কিংবা বিদ্যা-গম্যও

নহে। কবির আত্ম-মাহাত্ম্য সিদ্ধ না হইলে রীতির মাহাত্ম্য, তথা শিল্পের বিশেষত্ব ও সিদ্ধ হয় না। এই তত্ত্ব—'সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ'।

ভারতীয় শিল্প-আদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ গুলির মধ্যে একটা বিশিষ্ট রীতি, বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ—ভারতীয় আদর্শ আছে—মহৎ মনের চিহ্ন আছে। তাঁহার রচনা মধ্যে বাক্য-ব্যঞ্জনা, চরিত্র এবং ঘটনা-গতির সমঞ্জসীভূত যে-একটা স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শ আছে—উহাই মুখ্যভাবে ভারতীয়। কেবল চরিত্র-সৃষ্টি বা স্বভাবের অনুকৃতিই ভারতের চক্ষে কাব্যের একমাত্র আদর্শ নহে। সমগ্র কাব্য মানব সমাজের নিকট কবির যে-একটা নিজস্ব মর্ম্ম-সমাচার বহন করে, ঐ সমাচারই কাব্যের ফলশ্রুতি। এই ফলশ্রুতির সচেতন আদর্শ যে ভারতীয়, এবং উহা সিদ্ধ না হইলে ভারতীয় আদর্শে রচনার শিল্পত্বই যে সিদ্ধ হয় না, উহা আমরা বলিয়া আসিয়াছি! প্রণিধান করিলেই দেখিবেন, শিল্পীর জ্ঞাতসারেই হউক কিংবা অতর্কিতেই হউক, রচনা মাত্রের এইরূপ একটা ফলশ্রুতি গ্রাহকের মনে উপজাত না হইয়া যায় না। বলিতে পারেন, এই ফলশ্রুতির গ্রীক আদর্শ fate বা দৈবগতি; আধুনিক ইয়োরোপীয় আদর্শ জগদ্‌গতি বা naturalism; কিন্তু, ভারতীয় মতে উহার নাম জগন্মঙ্গল বা শিব। ভারতের শিল্পলক্ষণে সত্য ও সৌন্দর্য্য অপরিহার্য্য, কিন্তু এই শিব-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য! কাব্যের উদ্দেশ্য-গতি মুখ্যভাবে জগতের শিবঙ্করী বা মঙ্গলের অব্যভিচারী হওয়া আবশ্যক। কবি জগদ্‌গতির মধ্যে এই শিব-সমাচার বা অধ্যাত্ম আশ্বাস স্বয়ং লাভ করিতে না পারিলে, লেখনীই ধারণ করিবেন না, ইহাই যেন আমাদের সাহিত্য শাস্ত্রের অভিপ্রেত! মনোহর করিয়া যাহা-তাহা রচনা করিলেই প্রকৃত শিল্প নামের যোগ্য হইবে না। আবার, ভারতীয় শিল্পের এই বিশিষ্টতাও কেবল মঙ্গলাচরণ

পূর্ব্বক কাব্যের আরম্ভ এবং শেষ করিতে হয় বলিয়া নহে; আশীর্ব্বাদ কেবল কথায় পরিসমাপ্ত করিলেই চলিবে না; গ্রন্থের গতি এবং সমগ্র রস-নিষ্পত্তির মধ্যে উহা স্বতঃঅভিব্যক্ত হইয়া পাঠকের হৃদয় অধিকার করা আবশ্যক। এই কারণে কেবল দুঃখবাদে বা অদৃষ্ট জন্য অশুভবাদে ভারতীয় কাব্য পরিশিষ্ট হয় না। ভারতীয় শিল্পীকে শুভবাদী বলা যায়। কবি জগতের শুভানুধ্যায়ী হইয়াই সত্য-সৌন্দর্য্যের শিল্পচ্ছবি প্রকাশ করিবেন।

দুঃখবাদ, অশুভবাদ নানাদিকে নিরীশ্বর আদর্শ; এই আদর্শ ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে—সংস্কৃতের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পালিভাষার মধ্যে উহা কতকগুলি ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, সাহিত্য নির্ম্মাণে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। সর্ব্বত্র দেখিবেন, দুঃখবাদের, এবং অশুভবাদের উত্তর ফলে, যেমন ব্যক্তি বিশেষের, তেমনি সমাজের এবং সাহিত্যের শুষ্কতা অথবা আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া আসিতেছে। কবি বায়রণের অশুভবাদ স্পর্শাক্রামক এবং পাঠকের জীবন-মনের অবসাদক। কবি শেলী যে স্থলে উহার হাত এড়াইতে পারেন নাই, সে স্থলেই তিনি নাস্তিক এবং শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তির পরিত্যজ্য হইয়াছেন।

এই ভারতীয় আদর্শে, রামায়ণ মহাভারত বিয়োগান্ত হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখবাদী বা fate-বাদী নহে—উভয় গ্রন্থই চিন্ময় মঙ্গল আদর্শে, সাংসারিক সাধারণ সুখ দুঃখের অতীত ভূমিতে, পরম উন্নত লক্ষ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রে ভারতীয় শিল্প লক্ষণ

চন্দ্রশেখর গ্রহণ করুন—চন্দ্রশেখর বিয়োগান্ত হইয়াও এইরূপে ভারতীয় শিবাদর্শেই রচিত। ওথেলো লীয়র বা হেমলেটের ন্যায় ন্যূনাধিক অস্পষ্ট-উদ্দেশ্য 'ট্রেজিক' নহে বা কেবল বিয়োগ কারুণ্য-ঘটনার রসনিষ্পত্তি উহার উদ্দেশ্য নহে।

সফোক্লিসের Ajax এর ন্যায় fate বা অপরিহার্য্য দুঃখের আদর্শ ও উহার নহে। পরম মঙ্গল্য আদর্শে, মনুষ্যত্বের বিজয়-সংবাদ বহন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতাপের মৃত্যু পরিকল্পিত। কবি স্বয়ং প্রতাপের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অমৃতধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে কৃষ্ণকান্তে উইল ও ধর্ম্মলঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত রূপ শুভ ফলশ্রুতি সিদ্ধি করিয়াই প্রকাশিত। এই গ্রন্থদ্বয়ও ইয়োরোপীয় * বা গ্রীক ট্রেজিডী নহে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে গ্রন্থের didactive purpose বা উপদেশের অভিসন্ধি বলে, ইহা তাহাও নহে। কবি জগন্মঙ্গল-তত্ত্বের অভ্রান্ত সঙ্কেত করিয়া, গ্রন্থের সমঞ্জসিত শুভ ফলশ্রুতি সিদ্ধ করিয়াই শেষ করিয়াছেন। জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ দৈন্য-পাপমৃত্যু প্রদর্শন তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; উহা মরণের কবলেও জীবনের বিজয় গাথা! গ্রীক ট্রেজিডীর সহিত ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব আভাসিত করার উদ্দেশ্যে আমরা এই কথা গুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। সাহিত্য-জগতে এই আদর্শকে এখনো আমরা ভারতীয় শিল্পিগণ যথোচিত রূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই, বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র

* বর্ত্তমানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে ইউরোপের ট্রাজিডী গ্রীক আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র বিশেষত্ব লাভ করিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের Martyrdom বা আত্মোৎসর্গ কোন কোন দিকে গ্রীক জাতির আদিম Sacrifice আদর্শের অপত্যসূত্রে উদ্ভূত হইলেও, সমগ্র মানব জাতির হিতকল্পে খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গরূপ বিশ্বগরিষ্ঠ পুণ্যপথে খ্রীষ্টান জাতির ভাব-সাধনা প্রাচীন গ্রীক আদর্শ হইতে নানাদিকে অগ্রসর। উহার গতিকে আধুনিক ইয়োরোপের ট্রাজিডীও লেখক বিশেষে স্বাতন্ত্র্য, গরিষ্ঠতা এবং অপরূপ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতেছে। ভিক্তর হুগোর Toilers of the sea, লীটনের Zanoni কিং হলকেনের Manxman প্রভৃতি এইরূপে ট্রাজিক হইয়াও গ্রীক ট্রাজিডী হইতে ভিন্ন জাতীয় মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ করিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'বাণি-পন্থায়' পাইবেন। লেখক।

নিজের শিল্পি-জীবনে যাহা করিয়াছেন, তাহাও এখন যাবৎ এ দেশেই যথেষ্ট মতে অধীত হয় নাই—য়ুরোপীয় সাহিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দূরের কথা। কিন্তু এই আদর্শের বিশেষত্বে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক—দূর ভবিষ্যতে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহার সমুচিত শিল্পরূপ প্রদর্শন করিতেপারেন, তিনি ধন্য হইবেন, আশা করা অযৌক্তিক নহে।

উপসংহারে, এই সাহিত্যিক এবং মনুষ্যত্ব-সাধক বঙ্কিমচন্দ্রকে চিন্তা করি।

উপসংহার

এই একজন মনুষ্যের অন্তর্জীবন আপনাদের সমক্ষে উদঘাটিত করিতে চেষ্টা করিলাম। আদ্যন্ত সূত্রসম্বদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ এই জীবন। কবির কাব্যকে নানাদিক হইতে দর্শন করিতে ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। কাব্যকে কবির অন্তর্জীবনের সম্পর্কে স্থাপন করিয়া পরম্পরা সূত্রে পরিদর্শন করিব, এ উদ্দেশ্যে স্বদেশীয় পরিচিত সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একজন কৃতীপুরুষের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা এবং এ সময়টুকু অন্ততঃ সদ্ভাবে ব্যয়িত হইল কিনা—আপনারাই জানেন।

এই একজন পূর্ণাঙ্গ, এবং পূর্ণবয়স্ক শিল্পী আমাদের সাহিত্য-ভূমিতে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধন-ফল অনবদ্য হইয়াছে কিনা, সে বিচার করিব না। সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা মহার্ঘ এবং অসাধারণ গুণ—আমরা তৎসমক্ষেই নতশির হইতেছি।—

নমোনমো নমো, যারা ভাবের সাধনা সূত্রে,
বাঁধিয়াছ ইহ-পরলোকে!
নমো! যারা মানবেরে জড়তা তামসী হ'তে
আনিয়াছ পুণ্য দিবালোকে!

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাঙ্গলা গদ্য। *

১২৫০ বাং
১৮৪৩ ইং জন্ম।
১৯১০ মৃত্যু।

বস্তু সংক্ষেপ।

সাহিত্যে দ্বিবিধ বিশিষ্টতা; বিশ্বাদর্শ ও স্বদেশাদর্শ—বঙ্গসাহিত্যে কালীপ্রসন্ন—সাহিত্যে সন্দর্ভকারের স্থান—শ্রাদ্ধসভার কর্ত্তব্য, স্বরূপ কথন—সাহিত্য আলোচনায় ভক্তি—কালীপ্রসন্নের শক্তি, প্রতিভা, আত্মনিষ্ঠা—বঙ্গীয় গদ্যে বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন—কালীপ্রসন্নের ওজস্বিতা, মনঃসমুন্নতি ও হৃদয়গতি—রচনা রীতির মাহাত্ম্য—বক্তৃতাশক্তি—রচনারীতির দোষ, অনম্যতা—বাহুল্য—ঋজুতা ও সহৃদয়তা—কালীপ্রসন্নের দৃষ্টান্ত—বঙ্গভাষার আর্য্যশক্তি—বঙ্গীয়গদ্যের বিভিন্নধারা—বর্ত্তমানে প্রতিভার অভাব—সাহিত্যে কর্ত্তব্যভেদ—বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য—বঙ্গীয় গদ্যের বর্ত্তমানে দোষ—গদ্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ—সংস্কৃতের সম্বন্ধচ্ছেদে ভাবীফল—প্রাকৃত বাঙ্গালার স্বল্পশক্তি—ইংরাজী গদ্যের মাহাত্ম্য—পণ্ডিতি বাঙ্গলা ও কস্মী বাঙ্গালা—কালীপ্রসন্নের ভাষা, ভাব ও জীবন সাধনা।

দ্বিবিধ বিশিষ্টতা বিশ্বাদর্শ ও স্বদেশাদর্শ

যাঁহারা প্রতিভা-মাহাত্ম্যে বিশ্বসাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছেন, জাতি বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা বিশ্বলোকে পুনর্ব্বার দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন, জাতিবিশেষ তাঁহাদের স্মৃতিসভা ঘটনা না করিলেও ক্ষতি নাই—যাঁহারা দেশকালের সংকীর্ণ সীমাচক্র অতিক্রম পূর্ব্বক নিরবধি

* এই প্রবন্ধ ১৩১৭ সনের ভাদ্র সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।

কাল এবং বিপুলা পৃথিবীতে আপনার বাস্তু-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দেশবিশেষ তাঁহাদের স্মৃতি সংস্থাপনে কৃতপারকর না হইলেও অনিষ্ট হয় না। বিপুল মানবমনের কোন-না-কোন প্রতিভা-গুণে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহাদিগকে প্রীতি-পদ্মাসন দিয়াছে, পাত্রবিশেষের সঙ্কীর্ণ অনভিমত কিংবা অনভিরুচি জনিত চেষ্টা-চর্চ্চায় তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই। আমাদের বাল্মীকি, ব্যাস কিংবা কালিদাস এইরূপে দেশকাল-জাতির সীমা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের অমর-লোকে বাস করিতেছেন, এবং ব্যক্তিগত রুচি-চর্চ্চার সমক্ষে অধৃষ্য হইয়া আছেন।

বিশ্বসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, যাঁহারা দেশবিশেষে কিংবা জাতিবিশেষে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি ভাব অথবা মহিমা আনয়নে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—তাঁহারাও ধন্য। তাঁহাদের স্থান পূর্ব্বোক্ত বিশ্ববাসিগণের নিম্নে হইলেও, তাঁহারাও অমরযোনি। বাঙ্গালী এযাবৎ বিশ্বসাহিত্যের সভায় কোন সমুৎকৃষ্ট উপঢৌকন উপস্থিত করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহার এখনও নিশ্চয় হয় নাই। এই পরাধীন জাতি এখনও বিশ্বমণ্ডলীর সম্যক্ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও পারে নাই। সৌভাগ্যবান্ হরপ্রসাদ আকস্মিক শুভক্ষণে প্রাচীন ঋষির পদতলে বসিয়া 'বাল্মীকির জয়' রচনা করিয়াছিলেন। আজ ঐ গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া বঙ্গবহির্দ্দেশে—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিমে, বিশ্বসাহিত্যের মিলনস্থলী ইংলণ্ডে—শত শত সহৃদয় কর্ত্তৃক সাগ্রহে পঠিত এবং অভিনন্দিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের সমালোচক প্রফেসর ডাউডেন ঐ গ্রন্থের, শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন সেন কৃত প্রসিদ্ধ অনুবাদ পাঠে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সগৌরবে স্মরণীয়। 'বাল্মীকির জয়'কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"It widens the horizon of our western imagination অর্থাৎ 'বাল্মীকির জয়' আমাদের প্রতীচ্য কল্পনার দৃষ্টিসীমা

প্রসারিত করিয়াছে।' ইহা আমাদের সামান্য গৌরবের কথা নহে। যে গ্রন্থের কোন অপূর্ব্ব এবং মহনীয় ভাব-সংবাদ বিজাতীয় ভাষা-পথেও নিজের মাহাত্ম্য সম্যক্ রক্ষা পূর্ব্বক সৌন্দর্য্য এবং শিল্পগুণে বিদেশীর হৃদয়ে প্রীতির উচ্ছ্বাস জাগাইতে পারে, সে গ্রন্থই বিশ্বগৃহে প্রবেশের অধিকারী। উহার কর্ত্তাই অমর পদবা আশা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। আবার অন্যদিকে কোন বিজ্ঞ ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—"In Literature three years is boom; thirty years fame; three hundred immortality; and three thousand is Homer.—সাহিত্যে তিন বৎসরের প্রতিপত্তি, বাজার আওতা মাত্র, ৩০বৎসরের প্রতিপত্তিকে সুখ্যাতি বলিতে পারি; তিন শত বৎসর—অমরতা; ৩ হাজার বৎসর—হোমর।

এই বাক্যের প্রধান সারবত্তা এই যে, অনির্ব্বচনীয় অনুপ্রাণনা এবং শিল্প-প্রতিভার বহুরূপী গুণে যুগে-যুগে মানবহৃদয়কে যুগোপযোগী সৌন্দর্য্য প্রকাশে মুগ্ধ করিতে পারাই সাহিত্যে অমরতার প্রধান লক্ষণ।

বলা বাহুল্য, অদ্য যে স্বর্গগত পুরুষের স্মৃতি সভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি কিম্বা নব্যবঙ্গের কোন লেখক, পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ পণ্ডিতের প্রদর্শিত পরিমাপে হোমর বা অমর হইবেন কিনা, তাহা বর্ত্তমানে নিরূপণ করা আমাদের সাধ্য নহে। তবে এই কথা নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে, অদ্য হইতে শতাব্দী পরেও প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা, কিংবা ভ্রান্তিবিনোদের রচয়িতার নাম বঙ্গীয় পাঠকের অথবা লেখকের সাদর স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবে না। যিনি বঙ্গবাণীর কণ্ঠে আপন চিত্তসঞ্জাত উজ্জ্বল-শুভ্র সন্দর্ভ-মুক্তাহার পরাইয়াছিলেন, তাঁহাকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি এবং

বঙ্গসাহিত্যে কালীপ্রসন্ন

ঐশ্বর্য্যে বহুমাননী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুক্তা হীরকের ন্যায় দীর্ঘজীবী বা বহুমূল্য হইবে কিনা, তদ্বিষয়ে বিচার করা আমাদের প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেই মুক্তা অকুণ্ঠিত উজ্জ্বলতায় মাতৃকণ্ঠে শোভা পাইতেছে; রসজ্ঞ পাঠক বা বঙ্গীয় লেখক মাত্রেই দীপ্তি এবং ওজস্বিতা লাভার্থে তাহার সম্মুখীন হইতেছেন এবং উহা হইতে নানা মতে উপকৃত হইতেছেন। 'যঠ্কারক' অথবা 'প্রমোদলহরীর' রচনা প্রণালী প্রাচীন বঙ্গ-দর্শন এবং বান্ধবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরঙ্গ হইতে তিরোহিত হইতে পারে; কিন্তু ভ্রান্তিবিনোদ বা নিভৃতচিন্তা প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত প্রথা, এমন কি, উঁহাদের ভাবতত্ত্ব যে এখন যাবৎ পরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত লেখকগণের রচনাতেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্যে সন্দর্ভকারের স্থান

সাহিত্যক্ষেত্রে বস্তুভিত্তিবিহীন কাব্যশিল্প, অথবা দর্শনভাব-গত ক্ষুদ্র কবিতা কিম্বা সন্দর্ভাবলীর পক্ষে নিয়ত এই বিপদ সম্ভাবনা আছে যে,উহারা পরবর্ত্তী সমর্থতর ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্বর্ত্তিত এবং অতিক্রান্ত হইতে পারে; অস্থিরবৃত্তি কিংবা অত্যন্ত সাধারণ আতসবাজীর দ্বারাও বিপরিণত হইতে পারে। এ কারণেই ইংলণ্ডের টমসন এবং কাউপার বহুমতে ওয়ার্ডসোর্থ, শেলী, এবং কীট্সের ছায়ায় পড়িয়াছেন। এমন কি, কাহারও মতে, অতুলনীয় বেকনও নাকি সন্দর্ভ-সাহিত্যে হেল্পস্‌সাহেবের ছায়ায় পড়িয়াছেন! অপর পক্ষে, নিজস্ব বস্তু-সংঘটনার স্বাধীন শিল্পগুণে, ব্যাস বাল্মীকি কিম্বা হোমর, সেক্সপীয়র অথবা কালিদাস, হয়ত পরবর্ত্তী কর্ত্তৃক বহুরূপে প্রচারিত এবং বহুদোষানুঘ্রাত হইয়াও,কালে কালে বর্দ্ধমান যশে সমুজ্জ্বল হইতেছেন! স্থায়ী সাহিত্যের প্রধান গুণ যে কর্ত্তার নিজস্ব বস্তুঘটনা, সাহিত্যের এই

উজ্জ্বল স্বতঃ-সিদ্ধ সত্যও বর্ত্তমানে সকল সভ্যসাহিত্যেই একদল শিল্পী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেছে—মনে হয় অসমর্থতার কারণেই অবজ্ঞাত হইতেছে। তাই, এ জাতীয় সাহিত্য-শিল্পীগণ ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জর্ম্মনীতে Decadents, Sentimentalists নামে চিহ্নিত এবং অবজ্ঞাত হইতেছেন। তবে, সন্দর্ভ-সাহিত্যের বিষয়ে এই সত্য নির্ভয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে, উহা যে দর্শন, রীতি অথবা আনন্দেরগুণে একদিন সমাজের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, সমাজ যদি তদবস্থাকে নির্ব্বিশেষে পশ্চাৎ করিয়া উন্নত সোপানে আরোহণ না করিতে পারে, তবে উহার প্রতিপত্তি কোন-না-কোনরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। উক্তরূপ বিচারে নিঃসংশয়ে বলিব, কালীপ্রসন্নের রচনায় যে শক্তি, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ এবং দর্শনের কৃতিত্ব আছে, বঙ্গীয় সহৃদয় সমাজ তৎপ্রতি শতবৎসরেও বীতশ্রদ্ধ হইতে পারিবে না।

প্রভাতচিন্তা প্রভৃতি গ্রন্থের আনন্দ-মতি ভাবুক কালীপ্রসন্ন ঘোষের জীবনযাত্রা বিবরণী এখনো সম্যক্ অপ্রকাশিত। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক এই বহুকর্ম্মা পুরুষের কৃতার্থতার ইতিহাস পাঠে কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবেন। যে বালক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বঙ্গদেশবাসী হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার সেই সামর্থ্যের অন্তরালে পিতৃমাতৃ-ঋণ, অথবা স্বদেশ স্বজাতির সহায় ঋণ, অথবা পুরুষকার কি পরিমাণে বলীয়ান্ হইয়াছে, তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ, অদ্য আমরা সাহিত্য-সহানুভূতি বশেই সমবেত—সুতরাং সাহিত্য-সেবী কালীপ্রসন্নই অদ্যকার দেশ-দেশান্তরবাসী বাঙ্গালীর চিন্তনীয় হইতেছেন। সাহিত্যিক কালীপ্রসন্নের স্বরূপ এবং বঙ্গসাহিত্যে অবস্থান নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াই আমরা অদ্যকার কর্ত্তব্য শেষ করিব। অন্ততঃ সাহিত্যসেবীর বিষয়ে কোনরূপ অত্যুক্তি, বা স্মৃতিসভা-সুলভ সাধারণ হাহাকার প্রণালীর

আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমাদের মন সহজে অগ্রসর হয় না। একদিন আমরা এ স্থানেই, বাণিপুত্র নবীনচন্দ্রের স্মৃতিসভায়, তাঁহার কবিহৃদয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া, এবং তাঁহার উদ্দেশে অতিশয়োক্তির চেষ্টা করি নাই বলিয়া, কেহ কেহ সভাভঙ্গে আমাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, 'উচিত কথায় যেমন দেবতা তুষ্ট' হ'ন, তেমনি অমরলোক-প্রাপ্ত কবি এবং সাহিত্যিকগণও সত্যবাক্যে এবং গুণকর্ম্মজ্ঞাপক অন্বর্থবাক্যেই সন্তর্পিত হইয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা ঋত-পায়ী; তাঁহাদের জীবন এবং প্রতিভাবিষয়েও সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনদায়িত্বময় এবং মহার্ঘ ব্যাপারটিই স্বরূপ কথন! উক্ত প্রণালীতেই তাঁহাদের ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধকার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ হইতে পারে। অধিকন্তু, এইরূপ শ্রাদ্ধসভা, বরং মৃত অপেক্ষা জীবিতের সমধিক উপকার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যাঁহারা শুভ চিন্তার দায়সূত্রে, পৃথিবীতে মরিয়াও চিন্ময় আনন্দের পুরীমধ্যে অমর থাকিয়া যান, তাঁহাদের ওই আনন্দকর্ম্মের স্বরূপকথাই কি শ্রদ্ধাবিজ্ঞাপণে পর্য্যাপ্ত হয় না? সংসারে পরের মনে অকৃত্রিম আনন্দদানের সৌভাগ্য কোটীর মধ্যে কয়জনেই বা লাভ করিয়া যাইতেছেন? আমরা কোটী কোটী মনুষ্য কি নিয়ত নিজের স্বার্থে, ফলতঃ [ভক্ত কবি রামপ্রসাদের কথায়] "ভূতের বেগার খাটিয়া খাটিয়া" পরিশেষে রিক্তহস্তে এই সর্ব্বংসহা ভূমির ধূলিতলে অদৃশ্য হইতেছি না? আমাদের মধ্যে যিনি, ক্ষণকালের জন্যও মনুষ্য হৃদয়কে নির্ম্মল আনন্দে অভিষিক্ত করিবার উপকরণ রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনি উক্ত একমাত্র গুণেই কি বরেণ্য ও শ্রদ্ধেয় নহেন? সাহিত্যিকের পক্ষে এইরূপ একমাত্র গুণের নির্দ্দেশেই কি তাঁহাকে গড্ডলিকার প্রবাহ হইতে বিশিষ্ট ও সম্পূজিত করিলে যথেষ্ট হয় না?

সত্য অতিশয়োক্তি হইতে অনন্তগুণে বৃহৎ ও বরণীয়! সত্য যেই রসে হৃদয় অধিকার করে, তাহা কি অনন্ত সত্যস্বরূপের প্রতিভাসে গরিষ্ঠ নহে?

এ স্থলে আরও বলিতে চাই যে, আমরা কালীপ্রসন্নকে 'বঙ্গসাহিত্যের রাজা' অথবা 'সাহিত্য-সম্রাট' প্রভৃতি নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক, এবং দোকানদারীর বাক্যে ও লাঞ্ছিত করিতে চাহি না। প্রথমতঃ সাহিত্যকে শক্তিতন্ত্র বলিতে পারা গেলেও, উহা কদাপি রাজতন্ত্র নহে। সাহিত্যের অনন্ত শক্তি কোন সঙ্কীর্ণ দেহধারীর মধ্যেই রাজার ন্যায় কেন্দ্রিত হইতে পারে না। এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাকাব্যের অনন্ত বৃদ্ধ কবি যিনি, কেবল সেই সর্ব্বশক্তি-মান্‌কেই সাহিত্যের রাজা বা সম্রাট বলিয়া নির্ভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উক্তরূপ নিঃশঙ্ক বাক্যবিন্যাস যে বক্তাকে কি পরিমাণে বিগর্হিত এবং ক্ষুদ্রচেতা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, অথচ বাক্যের উদ্দিষ্ট শক্তিধর ব্যক্তি-কেও কি পরিমাণে উদ্বেজিত এবং লজ্জিত করে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা ব্যথা অনুভব করি। উহাতে প্রকারান্তরে নিরীহ ব্যক্তিকে ইতর সাধারণের বিদ্রূপ এবং দোষচর্চ্চার লক্ষ্যরূপে স্থাপিত করা হয়—বন্ধুর কার্য্য কোন মতেই হয় না। প্রতিভা চিরকাল সরল অথবা শক্তিহীন ভক্তের সমক্ষে নিরবচ্ছিন্ন মহামহিমতায় প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু যিনি প্রকৃত প্রতিভাবান্, তিনি বিশ্বসাহিত্যের বিশালতা ও উহার উন্নতিসীমা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন; সাহিত্যে কালে কালে কি পরিমাণ বিত্ত অর্জ্জিত হইয়াছে, স্বয়ং কোন অংশে কি পরিমাণে নূতন অর্জ্জন অথবা আবিষ্কার করিয়া গেলেন, উপরন্তু সম্মুখে সম্ভাব্যতার বক্ষে অনন্ত সত্য এবং সৌন্দর্য্য-মহাসিন্ধুর কি পরিমাণ অগম্য রহিয়া গেল, তিনি তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। তাদৃশ অত্যুক্তি-স্তুতিবাদে তাঁহার হৃদয়টিই সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহী হওয়া স্বাভাবিক।

তবে, আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে এবং সেই ভক্তি-অর্জ্জনে আয়াস স্বীকার করিতেও

সাহিত্যালোচনায় ভক্তি

লজ্জিত হইব না। কারণ, যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে, ভক্তিই মনুষ্যকে দেব-মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দানে সমর্থ; ভক্তের হৃদয়েই শতদলবাসিনী বাগেবী স্ব-রূপে প্রকাশিত হন। সর্ব্বপ্রকার প্রতিভা বিষয়ে সাহিত্যসেবীর যাহা করণীয়, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে বক্ষ্যমানরূপে প্রকাশিত—প্রতিভার সমক্ষে আদিতেই দোষ-বিচার লইয়া বা অপ্রণয় বুদ্ধি লইয়া যাইও না। প্রথমে তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা কর; তাহার মাহাত্ম্যে হৃদয় পূর্ণ কর; তাহাকে উপভোগ কর; ক্রমে, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দেখিবে, সে নিজেই স্বকীয় দোষ উদ্‌ঘাটিত করিতেছে এবং তোমাকে আত্ম দৃষ্টান্তে সাবধান করিতেছে! সাহিত্যে উন্নত প্রতিভার সঙ্গ মাত্রেই হৃদয়ের কলুষক্ষয়কারী এবং পুণ্যানুবন্ধী তীর্থস্নান! এইরূপে প্রতিভার দায়াদ হইয়া সমুন্নত দেশে এবং কালে জন্মগ্রহণ করাই পরম সৌভাগ্য।

কালীপ্রসন্নের ভাবসম্পত্তি পূর্ণরূপে লাভ করিতে হইলে কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সেবাপরিপ্রশ্নের আবশ্যক। তাহার কারণ, তিনি আপন চিত্ত-তত্ত্বের বশ্যতায়, স্বকীয় ভাবনার রীতি অনুসরণেই, ভাবকে ব্যক্ত করিয়াছেন; পরের বাক্য-ভঙ্গী ও পরকীয় রীতির পরিহারপূর্ব্বক আত্ম প্রকাশের উদ্দেশ্য করিয়াছেন। বিমুখের জন্য, অপ্রণয়ীর জন্য, বা সাধারণ্যে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ও লিখেন নাই। কোন্ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই বা লিখিয়া থাকেন? পরন্তু, প্রতিভার একটা প্রধান লক্ষণ আত্মনিষ্ঠা। কালীপ্রসন্নের রচনার স্থির গতি এবং স্থির শক্তির মধ্যে রীতি-প্রতিভার এই অসাধারণ গুণ দেখিতে পাইবেন। এই আত্মনিষ্ঠার কারণেই প্রতিভা যেমন অপরিচিত বা অপ্রণয়ীর সহজগম্য নহে, তেমন ঐ কারণেই

প্রতিভাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে সময়ের আবশ্যক হয়; উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে পাঠককেও শিষ্যত্ব-সাধনার আশ্রয় করিতে হয়। অন্যথা, তাহার সদরদ্বারে উক্তরূপ আত্মনিষ্ঠা হইতেই প্রবেশ-[illegible] এবং নিষেধ-হস্তের ব্যবস্থা আছে। আমাদের সাহিত্যের প্রথম প্রভাতে মধুসূদনকে বুঝিতে সময় লাগিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতেও সময় লাগিয়াছে; কালীপ্রসন্নকে বুঝিতেও কিঞ্চিৎ সাধনার আবশ্যক। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন, ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যের মহাপ্রবাহ আনিয়াছেন; প্রত্যেকে স্বকীয় হৃদয়ের বিশিষ্ট রসেও এ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। যে বাঙ্গালী সমুদ্রের বার্ত্তা শ্রবণ করিতে চাহেন, তিনি অকুটিল এবং অপ্রমত্ত চিত্তে এই সকল মহাপ্রাণ মনুষ্যের মানস-সরোবরে অবগাহন করিবেন, নিজের হৃদয়ে ইঁহাদের আনন্দ-লহরীময় প্রাণকম্পন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

শিল্পকলা ও দর্শন—এই দ্বিবিধ পথেই মনুষ্য চিরকাল ক্ষুদ্রতার সীমাগণ্ডী অতিক্রমপূর্ব্বক অসীমের অনুভব-ভূমিতে উপনীত হইতে চাহিতেছে! সাহিত্যে সর্ব্ববিধ শিল্পকার্য্যের জন্যই স্থান আছে; কিন্তু উহার গুণ-গৌরব এবং মাহাত্ম্য চিরকাল আভ্যন্তরীন অনন্ত-স্পর্শিতার বিচারেই নির্দ্ধারিত হয়।

সাহিত্যে গৌরব নির্ণয়

সাহিত্যে শিল্প-উপার্জ্জনের জাতিভেদ-বিচার-চিরকালই প্রবল, এবং অন্তরে অন্তরে সকল সভ্যসাহিত্যেই অনুসৃত। ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি কিংবা ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের প্রতিকৃতি, শিল্পীর নৈপুণ্য গণনায় দু'টাই সমান আদরে রক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত মাহাত্ম্য কাহার? গুণীগণ-গণনারম্ভে কঠিনী সুসম্ভ্রমে কাহাকে নির্দ্দেশ করিবে? শিল্পের প্রকৃতিগত ভাবের উচ্চতা, অপূর্ব্বতা এবং অনন্তস্পর্শিতার গণনাতেই লেখক বিশেষের বা সাহিত্য-বিশেষের আসন বিশ্বসাহিত্যে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গসাহিত্য গদ্যবিভাগে নবজীবনের শৈশবেই দুইজন কৃতী পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা বাঙ্গালীকে অসীমের তত্ত্বে দীক্ষিত করিবার জন্য চিরজীবন অস্খলিত সাহিত্য-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সে দুইজন যে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র, তাহা বঙ্গবাসী বিনা বিচারেই স্বীকার করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র কবিগুণ সম্পন্ন শিল্পী; তিনি আকৃতি প্রকৃতির ভিতর দিয়া মহানকে এবং অব্যক্তকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর বা প্রতাপের মধ্যে মনুষ্যত্বপথে সেই অসীমের অনুভব-ভূমিতে উঠিতেই চেষ্টা করিয়াছেন কালীপ্রসন্ন কবিগুণ-সম্পন্ন দার্শনিক; তিনি তারা ও ফুলে, সাহিত্যে ও জাতীয় বিকাশে, প্রজা ও রাজশক্তিতে, ভক্তিতে এবং রস-পরিহাসে, প্রভাতে সন্ধ্যায় নিশীথে, সজনে ও বিজনে, ইহকালে ও পরকালে, চিন্তা এবং ভাবুকতার পথে সেই অসীম অব্যক্ত এবং অমৃতকেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন! বঙ্গ সাহিত্যে, বাঙ্গলা গদ্যে সমুন্নত অথচ বীর্য্যপৌরুষযুক্ত ভাবুকতার উচ্ছ্বাস-ধারণায় কালীপ্রসন্নই অগ্রণী!

সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম এবং পূজ্যতম পদার্থ লেখকের হৃদয়।

কালিপ্রসন্নের ওজস্বিতা, মনঃসমুন্নতি ও হৃদয় গতি

যে লেখক উদার হৃদয় পাইয়াছেন ও তাহাকে অনাবিল ভাবে প্রকাশ করিবার ভাষা পাইয়াছেন, সাহিত্যে তাঁহারই জয়। বুদ্ধি যেস্থলে 'সপ্তপক্ষ' বিতর্ক বিচারে হয়ত বক্রগতিতে অগ্রসর হইবে, হৃদয় সেই অজ্ঞাতদেশে আকস্মিক তড়িৎ-প্রবৃত্তি বশে—যেন অনায়াসে উপনীত হয়! এই কারণে, প্রতিভার 'জাতি' চিরকাল হৃদয়-ধর্ম্মের বিচারেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কালীপ্রসন্নের বুদ্ধিও সর্ব্বথা হৃদয়ানুসারিণী ছিল। প্রভাত চিন্তা,

নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা বা ভক্তির জয় প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বত্র সেই বিপুল, ওজস্বী এবং তড়িৎ-বিভাসী হৃদয়েরই পরিচয় পাই! ওই হৃদয় একদিকে যেমন শিশুর মত সরল, অন্যদিকে তেমনই গহন-প্রবৃত্তি এবং রাজশ্রীতেই সমুন্নত ছিল। তাঁহার ভাষা একদিকে যেমন সরল ও ঋজুগতি, অন্যদিকে তেমনই জ্যোতির্বিলসিত বিপুল আবর্ত্তে কল্লোলিনীর মত ছুটিয়া চলিত! তাঁহার হৃদয় কিংবা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা, সংন্যাসীর হৃদয় অথবা শুষ্ক বৈরাগীর আধ্যাত্মিকতা নহে—অপরূপ জ্ঞান-কর্ম্মে, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যে উল্লাসী, অপ্রমত্ত অথচ সুখী, ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা! তিনি জ্ঞানী হইয়াও বৈরাগ্য-বিলাসী কিম্বা দুঃখবাদী নহেন। আবার, রামই তাঁহার প্রিয় আদর্শ; যুধিষ্ঠির নহেন; সুতরাং তিনি রামায়ণে প্রেমের পরাকাষ্ঠা এবং মহাভারতে ও প্রেমের অভাব দেখিয়াছেন! এই কারণেই, তাঁহার হৃদয় বিশ্বময় অমৃত-ত্বের অন্বেষণে এবং প্রত্যক্ষীকরণে ধাবিত হইয়াছিল; ঐহিক অমরতার স্বপ্নেও বিস্ফারিত হইয়াছিল! বঙ্গ সাহিত্যে এবং এতদ্দেশের মৃত্তিকায় এই প্রকৃতির হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতা নূতন! উহা হয়ত সর্ব্বদিকে সর্ব্বরূপে প্রস্ফুটিত ও পূর্ণাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই; ভবিষ্যতের সৌভাগ্যবান্ সাধকের অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে ইহা নূতন। ইংরাজী সাহিত্যে এ জাতীয় ভাষাপদ্ধতির পরিচয় পাই মিলটনে ও বার্কে; এ জাতীয় ভাবনা পদ্ধতির পরিচয় পাই—কার্লাইলে এবং এমার্সনে। উহা পাশ্চাত্য আর্য্য পণ্ডি-

রীতির মাহাত্ম্য

তের প্রকৃতি! যাঁহারা এই জাতীয় রচনার স্রোতোমুখে পতিত হন, তাঁহা-দের পক্ষে তৎকালের জন্য নির্ব্বিচারে উহারই প্রাবল্যবশে লেখকের উদ্দিষ্ট দেশে পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, ইহাই প্রতিভার শক্তি; প্রতিভা এ গুণেই যেমন সূক্ষ্মদর্শী রসজ্ঞের, তেমন আপামর সাধারণের

পূজালাভ করিতে এবং ঐহিক অমরতায় অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে। এই হৃদয়ধর্ম্মেই কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া তাঁহার আসন সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে নির্ব্বিশেষে শুনিয়াছি, অন্বর্থ এবং উল্লসিত

বক্তৃতা শক্তি

ত্বরিত বাক্যঘটায় হৃদয়কে তদ্গত আনন্দে অধিকার করিতে বঙ্গভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা শ্রবণের পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টি-স্মৃতি-সভায় কালীপ্রসন্ন সভাপতিরূপে কলিকাতায় আহূত হন। সে সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানীর সমস্ত প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র একবাক্যে বঙ্গভাষার এই অপূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্য শক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন; ইহা কালীপ্রসন্নের সামান্য গৌরব বা প্রতিপত্তির কথা নহে।

কালীপ্রসন্নের হৃদয় নিয়ত ভাবের উচ্চগ্রামে বিচরণ করিতেই

রচনা রীতির অনম্যতা

স্ফূর্ত্তিলাভ করিত—তাঁহার কণ্ঠও তার-স্বরে বিলসিত হইত। এই প্রণালী যে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছে, এমন বলিব না। এই কারণে, 'ধ্রুপদের কণ্ঠে টপ্পা'র ন্যায়, তাঁহার নর্ম্ম কৌতুক অনেক স্থলে বিপ্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে; এই কারণেই জুগুপ্সিত অথবা প্রাকৃত বিষয়ে কালীপ্রসন্নের হাস্যরসিকতা অনেক স্থলেই স্থূলবৃত্তি এবং মাতঙ্গগামিনী। কিন্তু যখন অধর্ম্ম, অত্যাচার অথবা পাষণ্ডতার প্রতি ওই হৃদয় উত্তেজিত হইয়াছে, তখনই ঘৃণা-তীব্র, শাণিত-বাক্যবাণ-বর্ষী কোদণ্ডটঙ্কারে তাঁহার কণ্ঠ অপূর্ব্বভাবে পরিস্ফূরিত হইয়াছে! তিনি কখনও গৌরবের আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতের

ভূমিতে নামিয়া আসিয়া, স্থূল রসিকতার লোভে হাস্য পরিহাসে যোগদান করিতে চাহেন নাই। বিগর্হিত বিষয়ে কোনরূপ সাময়িক অনুবৃত্তি, অথবা দাক্ষিণ্যের প্রণালীও তাঁহার ছিল না।

কালীপ্রসন্নের রচনাও যে সর্ব্বত্র চরিতার্থ হইয়াছে, উহা যে আত্মনিষ্ঠায় সকল সময় ঋজু, সুষম এবং সৌষ্ঠব যুক্ত বা বাহুল্য-বর্জ্জিত হইয়াছে, এমন নির্ভয় বাক্য আমরা উচ্চারণ করিতে পারি না। ভাবুক কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ও ছিলেন; এ কারণে তাঁহার রচনায় সময় সময় অলঙ্কার-বাহুল্য এবং অভিনয়-দোষ স্পর্শ করিয়াছে। বাগ্মী লেখনী ধারণ করিলে অনেক সময় অভিনয় অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার এই দোষ শক্তির দোষ, বাহুল্যের দোষ, অসামর্থ্যের নহে।

বাহুল্য

অপরপক্ষে, উক্ত কারণে তাহার 'প্রমোদ-লহরী' ও হয়ত যথেষ্ট মতে তীক্ষ্ণ কিংবা মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে নাই। তবে, তাহার কৌতুক-প্রথা কেবল 'ভণ্ডামী' 'জ্যাটামী' বা পরিহাস নহে। তাঁহার প্রমোদ-চেষ্টা যে সমুন্নতবুদ্ধি, উন্নতভাব-রসিক ব্যক্তির ক্ষণিক কটাক্ষ মাত্র, ভ্রান্তিবিনোদের সর্ব্বত্র উহার পরিচয় পাইতেছি। আবার, তাঁহার শক্রতা অথবা বিপক্ষতা, ঘৃণা-অবজ্ঞার সূক্ষ্মশল্য ও বহন করে না; নিজের অনভিমত বা বিরুদ্ধ মত ঋজুবাক্যে প্রকাশ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সকল বিষয়ে তাঁহার নিরাবিল সহৃদয়তা, সাহিত্যসেবীর প্রতি তাঁহার সদয় সহানুভূতি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি সাহিত্যের অত্যুন্নত আদর্শে, বঙ্গভাষার নিষ্কলঙ্ক মানসী মূর্ত্তি-ধ্যানে তদ্গত থাকিতেন, তথাপি সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-সেবীর প্রতি তাঁহার পরমস্নেহ-

ঋজুতা ও সহৃদয়তা

আনুগুণ্য এবং পক্ষপাতিতার পরিচয় ভূরিভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যসেবীর অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। স্বর্গগত নবীনচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি ক্রমে এত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ মাত্রকেই অপদার্থ জ্ঞানে, স্পর্শও করিতেন না। নবীনচন্দ্রের এই অভিযোগের কারণ ছিল কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিব না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, সাহিত্যসেবিগণের, বিশেষতঃ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির আত্মাভিমান এক রূপ সাধারণ ঘটনা। যে আত্মনিষ্ঠার গুণে প্রতিভা অজ্ঞাতলোকে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের জন্য অপূর্ব্ব রত্নসম্ভার আবিষ্কার করে, সে আত্মনিষ্ঠাই পদে পদে আত্মাভিমানে এবং আত্মম্ভরিতায় বিপরিণত হইতে পারে। দেশবিদেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের জীবনী হইতে ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। সমসাময়িক কবিগণের প্রতি শেক্সপীয়র বা ওয়র্ডসোয়ার্থের কোনই সদ্ভাব ছিল না। বায়রণ কীট্সের বিষয়ে, জনসন মিলটনের বিষয়ে, সার্লোটীব্রন্টি জেন অষ্টিনের বিষয়ে, বিকন্সফীল্ড থেকারের বিষয়ে, কর্ণিলী রেসাইনের বা আমাদের রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বিষয়ে কি কহিয়াছেন? জর্জ বরো ও পীকক্, উভয়ে একমত হইয়া স্যার ওয়াল্টার স্কটএর বিষয়ে, কিম্বা রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং পরস্পরের প্রতি কি অভিমত পোষণ করিতেন? বলা বাহুল্য, গ্যাঠে এবং সুইনবার্ণের মতন পরগুণগ্রাহিতা সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্লভ। ক্ষুদ্র বঙ্গসাহিত্যে ইতিমধ্যেই আমরা যেইরূপ প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, পরমত-অসহিষ্ণু এবং আত্মগুরী হইয়া পড়িতেছি, মাৎসর্য্যের সেই সংযত এবং অসংযত সহস্রবিষদংশনে কালীপ্রসন্নের দৃষ্টান্ত অমৃত-লেপের ফল প্রসব করিবে।

বঙ্গভাষা এখন নানা সাহিত্য ও প্রতিভার সংসর্গে বহুমুখী হইয়া

কালীপ্রসন্নের দৃষ্টান্ত

প্রবাহিত হইতেছেন ; কাব্যে সঙ্গীতে, ইতিহাসে উপন্যাসে, দর্শনে এবং সন্দর্ভে বঙ্গভাষা এখন নানা মূর্ত্তি ও প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আপনার সাফল্যকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় যে কৃতী পুরুষ অজ্ঞাত শক্তিসামর্থ্যের এবং ওজস্বিতার দৃষ্টান্ত-সংবাদ বঙ্গবাসীর দ্বারে উপস্থিত করিয়া চিরতরে অদৃশ্য হইলেন, তাঁহার স্মৃতিসভায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত সাহায্যে বঙ্গভাষার শক্তি এবং বঙ্গসাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ পন্থা-নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে, আশা করি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি স্বয়ং এ সাহিত্যের শক্তি-সাধন করিয়া, উহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি বিষয়ে অতন্দ্রিত ভাবে সেবা-তৎপর থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে, আমরা উত্তরাধিকারী কি

বঙ্গভাষার আর্য্য শক্তি

পরিমাণে লাভবান্ হইতে পারি, উহার বিচার করা কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষার শক্তির আদিম গোমুখীধারা কোথায় ? বঙ্গসাহিত্যের লেখকগণ কোনদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন ? বঙ্গভাষা, নিঃসন্দেহে, নানা ভাষার শক্তিসঙ্গমে, নানা বাক্যরীতির গুণসাধর্ম্ম্যে শক্তিমতী হইয়াছেন। রামমোহন রায় ও টেকচাঁদ, বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার বা কালীপ্রসন্ন, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ বা কৃষ্ণপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র চন্দ্রনাথ বা হরপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা নব্য লেখকগণ, যে স্বরগ্রামে এবং বাক্য প্রণালীতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা এক নহে— এক প্রকৃতিও নহে ; প্রত্যেকেই আত্মনিষ্ঠায় ভাবপ্রকাশের ন্যূনাধিক নব পন্থায় অগ্রসর

বঙ্গীয় গদ্যের বিভিন্ন ধারা

হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য প্রত্যেকের দ্বারাই উপকৃত। একদিকে এই ভাষা যেমন স্থির ধীর এবং আর্য্য শব্দ-বহুল ওজস্বী তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি সহজ

সরল এবং প্রত্যক্ষ-পরিচিত বাক্যচ্ছটায় পরিস্ফুরিত হইতেছে! আবার, তেমনই মিষ্ট-মধুর মন্দক্রান্তা গতি অবলম্বনে, কঙ্কণ কিঙ্কিণীর ঝঙ্কারে, সুখিনী এবং প্রমোদিনী হইয়াও চলিতেছে! একদিকে যেমন অরুন্ধতীমন্ত্র বা গায়ত্রীচ্ছন্দের ন্যায় পরমার্থ-সঙ্কেতী, শাণিত-মার্জ্জিত এবং সংযত বাক্য তন্ত্রে এই ভাষা বহুপূজ্যা হইতে পারেন; অন্যদিকে তেমনি সঙ্গত অলঙ্কারে, শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের প্রভাব-গৌরবে রাজরাণীর ন্যায় বরণীয়া হইতে পারেন; অপরদিকে তেমনি, পরস্পর-দ্বন্দ্ব সৌন্দর্য্য এবং অলঙ্কারের রণনশিঞ্জনে, কমনীয় গুণে এবং অলসপদবিন্যাসে উর্ব্বসীর মতই মোহিনী হইতে পারেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সুস্থির আর্য্যপদ বিন্যাসে, সরল ভাবরসের বিকাশে চেষ্টা করিয়াছেন; কেশবচন্দ্র প্রভৃতি বাগ্মী এই ভাষাকে দ্রুতবিলম্বী এবং ভক্তি-উজ্জ্বলিত হৃদয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন; কালীপ্রসন্ন এই ভাষাকে উভয়গুণের সম্মিলনে—ভাবুকতায়, উজ্জ্বল ভূষণপ্রভায় এবং গৌরব-গর্ব্বে বহুমানিনী ও অধৃষ্যা শক্তিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সে শক্তিকেই বিরাট মূর্ত্তিতে এবং পরিচ্ছদে, বিপুল বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত এই ছায়ালোকময়, সুখদুঃখময়, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এবং আলস্য বিলাসময় সপ্তকোটী বঙ্গবাসীর হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া, উহাকে 'সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা' রূপে, 'বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি' রূপে উদাত্তভাবে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকগণ, নানাভাবে, তাঁহাকেই নিত্য এবং নৈমিত্তিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক, পরিচিত এবঞ্চ অপরিচিতের সন্ধিভূমে কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার 'ভুবনোমনোমোহিনী' রূপ-স্বপ্ন দেখিতেছেন! ইঁহারা প্রত্যেকেই বহুরূপী বঙ্গসরস্বতীর সেবায়, অলঙ্করণে এবং পরিবর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিই নিবিষ্ট অধ্যয়নে, বাক্য বিন্যাসের অন্তরালে এ সমস্ত বাণি-সাধকের হৃদয়স্পর্শ অনুভব করিয়া

ধন্ত হইতে পারেন; এবং উত্তরাধিকার স্বত্বের সুব্যবহার পূর্ব্বক সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে লাভবান্ হইতে পারেন।

বাঙ্গালীরপক্ষে এখন সঞ্চিত সম্পত্তির শক্তি-প্রকৃতি-বিচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। উপার্জ্জনক্ষম প্রাচীন বরেণ্যগণ একে একে আমাদিগকে পশ্চাৎ করিয়া অন্তরিত হইতেছেন। এই এক মাসেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শেষাবশিষ্ট পূজ্য-বৃদ্ধ কালীপ্রসন্ন ও চন্দ্রনাথ অন্তর্হিত হইলেন; নবীনগণের অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্যে শান্তি নিকেতনের আশ্রয় লইয়াছেন এবং সাহিত্যাচার হইতে ক্রমেই হস্ত সঙ্কুচিত করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ-রঙ্গে অভিনয়-যোগ্য নাট্যগ্রন্থ রচনায় তৎপর হইয়াছেন। বর্ত্তমানের অবস্থা সবিশেষ আশাপ্রদ নহে। স্ফুট-প্রতিভার স্থিরজ্যোতি কুত্রাপি লক্ষিত হইতেছে না। উদয়গগনের দুই এক স্থানে আলোক দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু উহা নব জ্যোতিষ্কের প্রাগ্‌ভাস, না চঞ্চলার ক্ষণজ্যোতি, তাহা নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা যাইতেছে না!

বর্ত্তমানে প্রতিভার অভাব

সাহিত্যে সকল সময়ে সমুন্নত প্রতিভাসঙ্গম ঘটে না। জাতিবিশেষের অন্তঃকরণ যেন কিছু কালের জন্ম কোন প্রবল প্রতিভা-মুখে সৃষ্টিব্যাপারে রত থাকিয়া, আবার কিছুকালের জন্য বিরত হয়। জাতীয় শরীর-তন্ত্রে তখন জননের কার্য্য স্থগিত হইয়া, যেন পোষণ, প্রচলন বা পরিচালনের কার্য্য চলিতে থাকে। বহুমানিনী ইংরাজী ভাষার মধ্যেও বর্ত্তমানে এই অবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু, এ অবস্থায় নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এই ক্রমান্বয় শ্রম এবং বিশ্রামের ব্যাপারেই বিশ্বসৃষ্টিকে ধারণ করিতেছে! অধ্যাত্ম জগতের

সাহিত্যে কর্ত্তব্য ভেদ

অনেক সত্যই বহির্জগতের সত্যের সহিত সমান্তরালে এবং গুণসাধর্ম্মে চলিয়াছে! বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান শৈথিল্য এবং আলস্য-দশা, ভবিষ্যতের নবপ্রদীপ্ত প্রতিভামুখে অজ্ঞাতদেশে বিচরণ করিবার জন্য শক্তি-সঞ্চয়ে ব্যাপৃত আছে বলিয়াই আমরা আশা করিব।

সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন উপার্জ্জন এবং আবিষ্কার-কার্য্য যেমন বরণীয়, উপার্জ্জিত সম্পত্তির রক্ষণ, পরিপোষণ, কিম্বা সাধারণ্যে প্রচলনের কার্য্যও তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কারণ, এই পরিচালনের ফলেই জাতিগত অভ্যুদয় এবং জাতীয় হৃদয় হইতে নব নব প্রতিভার উদয়-সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। সাহিত্যে এই শেষোক্ত মহৎ কার্য্য সর্ব্বথা উপজীবী লেখকগণের দ্বারাই সুসাধিত হইয়া থাকে। এই কথায় আমরা অনেক সাহিত্যসেবীর হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিব না, আশঙ্কা করিতেছি। কারণ, কেহই যেন উপজীবী পরিগণিত হইতে চাহেন না, সকলেই মৌলিক বা original বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য বিচারকের নিকটে উপজীবী এবং মৌলিকের ভেদ এতই সুস্পষ্ট যে, উহা কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। (১) বিশেষতঃ যেমন জীবনে

(১) এই আলোচনায়, উপজীবী লেখক আখ্যায়, আমরা কাহারও কোনরূপ ন্যূনতাসঙ্কেত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। পুনঃ-পুনঃ বলিব, এই জাতীয় লেখকগণই নানাদিকে সাহিত্যের প্রকৃত কৃতী ই'হারাই সর্ব্বজনগম্য ও সর্ব্বজনরম্য হইতে সমর্থ। সাহিত্যের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ, অনেক সময়, যেমন গুণের তেমনি দোষের বিশিষ্টতায় সাধারণের অগম্য এবং অধৃষ্য —বিশেষতঃ, তাঁহারা স্বাভাবিক দৃঢ়তা বা 'গোঁড়ামী'র বশে, অনেক সময় পরকীয় সমালোচনা হইতে নিজের চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়াই অগ্রসর হন। সাহিত্যের মাহাত্ম্য বিচারেই তাঁহাদের গৌরব সম্যক্ পরিগণিত হইয়া থাকে। সমাজতন্ত্রে অপর লেখকগণের কার্য্যই সবিশেষ ফলপ্রসূ হইতে দেখা যায়; ইহারাই রীতি বিষয়ে লোকপ্রিয়, সর্ব্বথা সতর্ক এবং নির্দ্দোষ হইতে পারেন। বিশেষতঃ মৌলিক ও উপজীবী আখ্যা

তেমনি সাহিত্যে, আত্মজ্ঞান বা আত্মশক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ পরিচয়টিই সর্ব্বপ্রকার সফলতার মূল। সুতরাং, আমাদের এই প্রসঙ্গে যদি একজন সাহিত্যসেবীরও আত্মপরিচয়ে বা কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে সাহায্য হয়, আমাদের সমস্ত শ্রম, ও স্বর্গত কালীপ্রসন্নের এই শ্রাদ্ধসভার অনুষ্ঠান সফল জ্ঞান করিব।

বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য

কালীপ্রসন্ন-প্রমুখ সৌভাগ্যবান্ লেখকগণ যেই সকল অপরিচিত ভাবের, এবং বাক্য শক্তির সংবাদ দিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা, এবং উহাকে সাধারণ্যে পরিচালন পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ উন্নতির সাহায্য করিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এ বষয়ে—আমরা কি পরিমাণে যোগ্যতা দেখাইতেছি, তাহাও অদ্য চিন্তা করিব।

বঙ্গীয় গদ্যের বর্ত্তমান দোষ

ইহা স্থির যে বাঙ্গালী সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া থাকিলেও, এখন যাবৎ তাহার ভাষা কিংবা সাহিত্য পূর্ণাবয়ব হইতে পারে নাই। বঙ্গভাষা এখনও আপনার সামগ্র্য এবং অনবদ্যতার অন্বেষণ করিতেছে। বাঙ্গালীর বিলাসিতা, তাহার অলসতা, তাহার অধীন জীবনের কর্ম্ম-দৈন্য সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে! সপ্তকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক মাত্র জাতীয় উন্নতির পরমপন্থা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যেও অনেকে সম্যক্ সতর্কভাবে এবং স্থিরচিত্তে অগ্রসর হইতেছেন না। যে কোন মাসের সাময়িক সাহিত্য নিবিষ্টচিত্তে পরিদর্শন করিলেই

আপেক্ষিক এবং এ আলোচনায় উভয়ের আদর্শের বিশিষ্টতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। ফলতঃ, সাহিত্যে মাধুকরী বৃত্তি কোনমতেই নিন্দনীয় নহে, অনেক বড় বড় কবি এই মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনেই যশস্বী হইয়াছেন। লেখক।

নিঃসংশয়ে জ্ঞান হইবে—বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে! সাহিত্যের প্রধান জীবন-ভিত্তি, ভাষা; সেই ভাষাকে আমরা কোন্ অবস্থায় আনয়ন করিতেছি! * আমাদের অনেকের বাক্যপ্রণালী যেন কেবল শব্দবাহুল্যে প্রঘূর্ণিত হইয়া ব্যূহচক্রে ঘুরিতেছে, প্রস্তাবিত কিংবা প্রতিপাদ্য বিষয়ের নিকটবর্ত্তী হওয়াই বিস্মৃত হইয়াছে! কাহারও ভারতী যেন কেবল অলঙ্কার-বাহুল্যের প্রদর্শনী করিতে গিয়াই আপনাকে নানামতে ক্লিষ্ট করিতেছে—পাঠকের সমক্ষে নিজের মর্ম্মটুকু কোনমতেই উদ্ঘাটিত করিতেছে না! কাহারও রচনাপাঠে, ইংরাজ রসিকের কথায় বলিতে হয়, "Language was given to men to conceal their thoughts"! কাহারও রচনায় এত ভাবশৈথিল্য এবং চিন্তার আলস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পাঠকের শরীর মন উহাতেই অতর্কিতে নিদ্রাভিভূত হইতেছে! অনেকের বাক্য-মূলে কিছুমাত্র অর্থভিত্তি নাই, প্রবৃত্তির স্রোতে 'যথা তথা' লিখিত হইয়া, পরিশেষে একটা বিচিকিৎস্য নামসংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে! বস্তুতঃ, কেবল রচনার নামকরণের মধ্যেই কোন একটা গূঢ় অভিসন্ধির সঙ্কেত করিতে, অনেক লেখক বিস্তর শ্রমস্বীকার করিতেছেন! গদ্যের এ সমস্ত দোষ, সময়েসময়ে পদ্যে গুণস্বরূপে পরিণত হইতে পারে, স্বীকার করিব। কারণ

* আমরা এ ক্ষেত্রে প্রাকৃত বা প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারকেই লক্ষ্য করিতেছি না, শব্দ-প্রয়োগ চিরকাল অবস্থাগতিক। উহা লেখক মাত্রেরই সঙ্কট স্থল; সহস্রের মধ্যে একজনেও এ সঙ্কট প্রশংসনীয় ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। আমরা রচনার প্রণালী বা রীতিকেই উদ্দেশ্য করিতেছি। প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, বঙ্গভাষার গদ্যরীতি বর্ত্তমানে কত অপথে এবং বিপথে চলিতেছে, উহার প্রধান লক্ষণ অনার্জ্জব বা Insincerity; এই কথাটির দ্বারাই আমাদের গদ্যের সমস্ত মারাত্মক দোষ উদ্দেশ করা যায়; লেখক।

গদ্যের ও পদ্যের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হওয়া আমরা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি। গদ্যের অভীষ্ট স্থূলতঃ জ্ঞান, পদ্যের উদ্দেশ্য আনন্দ। আনন্দ দানের পন্থা এক নহে; উহা মানবহৃদয়ের বহুমুখী প্রবৃত্তি এবং রুচিভেদে, প্রকাশে কিংবা সঙ্কেতে, অভিধায় এবং ব্যঞ্জনায় অশেষ প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রতিভা আপনার অলৌকিক শক্তি-নির্ভরে শব্দ কিংবা অলঙ্কারশাস্ত্রের নিষেধবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও মানব হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত করিতে পারে। দেশে দেশে কাব্য-জগতে এ ব্যাপার বহুবার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কবি-প্রতিভা সাহিত্যে কি-কি উপায়ে আনন্দ দান করিতে পারে, উহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়া, পণ্ডিতগণ তাহার 'পথ নিষ্কণ্টক' বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কাব্য-বিচারের বাস্তবিক শাস্ত্র এই একটি মাত্র বাক্যে প্রকটিত—ফলেন পরিচীয়তে।

গদ্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

কিন্তু গদ্যের সম্পর্কে এ নিয়ম প্রযুক্ত নহে। গদ্যে আমরা ঋজু, সরলসঙ্কেতী, দ্রুতগতি এবং অন্বর্থ বাক্য-বিন্যাস আশা করি। বঙ্গভাষায় এখন গদ্যের এবং পদ্যের মধ্যসীমা নানা মতে উপেক্ষিত! কবি-ধর্ম্মী গদ্যলেখকগণের এই দোষ একরূপ অপরিহার্য্য, স্বীকার করি; এবং সাহিত্য ও কবিপ্রতিভার বহুদোষ মার্জ্জনা করিতে পারে। কিন্তু উহা যে দোষ, অতএব সাধারণের অনুকরণের অযোগ্য, সে বিষয়ে সকল লেখকের এবং পাঠকের বিবেকদৃষ্টি নিয়ত উদ্বুদ্ধ থাকা আবশ্যক। নতুবা, উহার গতিকে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়। সাহিত্যে একটা প্রধান দুর্য্যোগ এই যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তির দোষগুলিই শক্তিহীন ভক্ত ও উপজীবী লেখকগণের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রথম সংক্রামিত হইতে থাকে! সুতরাং, প্রতিভাবানের দোষবিষয় সাধারণের হিতকল্পেই বারম্বার পর্য্যালোচিত হওয়া আবশ্যক।

ম্যাথু আর্নল্ড একস্থলে, ফরাসী ভাষার গদ্যের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ফরাসীদের সাহিত্যবিষয়ে একটা পরিস্ফুট বিবেক বা Conscience in literary matters আছে; তাঁহাদের মনে রচনারীতির ঋজুতা ও সাহিত্য-বিষয়ক সত্যসমূহের একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে বলিয়া, ফরাসীভাষার রচনা প্রণালী সহজে বিপথগামী হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা ওইরূপ কোন ধারণা লাভ করিতে পারি নাই। এমন কি, তদ্বিষয়ে পাঠকসাধারণের সাহায্যকল্পে, এ যাবৎ বাঙ্গালায় কোন চেষ্টাই হয় নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে, উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিষয়ে লেখক এবং পাঠকের পরিস্ফুট বিবেক-ধারণা না থাকিলে পরস্পর-দোষে উভয়েই বিপথগামী হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে গদ্যে, পদ্যে, অভিনয়-রঙ্গে সর্ব্বত্র এই দোষ ঘটিতেছে। এই দোষ সময়ে বাধা প্রাপ্ত না হইলে এ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি সুদূরপরাহত! স্বীকার করি, ওইরূপ কোন নিয়ম শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিভার বিশেষ কোন উপকার নাই। কিন্তু যাঁহারা প্রতিভা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নব নব ভাবকে সাধারণ্যে প্রচলিত করেন, জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক—সেই উপজীবী লেখকগণের, বিশেষতঃ পাঠক সম্প্রদায়ের উহা হইতে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

সংস্কৃতের সম্বন্ধ-চ্ছেদে ভাবীফল

ইদানীং একদল লেখক নানামতে বঙ্গভাষাকে আর্য্যভাষার সম্বন্ধচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। যে ভাব সংস্কৃত অথচ সুবোধ্য শব্দ মাত্রের সাহায্যে অনায়াসে প্রকাশিত হয়, অনেকে প্রাকৃত-বাঙ্গলার লোভে, উহাকেই দূরবিলম্বিত এবং পরিশ্রান্ত বাক্য-প্রকারে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা নিশ্চয় যে বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাষা ‘সংস্কৃত’

নহে; সুতরাং উক্ত মতাবলম্বীগণের কথায় একদিকে বিস্তর সারবত্তা আছে। কিন্তু, সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার পরম শোণিত-সম্পর্ক ও আত্মীয়তা স্থিরসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রতিভাবান্ লেখকগণ তাহা সমাধা করিয়া বঙ্গভাষাকে ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্য কৌলিন্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। প্রাদেশিকতা, গ্রাম্যতা বা প্রাকৃত বাক্যের সাহায্যে কোন কোন ভাব সাধারণের কিছু সহজ বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু উহার লোভেই সর্ব্বত্র বাক্যের ঋজুগতি ও ত্বরিতগতি এবং সুমার্জ্জিত শক্তিকে উপেক্ষা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে মনুষ্যের ভাব ও চিন্তা নানাদিকে যত বর্দ্ধিত, গম্ভীর-গাহী এবং বিশাল হইয়া পড়িয়াছে, প্রাকৃত ভাষার কথা দূরে থাকুক, কোন প্রাচীন ভাষাই উহার ধারণা বিষয়ে স্বাধীন সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে পারে না। প্রাকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া গেলে, নিত্য জীবনের বহির্ভূত কোম জটিল ভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রাকৃত বঙ্গাভিধান যে নিতান্ত শক্তিহীন, তাহা লেখক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রভূত শক্তিধর বঙ্কিমচন্দ্রও যখনি প্রাকৃত জীবনের শিল্পচ্ছবির ক্ষেত্র পরিহার করিয়া কোন জটিলভাবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন "খাঁটি বাঙ্গালা" তাঁহাকেও বিপন্ন করিয়াছে! এ অবস্থায় বহু-ধনবতী প্রাচীন বাণীর সঞ্চিত সম্পত্তি উপেক্ষা করিতে যাওয়া, আর বঙ্গসাহিত্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করা অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে! আর্য্য ভাষার শক্তি যে ঋজু অথচ স্বল্পাক্ষর বাক্যে ভাবপ্রকাশের কতদূর সহায় হইতে পারে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। ইদানীং সংস্কৃত ধাতুনিষ্পন্ন অনেক শব্দের এমন শক্তি আবিষ্কৃত হইতেছে যে, মনে হয়, প্রাচীনেরাও যেন উহা সম্যক উপলব্ধি পূর্ব্বক কাজে লাগাইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন

প্রাকৃত বাঙ্গালার স্বল্পশক্তি

প্রভৃতির দ্বারা গরীয়সী আর্য্য ভাষার শক্তি সম্পত্তি কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গ-ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া থাকিলেও এখন উহার গতি একরূপ স্থগিত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে লেখক যেন মৌলিকতার অহঙ্কারেই এই ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থা করিতেছেন!

কালীপ্রসন্ন প্রাকৃত বাক্য প্রণালীর সবিশেষ বিরোধী ছিলেন, তদ্দরুণ যে বিপরীত দিক হইতে তাঁহাকে দোষ স্পর্শ করে নাই, এমন নহে। অত্যন্ততা সকল সময়েই গর্হিত, এবং আমরা পরবর্ত্তীর শিক্ষার স্থল। কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেও প্রতীত হইবে, একদল লেখক 'খাঁটি বাঙ্গালার' হুজুগ তুলিয়া, এবং সহজতার অজুহাত দেখাইয়া, অন্যদিক হইতে অত্যন্ততায় গড়াইয়া চলিয়াছেন! তাঁহারা যেন স্থানে অস্থানে আর্য্য শব্দের শক্তি এবং ব্যুৎপত্তিকে পদদলিত করিতেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে যশোলিপ্সু লেখক মাত্রেই গ্রীক বা লাটিনজাত শব্দের প্রকৃতিপরিচয় না করিয়া লেখনী ধারণটিই বিড়ম্বনা মনে করেন। ক্লাসিকের প্রতি অনুরাগ আমরা প্রতিষ্ঠিত লেখক মাত্রেই দেখিতে পাই। বলিতে কি, ইংরাজী ভাষাতেও এক সময়ে 'খাঁটি ইংরাজীর' 'সাক্সন ইংরাজীর' হুজুগ প্রবল হইয়াছিল। এখন উহার মহিমা-কথা কেবল এ দেশের ইস্কুল-ক্লাশেই যৎকিঞ্চিৎ শুনিতে হয়। বলিতে লজ্জা করে, ইংরাজী ভাষার সাধারণ সংবাদ পত্র পর্য্যন্ত ভাষায়, এবং জটিল-ভাব ধারণায় অনেক সময়ে আমাদের সমুন্নত গদ্য-চেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে!

ইংরাজী গদ্যের মাহাত্ম্য

উহার একপৃষ্ঠা বঙ্গভাষায় যথোচিত প্রতিশব্দ-ক্রমে অনুবাদিত হইলে আমাদের পাঠকগণের পক্ষে অবোধ্য হইবে! ইহার প্রধান কারণ, ইংরাজী ভাষা বিশ্বের যাবতীয় ভাষার বিশিষ্ট শব্দ এবং রীতি সাহায্যে

ভাবপ্রকাশের অন্নাক্ষর ও ঋজুপ্রণালা আয়ত্ত করিয়া পাঠক সাধারণকেও তাহার উপভোগে এবং সহানুভবে সমর্থ করিয়া লইয়াছে। ইংরাজী ভাষার অনেক শব্দের মধ্যেই প্রাকৃত বাঙ্গালার দীর্ঘবাক্যসাধ্যি, নিগূঢ় শক্তি-সঙ্কেত এবং সালঙ্কার ধ্বনি আছে। ভাষার এইরূপ শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মলাভ করাই কি লেখক ও পাঠকের পরম সৌভাগ্যের কথা নহে? বঙ্গসাহিত্যের উন্নত শ্রেণীর পাঠকবর্গও ভাষার অন্বয়াভিধান বিষয়ে এতই কলুষিতবুদ্ধি এবং শিথিলমতি যে, অনায়াস বোধের লোভে এবং মানসিক আলস্যে তাঁহারা শ্লথবিলম্বিত এবং নিঃশেষ-বিশ্রান্ত বাক্যজালের মধ্যেই কর্ম্মহীন দিন অতিবাহিত করিতে পারেন। আমাদের উচ্চ-আকাঙ্ক্ষী সাহিত্যের মধ্যেও এই শৈথিল্যের প্রমাণ মিলিতেছে। আমরা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছি বলিয়াই অনেকে নিজকে বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া মনে করিতেছি; এবং ঐটুকু ইংরাজী শিখিতেই যে কত সময় লাগিয়াছিল বিচারের সময় তাহাই ভুলিয়া যাইতেছি! অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে 'কালী প্রসন্নের লেখা যে অতি কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য', এইরূপ বিচার-বাক্য নির্লজ্জ গর্ব্বে প্রচারিত হইতেও শুনিতে হয়! বাঙ্গালার নাম 'মাতৃভাষা' বলিয়া আমরা জন্ম-স্বত্বেই কি উহার পূর্ণাধিকার ধারণা করিব? বঙ্গসাহিত্যের ভাষাকে মাতৃক্রোড়-পর্য্যাপ্ত অথবা কেবল দাসদাসী এবং 'বেহারা' হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুভাষায় পরিণত করিতে হইবে? শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এই অবস্থায়, বঙ্গসাহিত্য বিগত ৫০ বৎসরে যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কেবল উন্নত প্রতিভাসঙ্গম-জাত সৌভাগ্য-ফল বলিয়া মনে হয়। আমাদের জীবনের শিথিল শিক্ষা এবং প্রভূত কল্পালস্যই লেখক ও পাঠক উভয়পক্ষে

বঙ্গভাষার শিক্ষাভাব

এই সমস্ত আদর্শ-দোষ উৎপন্ন করিতেছে। * আবার, ইহার বিপরীত অসংযতা হইতেই বঙ্গে প্রাচীনকালে কাদম্বরী গ্রন্থের স্বনামখ্যাত "গৌড়ীয় বাক্যরীতির" জন্ম হইয়াছিল; বর্ত্তমান কালেও, অন্ততঃ একদিকে, কাদম্বরীর সেই অতিপল্লবিত, অতিপুষ্পিত দুরোদ্দেশ্য এবং দুরান্বয়ী বাক্যরীতিই প্রকারান্তরে অভিনন্দিত হইতেছে। বিদ্যাসাগরএই "গৌড়ীয় রীতির" "প্রাচীন বাঙ্গালা" হইতেই বঙ্গবাসীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও পুনর্ব্বার প্রাকৃতের পরিচ্ছদে, বরং বিপরীত দিক হইতে, সেই অনর্থগহন বাক্যরীতিই বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। উহা অধ্যাত্মভাবে বাক্যের অর্থভিত্তির আদর্শকে সময় সময় একেবারে পদ দলিত করিয়াই চলিয়াছে! উহার প্রধান লক্ষণ affectation বা মুরব্বিয়ানা। অনেকে উহার নাম দিয়াছেন—'ককনী'।

পণ্ডিতী বাঙ্গালা ও ককনী বাঙ্গালা

এই 'ককনী' শব্দ বিদেশী। উহা প্রকারান্তরে 'সহুরে প্রাদেশিকতা' বই নহে! উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজীসাহিত্যে এক শ্রেণীর 'খোশ খেয়ালী' লেখকের প্রতি এই বাক্য বহু প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা একরূপ দলবদ্ধ হইয়া "কেবল মিথোভাষণ এবং কথাবার্ত্তার প্রণালীতে, নিরর্থক অলঙ্কার বাহুল্যে, সাধু প্রাকৃত এবং প্রাদেশিক

* সমুচিত দৃষ্টান্তের অভাবও একটা কারণ। বঙ্গীয় গদ্যে বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্নের পর-সূত্রে একা রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বহুদিন, স্বতন্ত্র কোন রীতি-সাধক লেখকের জন্ম হয় নাই বলিতে হইবে। আবার যৌবন মধ্যবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান গদ্যশক্তি নানাদিকে পরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া থাকিলেও, তিনি স্বয়ং অতিমাত্রায় চলনশীল বলিয়া এবং রীতি বিষয়ে ক্রমান্বয়ে অত্যন্ততার উভয়কূল স্পর্শ করিয়াই চলিতেছেন বলিয়া, তাঁহার দৃষ্টান্ত অসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধিকে বরঞ্চ ঘোলা করিতেই সমধিক সাফল্য দেখাইতেছে! এ জাতীয় প্রতিভা হইতে কোন স্থিরতার আশা না করিয়া, বরং নব নব রীতির দৃষ্টান্ত লাভ করিতেছি বলিয়াই পাঠককে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। লেখক—

শব্দ বাক্যের সামঞ্জস্যবিহীন এবং 'দিশাহারা' প্রাচুর্য্য প্রকাশেই ভাব ব্যক্ত করিতেন। ভাবের মাহাত্ম্যে, উহার সন্ধি কিম্বা শবলতায়, অথবা উদ্গতি-অবনতি-বশে তাঁহাদের বাক্যরীতির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিত না; বাক্যে কোনরূপ ক্রমোন্নতি, উচ্চারণের ছন্দ বা Rhythm ছিল না। পুনঃ পুনঃ কেবল মুন্সীয়ানার অভিমান সঙ্কেত পূর্ব্বক, শ্লথবিলম্বিত প্রণালীতেই তাঁহাদের বাক্য কেবল "খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া" চলিত! জাতীয় হৃদয়মনের নির্ব্বিশেষ অবসাদক বলিয়া এই রীতি ইংরাজী ভাষায় সূক্ষ্মদর্শী কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, 'কক্নী' অভিযোগ, এবং 'কক্নীর' অভিমান বঙ্গসাহিত্যেও প্রবিষ্ট হইতেছে। 'পণ্ডিতি বাঙ্গলা' ও 'কক্নী বাঙ্গলা' কিংবা 'কথাবার্ত্তার বাঙ্গলা' অত্যন্ত-ভাবে চলিলে সমস্তই দোষ; বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের চিত্ত এই দিকে নিয়ত জাগ্রত থাকার আবশ্যক হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষের পরিহার বিষয়েও আমরা কালীপ্রসন্নের নিকট বহু শিক্ষা এবং সাহায্য লাভ করিতে পারিব।

কালীপ্রসন্নের ভাষা ভাব ও জীবন সাধনা

'কক্নীর' দোষ বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইলে কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাদি নিয়ত সম্মুখে রাখিলেও আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যেমন বলিয়াছি, 'কক্নী' 'কথাবার্ত্তা' বা 'পাঁচ—ইয়ারে'র প্রণালী কালীপ্রসন্নের রচনায় কুত্রাপি মিলিবে না। কালীপ্রসন্ন অপেক্ষা জটিল বা গভীর ভাবগ্রাহী লেখক হয়ত বঙ্গসাহিত্যে জন্মিয়াছেন; কিন্তু ভাবানুগত ভাষার স্থির শক্তি, উল্লসিত গতি এবং ঐশ্বর্য্যে বিষয়ে কালীপ্রসন্ন অদ্বিতীয়। নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ও প্রভাত চিন্তার আনন্দ-স্তব্ধ 'নীরব কবি' হইতে 'ছায়াদর্শনের' অনন্তব্যাপিনী অমরত্ব-তৃষা পর্য্যন্ত, যে বৃহৎ, মহৎ ও উদার হৃদয়ের আত্মজীবনী প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্র ভাষা এবং ভাবনার-রীতির একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গভীর

ঐক্যসূত্র এবং সামঞ্জস্য আছে। উহার ভিতর বিপুলসমুদ্রের অনন্তমুখিন্ প্রাণাবেগ এবং দীর্ঘনিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ-রসিকতার পরিচয় আছে; মনুষ্যের নিকটে নিজের বরিষ্ঠ এবং অনন্ত মুহূর্ত্তগুলির সুসম্বাদ বহন করিবার একনিষ্ঠ প্রয়াস আছে। ইহাই তাঁহার সাহিত্য-সাধনা; তিনি এই সাধনায় কর্ম্মোপযুক্ত সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় অদ্য তাঁহার এই মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ! প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই তাঁহার গ্রন্থগুলির যথোপযুক্ত এবং ক্রমান্বিত অধ্যয়নে বাণী-প্রতিভার এই অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ-মাহাত্ম্যে সহানুভূতি লাভ করিতে পরিবেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে কেবল কালীপ্রসন্ন বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে; রায়বাহাদুর কি বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিহ্নিত করা হয় নাই। রায়বাহাদুর বা রাজদ্বারে যশস্বী, কিম্বা সাংসারিক অথবা পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন অল্পজীবী এবং আমাদের বিবেচনা-বিচারের অসম্পর্কিত. জীব মাত্র। যে কালীপ্রসন্ন সংসারের দূরে বসিয়া নিভৃত সাধনায় বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বিধান পূর্ব্বক স্বয়ং নিজের জন্য ঐহিক অমরতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, আমরা বঙ্গবাসী অদ্য তাঁহারই উদ্দেশে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে সমবেত! তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহারই প্রণালীতে, তাঁহারই আদর্শ এবং মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিলাম। আমরা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অমর আত্মার উপস্থিতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি! উপসংহারে তাঁহারই বাক্যে বলিব—

প্রতিভার ঐহিক অমরতা

"যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ, কিম্বা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহুজীবনের সহিত মিলাইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কি আলেখ্য দেখাইয়া, মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন,

তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন, শ্মশান তাঁহাদের স্বর্গারোহণের সোপান-মঞ্চ।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করি—"যদৈবেহ তদমূত্র, যদমূত্র তদন্বিহ"! যে সার্থককর্ম্মা পুরুষ বাঙ্গালী সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে ঐহিক অমরতার এই অমৃতোজ্জ্বল, পরম-উল্লসিত, ভাব-সন্দেশ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিই যেমন-ইহকালে-তেমন-পরকালে উক্ত বাক্য সুপ্রযুক্ত এবং সার্থক হউক!

স্বদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল।

বস্তু সংক্ষেপ

বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রের স্থান—সাংসারিক পরিবেশ—প্রথম জীবন—হাস্য রসিকতা—পাষাণী—প্রতিভার জাগরণ—ভারতবর্ষে দেশানুরাগ—উক্ত যুগধর্ম্মের নাটকাদি ও উহাদের আদর্শ—উহাদের প্রতিষ্ঠা—উহাদের মধ্যে ভারতীয় লক্ষণ—দ্বিজেন্দ্রের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি—দ্বিজেন্দ্রের রীতি এবং উহার অপরিহার্য্য ফল—সাহিত্যে কবির প্রতিষ্ঠা—ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ভারতীয় বিশেষত্ব।

স্বদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল। *

বঙ্গদেশে ও সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রের স্থান

বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী অদৃষ্টের অমাগগন হইতে একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রপাত হইয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের মধুর কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব; আমরা অদ্য তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত। গভীর শোক এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের যুগ সাহিত্যের, উপরন্তু জাতীয়

* এহ প্রবন্ধের মূল অংশ চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক আহূত স্মৃতি-সভার বক্তৃতারূপে [illegible] উহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দ্বিজেন্দ্রের কবি-কাব্যের প্রশস্তি (appreciation) রূপে উপস্থিত করা হইল।—লেখক।

জীবনসাধনার একজন বলিষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষ এবং গুরুকেই অকালে বিদায় দিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশেষ অভাব পূরণ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কে আছেন? বঙ্গসাহিত্য-গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতেছি না! দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর আধুনিক নাট্য-মঞ্চের নেতা; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-সাধনার প্রধান নেতা, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; বাঙ্গালীর হাস্য-কৌতুকের সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ আসন; সঙ্গীত সাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণের সমস্থানীয়; সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান এ দেশের কোন সাহিত্যসেবীর পশ্চাতে নহে। এ হেন দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা অকালে হারাইয়াছি!

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়াছিলাম; এবং কেবল স্মৃতি-সভার মামুলি কথা বা কতকগুলি চলনসই প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াই অদ্যকার কর্ত্তব্য শেষ করিতে হইবে না। আমরা অসঙ্কোচে যথার্থ কথা বলিতে পারিব; এবং সত্য কথার দ্বারা এই ক্ষণজন্মা এবং সুকর্ম্মা পুরুষের গৌরব ব্যতীত অগৌরব হইবে না। সে দেশের সৌভাগ্য, যে দেশে এমন লোক জন্মায়, যাহার নাম আপামর সাধারণের পরিচিত; এবং মৃত্যুর পরেও যাঁহার স্মৃতিসভায় সমবেত হইয়া যথার্থ কথা বলিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায়। দ্বিজেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশের অধিবাসী। বাঙ্গালার এমন গ্রাম নাই যেখানে দ্বিজেন্দ্র-লালের উদ্দেশ্যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধুবাদ পড়ে নাই; যেখানে তাঁহার "আমার দেশ" বা "আমার জন্মভূমি" বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী নবস্পন্দনে ঝঙ্কারিত করে নাই; তাঁহার "নন্দলাল" বাঙ্গালীর মনকে পরমশিক্ষাপ্রদ সরস কৌতুকদণ্ডে মথিত করে নাই! এমন ভদ্র-গ্রাম নাই, যেখানে তাঁহার রাজস্থানের বীরকাহিনীগুলি অভিনীত

হইয়া, গ্রামীণগণের অন্তর্লোকে এক অভিনব স্থান স্পর্শ করত, তাহাদিগকে অভিনব 'স্বদেশ' এবং 'মনুষ্যত্ব' আদর্শে উৎসাহিত করে নাই! এই সমস্ত অবিসংবাদিত সত্য কথা, এবং সামান্য গৌরবের কথা নহে! কয়জন বাঙ্গালী এ-জাতীয় গৌরব লাভ করিয়াছেন? গত দশ বৎসর হইতে বাঙ্গালীর জীবনে এক নব চরিত্ররেখা উজ্জ্বল হইয়া পড়িতেছে। এই জাতি চিরকাল ভাবুক; এবং ভাবুকতার দিক হইতে আবেগ ব্যতীত আমাদের চরিত্র কখনও বিকাশ লাভ করে না। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ দৃঢ়তা, এবং কর্ম্মনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা দেখা দিয়াছে; অনন্ত ভেদ আদর্শের দেশে জাতীয়তা বলিয়া একটা আদর্শের স্বপ্ন এবং কর্ম্মানুবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যাঁহারা এই বিভেদ-পরিক্লিষ্ট দেশে এইরূপে যৎকিঞ্চিৎ সমতার এবং বিশ্বমনুষ্যের সহিত সমগতিক আদর্শসাধনার দীক্ষা আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে—সেই লোকশিক্ষক এবং লোক-চরিত্র-নিয়ামক, প্রাচীন এবং আধুনিক স্বল্পপরিমিত বাঙ্গালীর মধ্যে—দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যতম। তাঁহার নাম এ দেশের প্রাচীন কিংবা আধুনিক শিক্ষাগুরুগণের কাহারও নিম্নে নহে।

এই দ্বিজেন্দ্রলাল কে ছিলেন এবং কি ছিলেন, অদ্যকার শ্রাদ্ধবাসরে তাহা চিন্তা করা আমাদের একটা সবিশেষ কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের মধ্যে একজন চিরদিনের মানুষ! তাঁহার উক্ত মূর্ত্তি কি পরিমাণে বাঙ্গালীর বা কি পরিমাণে সমগ্র পৃথিবীর, কি পরিমাণে বর্ত্তমানের কিংবা চিরকালের, তাহার বিচার-নির্ণয়ে অদ্য নিবিষ্টভাবে অবহিত হইবার সময় নহে। তবু উত্তরাধিকারী আমরা, আমাদের পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তীর দায়-সম্পত্তির হিসাব যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সম্পর্কিত জীবন-বৃত্তান্ত আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

সাংসারিক পরিবেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়

কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সমুন্নত সামাজিক প্রতিষ্ঠা বলিতে যাহা বুঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম-স্বত্বেই তাহার ভাগী হইয়াছিলেন। দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাসুবিধা দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণমাত্রায় লাভ করেন, এবং ইংরাজি ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে চীরেনচেষ্টর কৃষিকলেজের ডিগ্রী লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন। গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডিপুটী কালেক্টর ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের পদকর্ত্তব্য সমাধা করিয়া-আসিতেছিলেন; সংপ্রতি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়ার উপক্রম স্বরূপ ফার্লো ভোগ করিতেছিলেন; পঞ্চাশৎ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন।

প্রথম জীবন

বাল্যবয়সেই দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ কৌতুক প্রবণতা ও বাক্‌পটুতা স্ফূর্ত্তিলাভ করে! শুনিতে পাই প্রথিতনামা বিদ্যাসাগর বালকটি একদিন দেশে বড়লোক হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা-রচনার 'ঝোঁক' ছিল। বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বেই ১৮৮২ সনে, তাঁহার আর্য্যগাথা নামক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; উক্ত গ্রন্থে তাঁহার দশম বর্ষের রচনাও গুটীকতক আছে বলিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। বিলাতে অবস্থানকালে, ১৮৮৩ সনে, তিনি লিরিক্‌স্ অব্ ইণ্ড্ (Lyrics of Ind) প্রকাশ করেন। উহা কবি এডুইন আর্ণল্ড্ (Edwin Arnold) এর নামে উৎসর্গিত এবং তৎকালে ইংরাজ-মহলে সবিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়াও তিনি বহুদিন ইংরাজীতেই কবিতা লিখিতেন; তবে ঐ সমস্ত কখনও মুদ্রিত করেন নাই। পরে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্ররোচনাতেই

বঙ্গসাহিত্যের দিকে তাঁহার শক্তি পরিচালিত হয় বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই বৃত্তান্তের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলেই কবি দ্বিজেন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া, এবং সম্ভবতঃ এতদ্দেশের সমাজ-নির্য্যাতনের ভাগী হইয়া কবি 'একঘরে' নামক ব্যঙ্গ-নাট্য

হাস্য-রসিকতা রচনা করিয়াছিলেন; উহা ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত হয়। সুখলালিত দ্বিজেন্দ্রের হৃদয় কৌতুকানন্দের মাত্রায় পরিপূর্ণ ছিল। স্বাভাবিক-শক্তির প্রেরণাবশেই তিনি বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব্ব কৌতুককবিতা ও কৌতুকসঙ্গীতের জনক হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সহজাত কৌতুকচ্ছন্দকেই নানাপ্রকার বাক্যচ্ছন্দে প্রমূর্ত্ত করিয়া ১৮৯০ সনে 'আষাঢ়ে', ১৮৯২ সনে আর্য্যগাথার ২য় ভাগ, ১৮৯৬ সনে কল্কি অবতার, ও ১৯০০ সনে 'বিরহ' প্রকাশিত হইয়াছে। এ সমস্ত রচনায় বঙ্গভাষা অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে শক্তিপ্রসার লাভ পূর্ব্বক অপরূপ রসতারল্যে বিলসিত হইয়াছে। কল্কিঅবতার বা বিরহ প্রভৃতির বৃত্তান্ত-ভিত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে কতকগুলি ভাবোজ্জ্বল কৌতুক-কবিতার সূত্র-সমষ্টি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ এবং বিদ্বেষবিহীন হাস্যরস-সাধনার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রের মধ্যেই প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। এ ঘটনা ভারতীয় সঙ্গীত-তন্ত্রেও বোধ করি প্রথম! ভারতীয় আর্য্যমন সাহিত্যে এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে চিরকাল তত্ত্ব-ভাব বা Seriousness অবলম্বনেই সবিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। হুতোম প্রভৃতির সমস্থত্রে রবীন্দ্রনাথ মানসীর মধ্যে কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতার নমুনা দেখাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতে হাস্য! উহা সহজকৌতুকপ্রবণ হৃদয় লইয়া স্বয়ং গায়ক না হইলে অসম্ভব ছিল। সহজাত শক্তির ইঙ্গিত-বশেই দ্বিজেন্দ্র উক্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন।

এই সূত্রে নিজের সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। দ্বিজেন্দ্রলালের নাম, কিংবা রচনার সঙ্গে তখনও পরিচয় ঘটে নাই—ছাত্রাবস্থায়, সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সনের 'সাধনায়,' দুইটি কবিতা পাঠ করিয়া কুতূহল এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম—'কেরাণী' ও 'গার্গী'! দুটিই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের রচনা এবং নিম্নে রচয়িতার নামও ছিল না। কেরাণীর মধ্যে এমন একটা ঋজুতীক্ষ্ণ মিষ্ট কৌতুকের মর্ম্মভেদী দংশন ছিল, এবং 'গার্গীর' ১৪টা পংক্তির মধ্যে এমন একটা উদাত্ত-মধুর অথচ গম্ভীর ধ্বনি ছিল যে, পাঠমাত্রেই প্রশ্ন জাগিয়াছিল—এই অজ্ঞাত কবি কে? রচয়িতা স্বয়ং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ না হইলে, বঙ্গসাহিত্যের আসরে যে এক নবতন্ত্রের স্বাধীন কণ্ঠ এবং বাক্যশিল্পী অবতীর্ণ হইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সাহিত্যিক জীবনের আদিম কৌতূহলবশে তখন মাতৃভাষার সাহিত্যগগনের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখিতাম। কোন দিকে কোন নূতন আলোক বা আলোকের আভাস দেখা দিল, কোন দিকে মিলাইল, কোন নক্ষত্র কোন রাশি বা বর্ণধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্ভব হইতেছে—এইরূপ জিজ্ঞাসা লইয়া আশৈশব ঘুরিতাম বলিয়া, তখন এই অ-পূর্ব্বপরিচিত জ্যোতিষ্কের উদয়াভাস লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম।

পাষাণী

১৯০১ সনে 'পাষাণী' এবং 'ত্র্যহস্পর্শ'। এই পাষাণীই কবির প্রথম তত্ত্ব-ভাবক রচনা। উহার প্রকাশমাত্র বঙ্গের সমালোচক মহল হইতে উচ্ছ্বাসিত সাধুবাদ উদীরিত হইতে থাকে। অন্যদিকে স্থিতিশীল আদর্শবাদিগণের তরফ হইতে, উহার অংশাবশেষ লইয়া সাহিত্য-আলোচনার নামধারী বিদ্রূপাস্ত্রও অনর্গল বর্ষিত হইতে আরম্ভ করে! পাষাণী নানাদিক হইতে বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম নাট্য

বলিয়াই বুঝিয়াছিলাম ; এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' 'বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা' নামক প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কোনরূপ সাংপ্রদায়িক আদর্শের কবল হইতে চিত্তকে স্বাধীন করিতে পারিলে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে, পাষাণীর মাহাত্ম্য এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বঙ্গীয় কাব্য-ছন্দের রাজ্যে এইরূপ সুদৃঢ় বস্তু-ভিত্তি, ভাব-গতি, এবং সংযত নাট্য-সমাধান পূর্ব্বকার কোন নাটকে দেখা যায় নাই ; এখনও উক্ত মত কোন অংশে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় কি না সন্দেহ। পাষাণীর কবিত্ব-সম্পদ্ সর্ব্বথা প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, উহা একটা পরিপূর্ণ হৃদয় এবং পরিণত সাহিত্য-বুদ্ধির দৃষ্টান্ত লইয়াই উপস্থিত আছে। আমাদের কবি-ভারতী সঙ্গীত কিংবা গীতিকবিতার নিরালম্ব নিরাশ্রয় আকাশমার্গে 'বহুতর' চলিতে জানিলেও, বাস্তবজীবনের রুক্ষ-বন্ধুর উর্ব্বী-বক্ষে কেবল 'স্তোক' মাত্রায় চলিতে পারিতেছেন ; আমাদের ভরত-শিষ্যগণের আদর্শ-দোষও সম্যক্ ঘুচিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি না।

পাষাণীর পর ১৯০২ সনে 'হাসির গান,' এবং ১৯০৩ সনে ক্রমান্বয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' 'সীতা' এবং 'মন্দ্র' প্রকাশিত হয়। পাষাণীর কবি আর একটি মাত্র কাব্য লিখিয়াছিলেন—সীতা। এই কাব্যদ্বয় দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে বলিয়াই আশা করিতেছি। উহাদের শিল্প-আত্মা দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে দুর্লভ এবং দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকিবে। আমরা এখন কেবল সঙ্গীত সাধনাতেই অবস্থিত : ছন্দের সাহায্যে নাটকীয় জীবন অথবা ভাব-সাধনার শক্তিটুকু সুলভ হইয়া পড়িতে, কিংবা উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও দীর্ঘপথ আমাদের সম্মুখে' রহিয়াছে !

পাষাণী প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের সাময়িক পত্রমহলে যে কোলাহল উঠে, তদ্দ্বারা দ্বিজেন্দ্রের হৃদয় এক অভিনব দিকেই উৎসাহ লাভ করে।

প্রতিভার জাগরণ

দেশের হৃদয় এবং জীবনতন্ত্রীর কাছাকাছি আসিয়া উহাকে গভীরভাবে আঘাত করিতে পারে, দৃশ্য-ঘটনা এবং সঙ্গীত। প্রথমটী বস্তু-গত, দ্বিতীয়টী ভাব-গত; সুতরাং নানাদিকে পরস্পরের বিরোধী। কবি দ্বিজেন্দ্র এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সমান অনুপাত এবং সমন্বয়ের উপকরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন—এই ঘটনা আমাদের সাহিত্য-ইতিহাস বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এ সমস্ত সাময়িক বাদানুবাদের শেষফলে কবির আত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল; অতঃপর, তিনি একান্ত ভাবে কেবল দৃশ্য-কাব্যের দিকে,বিশেষতঃ অভিনেয় নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে দেশানুরাগ একটা পরম সমস্যা এবং সাধনার জিনিষ। এদেশের সামাজিক অবস্থা-গতিকে, আধুনিক আদর্শের 'দেশ' বলিয়া কোন কথা যেন আমাদের

ভারতবর্ষে দেশানুরাগ

ছিল না; হিন্দুর পক্ষে নিজের প্রাচীন এবং 'সনাতন' সংজ্ঞার জাতি-ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম, এবং ঐ সমস্তের নিরূপক কতকগুলি আচারের মূর্ত্তিই সারাৎসার ছিল। জন্মভূমি বলিতে পৈতৃক বাস্তুভিটা এবং বিস্তারিত পক্ষে নিজের গ্রাম বা গ্রাম-সমাজই পর্য্যাপ্ত। জাতীয় স্বার্থ বলিতে নিজ নিজ গোত্রগোষ্ঠী, ব্যাপক-পক্ষে কুলের ব্যবসায়গত স্বত্ব-স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ ভাব আমাদের মধ্যে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের 'লোকহিত' 'পরার্থতা' বা 'পঞ্চঋণের' আদর্শও বরং এই

জাতি-স্বার্থ-নিষ্ঠ ধর্ম্মের আদর্শকে ভিত্তি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছিল। ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যেই, তাহাদের বিশেষ সমাজ-অবস্থা গতিকে, গত তিন শত বৎসরের মধ্যে এই অপরূপ 'স্বদেশ' এবং 'জাতি' (nation) আদর্শ মূর্ত্তিমান্ হইয়া একোদ্দিষ্ট সাধনা-বশে পৃথিবীর বক্ষে দিগ্বিজয়ী হইয়া চলিয়াছে! উহা বহু মনুষ্যকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একই 'পোলিটিকেল' বা রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থে সংমিলিত করিয়া, মনুষ্য-সভ্যতার মধ্যে একটী পরম কার্য্যকরী মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটনা করিয়াছে। মুসলমান জাতির, বিশেষতঃ ইংরাজের সম্পর্কে আসিয়া, ভারতের মনুষ্য এই সংহতি-সাধনার দিকে লোলুপতা দেখাইয়া আসিতেছে; নানাদিকে নানাপথে উহার প্রণালী খুঁজিতেছে! অথচ ভারতীয় আর্য্য সমূহের যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জাতিভেদ-বুদ্ধি, অচল আচারধর্ম্ম এবং স্পর্শাস্পর্শ-বিচারের আদর্শই—তথাকথিত 'সনাতন' ধর্ম্মই, উহার প্রধান অন্তরায়। তবু ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, ইয়োরোপীয় আদর্শের এই জাতীয়তা, রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, বা একই দেশসীমার অন্তর্গত মনুষ্য-নিবহের মধ্যে এই সমতা এবং সম-স্বত্ব ও স্বার্থের আদর্শকেই খুঁজিতেছেন। অনেক অটল-বিশ্বাসী হিন্দুও—স্বীকার করুন, আর নাই করুন—উহাকে জীবনরক্ষা-বিষয়ে অপরিহার্য্য জানিয়াই স্বধর্ম্মের ভেদ-আদর্শের বিপরীত পথে এই সমতাকেই খুঁজিতেছেন! বাঙ্গালী কবির হৃদয়ও —প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া কিংবা না বুঝিয়াই হউক—চিরকাল এই স্বদেশ এবং 'জাতি' আদর্শের দিকে তৃষিত দৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছে! নির্দ্দিষ্ট-সীমার অন্তর্গত ভূ-পৃষ্ঠকে তাঁহারা দেশ-মাতা, ভারত-মাতা বঙ্গ-মাতা জন্মভূমি প্রভৃতি নামে লক্ষ্য করিয়া, বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলেরই 'জনক-জননী-জননী' আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক, উহার দিকে দেশবাসী মাত্রেরই প্রীতিস্নেহ-মমতার উচ্ছ্বাস জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন;

উক্ত 'পোলিটিকেল' সীমা-মূর্ত্তিকে ভারতীয় হিন্দুর চিরন্তন শক্তি সাধনা—মাতৃসাধনার সহিত সঙ্গত এবং সম্মিলিত করিয়া, উহাকে পরম গরীয়সী পদবী প্রদান করিয়াছেন! এই দেশমাতার উপাসনা, উহা বর্ত্তমান সভ্যতাসূত্রে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব; সুতরাং আমাদের সাহিত্যের মধ্যেও এই স্বদেশ-রস, সমতা-রস এবং ঐক্য-রসের জন্য পিপাসাও অত্যধিক। দ্বিজেন্দ্রও অতঃপর এই স্বদেশ এবং জাতি-আদর্শকেই নিজের সাহিত্যজীবনের প্রধান সাধনা-রূপে বরণ করিলেন! রাজস্থানের ক্ষত্রিয় ইতিহাস বীর্য্যপূর্ণ প্রতিশোধ-স্পৃহা, কুলগর্ব্ব, কুলগৌরব ও কুলধর্ম্মের রক্ষা-কল্পে অক্লান্ত ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অনাকুল আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ! উহা আধুনিক ইয়োরোপের পোলিটিকেল দেশানুরাগ এবং দেশ প্রাণতার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী; সুতরাং অনায়াসেই উহাকে আধুনিক আদর্শে পরিণামিত করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী লেখক রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনীকে উক্ত আদর্শসাধনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিজেন্দ্রলালও তাহাই করিলেন। ১৯০৪ সালে তারাবাই প্রকাশিত হয়। উহার পর দ্রুতবেগে, ১৯০৫ সালে প্রতাপসিংহ, ১৯০৬ সালে দুর্গাদাস, ১৯০৭ সালে নুরজাহান, ১৯০৮ সালে মেবারপতন আলেখ্য ও সোরাব-রুস্তম, ১৯০৯ সালে সাজাহান। ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, আনন্দবিদায়, এবং তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক "পরপারে" প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কবি মৃত্যুর দুটিঘণ্টা পূর্ব্বেই তাঁহার সিংহল-বিজয়ের 'প্রেসকাপি' পরিদর্শন করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং নিজের সারস্বত সাধনার সাজে-পোষাকেই অক্লান্তকর্ম্মা পুরুষ আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

যুগধর্ম্মের নাটক ও তাঁহাদের আদর্শ

নাটকের দিকে, বিশেষতঃ বঙ্গ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা-উপযোগী অভিনেয় নাটকের দিকে, কবির জীবন আকৃষ্ট হওয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তি এবং সামর্থ্য লইয়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গ-রঙ্গে অবতরণ করেন নাই। এ ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ নানাদিকে তাঁহার সমান-কর্ম্মা এবং সহযোগী থাকিলেও, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যুদয়েই যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে প্রকৃত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জোরের সহিত নির্দ্দেশ করা যায়।

এ সমস্ত নাটক ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর ইংরাজী নাটকের আদর্শেই বিরচিত! প্রবল দেশানুরাগ বা প্রবল ব্যক্তিত্বশীল বীর্য্য কথা এবং আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ব্যক্তিগত চরিত্রের সদাত্ম বা দুরাত্ম ভাবের সরল এবং উজ্জ্বলচিত্র-সাহায্যে মনুষ্য-হৃদয়ের হ্লাদিনী-বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করাই দ্বিজেন্দ্রের এ সকল নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। আপামর সাধারণের হৃদয়কে লক্ষ্য রাখার কারণেই উহারা গদ্যে বিরচিত। সুতরাং তন্মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের তাত্ত্বিকতা, তত্ত্ববুদ্ধি বা ঐ বুদ্ধির গহনা মতি-গতি কদাচিৎ অনুসৃত হইতে পারিয়াছে। ঘটনাচক্রের কিংবা নাটকীয় উদ্দেশ্যের সমাধান বিষয়েও, তাই উহারা কোনরূপ তত্ত্ব-আদর্শকে লক্ষ্য করে না; না করিয়াও, কেবল মনুষ্যহৃদয়ের সাধারণ বা সহজাত ভাব-প্রবৃত্তি (Passion) গুলির উপর নির্ভর করিয়াই উহারা সর্ব্বত্র তরল-মধুর এবং মনোমদ হইয়া বাঙ্গালী রঙ্গ-চরগণকে একচ্ছত্রে অধিকার করিয়াছে!

এই ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের একবার মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় এবং আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। প্রথম আলাপের দিনেই, তাঁহার সঙ্গে বেগতিক তর্কযুদ্ধে মাতিয়া যাইতে বাধ্য হই। তাঁহার মত এই ছিল যে—কাব্য স্বভাবের অনুকরণ বই নহে—

Poetry is imitation of nature ; সুতরাং পদ্য-নাটক তিনি অস্বাভাবিক বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন ! বলা বাহুল্য, আধুনিক ইয়োরোপেও অনেকে উক্ত আদর্শ পোষণ করেন। স্বয়ং ঈবসেন, মধ্যজীবনের সামাজিক নাট্যলেখক ঈবসেনও উক্ত আদর্শ খ্যাপন পূর্ব্বক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিয়াছেন। অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে গদ্যাত্মক, উপরন্তু অভিনেয় নাটকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং অপরিহার্য্য ছিল বলিয়াই মনে করিতেছি।

অবশ্য, বলিতে হয় যে, রীতিবিষয়ে উভয়ে একমত হইলেও ঈবসেনের সহিত দ্বিজেন্দ্রের অন্য কোন বিষয়ে সাধর্ম্ম্য নাই। উভয়ের দৃষ্টি-স্থান, শক্তি, আদর্শ, এবং প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সমাজের দোষোদ্‌ঘাটন, সামাজিক সমস্যা-পূরণ প্রভৃতি আধুনিক ইয়োরোপের তাত্ত্বিকতা এবং ন্যূনাধিক জ্ঞান-প্রধান (intellectuality) শিল্প-আদর্শের বশীভূত হইয়া নরোয়ের কবি দ্বিজেন্দ্রের বিপরীত বর্ণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে মনুষ্য-চরিত্রের কেবল মহনীয় অংশে এবং মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়াই বিভোর ! দ্বিজেন্দ্রের প্রথম সামাজিক নাটক ‘পরপারে’ সমাজ আদর্শকে সম্মুখে রাখিলেও, উহা ইয়োরোপীয় নিয়মের সমস্যামূলক নাটক বা problem drama নহে ; উহার সমাধান কোনরূপ প্রতিজ্ঞা কিংবা প্রতিপাদ্য লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। বঙ্গের আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি এবং দম্পতির মিলন-সমস্যা প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিলেও,উহার ফলশ্রুতির মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-প্রতিপাদক অভিসন্ধি যথোচিত মতে প্রবল হয় নাই। হয়ত, প্রথম রচনা বলিয়াই, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় সমাজ-সমস্যার কোনরূপ গভীর ধারণাও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই। এই সমস্ত সর্ব্বতোভাবে কেবল ভাব-প্রধান আদর্শের নাটক (passion drama); পাত্রগণকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা-চক্রে এবং ভাবাবেগ-বশে পরিচালিত করিয়া,পাঠকের রসানন্দ বিধান

করাই উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নানাদিকে অতুলনীয় ভাবে সিদ্ধ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গের আধুনিক নাট্যরসিকের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন।

কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন সফলতাই যোগ্যতারই পরিমাপক —Success is the only test of merit.

উহাদের প্রতিষ্ঠা কালিদাসও কহিয়াছেন, "আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্"। বলা বাহুল্য, মনোজ্ঞ হইলেও, সূত্রদ্বয়ের কোনটিই প্রকৃত মীমাংসা উপস্থিত করে না। সাফল্য কি, বা বিদ্বান্ কাহাকে বুঝিব ? দেশকালের কোন অংশবিশেষকে ধরিয়া সাফল্যের এবং পাত্রসমূহকে লইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর ধারণা করিব ? পণ্ডিত টলষ্টয় তাঁহার what is art প্রসঙ্গে এ-জাতীয় প্রশ্ন লইয়াই অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন; কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, প্রকৃত মীমাংসাকে দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে না পারিলেও, সাহিত্যে উক্ত আদর্শের বিচারই চিরকাল প্রচলিত। প্রত্যেকে আপনাপন হৃদয়-প্রত্যক্ষের সাহায্যে বিচার করিতে থাকিলেও, নিজের বহিঃ-স্থিত মণ্ডলীর উপরেই চরম বিচার-টুকু রাখিয়া দেন; 'নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী'র দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রকৃত বিচার-অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। সাহিত্যে উপরোক্ত সাফল্য-ধারণার পক্ষে কিছুকাল অতীত হওয়া এবং বহু বিদ্বানের মনোগত অভিমত স্পষ্টবাক্যে সংগৃহীত হওয়া চাই। মোটের উপর, বহু গুণজ্ঞ সমালোচকের ব্যাখ্যান, আলোচনা, অনুরক্তি এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রশস্তি ব্যতীত কোন কবি কিংবা কাব্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মপরিচয় করিতে বা আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থির করিতে পারে না। সাহিত্যে গণতন্ত্রই সবিশেষ প্রবল বলিয়া, উহার বিচার-মাত্রেই বহুত্বের অপেক্ষা করে। ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং নিঃসন্দেহ হইতে

পারিলেও, এ ক্ষেত্রে রায় প্রকাশের সময়, দশের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, "বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ,"। দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি ভাল লাগে কিনা, প্রত্যেক পাঠকেই বলিতে পারিবেন; কিন্তু, 'কি পরিমাণ ভাল লাগে এবং ভাল লাগা উচিত কি না,' উহাই সাহিত্য-বিচারের প্রণালী। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই উহাদের রস-নিষ্পত্তিগত দোষগুণ ন্যূনাধিক চিনিয়া লইতে পারিবেন; কিন্তু উহাদের শিল্প-প্রতিপত্তি কিংবা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সহজেই সঙ্কুচিত হইবেন। কেননা, শত দোষ সত্ত্বেও, কেবল একমাত্র দুর্ল্লভ গুণের কারণেই অনেক কবি এবং কাব্যকে সাহিত্য-ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা নামক ব্যাপারটি অনেক সময়ে দোষের বাহুল্যকে আদবেই গণনা করে না। বহু সহৃদয় ব্যক্তির প্রকাশ্য অভিমত এবং অজুহাত সঞ্চিত হইয়াই দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির সুলভতা কিংবা দুর্ল্লভতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে; এবং ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর আগ্রহের উপরেই উহাদের জীবন-তত্ত্ব কিংবা প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব নির্ভর করিবে।

তবে বর্ত্তমান কালেও প্রকৃত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাঁহার সাহিত্য-জীবন এবং চরিত্রকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিতে হইলে, এ সমস্ত নাটকের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই সমস্ত নাটক দ্বিজেন্দ্রের পরিণত বুদ্ধি, হৃদয় এবং দীর্ঘকালের জীবন-সাধনার ফল। উহারা সাধারণ্যে বহু মতে পূজিত এবং পুনঃপুনঃ মুদ্রিত হইতেছে! উহাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করা কাহারও সাধ্য নহে।

তবে সাহস করিয়াই ব'লতে পারি যে, সাধারণের দিকে দৃষ্টি রাখার দরুণ, দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির প্রধান দোষ বা গুণ প্রায় সমস্তই সাধারণের গুণ বা দোষ হইতেই সম্ভূত হইয়াছে; সুতরাং, উহার গতিকেই তাহাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকাল অক্ষুন্ন থাকিতে পারিবে। কাব্যকলায়

হিসাবে উঁহাদের প্রধান দোষ হয়ত, ঘটনা-দৃশ্যের বাহুল্য, ঘটনাচক্রের মধ্যে এবং তদ্দ্বারা আবর্ত্তিত চরিত্রগুলির মধ্যেও একটা দৃঢ়-সম্বদ্ধ ক্রমিক পরিণতি-সূত্রের অভাব; চরিত্রের অঙ্কন কিংবা উপস্থাপনের মধ্যেও হয়ত, পরস্পর-সহায়তার একটা ঘনীভূত কিংবা চূড়ান্ত ফলের দিকেও লেখকের দৃষ্টি সবিশেষ নিবদ্ধ নহে! প্রত্যেক দৃশ্যকে কোন-না-কোন রূপে চিত্তাকর্ষক করিয়া শেষ করিতে পারিলেই, হয়ত কবির 'প্রয়োগবিজ্ঞান' চরিতার্থ হইয়াছে। পাঠকের অন্তরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া – মর্ম্মপটে উপচীয়মান চিত্রের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কবি হয়ত অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গীয় দৃশ্য-চাকৃচিক্য-সৃজনের দিকেই অবহিত! কিন্তু এই সমস্ত শিল্প-দোষ সাধারণের প্রীতিজনক কিংবা শিক্ষাসাধক দৃশ্যকাব্যমাত্রেরই দোষে-গুণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। আবার ভাবুক বা সঙ্গীত-সাধক কবিমাত্রেরই হয়ত ইহা সাধারণ দোষ; এবং অনেক সময় দোষটিই প্রগুণতা লাভপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা সাধারণ্যে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। তাঁহারা মনোন্মাদী ভাব কিংবা প্রাঞ্জল বাহ্যচিত্র উপস্থাপিত করিয়া, ভাবুকতার উদ্দাম তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় সামাজিকের হৃদয়কে নর্ত্তিত করিয়াই তাহাদিগকে আবিষ্ট রাখেন! এই অবস্থায়, কাব্যকলার নিখুঁত শিল্প-আদর্শ কিংবা অনবদ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে পোষায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রধানতঃ সঙ্গীত কবি; এখন বঙ্গসাহিত্যে গীতি কবিতার বা সঙ্গীত-ভাব-সাধক কবিতারই যুগ। বলা বাহুল্য, আমাদের নিরেট গদ্যসাহিত্যে পর্য্যন্ত, আমাদের জাতীয় হৃদয়ের চিরন্তন লক্ষণ-গত এই ভাবুকতার 'রং ধরিতে' আরম্ভ করিয়াছে! দ্বিজেন্দ্র এইরূপ সঙ্গীত-কবির হৃদয়টুকু লইয়াই স্বদেশী জীবন-সাধনার কঠিন মৃত্তিকায় অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলেই

দ্বিজেন্দ্রের শিল্পদোষ

হয়ত জীবনের শক্ত বস্তুটাকে ন্যূনাধিক শক্তভাবে ধরিয়া উহার উপরে ভাবের রং ফলাইয়াছেন; আমাদের নাট্য সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বস্তু-সাধনার ক্ষেত্রেও, বিশিষ্ট মনস্বিতার পরিচয় মুদ্রিত করিতে পারিয়াছেন! কিন্তু, ভিতরে দৃষ্টি করিলেই বুঝিবেন, তাঁহার সমস্তই বিশেষভাবে সঙ্গীত-অধিকারের প্রণালী! অনেক সময় তিনি সঙ্গীত প্রতিভার লীলাসূত্ররূপেই যেন এক একটী দৃশ্য গ্রহণ করিয়াছেন; এবঞ্চ, সঙ্গীতগুলির সার্থকতা-উদ্দেশ্যেই দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে ছুটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় পাত্রগুলির কথাবার্ত্তার মধ্যেও অনেক স্থানে সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছ্বাস এবং রসোদ্গারই লক্ষ্য করিবেন; সময় সময় এক একটি কথা অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভাসের ন্যায়, সঙ্গীতের আকস্মিক আভোগ-মূর্চ্ছনার ন্যায়, উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট করিয়াই হয়ত অচিরে বিলীন হইতেছে! এ সমস্ত নাটকের বাক্যরীতির মধ্যেও, সর্ব্বত্র এমন একটি তীক্ষ্ণ দীপ্তি এবং স্বল্প-নিশ্বাসযুক্ত স্ফূর্ত্তি আছে যে, সঙ্গীতের আকস্মিকতা দেখাইয়া, মুহূর্ত্তমৃত সঙ্কেত বা ক্ষণভঙ্গুর আভাষ মাত্র দিয়াই হয়ত উহা ম্রিয়মাণ হইতে থাকে! কিন্তু এই সমস্ত গুণ বা দোষের কারণেই হয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল অপরিহার্য্যতা লাভ করিয়া সাধারণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতিভা এবং প্রতিষ্ঠার এই সমস্ত লক্ষণ হয়ত এক কালে, নিপুণ সাহিত্য-রসিকের চক্ষে, এই সকল নাটকের শিল্পগৌরব বেশীকম খর্ব্ব করিতে থাকিবে; এবং যোগ্যতর শিল্পী বা কুশলী কর্ত্তৃক এই ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও কোন কালে পরিহার করিতে পারিবে না!

দ্বিজেন্দ্র ও শীলার

অনবদ্য শিল্পঘটনা পরম সৌভাগ্যের কথা, কে সন্দেহ করিবে? কিন্তু

কেবল শক্তি-সংস্থান হইতেই এ সৌভাগ্য ঘটে না! জগতের কয়জন কবি এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন? নিজের শিল্প-প্রতিভার যোগ্যতাবশে, অথবা অদৃষ্ট-দেবতার অনুরূপ গতিবশেই হোক, দ্বিজেন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী আমরা, আমাদের জাতীয় জীবনের হিসাব-গ্রন্থে ঐ ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহে লাভ উদ্বর্ত্ত করিয়াছি। তারাবাই, দুর্গাদাস,রাণা প্রতাপ বা মেবার-পতনের মধ্যে হয়ত (এই রূপ নাটক-রচনার শীর্ষ স্থানীয়) শীলারের ওয়ালেনষ্টাইন (Wallenstein), উইলিয়াম টেল (William Tell) বা জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc) এর ন্যায় স্থির-সংযত কবিত্ব-প্রতিভা বা সুনিপুণ আদর্শ-সাধনা নাই; কিন্তু, তথাপি, উহারা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক! প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়ই তাহার সাক্ষ্য দিবে। শীলারের সমসাময়িক জর্ম্মণ জাতির মধ্যে জাতীয়তার জন্য তৃষ্ণা আমাদের ন্যায় এত প্রবল ছিল না; জর্ম্মণীর সামাজিকগণও আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর ছিলেন। শীলার তাঁহার বিষয়গুলির দিকে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। শীলারের পক্ষে যাহা ন্যূনাধিক বুদ্ধি-ব্যবসায়গত সৌন্দর্য্যসমাধানে পরিণত হইয়াছিল, অবস্থা-গতিকে দ্বিজেন্দ্রের পক্ষে তাহাই জাতীয় অভাব-পূরণের দুর্ব্বিষহ ক্ষুধা এবং অবিরাম 'দেহি দেহি' আহ্বানের পরিবেশন কার্য্যেই পরিসমাপ্ত! জর্ম্মণীর পক্ষে যাহা সাহিত্যরসের উপভোগমাত্র, আমাদের পক্ষে তাহাই অনিবার্য্য তৃষ্ণা! সাহিত্য-আদর্শকে গুণীভূত করিয়াও, এই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধনটি দ্বিজেন্দ্রের পক্ষে আসন্ন ছিল! জগতের অন্য কোন সভ্যজাতির অবস্থাই আমাদের সঙ্গে তুলনীয় নহে।

কিন্তু, স্থায়ী সাহিত্যের রীতি কিংবা আদর্শে নিষ্ঠা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র শীলারের সমকক্ষ না হইলেও, পরিব্যাপ্ত মহত্ব এবং পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছ্বা-

সের ঘটনায় স্বদেশের এবং জাতীয়ত্ব-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শীলারকেও অতিক্রম করিয়াছেন ; এবং এই বিষয়ে, তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'মেবার-পতন' যে অতুলনীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। এই কাব্যের "মেবার পাহাড়—মেবার পাহাড়" হইতে আরম্ভ করিয়া, "আবার তোরা মানুষ হ" বলিয়া পরিশেষের মধ্যে, এমন একটী হৃদয়োচ্ছ্বাস, এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে-পাকে এমন অপরূপ আলোক-মধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ, এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা সুমার্জ্জিত দীপ্তি আছে যে, ভারতের জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, উহাকে তাঁহার এই-যুগের সর্ব্ব-গুণ-ঘনীভূত 'শ্রেষ্ঠ প্রকাশ' বলিয়া নিঃসন্দেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়! আমাদের জাতীয় জীবন-সাধনার চিরস্থায়ী সাহিত্য-ভাণ্ডারে উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতেও ইচ্ছা হয়!

দেশপ্রাণতা এবং জাতীয়তা! নীতি, ধর্ম্ম এবং সমাজের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ! দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি এই সকল আদর্শের ভাবোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালীকে যেই শিক্ষাদান করিয়াছে, সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইরূপে লোকশিক্ষক হওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এই সকল নাটক চিরকাল বাঙ্গালীর সমুন্নত ভাব-প্রয়াণের গুরু এবং সহযাত্রী হইয়া থাকিবে! কবি এইরূপ পুণ্যব্রত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, উহাদের মধ্যে মনুষ্য-হৃদয়ের কিংবা তাহার মেরুদণ্ডের অবসাদক কোনরূপ পরামর্শ বা ইঙ্গিত-ঈষারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই ; নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় He utterred nothing base. দ্বিজেন্দ্র যে সমস্ত দৃশ্যপরিকল্পনার সাহায্যে এই সকল নাটকের ভাব-প্রাণতা সিদ্ধ করিয়াছেন, সে সমস্ত অনেক দিকেই বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়! ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বা যোগ্যতর পরবর্ত্তী কর্তৃক

কখনো নির্জ্জিত হইবার আশঙ্কা ভবিষ্যতের অন্ধ গহ্বরেই নিহিত থাকুক! বর্ত্তমানের অভিনয়-রঙ্গে এবং জাতীয়তার প্রত্যক্ষ-শিক্ষা-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী!

নাটকের মধ্যে ভারতীয় লক্ষণ

পূর্ব্বোক্ত মতে, দেশধর্ম্ম, দেশপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং তৎকল্পে আত্মোৎসর্গের আদর্শকে—ন্যূনাধিক নীতি-অধিকারের আদর্শকে—উপজীব্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলি পাত্রগণের সুপরিচ্ছন্ন এবং সুদৃঢ় চরিত্র-রেখা উপস্থাপন পূর্ব্বক হৃদয়ে মুদ্রিত হইতেছে—মনুষ্যমনকে নির্জ্জীবতা এবং জড়িমা হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছে! দ্বিজেন্দ্রের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির পরিকল্পনাও (study) কি শ্রেষ্ঠ কবির যোগ্য নহে! তাঁহার নুরজাহান, আরংজেব বা চাণক্য! উহারা এলিজাবেথ যুগের দুরাত্মা-চরিত্র fiend) হইতে কতদিকে সমুন্নত, অথচ উহারা মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সত্যকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়াছে! এই study সম্পূর্ণ আধুনিক। উহারা ভারতবর্ষীয়—এবং এই ক্ষেত্রে সাহিত্য জগতে অতুলনীয়! 'নির্জলা' দুরাত্মতা, কোন রূপ পুণ্যসম্পর্কহীন দুর্বৃত্ত চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল কৌতুক-রসিক; কিন্তু এই কৌতুক ততটা বুদ্ধি-অধিকারের নহে; তাঁহার হাস্যোল্লাস সর্ব্বথা হৃদয় হইতে, নিজের সদয় সহৃদয়তা হইতেই উৎসারিত। তিনি বার-বনিতাকে পর্য্যন্ত মহত্বের আলোকে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন! এই লক্ষণটুকুর মধ্যেই লোকটীর অধ্যাত্ম চরিত্রের রহস্যতত্ত্ব নিহিত আছে। তাঁহার নীতি-উপদেশও কুত্রাপি উপদেষ্টার অহংকৃত উচ্চ আসন হইতে, কিংবা ঘৃণা-বিকৃত মুখ-রন্ধ্র হইতে বহির্গত হয় না! তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যেও নিখুঁত দুরাত্মা বা 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' জাতীয় স্ত্রী নাই! রমণীজাতির প্রতি একটা অন্তর্নিহিত সম্মানের ভাব

হইতেই যেন তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রগুলি অঙ্কিত! কমলমণি, গিরিজায়া কিংবা শান্তি জাতীয় স্ত্রী-লোকই তাঁহার লেখনীমুখে পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতেছে! মনুষ্যচরিত্রের অবিমিশ্র দুরাত্ম-ভাব যেন তাঁহার দৃষ্টির পক্ষে অ-দৃশ্য।

ইহা ভারতীয় দৃষ্টি—এবং ভারতীয় সমাজের অতর্কিত ফল! যে দৃষ্টি মনুষ্য-জন্মকে প্রকট পুণ্যফলরূপে—জীবত্বের উদ্গতিসূত্রে সমুন্নত প্রাপ্তি বলিয়া ধারণা করে! যে দৃষ্টি রাবণাদিকে, দুর্গাসুর, মহিষাসুর প্রভৃতি ব্যতিক্রমকেও জন্মান্তর বাদ এবং অভিশাপ্-পতন প্রভৃতির সাহায্যে পুণ্য-অভিব্যক্তি-সূত্রের সহিত, বিশ্বনীতির সহিত সঙ্গত করিয়া লইতে চেষ্টা করে! ভারতবর্ষীয় সমাজে নিরবচ্ছিন্ন দুরাত্মতার সম্ভাবনাও দুর্ঘট! সমাজবন্ধনের বিশেষ আদর্শফলে এই সমাজে মধ্যম-শ্রেণীর ব্যক্তিসংখ্যাই অধিক; তাই ভারতবর্ষ বর্ত্তমান মানব-সভ্যতার সূত্রে কেবল মধ্য-পথসেবী এবং স্থিতিশীল। এই অতর্কিত আদর্শ এবং সমাজ-পরিবেশের কারণেই দ্বিজেন্দ্রের দুরাত্মা-সমূহ তৃতীয় রিচার্ড বা আয়াগো, লেডী ম্যাক্‌বেথ, গনিরীল্ বা রীগাণ হইতে পারে নাই। এই লক্ষণটুকুর মধ্যে সমগ্র লোকটার অধ্যাত্ম চরিত্রের গুপ্তরহস্য নিহিত! এই রঙ্গ-প্রিয় এবং ভিতর-বাহির-খোলা, এই দোষে-গুণে সরল এবং সহৃদয় ব্যক্তিই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল! প্রথম পরিচয় এবং আলাপের দিনেই মানুষটী তাহার সমগ্র চরিত্র নিরাবরণ করিয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল! মনুষ্যত্বের হিসাবেও ইহা পরম দুর্ল্লভ গুণ বলিয়া মনে করি।

দ্বিজেন্দ্রের সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা

অন্তশ্চরিত্রের এই ভাবসমুন্নত সরলতা হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সর্ব্বত্র ভাবোন্নত উচ্ছ্বাসের লক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে! উহা সম্পূর্ণ আধুনিকতার সম্পত্তি! এবং উহা বিশ্বসাহিত্যের আধুনিকতা!

ইংরাজীর ভিতর দিয়া, এতদ্দেশের পূর্ব্বাপর কবিগণের ভিতর দিয়া, ইহা বঙ্গসাহিত্যে ন্যূনাধিক সাধারণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্র এই সাধারণতার ক্ষেত্র হইতেই নিজের অনন্য-সামান্য ব্যক্তিত্ব সিদ্ধি করিয়াছিলেন! তাঁহার ব্যক্তিত্বের এই মূল লক্ষণটুকুই সাহিত্যকলার অধিকারে সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা নামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা নামক কথাটি, সাধারণ কবিতা-লেখকের পক্ষে, অনেকসময় প্রথমযৌবনের শারীরিক উত্তেজনা-জনিত 'আনচান' বই নহে—মানসিক বিকার—ইন্দ্রিয় জন্য বিকার! এইরূপ অবস্থাকেই প্রাচীন কবির ভাষায় বলা যায়—

যদাভূৎ অজ্ঞানং স্মর-তিমিরমোহান্ধজনিতম্
তদাপশ্যং সর্ব্বং নারীময়মশেষং জগদিদম্।

এই যৌন তৃষ্ণাকে স্পষ্ট বর্ণনা কিংবা অস্পষ্ট ইঙ্গিতের সাহায্যে সংকেতিত করিয়া মনুষ্যদেহের স্নায়ুগত উত্তেজনা-সাধনকেই সাধারণ লোক 'আদি রস' বলিয়া ভুল করে—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বলিয়া মনে করে। কেবল বেচারা ভারতচন্দ্রের দোষ দিলে চলিবে না, অবস্থা-গতিকে অনেক বড় বড় কবির বেলাতেও এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে! দ্বিজেন্দ্র মনুষ্য-হৃদয়ের মূল ভাববৃত্তিগুলির উপরেই ভিত্তিস্থাপন পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমন্দির পরমের দিকে—মহৎ বৃহৎ এবং প্রসারিতের দিকে উত্তোলিত করিয়াছেন। উহা চূড়া-শীর্ষে "কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" বলিয়া আত্মবিলয় না করিলেও 'জগদ্ধিতায়' বলিয়াই আত্মোৎসর্গ করিতেছে! রসজ্ঞ মাত্রেই বুঝিবেন, "জগদ্ধিতায়" এবং "কৃষ্ণায়" কত অভিন্নভাবে এবং অপরিহার্য্যভাবেই সম্বদ্ধ! সৌন্দর্য্যের সাধক এতদুভয়ের যে-কোনটি অবলম্বন করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিজেন্দ্রের সাধনপ্রণালী কিংবা সমাধান শ্রেষ্ঠ কবি-কৌলিন্যের যোগ্য কি না তদ্বিষয়ে বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহ

হইতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চিতমতে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবি-কৃত্যমধ্যে কোথাও উৎপথ-গামিতার পরিচয় নাই।

ঘননিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, স্থিরসংযত দৃষ্টি, ভাব-রসের স্থিরপ্রবাহিত প্রকাণ্ড কিংবা গভীর উচ্ছ্বাস, বিপুলগভীর কিংবা পরিণাহী চরিত্র-অঙ্কন, উপরন্তু এ সমস্তের নিয়ামক-স্বরূপ সমস্ত কাব্যের অন্তরঙ্গীয় একটী সত্য-সন্ধ মূললক্ষ্য—এক কথায় অসাধারণ চমৎকারিত্ব-বিধায়িনী কবিত্ব-প্রতিভাই কবিকে সাহিত্য-জগতের স্রোতোমধ্যে অটল করিয়া কৌলিন্য প্রদান করে। বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিমাণে কিংবা সংখ্যায় স্বল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যে একটি কবি-প্রতিভা অসাধারণ শক্তি-ক্রীড়া দেখাইয়া অকালে অন্তর্হিত হইয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যের সাধারণ সমতল নানাদিকে উন্নমিত করিয়া গেল, এই সাহিত্যের উপরিস্তরের স্বল্পসংখ্যক মহাজন-নামের তালিকামধ্যে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়া গেল, আমাদের ইতিহাস তাহা কোনও কালে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দ্বিজেন্দ্রের রীতি এবং উহার অপরিহার্য্য ফল 'অস্পষ্টতা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

দ্বিজেন্দ্রের 'এবারত' বা রীতির মধ্যে যেমন একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাঁহার চরিত্রাঙ্কন প্রণালীর মধ্যেও তেমনি একটা সুমার্জ্জিত সীমা-পরিচিহ্ন এবং রেখা ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য! সময়-সময় দৃঢ়-চঞ্চল অথচ বৃহৎ তুলিকা সঞ্চালনে বর্ণসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করার অপরূপ ক্ষমতাও প্রত্যক্ষ হইবে! বঙ্গসাহিত্যে এই-জাতীয় আর একজন শিল্পী গিয়াছেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। এ সাহিত্যে বঙ্কিমগুণের উত্তরাধিকারী কেহ থাকিলে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল। এ কারণেই দৃঢ় এবং বৃহৎ-তুলি-শিল্পী, স্পষ্টশিল্পী দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গসাহিত্যের সূক্ষ্মশিল্পী

এবং রেখা-আভাস-শিল্পিগণের—'অস্পষ্ট'তা-শিল্পিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। নিজের অধ্যাত্ম প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, (নানাদিকে উহা অপরিহার্য্য ছিল বলিয়াই) এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা জানি দ্বিজেন্দ্রের উক্ত কার্য্যকে নানাজনে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে কেবল দলাদলির ভাব কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়া কটাক্ষ করিতেও কসুর করে নাই! আমাদের মধ্যে চিরকাল সামাজিক দলাদলির ঝোঁক প্রবল বলিয়া সাহিত্যের spirit, সাহিত্য-আচার বা সাহিত্যসাধনার নিঃস্বার্থ ভাব অধিকাংশ লোকেই বুঝে না; অনেকে 'সমালোচনা' জিনিষটাও বুঝে না। সাহিত্যে লেখকের বিশিষ্টতা এবং স্বরূপ-নির্ণয়ের পক্ষে, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা এমন-কি প্রশস্তির পক্ষেও দোষবিচার অপরিহার্য্য! সাহিত্য কি পদার্থ, উহার ভালমন্দ বা দোষগুণ সমগ্র 'জাতির অদৃষ্টকে' নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া,ঐ ভালমন্দকে কিরূপ 'নাছোড়-বান্দা' ভাবেই সমালোচনা করিতে হয়,আমরা তাহা বুঝিতে পারি না; সাহিত্য-সমালোচনাকেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের আমলে আনিয়াই গ্রহণ করি। এখন দ্বিজেন্দ্রলাল নাই, সুতরাং আলোচনার মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিগত 'ফোঁড়' থাকিলে তাহাও অন্তর্হিত। কিন্তু, আমরা দেখিতে[illegible], দ্বিজেন্দ্রের স্বকীয় শিল্প-আদর্শের হিসাবে, উক্তরূপ প্রতিষেধ উচ্চারণ না করাটিই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল! নিজের বিপরীত সাহিত্য-আদর্শ[illegible] কেবল 'মৃকার্পিতাঙ্গুলিসংখ্যয়ৈব' 'পাশ-কাটিয়া যাওয়া' তাঁহার পক্ষে অস[illegible] ছিল। বরং এই কার্য্যে তাঁহার স্বকীয় বিশ্বাস-অনুগত সাহসের পরিচয়টি পাইতেছি! উহা হইতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ দাঁড়াইয়াছে। আর, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইলেই বা কি? জগতে, বিশেষতঃ সাহিত্য-জগতে এ[illegible] স্বার্থপরতা নাই যদ্দ্বারা পরার্থও বিশেষভাবে লক্ষিত না হইয়া পারে! সাহিত্যজগতে ইহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে! ইংরাজী নবেলের ইতিহাসে

দেখিবেন, রিচার্ডসন, স্মোলেট ফীল্ডিং-ইহারা কেমন ক্রমান্বয়ে, একে-অন্যের আদর্শকে প্রতিষিদ্ধ করিয়া, একে-অন্যের রচনার বিকৃতি বা সং দেখাইয়াও, সমগ্র ইংরাজী সাহিত্যের নবেলের শিল্প-কলাকে অপূর্ব্ব-ক্ষেত্রে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন!

বরঞ্চ, দ্বিজেন্দ্রলালের এই কার্য্যকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের একটি সবিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়াই মনে করি। বঙ্গসাহিত্যে দুইটি ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকিবে, যদ্দ্বারা এই সাহিত্যের জীবন বিশেষভাবে অগ্রসর করিয়াছে! অশেষ শুভই সাধিত হইয়াছে! প্রথম, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা হৃদয় খুলিয়া মধুসূদনের সমর্থন; দ্বিতীয়, দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক হৃদয় খুলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রণালী-বিশেষের প্রতিষেধ। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আসন্ন পক্ষগণের কিছুমাত্র লাভ নাই; বরং ব্যক্তিগত প্রীতি-সম্পর্কের হিসাবে সবিশেষ ক্ষতি। প্রকৃত কবিমাত্রেই নিজের সজ্ঞান-জাগ্রত এবং অপরিহার্য্য দোষ-গুণেই কবি। বিপক্ষীয় সমালোচনা কিংবা 'গালাগালি' দ্বারাও কোন গঠিত-চরিত্র প্রকৃত কবির বিশেষ কোনরূপ উপকার ঘটে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকসংঘ, বিশেষতঃ এই সাহিত্যের সেবকবৃন্দ উক্ত কার্য্য হইতে যথেষ্ট মতে লাভবান্ হইয়াছে! এই লাভের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে—কিন্তু বঙ্গের সচেতন সাহিত্যসেবিমাত্রেই আমাদের কথায় 'সায় দিবেন' বলিয়াই মনে করি। এই বিদ্রোহ অত্যন্ত সুসময়ে উত্থিত হইয়া নিঃসম্পর্ক পাঠক যাহারা—তটস্থ যাহারা—যাহারা অগঠিত মতি—যাহারা ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যশিল্পের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ বা 'থিওরী' জানে না—চরমপন্থী আদর্শগুলির 'বভিন্নতাও বুঝে না—যাহারা অজ্ঞান এবং অসতর্ক তাহাদের—এক কথায় আমরা সর্ব্বসাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছে! যাহাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তাহাদের অনেকেই সতর্ক হইয়া গিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রলাল সাহস করিয়া বলিয়াছেন, কাব্যে স্থায়শাস্ত্রটাকে মানিয়া চলা একান্ত আবশ্যক—এবং রবীন্দ্রনাথ সময় সময় স্থায়শাস্ত্রকে পদদলিত করেন! রবীন্দ্রনাথও ততোহধিক সাহসের সহিত বলিয়াছেন, স্থায়-শাস্ত্রকে মানিয়া চলিতে গেলে সকল সময় ভাল কবিতা হয় না! উভয় সাহসিকতার মধ্য হইতেই আমরা লাভ উদ্বৃত্ত করিয়াছি।

সাহিত্যে কবির প্রতিষ্ঠা

ব্যারেট ব্রাউনীং কাব্যের ছন্দঃশাস্ত্রকে ফ্লোরেন্সের সাগরজলে ডুবাইয়াছিলেন, তবু তিনিই আজ ইংলণ্ডের মহিলা মহলের শ্রেষ্ঠ কবি! পরম ছন্দঃঐশ্বর্য্য-শালিনী খ্রীষ্টানা রসেটী বা বিপুল শক্তিসামর্থ্য-বতা ফেলিসীয়া হীমেন্স্ এই পদবী লাভ করিতে পারেন নাই! কবি কীট্স্ ইংরাজী শব্দশাস্ত্রকে "পদ্মবনে মত্তকরী সম" বিদলিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তগণেও স্বীকার করেন! স্বয়ং বায়রণ এইরূপে Queen's Englishকে খুন করার দৃষ্টান্ত আছে! তবু ইহাঁরা চিরকালের বরণীয় কবি! পাঠকগণ অম্লানমুখে তাঁহাদের এই সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াই, তাঁহাদের কবিতার বিশিষ্ট রস-ভোগে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজী বিদ্যালয়ে কীট্স্ ও বায়রণ অধীত হইতেছে—মুখবন্ধে মাথার দিব্য দিয়া বলা হইয়াছে—"সাবধান, ইহাঁরা কিন্তু এইরূপ উন্মত্ত, বাতুল এবং খুনে!" কিন্তু, তাঁহাদিগকে মাথায় না তুলিয়া উপায় কি? দ্বিতীয় ব্যারেট, দ্বিতীয় কীট্স বা দ্বিতীয় বায়রণ জন্মাইলে ত! আমরা টের পাইয়াছি, সহস্র দোষের সন্নিপাতসত্ত্বেও, কোনও রূপ মহার্ঘতা এবং অসাধারণ বিশিষ্টতার উপরেই কবি-মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা! এই বিশিষ্টতা বা দুর্লভতা লাভ না করিয়া, অপর সহস্রদিকে অশেষবিশেষ গুণগরিমায় একেবারে 'নৈকষ্য' হইলেও কবি-কৌলিন্য লাভে যোগ্যতা জন্মে না! এইরূপ দুর্লভতার অভাবে কতকত গুণী-জ্ঞানী, ভাষা স্থায়শাস্ত্র এবং

ছন্দোবদ্ধ বিষয়ে পরম বিশুদ্ধ গন্ধের কবিও বিস্মৃতিনীরে হারাইয়া গিয়াছেন!

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ভারতীয় বিশেষত্ব।

আমরা এই প্রসঙ্গের বহুস্থানে দ্বিজেন্দ্রকে একজন সঙ্গীত-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও একজন জন্মসিদ্ধ গায়ক; এবং গীতি-জাতীয় প্রতিভার বশবর্ত্তী হইয়াই উভয়ে অতুলনীয় সঙ্গীত-সম্ভারে বঙ্গ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ললিতকলার অধিকারে সঙ্গীতকে কাব্য হইতে একটি স্বতন্ত্র শিল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ফলতঃ, সঙ্গীত বাক্যকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেও, ন্যায়বাদার্থ কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলী অতিক্রম করিয়া, এমন কি কোনরূপ সুস্পষ্ট অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াও, নিজের একটা মাহাত্ম্য এবং চমৎকারিতা সিদ্ধ করিতে পারে। সঙ্গীত-প্রতিভার কবিগণ সাহিত্যের আসরে আসিয়া গান ধরিলেই উহার নাম হয় গীতি কবিতা! অনেক সময় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত-কবিতা বই নহে। এই ভেদটুকু এখন আমাদের পক্ষে পদেপদে মনে রাখা আবশ্যক হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুবাদিত হইয়া ইয়োরোপীয় জাতির সমক্ষে বাঙ্গালীর প্রতিভা প্রমাণিত করিতেছে! 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্টতা-সূচক, বিশেষতঃ ভারতীয় 'বৈষ্ণব' আদর্শের লক্ষণাক্রান্ত অধ্যাত্মভাবের গীতিজাতীয় কবিতায় পূর্ণ! বিলাতের চক্ষে উহা সম্পূর্ণ নূতন না ঠেকিয়া পারে না। কাব্য বিভাগের সূক্ষ্ম-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক মানসিকতা বা বুদ্ধি-উপজীবী (intellectual) শিল্প-আদর্শকে 'সিম্বোলিষ্ট' কবি-সম্প্রদায়ের আদর্শকে অতুলনীয় ভাবে আত্মস্থ করিয়া ভারতের

প্রাচীন দ্বৈত-আদর্শের আধ্যাত্মিকতার সহিত উহাকে সংমিলিত করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় কাব্য-ক্ষেত্রে, এই সিম্বোলিষ্ট্ আদর্শের নেতা মৈতরলিংক্ অপরূপ প্রতিভা, অপিচ অপরূপ উদ্দামতা এবং 'খামখেয়ালী'র বশবর্ত্তী হইয়া 'দৃষ্টিহারা' 'পিলিয়াস এবং মেলিসিন্দা' প্রভৃতি তরলার্থক এবং অপরূপ মুষ্টি-পলাতক ইঙ্গিত-আদর্শের যেই সমস্ত গম্ভকাব্য লিখিয়াছেন, সে সমস্ত যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' বা 'ডাকঘর' প্রভৃতি হইতেও আপনাদের আধ্যাত্মিক সঙ্কেত-সিদ্ধির ক্ষেত্রেই কত দুর্ব্বল, ইয়োরোপীয় খ্রীষ্ঠশিষ্যগণের, বিশেষতঃ বিলাতের বিশেষজ্ঞগণের চক্ষে তাহা স্পষ্ট না হইয়া পারিবে না! ভারতবর্ষ নিজের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতাকে ভালরূপে বুঝিয়া আধুনিক সাহিত্যের 'নামরূপে' উহাকে আকারিত করিতে পারিলে, এই দিকে তাহার জন্ম পরম পূজা-গৌরব-লাভের পন্থা রহিয়াছে! ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। নয় বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য পত্রিকায়, "বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম "প্রাচীন বেদ উপনিষদের যে পাবনী ভাব-ধারা এতকাল আর্য্যরক্তের সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী এখনো জগতের সমক্ষে অনুরূপ সাহিত্যমূর্ত্তি প্রদানে প্রকাশ করিতে পারে নাই। উহা পারিলে সে সমগ্র জগতের বিস্ময়স্থলী হইবে।" আমাদের রামমোহন, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি এবং পরিশেষে এই রবীন্দ্রনাথ বিলাতী খ্রীষ্টানগণের এবং খ্রীষ্টান সাহিত্য-সেবীর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন! * উহার হেতু কি? আমাদের দেশের এই সকল সুপুত্র, উহাদের কোন নাড়ী টিপিয়া, হৃদয়ের কোন রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া, এই সম্মান আদায় করিয়াছেন?

* বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইবার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রঃ সঃ

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙ্গালী কোন্ একটা বিশেষত্বের নির্ভরে দাঁড়াইতে পারেন? এই ঘটনার ভিতরেই উক্ত সমস্ত কথার একটা মীমাংসা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আত্মবোধ এখনো এই দিকে উপযুক্তভাবে বা ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের এই বিলাতযাত্রা একদিকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের পরম সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে! ইহার পর হইতে, ইয়োরোপীয়গণ আগ্রহ সহকারে আমাদের সাহিত্যের মতি-রতি এবং গতি পরিদশন করিতে থাকিবেন! প্রকৃত সহৃদয় থাকিলে, 'সমঝদার' থাকিলে তাহারা ইয়োরোপে আছে! আমাদের দেশে সমালোচনা বলিয়া পদার্থ এখনো জন্মলাভ করে নাই। ইয়োরোপীয় সমঝদারগণের সমক্ষে কর্ম্মফল উপস্থিত করিতে না পারিলে আমাদের আত্ম সম্মান বা প্রকৃত আত্মবোধ জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই! আমাদের সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে দর্শনে সর্ব্বত্র এখন এই অবস্থা! আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-প্রতিভাও পরম মহার্ঘ বলিয়াই মনে করি। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে, সঙ্গীত-কবিতাগুলি চয়ন পূর্ব্বক একটা অপরূপ গীতাঞ্জলি রচনা করিতে পারা যায়! বাস্তবিক এইকালে, চয়ন-গ্রন্থ ব্যতীত, অনেক সাহিত্যিকের প্রকৃত মাহাত্ম্য-জ্ঞানের জন্য যেন অন্য উপায় নাই! মুদ্রাযন্ত্র এবং সাময়িক পত্রিকার অবিশ্রাম দাবী-দাওয়ার মধ্যে পড়িয়া কবিগণ যখন-তখন এবং যাহা-তাহা লিখিতে বাধ্য হইতেছেন। উপযুক্ত পাত্রের দ্বারা, তাঁহাদের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক শিল্পগুলির সংগ্রহ ব্যতীত, সমস্তই এ কালের বিগহন জনতা এবং বেচা-কেনার হলহলার মধ্যে হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য, দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ভারতীয় বিশেষ আদর্শের আধ্যাত্মিক দন্তোদ্গম হইবার সময়-যোগ ঘটে নাই; কিন্তু, তাঁহার সঙ্গীতাত্মক কবিতাগুলি সমূহিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিব তাঁহার মধ্যে একটা 'অনির্ব্বচনীয়' এবং 'চমৎকারী' (এ গুলি সংস্কৃত

সাহিত্য শাস্ত্রের প্রাচীন কথা, ‘অস্পষ্ট’ বলিলে হয়ত দ্বিজেন্দ্রের পরলোকগত আত্মা রুষ্ট হইবেন) রসের সমাধান আছে এবং বিশেষত্ব আছে, যাহাতে এই কবি সঙ্গীত-কাব্য জগতের গণনীয় কবিগণের মধ্যে —সঙ্গীত-ভাব-সাধক কবিগণের মধ্যে, নিজের স্থিরনির্দ্দিষ্ট পদবী লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বা সন্নিহিত বন্ধুগণের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি এই কর্ত্তব্য গ্রহণ পূর্ব্বক, এই চয়নিকা রচনা করিলে, ততোহধিক ইংরাজী ভাষার মধ্যে উহার যথার্থ অনুবাদ প্রকাশ করিলে, কবির চিরস্থায়ী স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্যটিই সমাহিত হইবে।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ

বস্তু-সংক্ষেপ।

১। এইরূপ সংবর্দ্ধনা সভায় সভাপতির কর্ত্তব্য—ইয়োরোপে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনায় বাঙ্গালীর আনন্দ—সাহিত্যে মৃত কবিগণের সহিত জীবিতের তুলনামূলক বিচার অবৈধ—‘শ্রেষ্ঠ কবি’ ‘অদ্বিতীয় কবি’ প্রভৃতি শব্দবিন্যাস আধুনিক সমালোচনায় অবৈধ—কোন মহার্ঘগুণ প্রকাশ করিয়াই কবির মাহাত্ম্য—বর্ত্তমানে রবীন্দ্রের ‘মাহাত্ম্য’ জিজ্ঞাসাই একমাত্র কার্য্য—রবীন্দ্র নাথে আর্য্য-সাহিত্য-প্রতিভার লক্ষণ?—হেগেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সাহিত্যের ত্রিপন্থা—আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যর বিশিষ্ট গুণ—এই সূত্রে রবীন্দ্রের বিশিষ্ট গুণ—ইয়োরোপে রবীন্দ্রের বিশিষ্টতার পরিচয়—গীতাঞ্জলির বিশিষ্টতা—ইয়োরোপীয় সমালোচক কর্ত্তৃক রবীন্দ্রের গুণালোচনা—‘কেল্‌টিক’ ও সিম্বোলিষ্ট সাহিত্য-রীতির সহিত রবি-রীতির সাধর্ম্ম্য ও তদ্দ্বারা ইয়োরোপে পরিচয়ে সহায়তা—রবি রীতির বিশেষত্ব।

২। গীতাঞ্জলির সমজাতীয় ইয়োরোপীয় সাহিত্যে 'স্বাতন্ত্র্যের' আদর্শ—ইংরাজী সাহিত্যশিল্পীর বিশিষ্টতা—জর্ম্মনও ফরাসী সাহিত্য-শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন চরমপন্থী আদর্শ—আধুনিক 'সিম্বোলিষ্ট'-আদর্শ ও প্রাচীন রূপক সিম্বোলিষ্ট শিল্পের সন্নিকৃষ্টরীতি ও অত্যন্ততা বাদ—বর্ত্তমান সভ্যতায় সিম্বোলিষ্ট আদর্শের অপরিহার্য্যতা—মিষ্টীসিজম—স্থায়ী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের স্থান, মৈতরলিঙ্ক, ঈয়েট্‌স—ভারতীয় আদর্শ সমক্ষে ইয়োরোপের 'সিম্বোলিজম'—ভারতীয় আদর্শের বিশেষত্ব বিষয়ে আমরা সম্যক উদ্বুদ্ধ নহি—ভারতীয় ভাবুকতা ও বিশ্বাস—ইয়োরোপীয় সিম্বোলিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসের অভাব—সাহিত্যক্ষেত্রে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের 'বাহুল্য'—রবীন্দ্রনাথে স্বদেশী-বিদেশী আদর্শের সম্মিলন।

৩। আধুনিক সভ্যতায় সাহিত্যশিল্পীর স্বত্ব ও দায়িত্ব—রবীন্দ্রনাথে উহার সাফল্য ও বিশিষ্টতার উপাৰ্জ্জন—নিজের পূর্ব্বোপর সাহিত্য-কার্য্যে এবং স্বদেশী বিদেশী শিল্পিগণের সূত্র-সামঞ্জস্যে রবীন্দ্রের নিজত্ব—রবীন্দ্রে পরকীয় ঋণ ও নিজত্ব—ভারতীয় ও পারশিক 'ধর্ম্ম' লক্ষণাক্রান্ত ভক্তিবাদীর এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সিম্বোলিষ্টগণের সম্মিলন-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রে বরং পারশিক 'সূফী' লক্ষণের প্রাবল্য—মধ্যবর্ত্তিতা-বাদী ইয়োরোপীয় সমালোচকের চক্ষে গীতাঞ্জলীর 'প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ'-বাদের মাহাত্ম্য—বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালা গীতাঞ্জলির সাহিত্য-গুণ—ইংরেজী গীতাঞ্জলী সঙ্গীত তন্ত্রীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাৰ্জ্জন—ইংরাজী গীতাঞ্জলির মূল কবিতা সমূহের সাহিত্যরীতি—ইয়োরোপের বিচারে এসিয়ার প্রাচীন মহাকবিগণের মাহাত্ম্য—আধুনিক খণ্ডকাব্যের ক্ষেত্রে ওমরখায়ম্ ও রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রের অসহায় সাহিত্য-সাধনা ও উহার ফল ইয়োরোপের সমক্ষে উপস্থাপন—বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী মাত্রের কর্ত্তব্য।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ। *

পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের আহ্বানে যখন অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হই, তখন এই সভার সহস্রের অন্তর্গত জনৈক সভ্যরূপে

* চট্টগ্রাম সাহিত্যপরিষদ্ কর্ত্তৃক আহূত সম্বর্দ্ধনা-সভায় লেখক যে বক্তৃতা করেন তাহাই প্রবন্ধ আকারে লিপিবদ্ধ হইয়া ১৩২১ সনের শ্রাবণ ভাদ্র এবং আশ্বিন সংখ্যা গৃহস্থে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধও ১৩১৮ সনের আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যা নব্য ভারতে প্রকাশিত।

উপস্থিত বিষয়ের উপযোগী নির্ম্মল আনন্দমাত্র প্রকাশ করিয়া যাইব বলিয়াই আশা করিয়াছিলাম ; আপনারা উহা সহজে ঘটিতে দিলেন না, আপনারা আমাকে আক্রমণপূর্ব্বক অদ্যকার সভাপতিপদে বসাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং, আমি নিজকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন মনে করিতেছি। সভাপতিকে গম্ভীরভাবে আসন দখল করিয়া বসিতে হয় ; কোন দিকে অতিরিক্ত উত্তেজনা কিংবা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাহার পক্ষে অবৈধ ; তাহাকে সভার যাবতীয় আলোচনারমধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিতে হয়—ইত্যাদি, আধুনিক সভাপতিবিষয়ক নানা অলিখিত ব্যবস্থাবিধি মানসপথে প্রবলভাবে উদিত হইয়া আমাকে এককালে 'দমাইয়া' দিয়াছে। আমার উচ্ছ্বাসের উৎসাহমুখে আপনারা একেবারে জগদ্দল চাপাইয়া দিয়াছেন ! এই সভার আলোচনাও সময় সময় এত বিভিন্ন পথে ছুটিয়া গিয়াছে যে, সমস্তের সামঞ্জস্য করিয়া সভার উপসংহার করিতে হইলে দীর্ঘ সময় এবং প্রচুর বাক্যবচসার আবশ্যক ; উহা চিন্তা করিয়াও আমার মন যে কিঞ্চিৎ উৎপীড়িত হইতেছে না, তাহা নহে।

এইরূপ সভায় সভাপতির কর্ত্তব্য

আপনারা জানিয়া শুনিয়াই একজন সাহিত্যসেবীকে অদ্যকার সুধীসমাগমের অধ্যক্ষপদে বসাইয়া দিয়াছেন ; এই কার্য্যের কিঞ্চিৎ ফল আপনাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সবিশেষ, ইহা প্রধানতঃ সাহিত্যিক সমাগম বলিয়া, অনিচ্ছুকগণকেও কিঞ্চিৎ সাহিত্যবক্তৃতা শুনিতেই হইবে। তৎপূর্ব্বে, আপনাদের সমক্ষে এই সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি ; আশা করি আমার বক্তব্যের উপসংহারে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি মতে গ্রহণপূর্ব্বক, আপনারা অদ্যকার সম্মিলন এবং যাবতীয় আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সফল করিবেন, প্রস্তাব এই—

ইয়োরোপে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনায় বাঙ্গালীর আনন্দ

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসাধারণ কবিপ্রতিভার ফল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিলাতের সাহিত্যিকমণ্ডলীর সম্মান লাভ করিয়াছেন, এবং বিশ্বসাহিত্যের দরবার সমক্ষে ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন করিয়া বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালীকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন; উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ্ কবিবরকে আন্তরিক আনন্দ এবং প্রীতি বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

* * * * *

মহোদয়গণ, আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন। এই আনন্দের পরিমাণ এত অধিক যে স্বয়ং বাঙ্গালী এবং বঙ্গসাহিত্যের সেবক আমি তাহা কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেও পারি না। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, এবং রাজকীয় বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর শিক্ষাসাধনার পক্ষে অপরিহার্য্য পরিগণিত হইয়া আমাদের বঙ্গভাষা স্বীকৃত পদবী লাভ করে, এবং বাঙ্গলা গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'তোতার কাহিনী' লিখিত হয়, অথবা পরে যখন বাঙ্গলাশিক্ষার্থীর সাহায্যের জন্য 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচিত হইয়া পাঠ্য-গ্রন্থের স্থান গ্রহণ করে, তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে শতাব্দী অতীত হইতে-না-হইতেই বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-হৃদয়কে বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করিবে! উহার পর, ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বাঙ্গালীর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়, কিংবা ৪১ বৎসর পূর্ব্বে যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রচারিত হয়, তখনো কেহ আশা করিতে পারে নাই যে, বাঙ্গালীর হৃদয় এত অল্পকালের মধ্যে ব্রহ্মতালে বাজিয়া উঠিয়া বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিস্ময়স্থলী হইতে পারিবে! কিন্তু,

বিধাতার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। অদ্য আমাদের সমবেত হৃদয় ঐক্যতানে উহা অনুভব করিতে পারিতেছে বলিয়াই আনন্দ! বিধাতা বাঙ্গালীর রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন পূর্ব্বক অচিন্তনীয় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই, আমাদের অদ্যকার আনন্দ যেমন আশীর্ব্বাদ প্রবন্ধ কৃতজ্ঞতারূপে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিতেছে, তেমনি চিন্ময় জগতের উপাসনারূপে সেই অঘটন-ঘটনপটু বিশ্বনিয়ন্তার চরণ উদ্দেশেও উত্থিত হইতেছে।

পরিষদের সভ্যগণ এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই সভায় একরূপ অতর্কিতে নানা কথার অবতারণা ঘটিয়াছে। কোন বক্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই গৌরব এবং সাহিত্যিক উপার্জ্জনের সঙ্গে ইংরাজ আমলের আধুনিক বঙ্গসাহিত্য কিংবা ভাষার ইতিহাস কোন অংশে সম্পর্কিত নহে—তিনি প্রাচীন মহিমামণ্ডিত বৈষ্ণবকবিগণের কিঞ্চিৎ ভাবতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াই ইয়োরোপের বিস্ময় অর্জ্জন করিয়াছেন! কোন বক্তা (নিতান্ত অসাময়িকভাবে) পূর্ব্বগত মধুসূদন এবং হেম নবীনের সহিত তুলনা পাড়িতে এবং কেহ কেহ বা 'ভাল মন্দ' বিচারে রবীন্দ্রনাথের দোষগুণ সঙ্কেত করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। আপনারা জানেন, আমিও বঙ্গসাহিত্যের একজন দুরাকাঙ্খ অথচ অকৃতী সেবক, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যসেবী হইতে হয়, তবে, অন্ততঃ নিজের ভাষা ও সাহিত্য কি-ছিল কি হইয়াছে, এখন কোন্ দিকে চলিয়াছে, কোন্ কবি বা কোন্ লেখক উহাকে কোন্ সম্পদ্ দান করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয়ের পূর্ব্বাপর জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সাহিত্যসেবার ভূমিকা পরিগ্রহ করাও যে অসম্ভব, তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। সাহিত্যের বহুমুখী

সাহিত্যে মৃত কবিগণের সহিত জীবিতের তুলনা মূলক বিচার অবৈধ

ধারা এবং চরমের অখণ্ড একত্ব ও সাগরসঙ্গমের তত্ত্ব কিঞ্চিন্মাত্রও ধারণা না করিয়া সাহিত্যসেবী হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমন এই সাহিত্যসেবীর পক্ষে প্রকৃত কবিগণের মধ্যে ছোটবড় বা 'দুয়োসুয়ো' বিভাগ করাটাও যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাও সাহিত্য রসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

'শ্রেষ্ঠ কবি' ও 'অদ্বিতীয় কবি' প্রভৃতি শব্দবিন্যাস আধুনিক সমালোচনায় অবৈধ

এতদ্ভিন্ন সাহিত্যসেবী মাত্রকেই আর একটা কথা স্বীকার করিতে হয়! তাহা এই যে, বর্ত্তমানে সাহিত্যের এত বিভিন্নরূপ—দেশকালভেদে তাহার এত বিভিন্ন পন্থা, এত বিভাগ পরিস্ফুট হইয়া গিয়াছে যে, 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি' 'অদ্বিতীয় কবি'প্রভৃতি অতিশয়োক্তিমূলক শব্দবিন্যাস সাহিত্য-সমালোচনার রাজ্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই নির্ব্বাসিত! এমন যে সেক্ষপীয়র, যাঁহাকে কাব্যসাহিত্যের বিভাগ বিশেষে অতুলনীয় কৃতিত্বশালী বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে অনেক পণ্ডিতেই ইতস্ততঃ করেন না, তাঁহাকেও 'শ্রেষ্ঠ কবি' আখ্যায় বিশেষিত করা যায় না। একেত কোন মৃত কবির সঙ্গে জীবিতের 'তুলনায় সমালোচনা' সাহিত্যের শিষ্টাচার বহির্ভূত বলিলেই চলে; কেন না, সাহিত্যের মৃতগণ পিতৃলোকের, অমর লোকের অধিবাসী! বিভিন্ন ক্ষেত্রকোটীর অধিবাসীর সঙ্গে তাঁহাদিগকে একই সমতলে স্থাপন করা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তাহার পর, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কবি, যাঁহারা কোন-না-কোন গুণ-প্রকাশে জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিজের করমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, দেশের রুদ্ধহৃদয়কে কোন-না-কোন দিকে আঘাতপূর্ব্বক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আলোকের গবাক্ষ খুলিয়া দিয়া যাঁহারা কবি পদবী অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ স্থির করাও সহজ নহে। এই ক্ষেত্রে-

পদেপদে ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কারণ, অনুকরণকারী বা অপরের প্রতিধ্বনিকারী যেমন কবি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না, কবিসংঘের চিরকালীয় হিসাবের গ্রন্থে যেমন তাঁহাদের নাম উঠে না, তেমনি, প্রত্যেক প্রকৃত কবি নিজের

কোন মহার্ঘগুণ প্রকটিত করিয়াই কবির মাহাত্ম্য

কোন বিশেষ মাহাত্ম্য এবং অননুকরণীয় বিশেষত্বের গুণেই কবি! কবিগণের অন্তরঙ্গীয় এই বিশেষত্বটুকু নিরূপণ করাই সাহিত্যসমালোচকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং, অদ্যকার সভায় তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোনরূপ আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়াই মনে করি। মধুসূদন, হেম, নবীন বা বর্ত্তমানের রবীন্দ্রনাথ যেমন পরস্পরে স্থান বিনিময় করিতে পারেন না, মধুসূদন যেমন হেন নবীন রবি হইতে পারিতেন না, তেমনি রবীন্দ্রও মধু-হেম-নবীনের কৃতিত্ব-কোটি লাভ করিতে পারিতেন না—চেষ্টাও করেন নাই। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব,

বর্ত্তমানে রবীন্দ্রের 'মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা'ই একমাত্র কার্য্য

দৃষ্টিশক্তি এবং কবিত্ব-শক্তির ফল উপাহরণপূর্ব্বক কবিপদবী অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের বিশিষ্ট চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই কথাটির অর্থবত্তা সকল দিক হইতে হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধান কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে।

সাহিত্যবন্ধুগণ, অনুমান ১০ বৎসর পূর্ব্বে, 'সাহিত্য' পত্রিকায় বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের কতিপয় কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গসাহিত্য সগৌরবে উহাদিগকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রেরণ করিতে পারে। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারেও

এই মর্ম্মে বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী আর্য্যহৃদয়ের উত্তরাধিকারসূত্রে, নানাদিক দিয়া অতর্কিতভাবে, নিজের জীবন-পথে, সত্যশিব-সুন্দরের যেই সাধনা করিয়া চলিয়াছে, তাহা এখনও সতর্ক এবং সমুচিত-ভাবে সে নিজের সাহিত্যের মধ্যে প্রকটিত করিতে পারে নাই ; উহা ঘটাইতে পারিলে বাঙ্গালী বিশ্বসাহিত্যমণ্ডলীর বিস্ময়স্থলী হইতে পারিবে! আমার সেই স্বপ্নানুভূতি সফল হইতেছে ; কি ভাবে, কোন্ দিকে সফল হইতেছে তাহার নিরূপণ, এবং অদ্যকার সভাপতির কর্ত্তব্যটুকু নানাদিকে অভিন্ন বলিয়াই আমার ধারণা জন্মিয়াছে ; সুতরাং অদ্যকার কর্ত্তব্যসম্পাদনে আমার পুরাণ কথাটাই পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব!

রবীন্দ্র নাথে আর্য্যসাহিত্য প্রতিভার লক্ষণ।

জর্ম্মন দার্শনিক হেগেল সাহিত্যের তিনটি বিশেষ অবস্থার এবং গতি-তত্ত্বের আবিষ্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-ছেন। সাহিত্যের প্রাণভূত ভাব পদার্থকে অবলম্বন করিয়া, ভাষা এবং বস্তু সম্বন্ধে উহার বিষম, সম এবং অতিরিক্ত—এই তিন অবস্থা নির্ণয়পূর্ব্বক হেগেল উহাদের নামকরণ করিয়াছেন। 'বিষম' অবস্থায় সাহিত্যের বস্তু কিংবা ভাবের মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না ; উহারা অসংযত এবং 'এলোমেলো' ভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করে ; সামঞ্জস্যের আদর্শকে অতিক্রমপূর্ব্বক নানাপ্রকার আগন্তুক উদ্দেশ্যে এবং বিক্ষিপ্তভাবে স্ফুরিত হইতে থাকে। আমাদের পুরাণাদির মধ্যে—বিশেষতঃ, প্রাচ্য প্রভাব-নির্জ্জিত ইয়োরোপের মধ্যযুগে সাহিত্যের এই লক্ষণ প্রবল দেখিয়া হেগেল উহার নাম দিয়াছেন—ওরিয়েণ্টাল্। 'সম' অবস্থায় ভাব কিংবা বস্তুর সামঞ্জস্যকে কোনদিকে

হেগেল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সাহিত্যের ত্রিপন্থা।

অতিক্রম না করিয়া, বরঞ্চ উভয়কে ন্যূনাধিক সঙ্গতির আদর্শেই পরিচালিত করিয়া সাহিত্যের শিল্পকলা স্ফূর্ত্তিলাভ করে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই অবস্থার প্রচলিত নাম, 'ক্লাসিক'। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক জাতির মধ্যে সাহিত্যের এই লক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকটিত বলিয়া 'ক্লাসিক' বলিতে সাধারণতঃ গ্রীক এবং রোমক সাহিত্যকেই বুঝায়। গ্রীকজাতি সাহিত্যে শিল্পে এবং সমাজ-জীবনে এই 'ক্লাসিক' আদর্শের সাধক ও শিক্ষক। গ্রীক-জাতির সভ্যতা এবং ইহপরকালের আদর্শ সকলদিকে দেহ এবং মনের মধ্যে এইরূপে সঙ্গতির অনুশীলনেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া,উক্ত জাতি দেহ এবং মনের সমঞ্জসিত বিকাশের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিতেন বলিয়া, তাঁহাদের সাহিত্য ও সঙ্গীত এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিত কলার মধ্যেও সত্য-শিবসুন্দরের এই স্থির সঙ্গতির আদর্শ মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাদিগকে এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিক্ষকরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে! প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর, সমস্ত ইয়োরোপের সভ্যতা 'মধ্যযুগের অন্ধকারে' আচ্ছন্ন হইয়া যায়! কিন্তু, এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রলয়সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতেই বিশ্বদেবতা ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যতার 'কমলকামিনী' মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন! এই 'মধ্যযুগ' হইতেই ইয়োরোপে নব আর্য্য-জাতির অভ্যুদয় ঘটিতে আরম্ভ করে। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই দেবতা ক্রমে অভিনব বিজ্ঞান-দর্শনের সৃষ্টিপূর্ব্বক ইয়োরোপীয় শিল্পসাহিত্যের যে অভিনব ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছেন, তাহা গ্রীসের হৃদয়-সরস্বতীজাত এফ্রোডাইট্‌স বা বিনস হইতে একটি বিশেষ দিকেই অগ্রসর। তিনি শতদলবাসিনী; এবং এই শতদল মনুষ্য-সভ্যতার হৃদয়রূপে ঊর্দ্ধদিকে—দেহ-মনের অতীত লোকের দিকে, বিকশিত

আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিশেষ গুণ।

হইয়াই ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ধারণ করিতেছে! মনুষ্যের ভাব ঈষণা এবং জ্ঞান, তাহার দেহবস্তুর সামর্থ্যকে অতিক্রম করিয়াও পরম প্রাচুর্য্যবিলাসে উল্লসিত হইতেছে বলিয়া, শিল্পসাহিত্যের এই ভাব-অতিরেক অবস্থার নামকরণ হইয়াছে—রোমান্টিক! উহা ইয়োরোপীয় সভ্যতার Renaisance বা নবজীবন হইতে উপজাত হইয়া ইয়োরোপখণ্ডে আধুনিক সাহিত্য এবং ললিতকলার প্রধান লক্ষণামূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে! ঐ দেশের আধুনিক সাহিত্য এখন নানাদিকে নানামুখে অগ্রসর; কিন্তু, মোটামোটি উহাকে এই 'রোমান্টিক' নামেই নির্দ্দেশ করা যায়! উহা সময় সময় এই ভাব-অতিরেকের অবস্থা হইতে আরও অগ্রগামী হইয়া, ভাষার শক্তি এবং সামর্থ্যকে একেবারে উল্লঙ্ঘন করিয়াও—সঙ্গীত এবং চিত্রকলা প্রভৃতির রাজ্যে সাধিকার এবঞ্চ অনধিকার প্রবেশ করিয়াও, অগ্রসর হইতেছে!

বঙ্গীয় পূর্ব্বশূরিগণের বিশিষ্ট গুণ

এখন, আমাদের সাহিত্যের পূর্ব্বশূরিগণের কবিকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে দেখিব, তাঁহারাও সাহিত্যের উক্ত ত্রিধারার লক্ষণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। প্রাচীন মুকুন্দরাম ঘনরাম প্রভৃতি, মনসার পুঁথির কবিগণ, কিংবা ভারতচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখিব, তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যের 'ওরিয়েণ্টাল' আদর্শই স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের পর, নব ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সবিশেষ পরিচয়ে, বাঙ্গালীর মন মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে বহুমতে ক্লাসিক আদর্শেই উল্লসিত! ইঁহারা নব্য বঙ্গের ভাবগঙ্গাকে ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া, উপরন্তু সাহিত্যজগতের সমুন্নত ভাব এবং বস্তুসম্ভারকে ভারতীয় মনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যকে বিশ্বের ক্লাসিক-সাহিত্য-সমতলে উন্নীত

করিয়া গিয়াছেন! প্রত্যেকের মধ্য দিয়া বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী অপূর্ব্বকে লাভ করিয়াছে—বাঙ্গালীর মনোজীবন অভাবনীয় রূপেই প্রসারিত হইয়াছে! ইহাঁদের প্রতিভা-সঙ্গম না ঘটিলে, বাঙ্গালী হয়ত প্রাচীন বৈষ্ণবকবিপন্থার 'গীতকলা'য় অগ্রসর হইতে পারিত, কিন্তু আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের কৌলিন্ত-দরবারে বসিবার উপযোগী ভাব ও ভাষার সামর্থ্য এবং বস্তুভিত্তি কখনও লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। ইহাঁদের পর, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, বৈষ্ণব 'চরিত কবিগণের পদানুবর্ত্তনে, ইয়োরোপীয় রোমান্টিক আদর্শকে যেমন নবভাবে অনুসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শক্তি এবং প্রসার বর্দ্ধিত করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও তেমনি বৈষ্ণব 'গীতি' কবিগণের দীক্ষালাভ পূর্ব্বক, খণ্ডকাব্য গীতিকবিতা এবং সঙ্গীতকবিতার ক্ষেত্রে আত্মানুসরণ করিয়া নব নব ভাবাতিরেকের রাজ্যে বিলসিত হইয়া আসিয়াছে! তাঁহার মধ্যে হয়ত মধুসূদনের শক্তি, হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট গৌরব কিংবা নবীনচন্দ্রের জ্বালাতরঙ্গময়ী ভাবপ্রবণতা নাই; কিন্তু তাঁহার মধ্যে বঙ্গ-ভাষার যৌবনোপযোগী এমন একটা তরলোজ্জ্বল লাস্যলীলা বা আনন্দের এবং কৌতুকের চমক আছে, সর্ব্বোপরি বাঙ্গালিজীবনের ক্ষুদ্র সরল বস্তুবিষয়গুলিন অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের দিকে—অপ্রাপ্ত এবং অজ্ঞাতের উদ্দেশে, এমন একটা অনির্ব্বচনীয় সঙ্কেত বা অস্পষ্টমধুর ঈষারা স্ফূরিত হইয়াছে যে, উহাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, প্রাচ্য-সাহিত্যের তরফ হইতে, নব মাহাত্ম্য-অধিকার সপ্রমাণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে; এবং উহাই ১৯১৩ সনের নোবেল পুরস্কার অর্জ্জন পূর্ব্বক আমাদের বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে!

এই সূত্রে রবীন্দ্রের বিশিষ্ট গুণ।

আমাদের কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর কবিসম্পর্কে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা যে নিতান্ত সত্যকথা, উহা বঙ্গসাহিত্যের পরিদর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইঁহাদের একজনে যাহা দিয়াছেন, অন্যজনে তাহা পারিতেন না। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ করিতে যাওয়া অনেকস্থলে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া বই নহে। এইপ্রকার বিচারের দ্বারা আমরা কেবল নিজের অহৃদয়তা এবং সঙ্কীর্ণ রুচির পরিচয় দিতে থাকিব —উহা প্রকৃত সাহিত্যিকের বিচার হইবে না। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্যে এমন কবি জন্মেন নাই—বলিতে কি কোন সাহিত্যেই জন্মেন নাই—যাঁহার মধ্যে সাহিত্যের সাকল্য শক্তি সঞ্চিত হইয়া এবং কৃতিত্ব লাভ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যের সর্ব্ববাদিসম্মত এবং 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' পদবীতে তুলিয়া ধরিতে পারে।

এখন, অদ্যকার সময়-উপযোগী বিষয় বিচারে অবহিত হইব।

ইয়োরোপে রবীন্দ্রের বিশিষ্টতার পরিচয়

আমাদের রবীন্দ্রনাথ কোন্ গুণের দৃষ্টান্ত সমুপস্থিত করিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের সাধুবাদ অর্জ্জন করিলেন; এবং এই পরাধীন দেশের উদীয়মান সাহিত্যের জন্য ইয়োরোপের মূল্যবান্ স্বীকারগৌরব অর্জ্জন করিলেন? ইহা সাহিত্য-পরিষদ্ কর্ত্তৃক আহূত সভা বলিয়া, এবং সভার আলোচনাও কোন কোন দিকে বিসম্বাদ-পন্থায় অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে বলিয়া, বিশেষতঃ আপনারাও এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিমতটুকু জানিতে আগ্রহ দেখাইতেছেন দেখিয়া, আমরা উত্থাপিত প্রশ্নের মোটামোটি ধারণা এবং মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আপনারা হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠ করিয়াছেন। এ গ্রন্থ

গীতাঞ্জলির মূল বিশিষ্টতা

কবির জীবনব্যাপী রচনাসমূহ হইতে বিশেষতঃ 'ক্ষণিকা' 'নৈবেদ্য' এবং 'খেয়া' হইতে, (প্রচলিত কথায়) কেবল 'ধর্ম্ম-ভাবের' লক্ষণ-যুক্ত সঙ্গীত এবং সঙ্গীত-জাতীয় কবিতার অনুবাদ সমষ্টি। সুতরাং, প্রৌঢ়জীবনের একটি বিশেষ ভাবযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে, একটা বিশেষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই কবি ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' চয়ন করিয়াছেন; এবং ন্যূনাধিক স্বাধীনভাবে উহাদের ইংরাজী অনুবাদ সমাধা করিয়াই তাহা ইয়োরোপের পরীক্ষাধীন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সংগ্রহস্তবকের প্রকাশরীতি এবং ভাবসম্পত্তির মধ্যে এমন একটী বিশিষ্ট অথচ মনোমদ সৌরভ বিজাতীয়ভাষার আস্তরণ ভেদ করিয়াও পরিস্ফুট হইতেছে যে, ইয়োরোপীয় বিচারক মণ্ডলী উহাতেই কবিকে একজন প্রথমশ্রেণীর কবি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন; এবং ১৯১৩ সালের 'নোবেল পুরস্কার' তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

এখন, যাঁহারা অভিনিবিষ্ট সাহিত্যিক নহেন, কিংবা যাঁহারা তুলনামূলক অধ্যয়নের রীতি অবলম্বনে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করেন না, অথবা যাঁহারা, সম্যক্‌দর্শনের কোনরূপ ধার না ধারিয়া কেবল উপস্থিতের অনুভব সাহায্যেই 'ভালমন্দের' স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের চক্ষে বিলাতী পণ্ডিতমণ্ডলীর এই বিচার-ব্যাপার একটা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। এইরূপ প্রতীতির যথেষ্ট দৃষ্টান্ত অস্মকার সভামধ্যেই পাইয়াছি। কবি রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতামূলে আমাদের অনেকের নিকট পরিচিত, কিংবা যে সকল কবিতা তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে বলিয়া অনেকে মনে করেন, উহাদের অধিকাংশই হয়ত ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে পাইবেন না; এমন কি, অনুবাদিত কবিতাগুলিও

হয়ত বাঙ্গলায় যেই সমস্ত অংশমূলে আপনাদের সমক্ষে মাহাত্ম্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্মৃতিমুদ্রা লাভ করিয়া আছে, অনেক সময় সে সমস্তই অনুবাদের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইবেন! বন্ধুগণ, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এই সমস্যার একমাত্র প্রত্যুত্তর এই হইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি, রুচি এবং বিচারপ্রণালী আমাদের হইতে নানাদিকে স্বতন্ত্র; অপিচ, রবীন্দ্রনাথও বিলাতী রুচির সমুচিত নির্দ্ধারণ এবং প্রয়োগের প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহাদের সাধুবাদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গীতাঞ্জলি প্রথম অবস্থায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবার পর বিলাতী সংবাদপত্রে উহার যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিলে একটা বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহা এই যে,

ইয়োরোপীয় সমালোচক কর্ত্তৃক রবীন্দ্রের গুণালোচন

সমালোচকগণ—অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্যের নামজাদা সমালোচক কেহ আছেন কিনা জানি না—কেহই তাঁহাদের প্রাচীন কবিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তুলনায় সমালোচনা' করিতে চেষ্টা করেন করেন নাই। কেবল কবি ঈয়েট্স্ ভূমিকায় গীতাঞ্জলির ভাবজগৎকে 'স্বপ্নাবেশের জগৎ' উল্লেখে রসেটির 'willow wood'এর সঙ্গে তুলনা পাড়িয়াছেন; ম্যানচেষ্টর গার্ডিয়ান উহার মূলশক্তিকে প্রাচীন পারস্য-কবি-গণের ধর্ম্মভাবুকতা এবং 'অধ্যাত্ম মাহাত্ম্যের' সহিত উপমিত করিয়াছেন; টাইম্‌স উহার প্রকাশরীতিকে দায়ুদের গীতসংহিতার সমপ্রকৃতিক বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের নব্য কবিগণ এই পথে, সরল অথচ আন্তরিক অভিনিবেশের সাহায্যে ইংরাজ-জীবনের দিকে তীক্ষ্ণতরল দৃষ্টি

পরিচালিত করিতে জানিলে, ইংলণ্ডেও যে বর্ত্তমানকালে এ প্রকার কবিতার একটা 'সাহিত্য' দাঁড়াইতে পারে, গীতাঞ্জলির দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া টাইম্‌স এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং বস্তুবিষয়কে প্রতিমারূপে অবলম্বন করিয়া, এইরূপে যে একশ্রেণীর 'মীষ্টিক' বা আধ্যাত্মিক মধুররসের তরল কবিতা রচিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিলাতী বিচারকগণ অনেকেই একমত হইয়াছেন, মনে করি। এ স্থলেই বিলাতের চক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রধানমাহাত্ম্য নিহিত বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতীত হইতেছে! রবীন্দ্রকে সর্ব্বপ্রথম সাগ্রহে পরিচিত করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডের কবিগণ। আয়র্লণ্ডে

কেল্‌টিক ও সিম্বোলিষ্ট সাহিত্য রীতির সহিত বৈষ্ণব-রীতির সাধর্ম্ম্য ও তদ্বারা সহায়তা

সম্প্রতি প্রাচীন 'কেল্‌টিক' সাহিত্যের ভাবগত আদর্শের সমসূত্রে এক নব সাহিত্যের প্রচেষ্টা প্রতীয়মান। এই আদর্শ নানাদিকে পারস্যের স্যূফী এবং বঙ্গের বৈষ্ণবসাহিত্যের আদর্শ এবং রীতির সহোদর। বর্ত্তমানে ঈয়েট্‌স্ এই নব সাহিত্যচেষ্টার নেতা। এখন, আইরিষ জাতির এই কেল্‌টিক সাহিত্যরীতির সহিত প্রাচীন প্রাচ্য কবির, বিশেষতঃ পারসীক ও বৈষ্ণব কবিগণের রীতি-সামঞ্জস্য নানাদিকে সমুজ্জ্বল! এই আইরিষজাতির সহিত আর্য্যতার ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্য্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সাধর্ম্ম্যও নানাদিকে পরিলক্ষিত হইবে। 'কেলটিক' সাহিত্যরীতিই যে অভিনব ভাবুকতার প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া, খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপে 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য-সৃজনের সহায়তা করিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞগণ বলেন। বর্ত্তমানের আইরিষ কবিসংঘ একরূপ 'একরোখা' হইয়াই, আধুনিক বিলাতে এই সাহিত্যিক দল গঠন করিতেছেন! বিলাতী সাহিত্যে ব্লেক একজন 'মীষ্টিক' কবি বলিয়া

পরিগণিত ; ঈয়েট্স বিস্তারিত ভূমিকাসহকারে তাঁহার রচনাসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন ; এবং প্রবলভাবে মাহাত্ম্য ঘোষণাপূর্ব্বক ব্লেককে প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিপত্তি দানের চেষ্টা করিয়াছেন। 'মাষ্টিক' বলিতে দার্শনিকতার তরফ হইতে যাহা বুঝায়, কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রকৃতির না হইলেও, * কোন কোন বিলাতী সমালোচক গীতাঞ্জলির ধর্ম্মভাবুকতা এবং অস্পষ্ট সংকেতের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেও 'মাষ্টিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং, আইরিষ কবিগণের প্রাথমিক সহানুভূতি এবং সাধুবাদ হইতেই যে বিলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়ের প্রবল সহায়তা ঘটিয়াছিল, অপিচ ইয়োরোপের—বিশেষতঃ ফ্রান্স্ এবং জর্ম্মণীর 'সিম্বোলিষ্ট' নামক প্রসিদ্ধ কবি সংপ্রদায়ের কাব্য-প্রচেষ্টা হইতেও যে ওই পরিচয়ের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়টুকু অপনীত হইয়া উহার ভূমি বিলাতের মনোজগতে পূর্ব্ব হইতেই নানামতে পরিষ্কৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই শেষোক্ত বিষয়ে পরে দৃষ্টি করিতে পারিব। গীতাঞ্জলির প্রকাশ রীতি (manner and style) বা আভ্যন্তরীণ আব-হাওয়াটিই যে সর্ব্বাগ্রে বিলাতের চক্ষে চমৎকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বিচারকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হয়। উহার অর্থবস্তুর বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান কিংবা সুস্থির সহানুভূতি জন্মিবার পূর্ব্বেই, উহার ভাবগত ঈশারাগুলি তাহাদের প্রাচ্য দূরত্ব অপিচ আপাতিক তারল্য গতিকেই সর্ব্বপ্রথমে বিলাতী পাঠকের হৃদয়মধ্যে একটা অনন্যচিত্ততা এবং আবেশ জাগাইতে পারিতেছে! আমরা জানি, ইয়োরোপীয় সাহিত্য

* কোন অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসিদ্ধির দাবীকেই প্রকৃত প্রস্তাবে "মীষ্টিসিজম্" বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপ কোন 'অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান' বা **Spiritual Mysticism** উদ্ভব নহে ; তাঁহার প্রণালীকে বরং **Intellectual Mysticism** বা **Mystification** বলিলেই কোন কোন স্থলে সুসঙ্গত হয়। লেঃ

এখন কত ব্যাপকভাবে সুদৃঢ় অর্থসাধনায় এবং বস্তুনিষ্ঠ ভাবের সাধনায় অবহিত! কোনরূপ 'অস্পষ্টতা'-প্রণালী 'অলখ'-লোকের ভূমিবিষয় অবলম্বন ব্যতীত, 'ধর্ম্ম' লক্ষণের ন্যূনাধিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত, বিলাতী সাহিত্যে 'কায দেখিতে' কিংবা দাঁড়াইতেও পারিত কিনা সন্দেহ! সুতরাং, দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ পরম নৈপুণ্যসহকারেই ইংরাজী গীতাঞ্জলি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিলাতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

রবি-রীতির বিশেষত্ব

এখন, এই 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করিতে বসিলে যে আনন্দ লাভ হয়, উহাকে পাঠক হয়ত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারে না। কোন ভাবকে অল্প কথায়, বা স্মরণীয় বাক্যের অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনা-শক্তির অধিকারে আনিয়া ধরিতে পারিলেই উহা পাঠকের 'মুষ্টিবদ্ধ' হইল স্থির করিতে হইবে—উহা পাঠকের প্রকৃত প্রাপ্তির অধিকারে আসিল। শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কবিগণ মনুষ্যের এইরূপ প্রাপ্তি-অধিকার বর্দ্ধিত করিয়াই সম্পূজিত হন। কিন্তু, যে কবি বাক্যশক্তির সীমা-অধিকার উলঙ্ঘন করিয়া, কোনরূপ কাহিনী কিংবা অবস্থাকে অবলম্বনপূর্ব্বক, চিত্রকলা অধিকারের রেখা বা আভাস-প্রণালীর সাহায্যে কিংবা সঙ্গীত-অধিকারের অনির্ব্বচনীয় স্বর-রাগিনী অন্তরা-আভোগ বা ছন্দের ফাঁকতালের সাহায্যে, অথবা উভয় প্রণালীকেই নির্ব্বিশেষে এবং ওতপ্রোত ভাবে অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনাপূর্ব্বক পাঠককে আনন্দ দান করেন, তিনি পাঠককে ওই আনন্দটুকু স্তোকবাক্যে নিজের প্রাপ্তি-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে কোন সাহায্যই করেন না। তিনি স্বয়ং যে আনন্দকে বাণী-সীমার মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক লাভ করেন নাই, পাঠককে তাহা ধরাইয়া দিবেন কি করিয়া? অতএব পাঠকও যেই আনন্দ লাভ করে উহা স্বপ্ন-অধিকারের আনন্দের ন্যায় পরমুহূর্ত্তেই মুষ্টিচ্যুত হয়।

সমস্ত কবিতাটি কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত, পাঠকের পক্ষে ঐ স্বপ্নাবেশ বা উহার ঈশারা টুকুও ইচ্ছায়ত্ত করার কোন সুবিধাই থাকে না। পাঠককে ঐরূপ সুবিধা দেওয়ার পক্ষে কবির কোন ইচ্ছা নাই—অপিচ, নিজের-প্রণালীবশাৎ ক্ষমতাও নাই; তাঁহার কাব্য-ভূমি এবং আদর্শই উহার বিরোধী। সুতরাং, ঐ প্রাপ্তিটুকু বাস্তবিক পক্ষে লাভ কিনা—ঐ আনন্দটা কবির কৃতিত্ব না পাঠকের কল্পনাকৃতিত্ব-গতিকেই লব্ধ হইতেছে, এইরূপ একটা সংশয়প্রশ্নে জিজ্ঞাসু পাঠকের চিত্ত চিরকাল আন্দোলিত হইতে থাকে। এই কারণে, একই কবিতা পাঠান্তর যেমন কাহারও পরম আনন্দ, তেমন কাহারও পরম বেদনা উদ্রিক্ত হওয়াটাও অসম্ভব নহে! ইংরাজী গীতাঞ্জলির প্রায় সমস্ত কবিতাই এ-জাতীয়—এইরূপে সঙ্গীত এবং সুরের আভাসময়ী মায়াপুরীর সৃষ্টি! উহারা যেন স্বপ্নদৃষ্ট বাস্তব সত্যের আভাস বই নহে! কবি-চিত্তের ত্রিকোণাকৃতি অথচ আপাত-স্বচ্ছ কাচখণ্ডের মধ্যদিয়া মনুষ্যজীবনেরএবং জগতের দিকে দৃষ্টি! কবি রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন গদ্যেপদ্যে এইরূপ দার্শনিকতার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন! তাঁহার প্রতিভা একদিকে যেমন সঙ্গীতের প্রতিভা, তেমন অন্যদিকে একটা দার্শনিকতার প্রতিভা, তাহাতেও সন্দেহ নাই। চিত্রকলার পরিভাষায়, তাঁহার কবিতা অনেকস্থলে স্থূলতঃ, চারিদিকের আবেষ্টন-বিস্মৃত—কেবল একাভিনিবিষ্ট ছবি—জলছবি (water colour painting). এই প্রতিভা অনেক সময় বরং প্রকৃত সত্যকে প্রকৃতনেত্রে দর্শন না করিয়াও কেবল একটা বিশেষ চক্ষে এবং পথে দর্শন করার প্রতিভা! তাঁহার মেজাজের এই বিশেষত্বকে ইংরাজীতে genius of temperament বলিতে পারি। এই মর্জ্জির সহিত—কবির দর্শন প্রণালী অপিচ প্রকাশের রীতি বা আদর্শের সহিত সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে না পারিলে, এই সমস্ত কবিতার প্রাণীভূত ঈশারা বা সঙ্কেতের স্পর্শ-সমক্ষে পাঠকের হৃদয় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলে, উহারা বেদনাদায়ক

হইয়া পড়াও বিচিত্র নহে। ইংরাজী গীতাঞ্জলির কবি এদেশের বাস্তব-জীবনের ছোট ছোট কাহিনী এবং ঘটনাবিষয়কে ঈশারামাত্রে ধরিয়াধরিয়া নিজের অজ্ঞাত এবং অধৃত তত্ত্বের ক্ষণিক আভাসমাত্র উপস্থিত করিয়াছেন; পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, উহা 'ধর্ম্ম'-তরফের বা জগতের অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় আভাস। অধিকাংশ কবিতাই নিতান্ত 'খাদের পর্দ্দায়' রাগিনী বিনাইয়া, সাধারণ-শ্রুতির অগম্যলোকে লঘুচঞ্চল রেখা টানিয়াই নিজকে চরিতার্থ মনে করিতেছে! সুতরাং, উহাদের মধ্যে অনেক স্থলেই ভাষা-অধিকারের কিংবা পরিস্ফুট সাহিত্য-অধিকারের কোন বিশেষ প্রাপ্তি নাই বলিয়াও অনেকে নিঃসঙ্কোচে রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন; কেহই ধরাইয়া দিতে পারিবে না—কি পাইলে! পারিলেও, উহার মাহাত্ম্য হয়ত অনেক সময় খুব বেশী বলিয়া, ঠেকিবে না। কিন্তু, যাঁহারা ভাষার অধিকার ডিঙ্গাইয়াও, তাল-মান-রাগিনীর বা নহবৎরোশনচৌকীর অমূর্ত্ত-অধৃত আনন্দস্পন্দকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বসিয়া ধমনীর স্পন্দন মধ্যে অনুভব করিতে চায়, পরিস্ফুট লাভালাভ হিসাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আনন্দ-আবেশ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে চায়, সাহিত্যের তরফে বসিয়াও তানসেনের হস্তস্থিত 'একতারার একটি তার' হইতে একোদ্দিষ্ট অথচ বিভিন্ন রাগিনীর 'সঙ্গৎ' উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চায়, তাহা হইলে বঙ্গদেশের এই জন্মসিদ্ধ গায়ককবি রবীন্দ্রনাথের চরমকণ্ঠপরিণতির কুহুকাকলীকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটা উদার উপার্জ্জন বলিয়া মনে করিতে পারিবে। উহাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে গেলে অনেক স্থলে বেদনা ব্যতীত অন্য কোন প্রাপ্তির সুবিধা যেমন কম, তেমনি হৃদয় দিয়া কিংবা স্নায়ুর পথে বুঝিতে গেলেও অনেক সময় অমৃত বলিয়াই অনুভব হইতে থাকিবে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটক বা খণ্ড কবিতামাত্রের মধ্যেও এই সঙ্গীত এবং চিত্র জাতীয় এবম্ব অনির্ব্বচনীয় একটা প্রাপ্তি না থাকিয়া

পারে না ; উহা শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পমাত্রেরই সমস্ত ভাবাথ সঙ্গতি এবং পরিস্ফুট প্রাপ্তির উপরি-পাওনা। কেন না, সৌন্দর্য্য বা আনন্দরসের অনির্ব্বচনীয়-তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পমাত্রের অপরিহার্য্য লক্ষণ। বলিতে গেলে, উহা শিল্পাত্মার—প্রকৃত প্রস্তাবে কবির অন্তরাত্মার সহিত সংসর্গ জনিত ; উহা কবির ভাষা, ভাব, প্রকাশরীতি,বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের সমূহিত আবেষ্টন-পরিবেশ হইতে উপজাত হইয়া শিল্পের অপিচ কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচিহ্নকস্বরূপ একটি অনির্ব্বচনীয় প্রাপ্তিরূপেই পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায়—জাগ্রত ভাষা-বুদ্ধি কিংবা অর্থ-বুদ্ধির অধিকারে আসিয়া কোন মতে ধরা দেয় না! বিস্তারিত রামায়ণ মহাভারত, মেঘদূত, শকুন্তলা বা কপালকুণ্ডলা—ইহাদের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গীয় সমগ্র-সুরের মধ্যেই কবির হৃদয়-সঞ্জাত এইরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সৌরভ আছে—উহাদের ভাষারীতি ঘটনাচক্র এবং অর্থ-অভিব্যক্তির মধ্য হইতে এইরূপ একটি ব্যামিশ্র অথচ অনির্ব্বচনীয় সঙ্গীত এবং চিত্র-জাতীয় আনন্দের প্রাপ্তি আছে! গীতাঞ্জলির ক্ষুদ্র কবিতাসমূহ সময় সময় জাগ্রৎ-ভাবে স্পষ্টবাক্যের অর্থমাহাত্ম্য সাধন না করিয়াও—এমন কি সময় সময় তাহাকে অমান্য করিয়াও এই অনির্ব্বচনীয়তার ক্ষেত্রে কেবল দূর-দূরগামিনী ক্ষণপ্রভা প্রসারিত করিতে চাহিয়াছে! এ স্থলেই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব! সাহস করিয়া, সুদৃঢ় অর্থভিত্তিকে উদ্দেশ্যতঃ পরিহার পূর্ব্বক, হৃদয়কে লঘুতরল কাগজের ঘুড়ীর ন্যায় অধ্যাত্ম-ভাবের শূন্যবিশূন্যে ঘুরিবার জন্য পরিচালিত করায়, একদিকে উহার সাহিত্যলক্ষণটুকু কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, অন্যদিকে দূরদূরান্তরিত অনুরণন, দ্যুতি এবং চমক চমৎকারভাবে বাড়িয়া গিয়াছে! ইয়োরোপীয় বিচারকগণ গীতাঞ্জলির এই প্রতিপত্তিকে মৌলিকতা বলিয়া অনুভব করিতে, অপিচ রবীন্দ্রনাথকেও একজন পরম অধ্যাত্ম অধিকারশালী কবি বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিয়াছেন।

.এই গীতি-চিত্র-তন্ত্রের মধ্য-পথসেবী, আত্যন্তিক ভাবুকতা এবং দার্শনিকতা! এই পথেই কবির জীবনব্যাপী অর্জ্জনের সাকল্যফল সাহিত্যসংসারে অতুল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না! তাঁহার মধ্যে হয়ত মধুহেম নবীনের কণ্ঠসমুন্নতি, বস্তুগত উচ্চতা বা বিষয়ের বিপুলতা নাই। কিন্তু উহা আপন পথে অবিশ্রান্ত ক্রিয়ারত হইয়া ক্ষুদ্রের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক সমাজজীবন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক যে গভীরতা লাভ করিয়াছে, ক্ষুদ্রের পথেই জগতের অন্তস্তত্ত্বে যতদূর 'তলাইয়া' গিয়া মনুষ্যকে স্বকীয়তত্ত্ব লাভে, ভাবগত স্বাধীনতা-লাভে সাহায্য করিবার জন্ম যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, তাহাও অতুলনীয় বলিয়াই মনে হয়! সঙ্গীততন্ত্রের গতিকে যেমন রবীন্দ্র-প্রতিভা ভাবের ঘনতা অপেক্ষাও ছন্দের তাল-মান এবং বোলচালের দিকে বেশী ঝোক দিয়াছে, বিভাব অথবা স্থায়ীভাব অপেক্ষাও বরং ব্যভিচারিভাবের পথেই সমধিক বিলসিত হইতেছে, তেমনি দার্শনিকতার গতিকেও রূপ অপেক্ষা ভাবগত অব্যক্তের দিকে, বস্তুমূর্ত্তি অপেক্ষা অরা-(aura) যুক্ত আভাসের দিকেই সমধিক প্রবণতা দেখাইতেছে! সাহিত্যের বাক্য-প্রণালীকে, গদ্য এবং পদ্য উভয়কে বিশেষভাবে লালিত্য এবং শ্রুতিসুখ-সাধনায় নিয়োজন পূর্ব্বক পাঠকের চিত্ত-আকর্ষণে চেষ্টা করিতেছে!

২

এখন, এই গীতাঞ্জলির সমজাতীয় বিলাতী সাহিত্যের দিকে একবার দৃষ্টি পরিচালিত করিলেই দেখিব, ইয়োরোপে এরূপ ভাবগত প্রণালীর কিংবা সঙ্কেত লক্ষণের কবিতা যে নাই তাহা নহে। বর্ত্তমান ইয়োরোপ

গীতাঞ্জলির সমজাতীয়

সাহসিকতার ভাণ্ডার! ওই ভূখণ্ডে, ভাল মন্দ যাহাই হোক, প্রত্যেক জাগ্রত ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিত্বটুকুন বিশেষিত করিতে চায় বলিয়া, যে

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ

কোনরূপেই-হোক একটা 'নূতন কিছু' করিয়া ফেলিয়া সকলের কৌতূহলভাজন এবং দর্শনীয় হইবার জন্য মাথা ঘামাইয়া সে দেশে অসংখ্য লোক লাগিয়া আছে। সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীত-চিত্র-ভাস্কর্য্যে,কৌতুক কথায়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে, এমন কি বুজরুকির ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত এইরূপে 'মৌলিক' হইয়া পড়ার একটা অতিরিক্ত ঝোঁক ওইদেশে বেগতিক প্রাবল্য লাভ করিয়াছে! কলাবিদ্যার প্রত্যেক তরফেই একদিকে যেমন রক্ষণশীল দল নানারূপে ছুটপাট, হুঙ্কার বা হাহাকার করিয়া প্রাচীনতার পূজ্যসীমা রক্ষা করিতেই লাগিয়া আছেন, অন্যদিকে তেমনি উন্নতিশীল এবং সাহসিকের দলও সমস্ত সীমা-শিকলকে পদদলিত করাই যেন একটি মহৎ কার্য্য মনে করিয়া চলিতেছেন! ইহার ফলে, সকল তরফেই হয়ত সুস্থির এবং অনবদ্য আদর্শের শিল্প-উপার্জ্জন কম হইতেছে; কিন্তু, মনুষ্যের মানসভূমি —দৃষ্টিভূমি—নানামুখী রীতিপ্রণালী এবং আদর্শের ভূমি অভাবনীয়রূপে প্রসার লাভ করিতেছে! এই ব্যাপারের উত্তর ফল এবং দৃষ্টান্তের গতিকে ভবিষ্যতের পন্থা বিস্তারিত হইয়া, বরং উত্তরাধিকারী এবং উন্নত শক্তিশালী অথচ সংযত আদর্শ-সাধকের পক্ষে যে অশেষ উপকার ঘটিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে বর্ত্তমান ইয়োরোপের অনেক একদেশ-গামী সাহিত্যমহিমাও, ঐতিহাসিকভাবে ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্যের উপক্রম বই নহে! ইদানীং ইয়োরোপীয় সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, কিংবা কলাবিভাগের সর্ব্বত্রই, মোটের উপরে, উপস্থিত প্রাপ্তি অপেক্ষা বরঞ্চ ভবিষ্যতের প্রাপ্তিই যে সমধিক পরিস্ফুত হইতেছে, তাহা পরিদর্শক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। মৌলিকতা এবঞ্চ উন্মার্গগামিতা, বলিতে কি উন্মত্ততাই বরং বাড়িয়া গিয়াছে! সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইংলণ্ড অপেক্ষা বরং

ইংরাজী সাহিত্য- শিল্পীর বিশিষ্টতা

ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীতেই যেন এইরূপ সাহসিকতার দৃষ্টান্ত অধিক! ইংরাজজাতি প্রধানতঃ রক্ষাপ্রবণ। এই জাতির মধ্যে, মহিমান্বিত অতীতের স্থিরসমুজ্জ্বল মাহাত্ম্য গতিকেই, রক্ষাশীলতার একটা আদর্শ এত বলবান যে, তাহার কর্ম্মী এবং চিন্তাশীলগণ সকল বিভাগেই সাহসিকতাকে যেন নিতান্ত ভয় করিয়া চলেন—প্রাচীন মহনীয় আদর্শকে ন্যূনাধিক মান্য করিয়াই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন। কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইলে, ইংরাজ প্রথমতঃ যেন অন্যজাতির দৃষ্টান্ত পরিদর্শন পূর্ব্বক নিজের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে উহার সঙ্গতি চেষ্টা করিয়াই সাধনায় মনোনিবেশ করেন; এবং ধীর-সংযত সাধনাক্রমে অনেক সময় আদিম উদ্ভাবক জাতিকেও অতিক্রম করিয়া যান। নূতন নূতন ভাবের প্রবল তরঙ্গগুলি ইংলণ্ডে আসিয়াই যেন চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে, এবং একনিষ্ঠ তদ্গত সাধকগণের সাহায্যে, ধীরে ধীরে, বিশ্ব-পরিদৃশ্য হইয়া উঠে! ইংরাজের এই গুণ সকল বিভাগেই ন্যূনাধিক লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

জর্ম্মন ও ফরাসী সাহিত্য শিল্পিগণের বিভিন্ন চরম পন্থী আদর্শ

জর্ম্মণীতে, বিশেষতঃ ফরাসী দেশের কাব্য-সাহিত্যেই যেন এই মৌলিকতার হুজুগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! ফরাসীর অন্তঃকরণ অনেকগুলি কবি এবং লেখকের ভিতর দিয়া, বিগত শতাব্দীর শেষভাগে অত্যাশ্চর্য্য ভাবে সাহিত্যের প্রাচীন ভাব-সীমা এবং রীতিপ্রণালীর প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ইংরাজপণ্ডিতগণ কৌতুকস্বরে বলিয়া থাকেন, প্যারীনগরীতে প্রতি পাঁচ বৎসরেই নূতন নূতন কাব্যরীতি এবং মৌলিকতার হুজুগ উদ্ভূত হইয়া বুদ্বুদের মতই বিলীন হইতেছে! এই সমস্ত বুদ্বুদ হইতে যে সাহিত্য-

সমাজ কিছুমাত্র লাভ উদ্বৃত্ত করেন না. তাহা নহে ; প্রত্যেক দলধর্ম্মের মধ্যেই, তাহার চরমপন্থিতার অন্তরালে, একটা-না-একটা সুলক্ষণ না থাকিয়া পারে না—উহার সম্পর্কেই সমাজ লাভবান্ হয়। সাহিত্য-পণ্ডিতগণ জানেন্, এইরূপে ফরাসীদেশে, এবং তাহার দেখাদেখি সমগ্র ইয়োরোপে, নব নব আদর্শবাদী এবং চরমপন্থী কবিতাসেবকের দলসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক দলের মধ্যেই দুই-একজন ন্যূনাধিক উচ্চশ্রেণীর কবি উদ্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ বলিতে চাহেন যে, কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল ছন্দের নবনব লীলা এবং কোমল-মিষ্ট-পদাবলীর চমৎকারিতা সাহায্যে পাঠককে আবিষ্ট করা বই নহে ; সুতরাং, ওই উদ্দেশ্য সমাধা করিতে যদি ব্যাকরণের ভুলও করিতে হয়, কিংবা অর্থহীন পদবাক্যও ব্যবহার করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই ! আবার, অন্যদল বলিতে চাহেন যে, আমাদের মনোমধ্যে যে ভাব জাগিয়া উঠে, শব্দ-প্রকৃতির মধ্যে তাহার এক-একটা 'কারণরূপ' আছে ; সার্থক কিংবা নিরর্থক বাক্যচ্ছন্দের সাহায্যে এই কারণরূপ সৃষ্টি করার নামই কবিতা ! সুতরাং তাঁহাদের মতে কবিতা একটা 'গৎ' বই নহে। যে কোনরূপ শব্দের সংযোগ-বিয়োগ সাহায্যে এইরূপ 'গৎ' ভাঁজিয়া পাঠকের মনোমধ্যে ভাবের স্পর্শ জাগাইতে পারিলেই হইল ! উক্ত আদর্শের বশীভূত হইয়া, সঙ্গীতকলার ক্ষেত্রে অনেকে যেমন 'তুফান গাহিতেছেন,' 'যুদ্ধ বাজাইতেছেন' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শাব্দিক প্রকৃতির তুফান-রচনা এবং যুদ্ধ-রচনা চলিতেছে ! আবার কেহ কেহ, এইরূপে উচ্চারিত শব্দের অর্থ-রেখার জাল বুনিয়া (চিত্রের আদর্শে) পাঠকের মনোমধ্যে কেবল নিজের মস্তিষ্ক-স্থিত 'যুদ্ধের চিত্র' আঁকিতেছেন বলিয়াই খ্যাপন করেন ! এমন সাহসী ব্যক্তিরও অভাব নাই, যিনি বলিয়া থাকেন যে, অর্থ সম্পর্কে কবি কিংবা পাঠকের মধ্যে কোনরূপ মিল কিংবা সমসূত্রিতা থাকার আবশ্যকই

নাই। কবি নিজের মনের মতন গাহিয়া যাইবেন, পাঠক আপন মনের মত উহার অর্থ বুঝিয়া লউক! রবীন্দ্রনাথের মানসী হইতে দুইটা পংক্তি উদ্ধার পূর্ব্বক এই আদর্শটি বুঝাইতে পারি—

আমার মনের ভাবে আমি এক গেয়ে যাব,
তোমার মনের মত তুমি বুঝে যাবে আর।

বলা বাহুল্য, এইরূপে চিত্র এবং সঙ্গীতকলার আদর্শ-রাজ্যে অনেক সময় অনধিকার প্রবেশ করিয়া এবং প্রবলভাবে দলবদ্ধ হইয়া, উপরন্তু সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শকে নানামতে তিরস্কার পূর্ব্বক, ইয়োরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক বাক্যশিল্পী গ্রন্থ রচনা করিয়া চলিয়াছেন। প্রাচীনতা-নিষ্ঠ সুধীগণ উহাদের নিন্দা করেন; উহাদিগকে 'সর্ব্বসাহিত্যের সংহারক' 'উন্মার্গগামী, 'অধোগামী' বা 'অধঃপেতে' নামেও নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত দলই আধুনিক সাহিত্যে decadent, Parnassian, Symbolist, Magii প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক নামে চিহ্নিত হইতেছে অনেক সময় তাঁহারাও, পরের কথাকে 'সুবুদ্ধি' প্রকাশ পূর্ব্বক 'হাসিয়া উড়াইয়া,' নিজেরা সগর্ব্বে এই সমস্ত আখ্যায় আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বদ্‌লেয়ার,ভার্লেন,মৈতরলিঙ্ক,ভারহারণ, মরিয়াস, বিগ্‌নিয়ার,রোদেন-বাক্, পীলাদন, বোই প্রভৃতি নূন্যাধিক দ্বিশত কবিতা লেখকের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইঁহারা কাব্যের ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ 'অস্পষ্টতার' থিওরী অনুবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর। "উৎকৃষ্ট কবিতা এক একটা হেঁয়ালী বই নহে "(there should be always an enigma in poetry)। "To name an object is to take three quarters from the Poem, which consists in the happiness of guessing little by little; to suggest, that is the dream,"—এই সকল কথায় ইঁহাদের মর্ম্মগত আদর্শকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। এখন, দল

মাত্রেই উপরে-উপরে কয়েকজন বিশিষ্টব্যক্তি এবং অপর সমস্ত অনুকরণ-কারী লইয়াই গঠিত হয়; এইরূপে, এ সকল দলের মধ্যে, কচিৎ বিশিষ্ট কবিও রহিয়াছেন। ইঁহারা আদিবন্ধে 'একরোখা' মতবাদ অবলম্বনে আত্মপরিচয় করিয়া আসিলেও, ক্রমে আপনাদের মধ্যে সাহিত্যের সনাতন কিংবা সাধারণ অনুভব-প্রণালীর কিছু-না-কিছু সমন্বয় করিয়া দলের বাহিরেও বহুলোকের স্বীকার এবং সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জনসমূহের বিচার করিয়া, ক্রমে পণ্ডিতগণের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, প্রত্যেকদলের মধ্যেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; অর্থাৎ কাব্য চিত্র কিংবা সঙ্গীতের তরফে অনধিকার প্রবেশ করিয়াও সময়-সময় এমন সমস্ত উপায়ন উপস্থিত করিতে পারে, যাহাতে উহার প্রতি অন্ততঃ বিদ্বেষটুকু কমিয়া যায়; স্থলবিশেষে নিরপেক্ষ বিচারকের চক্ষে উহা একটা সত্য উপার্জ্জন বলিয়াও প্রতিভাত হয়! তাঁহাদের স্থূল আদর্শটুকু অন্ধনেত্র অনুকরণকারীর পক্ষে শ্রেয়স্কর না হইলেও, উহা একটা ক্ষুরধার পন্থা হইলেও, সতর্ক এবং সুনিপুণ সাধকের পক্ষে এককালে অগম্য নহে। ফ্রান্সের বদ্‌লেয়ার ভার্লেন এবং আধুনিক বেলজিয়ামের মৈতরলিঙ্ক্‌ ও ভারহারণ্‌ প্রভৃতি কবি এইরূপে সঙ্কীর্ণ দলধর্ম্ম হইতেই বিশিষ্টতা অর্জ্জনপূর্ব্বক ইয়োরোপীয় আধুনিক সাহিত্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, একালের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কিংবা আমাদের দেশেও, কবি অথবা ললিত-শিল্পী মাত্রকে এই অতি-প্রবল 'সিম্বোলিষ্ট' আদর্শের কিছু-না-কিছু বর্ণধর্ম্ম স্পর্শ না করিয়া পারিতেছে না।

আধুনিক সিম্বোলিষ্ট

তবে, ইহাও বলিতে হয় যে, এই 'সিম্বোলিষ্ট' কবিতা নূতন নহে—উহা প্রাচীন রূপক বই নহে। ইয়োরোপ খণ্ডে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত, পরিস্ফুট রূপক কবিতা

কাব্য আদর্শ ও প্রাচীন রূপক

ভূরি ভূরি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কথাই ত নাই! আমাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণগুলি, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ প্রভৃতি, সমস্তই ত 'রূপকের খেলা'! ইয়োরোপের Mystery Plays, Morality Plays প্রভৃতির ন্যায়, স্পেন্সার, চসার, পোপ-ড্রাইডেন প্রভৃতির প্রসিদ্ধ কবিতাসমূহের ন্যায়, ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' এবং 'আশাকানন' প্রভৃতি—কোন কোন দিকে আধুনিক 'যাত্রা' লক্ষণের নাটকগুলি! অনেক স্থানে তত্ত্বজগতের গুণবাচক পদগুলিকে ব্যক্তি-রূপ প্রদান করিয়াই এই রূপক চলিয়াছিল! চরমপন্থী 'সিম্বোলিষ্ট'গণ মৌলিকতা-হুজুগের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রাচীনকালের সহিত সম্বন্ধটুকু স্বীকার করিতে না চাহিলেও, আমাদের চক্ষে প্রকৃত সত্য অবভাত হইতে বিলম্ব ঘটে না! বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বকবিগণ ন্যায়শাস্ত্রের এবঞ্চ লোকনিন্দার ভয়ে রূপক চরিত্রগুলার ধরণধারণ, কথাবার্ত্তা এবং চাল-চল্‌তির মধ্যে একটা বস্তুসঙ্গতি এবং পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চাহিতেন; আর, আধুনিক 'সিম্বোলিষ্ট'গণ

সিম্বোলিষ্ট্ শিল্পের সন্দিগ্ধ রীতি ও অত্যন্ততা বাদ

কোনদিকে ধরা-পড়িতে চাহেন না; ওই প্রকার কোন ন্যায়সঙ্গতি রক্ষার দিকেও দৃষ্টি করেন না; মনুষ্যের সাধারণজীবন এবঞ্চ সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে, এক অর্থের প্রকাশ পূর্ব্বক অন্য অর্থের উপন্যাস ক'রিয়া —মনে 'সুড়সুড়ি' দিয়াই, পাঠককে আবিষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। এই আদর্শের দোষগুণ উভয়ই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। যেমন বলিয়াছি, এই কার্য্যকে এক শ্রেণীর পাঠক যেমন ভক্তিগদ্‌গদ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, অন্যপক্ষ তেমনি পরম বিরক্তি জনক এবং বেদনাকর

বলিয়াও মনে করা বিচিত্র নহে। সাহিত্যে ভাব ভাষা এবং বিষয়বস্তুর সুদৃঢ় সঙ্গতি, এক কথায় 'বাগর্থ প্রতিপত্তি'ই সনাতন মাহাত্ম্যলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। রচনার মর্ম্মটুকু মোটামোটিভাবে কিংবা আঁচে-আভাসে ধরিতে পারা গেলেই যথেষ্ট হইল না; পাঠকের চিত্তপটে বাক্যসাহায্যে যেই ভাব-রূপ অঙ্কিত হইতেছে, প্রত্যেক পদের—প্রত্যেক তুলি-সঞ্চালনের সামগ্র্য এবং অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিলে, ওই অসঙ্গতির তরফ হইতে মনে যেই বেদনা উপস্থিত হয়, 'মোটামোটি অর্থবোধের' আনন্দটুকু তাহা দমন করিতে অনেকের পক্ষেই কাজ দেখে না। বিস্তারিত কাব্যের ক্ষেত্রে এই দোষ 'যেন-তেন' সহিতে পারা গেলেও, ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে উহা নিঃসন্দেহে মারাত্মক হয়। বিশেষতঃ, লেখকের সাধুতার উপরেই পাঠকের নির্ভর শিথিল হইয়া গিয়া বিরাগ উদ্রিক্ত হইতে থাকে। সুতরাং, 'সিম্বোলিষ্ট' আদর্শের সমস্ত মাহাত্ম্য মনে রাখিয়াও, এই স্থলে স্বীকার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য যে, উহা একদিকে বর্ত্তমানকালের একটা 'চরমপন্থী বিশেষত্ব' বই নহে। 'রিয়ালিষ্ট' বা 'নেচরেলিষ্ট' বলিয়া শিল্প-আদর্শটাও যেমন নানাদিকে চরমপন্থী! ভবিষ্যতে এই সমস্ত টিকিবে কিনা, সংশয়টিও কোনমতে অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষাধ্যায় কেবল কতকগুলি খামখেয়ালী নীতি-নিয়মের সমষ্টি নহে; উহার মূলে শিল্পতত্ত্বের—মনুষ্যের মনস্তত্ত্বের অলঙ্ঘনীয় নীতি-ভিত্তি রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া কোন সারস্বত কার্য্যই সুধীসম্মতি লাভ করিতে পারিবে না। 'লজিক' বজায় রাখিয়া চলিলে সকলসময়ে ভাল কবিতা হয় না বলিয়া সিম্বোলিষ্ট্‌গণ যে অজুহাত উপস্থিত করেন, তাহাতেও 'কারি করিতে' পারে না; যে হেতু, মনুষ্যের মন নামক পদার্থ টি চিরদিন সংশয়ী। কে বলিতে পারে, আজ যে পদার্থ এক কবির হস্তে—তাঁহার ভাষা এবং রীতিমুখে, হয়ত

অপরিহার্য্য ভাবেই অস্পষ্ট বলিয়া ঠেকিতেছে, তাহা আগামী কল্যই অন্যতর সমর্থ শিল্পিকর্ত্তৃক বাগর্থের রাজ্যে স্থির ধারণা লাভ করিয়া মনুষ্যের প্রাপ্তি-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিবে! 'এই পর্য্যন্ত' বলিয়া সাহিত্যে কিংবা প্রতিভার সমক্ষেও কোন সীমা নাই। দ্রষ্টার কিম্বা প্রকাশকের শক্তিরই সীমা! এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠম্মন্য ব্যক্তির রায়-পরামর্শও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। কে বলিবে যে, এ স্থানেই, এই স্বীকৃত দৈন্য-দুর্ব্বলতা লইয়াই সাহিত্যের শেষ! ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন মনুষ্যকে, চক্ষে ধুলা দিয়া দীর্ঘকাল অন্ধ করিয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে। আমরা জানি, এই 'সিম্বোলিষ্ট্' আদর্শের বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের দেশেই, একদিকে যেমন ভক্তি অনুরাগের, অন্যদিকে প্রবল বিরাগের লক্ষণও দেখা দিয়াছে; উভয়েরই বিস্তৃতি এবং গাঢ়তা বিষয়ে এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তুলনাহীন। মনুষ্যের সনাতন মনস্তত্ত্বের মধ্যেই উহার রহস্যটুকুন নিহিত আছে! মানুষ শিক্ষা দীক্ষায়, কথায় কার্য্যে, জীবনপথে চিরকাল ন্যায়নীতির সঙ্গতিটুকুই সাধন করিয়া চলিতেছে। সমাজের মধ্যেও, মানুষে-মানুষে যাহা প্রকৃত তফাৎ, ভাল-মন্দ বড়-ছোট এবং সুবোধ-অবোধের মধ্যে যাহা প্রকৃত পার্থক্য, তাহাও প্রকারান্তরে মনুষ্যের বাক্য এবং অর্থ, কথা ও চিন্তা, জ্ঞান এবং কর্ম্মের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে এইপ্রকার ন্যায়সাধনার সাফল্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে! মানুষ কখনও সজ্ঞানে ন্যায়-আদর্শকে ন্যক্কার পূর্ব্বক কেবল অস্পষ্টতাজীবী হইতে পারিবে না; কাব্য-উপভোগের ক্ষেত্রে আসিয়াছে বলিয়া চিরজীবনের সাধনাভূত ন্যায়-সঙ্গতির দাবীটাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। সাহিত্য স্পষ্টভাবে লজিকের দাবীকে অগ্রাহ্য করিলে, জনসমাজে তাহার বর্ত্তমান মাহাত্ম্যটুকু যে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে, শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে যে তাহার 'প্রসাদোহপি ভয়ঙ্কর' হইয়া দাঁড়াইবে, মনুষ্যের শাস্ত্রকার এবং মঙ্গলচিন্তক-

গণও যে তাঁহাদের 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ'-নীতি সুদৃঢ় করিবার সাপক্ষ্যে আর একটি প্রবল অজুহাত লাভ করিবেন—তাহাতেও সন্দেহ হয় না। 'সিম্বোলিষ্ট্'গণ এই অস্পষ্টতার আদর্শ কখনও সমাজের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন না—'ধর্ম্ম'সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নহে। 'অলখ'-লোকের পদার্থ বিষয়েও মনুষ্য-ভাষার অস্পষ্টতাটুকুন প্রকৃত প্রস্তাবে অপরিহার্য্য বা ন্যায়সঙ্গত কি না, ইহা মানুষ চিরদিন জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে!

বর্ত্তমান সভ্যতায় সিম্বোলিষ্ট্ আদর্শের অপরিহার্য্যতা, মীষ্টি্সিজম

অন্যদিকে, মনুষ্যের দৃষ্টি সমক্ষে বর্ত্তমানে সকলদিকেই যেমন একটা সীমা থাকা প্রতীয়মান, ইহাও নিঃসন্দেহ যে, এই সীমা চিরদিন থাকিয়া যাইবে; সমস্ত বিজ্ঞানের পরমা প্রাপ্তির পরেও অনন্ত অ-জ্ঞান থাকিয়া যাইবে! মানুষ অস্পষ্টতাকে কখনও ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে না বলিয়াই'অস্পষ্ট'কবিতার একটা সম্ভব-ক্ষেত্র চিরকাল মনুষ্য-জীবনে থাকিয়া যাইতেছে। অদ্যকার অস্পষ্ট আগামী কল্য হয়ত স্পষ্ট হইয়া চলিতে থাকিলেও, এই অনন্তগতিশীল ভূতচক্রের রঙ্গভূমি যে মনুষ্যের দৃষ্টিসমক্ষে উহার আদি এবং অন্তবিষয়ে নিত্যকাল অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না। গীতার 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত' ইত্যাদি কথা যেমন সৃষ্টির প্রত্যুষে সত্য ছিল, তেমনি, 'সৃষ্টির সন্ধ্যা' বলিয়া কোন ঘটনা থাকিলে তৎকালেও সুপ্রযুক্ত হইতে পারিবে। সুতরাং, কোন 'অস্পষ্ট' কাব্যের সাধুতা বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন টুকুর মীমাংসা যেমন চিরকাল অভিজ্ঞ ব্যক্তির অপেক্ষা করিবে—বলিতে কি, সাধারণের পক্ষে এই ক্ষেত্রে যেমন পূর্ব্বাপর-অভিজ্ঞের

মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই—তেমন ইহাও নিশ্চয় যে, মনুষ্যের এই আদি-অন্ত-উদ্দেশী ভাব এবং চিন্তা, এই অব্যক্ত-বিলাসিতা এবং এই ছায়াবাদিতার প্রবৃত্তি টুকুও নিত্যকালের অমর! অতএব, মনুষ্য-সাহিত্যের প্রকৃতি মধ্যে এই 'মীষ্টিসিজম্' এর প্রবৃত্তিটুকুও নিত্যকালের অপরিহার্য্য এবং অমর!

স্থতরাং, স্বীকার করিতে হয় যে, এই সিম্বোলিষ্ট্ প্রভৃতি চরমপন্থী আদর্শের উপার্জ্জন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মতএবং সনাতন প্রাপ্তি কি না, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার পক্ষে বিস্তর বিলম্ব থাকিলেও, উহার 'থিওরী' এখন আর পরিব্যাপ্ত বিদ্বেষ কিংবা পরিহাস উদ্রেক করে না।

স্থায়ী সাহিত্য ক্ষেত্রে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের স্থান, মৈতরলিঙ্ক্, ইয়েট্স্

এই পথে, অন্ততঃ ভবিষ্যতে সাহিত্যের একটা স্থায়ী-প্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া, 'নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথিবীর' দিকে চাহিয়া, পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারিতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও সত্য যে, কেহকেহ যেমন 'ডিকেডেণ্ট' কবি বার্লেনকে Prince of Poets বলিয়াছেন, অনেকে তেমনি তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করার হুকুমজারী করিতেও ছাড়েন নাই। মৈতরলিঙ্ক্‌কে কেহকেহ যেমন বর্ত্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন মৌলিক প্রতিভাবান্ অপিচ অতুলনীয় জ্যোতিষ্ক (Lightgiver) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যেরা তেমনি Hopeless mental cripple বলিয়া ন্যকার করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। উভয় বিচারের মধ্যেই প্রভূত সত্য আছে। মৈতরলিঙ্ক্ যে ইতিপূর্ব্বে 'নোবল' পুরস্কার পাইয়াছেন তন্মধ্যে, তাঁহার কাব্যের সাধারণ-সম্মত সমৃদ্ধিবিষয়ে ইয়োরোপীয় সাহিত্যরসিকগণের অন্ততঃ অধিকাংশের অভিমত লুক্কায়িত আছে বলিয়াই মনে করিতেছি।

মৈতরলিঙ্ক্ বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর মৌলিক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক * এবং idealist কবি বলিয়াই পরিগণিত! সাহিত্যে স্বাধীন ভাবুকতার, বা জগৎ-বস্তু-বিষয়ে কবির অধ্যাত্ম-দৃষ্টির অভিনবতার উপরেই সাহিত্যের প্রাণটুকুন এবং উহার বিকাশের প্রধান রহস্যটুকুন নির্ভর করিতেছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিবেন; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের বিধানমতে ভাবুকতা-আদর্শের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেই বৎসর-বৎসর 'নোবল' পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে! বলা বাহুল্য, মৈতরলিঙ্ক্ 'নোবল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন।

ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ইয়োরোপের শিম্বোলিষ্ট ও মীষ্টিসিজম

'কেলটিক্ রিভাইভেল'এর কবি ইয়েট্স্ প্রভৃতির আদর্শও নানাদিকে ইয়োরোপের এই ডিকেডেণ্ট এবং সিম্বোলিষ্ট আদর্শের সহোদর; তাঁহাদের মধ্যেও মৈতরলিঙ্ক্ প্রভৃতির রূপকবুদ্ধি এবং 'মোটামোটি অর্থের' সঙ্কেত

* মৌলিকতার ক্ষেত্রেও আবার এই শ্রেণী-বিভাগ নামক কথাটি নিবিষ্টভাবেই বুঝিয়া লওয়া দরকার মনে করি। এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলাও আবশ্যক যে, মৌলিক কবি হইলেই প্রথম শ্রেণীর কবি হয় না। শেষের কথাটা কবির উপার্জ্জনের মাহাত্ম্য বিচার করিয়াই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি যে, রবার্ট ব্রাউনীংকে অকাতরে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বলিয়া হয়ত নির্দ্দেশ করিতে পারিব; তাই বলিয়া তাঁহাকে ওয়ার্ডসোয়ার্থ শেলী বা কীট্স—কিংবা টেনিসন হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে সঙ্কুচিত হইব। কেন না, শিল্প-উপার্জ্জনের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, বিশ্বজনীনতার ক্ষেত্রে অপিচ অধ্যাত্ম-আদর্শে উহার শক্তি বা সুদুর্লভ রসবত্তার হিসাবেই বাণিপন্থি-মাত্রের চরম বিচার নির্ভর করিয়া থাকে। শেষোক্ত তুলাদণ্ডে পরিমাপিত এবম্ উত্তীর্ণ না হইয়া কেবল মৌলিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হইতে পারিলেই শ্রেষ্ঠতার প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না। লেখক।

আদর্শই জাগ্রত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এখন, বর্ত্তমান ইয়োরোপের এই নব আদর্শের শিল্পকলা ভারতীয় আদর্শাভিজ্ঞের চক্ষে খুব মহীয়সী বলিয়া না ঠেকিলেও, উহার প্রকাশরীতি বা খণ্ডপদের অর্থগৌরব এবং বিশিষ্ট-শিল্পাদির সৌন্দর্য্যসমাধান যে অতুলনীয় মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে, উহার যেই অধ্যাত্ম-ভাবুকতা ইয়োরোপের চক্ষে 'অলৌকিক চমৎকারী' বলিয়া প্রতীয়মান, তাহার 'অলৌকিকতার' প্রতিভাটুকু ভারতবর্ষের সমক্ষে (বোধ করি, জড়বাদিতার হৃদয়জাত বলিয়াই) কিঞ্চিৎ 'মেটো' এবং 'মাটীঘেঁশা' বলিয়া বোধ হইতে থাকে—দৃষ্টিহীনের আলোকস্বপ্ন বলিয়াই প্রতীতি জন্মাইতে থাকে! ঋষিশিষ্যের পক্ষে এই ঘটনা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ভারতবাসীর সমক্ষে অন্য জাতির ভাবুকতা! বিশ্বজগৎকে ভাবুকতার বর্ণপাতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে, অন্য কোন্ জাতি? এই দেশে 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত', পরলোকের অমর-জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলি পর্য্যন্ত, মনুষ্যের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান—ধর্ম্মজীবন, সমাজজীবন, পারিবারিক জীবন এবং উহাদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত সমস্তই ভাবুকতায় ওতপ্রোত! ইহা ভারতীয় আর্য্যগণের চিরন্তন বিশেষত্ব! হিন্দুর ধর্ম্ম কতকগুলি ভাব সাধনা—বিশেষ আদর্শের সাধনা বই নহে! বিশেষতঃ, এই ভাবুকতার রাজ্যে, তথাকথিত অধ্যাত্ম প্রাপ্তি এবং মাহাত্ম্যের রাজ্যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ একেবারে কল বসাইয়া—কলের-গাড়ী চালাইয়া গিয়াছেন বলিয়াই সে মনে করে! সুতরাং, ইয়োরোপীয়-গণ যেই অধ্যাত্ম বিষয়ে কেবল 'সংকেত' এবং 'আভাস' পাইয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার বিশ্বাস (সত্যাসত্য যাহাই হোক) এই যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ ওইরাজ্যে একেবারে গণিত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পদ্ধতি অনু-সরণে সমস্ত অস্পষ্ট অনুভূতিকে সুদৃঢ় বস্তু-মূর্ত্তি প্রদান পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া

গিয়াছেন। বাঙ্গালীর ত কথাই নাই! এ জাতির সমস্ত দোষগুণের মূলসূত্র, শক্তি এবং দৈন্যদুর্ব্বলতার মূলাধার টুকুই ভাবুকতা বলিয়া আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি! সুতরাং বাঙ্গালীর সমক্ষে আধুনিক idealismএর আদর্শ! ভাবুকতার ক্ষেত্রে যে জগতের অন্য কোন জাতি আমাদিগকে উত্তরাইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা ত আমাদের মনোমধ্যে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে! রবীন্দ্রনাথকে না কি কোন জর্ম্মন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, হিন্দু এবং জর্ম্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ভাবের কথা, বুঝে না। এই জর্ম্মণও অবশ্য, প্রাচীন Platonism এবং Neo Platonism এর সন্ততিসূত্রে কাণ্ট্ ফিক্টে শেলীং শোপেনহর হেগেল এবং গ্যেঠের মন্ত্রদীক্ষিত জর্ম্মণ—সুতরাং নানাদিকে আমাদের বেদান্ত-মর্ম্মের দীক্ষা প্রাপ্ত জর্ম্মণ: ধর্ম্মের আদর্শকেই যদি মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান গঠনীশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম-আদর্শকেও যদি কেবল কতকগুলি বিশেষতন্ত্রীয় ভাবুকতার সমষ্টি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তা' হইলে বলিব, হিন্দুর স্থান সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চে! তারপর খ্রীষ্টান—মুসলমান—ও বৌদ্ধ! এসিয়ার মানসপুত্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ভাবুকতার লক্ষণে বলিষ্ঠ হইলেও, তাহার শিষ্যগণের পক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভাবুকতা করিবার জন্য এখন অবকাশ নাই—ইয়োরোপীয় জাতি জীবন-সংগ্রামে পৃথিবীর কর্ম্মভূমি এবং স্বর্ণভূমির অধিকার-উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত! ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই জগতের অন্যজাতিকে প্রকারান্তরে জগতের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং তপোবনে সমাধি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যটাই বলবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন! এই ভাবুকতাই যে ভারতীয় আর্য্যের সকল পাপপুণ্য অপিচ সমস্ত সবলতা-দুর্ব্বলতার মূল কারণ তাহা দ্রষ্টামাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, আমরা ভারতবাসী এখন যাবৎ প্রায় সকল দিকেই নিদ্রিত; আমাদের সনাতন

ভারতীয় আদর্শের বিশেষত্ব বিষয়ে আমরা সম্যক্ উদ্বুদ্ধ নহি

বিশেষত্ব বিষয়ে কেহই জাগরণ লাভ করিতে পারি নাই; সাহিত্যে এই ভাবুকতাকে আনিয়া, শিল্প-কলার সহিত সঙ্গত করিয়া, এখনও আকার দান করিতে পারি নাই; আমাদের সাহিত্য এখন যাবৎ ভাবুকতা দেখাইবার জন্য যথোচিত বস্তু-ভিত্তি বা জীবনের ভিত্তিটুকু পর্য্যন্ত সম্যক্ উদ্দেশ করিতে পারে নাই। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক যুগের পর ভারতবর্ষে কালিদাসাদির সাহিত্যযুগের অভ্যুদয়। অমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি, উহাও সকল দিকে আত্ম-জাগরণ লাভ করিতে-না-করিতেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং জাতীয় দুরবস্থার সূত্র-পাত; সুতরাং, ঐ সাহিত্য-চেষ্টা জাগিতে-না-জাগিতেই ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরেই আমরা বিশ্বজনীন আদর্শ-প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া সবেমাত্র জাগিতে আরম্ভ করিয়াছি বই নহে; আমাদের জাতীয় আত্মবোধ এখনো বিশ্বের সম্পর্কে বা নিজের দিক হইতেও যথেষ্টমতে অগ্রসর হয় নাই। আমাদের ধর্ম্ম কিছুকাল হইতে বিজাতীয় আঘাতে জাগিয়া থাকিলেও, তন্মধ্যে পূর্ব্বাপরের সূত্রধারণা কিংবা বিশ্বচিন্তার দৃঢ়সংযত দার্শনিক প্রতিভা এখনও জন্মে নাই বলিতে হইবে। রাম-মোহন, দয়ানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে ন্যূনাধিক আত্ম-সংস্কারের চেষ্টা, ধর্ম্ম-ভাবুকতাকে বর্ত্তমানযুগের উপযোগী পথে ন্যূনাধিক কর্ম্মনিষ্ঠ করার চেষ্টাই যেমন কার্য্য করিয়াছে, তেমন, পরবর্ত্তী এবং অল্পায়ু বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতীয় বিশেষতন্ত্রের কোন কোন লক্ষণ আত্মপ্রাপ্তি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা খুঁজিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি, এই সমস্ত দীনতা স্বত্বেও হিন্দু মাত্রেই, নিজের সমাজতন্ত্রীয় ধর্ম্ম-

ভারতীয় ভাবুকতা ও বিশ্বাস

ভাবুকতার দরুণ এমনসমস্ত ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বর্দ্ধিত হয় যে, নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিটিও এ ক্ষেত্রে নিজকে অন্যজাতি হইতে বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে থাকে! এই ভাবুকতা, এই চরমপন্থিতা, এই বিশ্বাস বা এই অন্ধ অহংকারই একদিকে হিন্দুর সর্ব্বস্ব—তাহার অধঃপতিত পার্থিব জীবনের—তাহার পঙ্গুজীবনের একমাত্র নির্ভরযষ্টি! যে হিন্দুর লক্ষ লক্ষ লোক এখন যাবৎ, বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানসূর্য্যের প্রচণ্ড আলোক সমক্ষেও, বনে জঙ্গলে কেবল ভাবের সাধন করিয়া—সর্ব্বতোভাবে কেবল 'লক্ষ্মীছাড়া' হইবার অভিসন্ধিটুকু সম্মুখে রাখিয়াই চলিতেছে, কেবল বিশ্বাসের নির্ভরেই প্রাণধারণ করিতেছে, তাহার সাহিত্যও যে কেবল 'মলয়া এবং জ্যোছনা' ভক্ষণ করিয়াই বাঁচিতে পারিবে, কিংবা অব্যক্ত এবং অপ্রাপ্তের উদ্দেশে কেবল হা-হুতাশ করিয়া, দূর-দূরান্তগামী অনুভবের আবছায়া এবং ইঙ্গিত লইয়াই বর্দ্ধিত হইতে পারিবে তাহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। যে ভাবুকতার জন্য 'নোবল' পণ্ডিতগণ এত লালায়িত, হিন্দুর পক্ষে তাহাই নানাদিকে স্বতঃসিদ্ধ—বস্তুনিষ্ঠ হওয়াটাই বরং তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ পদার্থ!

ইয়োরোপীয় সিম্বোলিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসের অভাব

এখন, এই বিশ্বাসের ক্ষেত্র হইতেই ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সিম্বোলিষ্ট কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মৈতর-লিঙ্ক স্বয়ং একজন সংশয়ী। তাঁহার রচনার মধ্যে পাঠকগণ যে-আলোকের আভাস পায়, উহা যেন সুস্থির কিংবা সমূলক আলোক নহে—আলেয়ার দীপ্তি!

একটা অর্থকে বাহ্যতঃ অবলম্বনপূর্ব্বক উহা অর্থান্তরন্যাস উদ্দেশ্য করিতেছে! অন্য অর্থের ইশারা করিতেছে—এবং চাপিয়া ধরিতেই শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে! প্রতিপদেই মনে হয়, এই সমস্তের মূলে যেন কবির কিছু মাত্র বিশ্বাসের ভিত্তি নাই—অনুভবের বিশেষ গভীরতাও নাই! উহা যেন সংশয়ীর পরমার্থ সঙ্কেত! ইয়োরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে; সুতরাং, বিজ্ঞানও অধ্যাত্মবিষয়ে সংশয়ী বলিয়া, অধিকন্তু দেহী মাত্রেই অধ্যাত্মবিষয়ে ন্যূনাধিক সংশয়াপন্ন বলিয়া, এই সিম্বোলিষ্ট আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমি যে বহুব্যাপী হইবে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। তবে, উহার সাধন করিতে গিয়া যে-জাতীয় প্রতিভা প্রকটিত হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রকৃত কবিত্বশক্তির অংশ-অনুপাত অপেক্ষা বরং দর্শনশক্তি এবং দার্শনিকতার একটা বিশেষ ঝোঁকই যে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যবন্ধুগণ, এই স্থলে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের কয়েকটি গুপ্ততত্ত্বের দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাহিত্যক্ষেত্রে সিম্বোলিষ্ট শিল্পের রহস্য

উহার ভাষা অনেকস্থলেই নিতান্ত সরল—এত সরল যে উহা অনেক সময় নিতান্ত 'ঘোরো' এবং 'আটপৌরে'—উহার বিরুদ্ধে গ্রাম্যতার অভিযোগও আনিতে পারা যায়। রহস্য এই যে, ভাষাপ্রণালীর এই আপাতিক সরলতাই যেন অর্থসঙ্গতি বিষয়ে উহার প্রকৃত অসরলতাটুকুন—পরম অসাধুতাটুকুনও ঢাকিয়া রাখে! 'মিষ্টি বুলি'র ইন্দ্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক খেলায়-খেলায় মানুষের অর্থবিচার-বুদ্ধির চোক টিপিয়াই যেন উতরাইয়া যায়! মানুষ প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছু না-বুঝিয়াও খুসী হইতে থাকে! যেই সিম্বোল বা রূপকের সম্মুখীন হইয়াছে, উহা সর্ব্বথা 'ন্যায়'-সঙ্গত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে মাথা ঘামাইতে চায়

না; 'খুব বড় একটা কিছু বুঝিতেছি' বলিয়া মনে 'সুড়সুড়ি' লাগিলেই হইল! ইহা যে নিদানতঃ চিত্র এবং সঙ্গীতঅধিকারের বিশেষত্ব তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সূত্রে সিম্বোলিষ্ট্‌ শিল্পের আর একটি রহস্য— অবলম্বিত বিষয়-বস্তুর দূরত্ব ঘটনা। স্বয়ং কবিটিও পাঠকের সম্পর্কে দেশে বা কালে যতই দূরবর্ত্তী হইবেন, উহার মুগ্ধকরী শক্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে! বিষয়টুকু পাঠকের আসন্নদৃষ্টি-সম্বন্ধের বহির্ভূত হইলে উহার চমৎকারিতা বিধানে যেমন বিশেষ সহায়তা ঘটে (কারণ it is distance which gives enchantment to the view) তেমনি, কবিও ভিন্ন-দেশীয় কিংবা ভিন্ন-জাতীয় হইলে, তাঁহার ভাবের পরিবেশ পাঠকের জাতীয় সংস্কার (race-consciousness) বা সহজ অনুভব হইতে দূরবর্ত্তী হইলে, উহার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যায়! কাব্যের ভাব কিংবা বিষয়-বস্তুর মধ্যে সত্য-সত্যই কোন দোষ কিংবা অসঙ্গতি থাকিলেও, পাঠকের অনভিজ্ঞতার সাহায্যেই উহার ধারটুকুন অনেকটা কাটান যায়; অপিচ, সম্পূর্ণ অসত্যও সত্য বলিয়াই মাহাত্ম্য অর্জ্জন করিতে পারে! এইরূপে স্বজাতির নেত্র সমক্ষে আসলের মাহাত্ম্য অপেক্ষাও, বিজাতীয়ের চক্ষে নকলের পদবীটুকু বড় হইয়া পড়ার সুযোগও ঘটিতে থাকে—এই শিল্প-আদর্শের মায়াটুকুন, উহার illusion টুকুন এরূপেই সম্যক্‌ সমাধা হইয়া যায়! ফলতঃ, এই আদর্শের মূল রহস্য মায়া বই নহে। কিন্তু উহাও ত সাহিত্যকলার একটা বিশিষ্ট বিভাগ! সম্পূর্ণ মায়িকতার সাহায্যেও সত্যরস-নিষ্পত্তি কিংবা রসাভাস-সিদ্ধি কবির পক্ষে কখনও অগ্রাহ্য নহে; উহা চিরকাল সাহিত্যকলার একটা প্রধান দাবী বলিয়াই পরিগণিত। সত্যই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য—যে-কোন চমৎকারী উপায় সাহায্যে সত্যকে সরস করিয়া পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা'র নামই কাব্য-তন্ত্রের 'স্বাধীনতা'!

এইরূপে আমরা আধুনিক ইয়োরোপের একটি প্রবল শিল্প-আদর্শের 'মোটামোটি' ধারণা করিয়া আসিলাম। এখন দেখিতে পারিব, উহার সহিত—প্রাচীন অথবা আধুনিক প্রাচ্য কাব্য-আদর্শের সহিত, বঙ্গদেশের আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের মিল, পার্থক্য কিংবা বিশিষ্টতা কোথায়; এবং তিনি কোন স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথে স্বদেশী ও বিদেশী আদর্শের সম্মিলন

৩

জর্ম্মণীর সুবিখ্যাত কবি গ্যেঠে একস্থলে বলিয়াছেন, সাহিত্যে পূর্ব্ববর্ত্তীর অর্জ্জিত সম্পত্তিতে পরবর্ত্তীর দায়াধিকারতন্ত্র বিশেষভাবেই প্রচলিত। যেই কবি বলেন যে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীর নিকট কিছুমাত্র ঋণী নহেন, তিনি হয় ত একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'বেকুব', নতুবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। তবে, শেষোক্তের ঘটনা বর্ত্তমানকালে অসম্ভব। এইরূপ দায়াধিকার সাহিত্যে এত প্রবল যে, পূর্ব্ববর্ত্তীর তহবিল হইতে পরবর্ত্তিগণ যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রধান কথা এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তীর সম্পত্তিকে পরিমার্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়াই গ্রহীতাকে উক্ত ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে; বিশ্বলোকের সমক্ষে নিজের মৌলিক উপার্জ্জন এবং পরিবর্দ্ধনা দেখাইয়া—মনুষ্যের জ্ঞানভাবের ভাণ্ডার পরিস্ফুটভাবে বর্দ্ধিত করিয়াই ঋণ-কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এইরূপে, সাহিত্যের গতি এবং উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর ধারাসম্বন্ধে ঋণ-গ্রহণ এবং ঋণ-মুক্তি বই নহে। বন্ধুগণ,

আধুনিক সভ্যতায় সাহিত্য শিল্পীর স্বত্ব ও দায়িত্ব

আপনারা সকলে বর্ত্তমান কালের বহুপ্রচলিত "সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব" 'মৌলিকতা' 'জাতীয় সাহিত্য' 'বিশ্বসাহিত্য' প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন বলিয়াই মনে করিতেছি। অধুনা, মনুষ্য-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, গত তিনশতাব্দীর উন্নতিশীল পদার্থবিজ্ঞান এবং আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতির সাহায্যে, মানুষ প্রাচীনতর কালের মনুষ্য-অদৃষ্ট এবং দেশ-কালের সীমাসংকীর্ণতাকে নানাদিকে অতিক্রম করিয়াছে। সমাজের মধ্যে শান্তি, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার স্থিরতা এবং সুখসুবিধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত করিয়া ব্যক্তিবিশেষকেও নিজ নিজ 'ব্যক্তিত্ব' লাভ করিতে—সুতরাং অধ্যাত্মলোকেও অশেষপ্রকারে লাভবান্ হইতে অশেষ সাহায্য করিতেছে। আমাদের মধ্যে অনেক 'একরোখা' পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তি এই ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে 'জড়সভ্যতা' বলিয়া অভিধান রচনাপূর্ব্বক কেবল উহার বিজাতীয় দোষের লক্ষণগুলি উজ্জ্বল করিয়াই আমাদের অবজ্ঞা উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমরা দেখিয়া থাকি যে, এই 'সভ্যতা' মানবের অধ্যাত্মসভ্যতার অবস্থান্তর, এবং উহার পরম ক্রমবিকশিত প্রকাশ বই নহে। সৌভাগ্যগতিকেই ইয়োরোপের এই 'জড়'সভ্যতা আমাদের উপর আপতিত হইয়া, আমাদের দ্বার সমক্ষে বিশ্বমনুষ্যের সমস্ত জ্ঞানভাবকর্ম্মসম্পত্তি—সুতরাং অধ্যাত্মসম্পত্তি অপ্রত্যাশিতভাবে রাখিয়া যাইতেছে! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাগরিত আছেন, তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সমগ্রধরণীর মনুষ্যহৃদয়ের কর্ম্ম-উচ্ছ্বাস এবং জ্ঞানভাবের অভিজ্ঞতার পরিণতি-গভীর আনন্দকল্লোলে জাগিয়া থাকিয়াই নিজের এই 'ব্যক্তিত্ব' এবং ইহপরকালের পরমার্থসাধনায় নিরত থাকিতে পারিতেছেন! এই সৌভাগ্য দুইশতবৎসর পূর্ব্বকার কোন মনুষ্যসন্তানের পক্ষেই এত সুলভ ছিল না। দেখিবেন, এই

রবীন্দ্রনাথে উহার সফলতা ও বিশিষ্টতার

উপার্জ্জন

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কোটি কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে, এবং সহস্র সহস্র সাহিত্যসেবকের মধ্যে, সেইরূপ একজন পরম সৌভাগ্যবান্ জাগ্রত ব্যক্তি। তিনি সভ্যজগতের প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যসম্পৎ, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগএবং উহাদের প্রকাণ্ডতা জ্ঞাত আছেন, স্বীয় শক্তির বিশিষ্ট লক্ষণটুকুও বিশেষভাবেই জ্ঞাত আছেন। অপিচ, তিনি সভ্যজগতের সহস্র পূর্ব্ববর্ত্তিকে হজম করিয়াই, যেমন নিজের সাহিত্যজীবনকে the work of Supreme Culture * রূপে খাড়া করিয়াছেন, তেমন একটি বিশেষ দিকে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার পরমতম সৌভাগ্যও উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ইয়োরোপীয় কবিগণ হইতে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক—এবং সেই ঋণ তাঁহাদের পথেই পুরামাত্রায় শোধ করিয়া—বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্য-সম্পত্তির যাহা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রথম পক্ষে ই ইয়োরোপের সমক্ষে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। সমধিক প্রাচ্যের প্রণালী অবলম্বনে তিনি যেই সম্পত্তি উপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বাধীন মাহাত্ম্যতটে উত্তোলিত করিয়াছিলেন, পরম স্বানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া এই 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে উহাকেই পাশ্চাত্যের নয়নসমক্ষে ধরিয়াছেন—এবং উহাও সরল ত্বরিতভাবেই লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে!

ইংরাজী গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব কি, এখন তাহাই ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়া এ

পূর্ব্বাপর সাহিত্য কার্য্যের এবং স্বদেশী বিদেশী শিল্পীগণের সূত্র-সামঞ্জস্যে

প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ নিজের দিক হইতে, অবশ্য, শৈশব সঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া নৈবেদ্য, খেয়া, রাজা ও ডাকঘরের

* গীতাঞ্জলির ভূমিকায় ঈয়েট্‌স।

রবীন্দ্রের নিজত্ব

রবীন্দ্রনাথের সমূহ-ফল সন্দেহ নাই। সোণার তরীর সময় হইতে, উহার বহু-আলোচিত প্রথম কবিতাটি হইতে, রবীন্দ্রের কাব্যজীবনে একদিকে যে সিম্বোলিষ্ট আদর্শের ধারা দেখা দিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন—উহা যেমন এক দিকে শৈশব-সঙ্গীত হইতে আরব্ধ কবি-জীবনের উত্তর ফল; পক্ষান্তরে, উহার মধ্যে ইয়োরোপীয় আধুনিক সিম্বোলিষ্ট-গণের শিল্প-লক্ষণ ও কার্য্য করিয়াছে। বহির্দ্দিক হইতে তিনি প্রাচ্যতরফের বাঙ্গালী এবং বৈষ্ণবগীতিকবিগণের, পারস্যের সুফীকবিগণের, এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক 'ভাবুক' কবিগণের—বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত মৈতর্লিঙ্ক্, ভারহারণ প্রভৃতি ফরাসী-বেলজী কবিসংঘের উত্তরাধিকারসূত্রে দাঁড়াইয়াছেন। সর্ব্বোপরি, ইংরাজী গীতাঞ্জলি হীব্রু বাইবেলের—বিশেষতঃ উহার ইংরাজী-অনুবাদ 'গীত-সংহিতার' (Psams) ভাষা-রীতি অবলম্বনেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখন, এই কথা আপনাদের সমক্ষে একটা প্রহেলিকা বলিয়া ঠেকিতে পারে। অনেকেই হয়ত, উক্ত সমস্ত গ্রন্থের প্রাণপদাথের সহিত সাহিত্যিকের হিসাবে পরিচিত নহেন। কিন্তু সাহিত্যে, কোন কবিকে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-সূত্রে আনিয়া দৃষ্টি করিতে হইলে এই প্রণালী ব্যতীত গত্যন্তর নাই—কথাগুলিকে যথাসাধ্য বিবৃত করিতেই চেষ্টা করিতেছি।

রবীন্দ্রের পরকীয় ঋণ ও নিজত্ব

এই সভায় কোন বক্তা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল বৈষ্ণব কবিগণের কতিপয় ভাব-সম্পত্তি লইয়া 'নাড়াচাড়া' করিয়াই ইয়োরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে, বিশেষতঃ সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে, ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তির কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

ইংরাজীতে 'বেকুবের স্বর্গলোক' বলিয়া একটা স্থান আছে, রবীন্দ্রকে বৈষ্ণব কবির বা হীব্রু পারসীক অথবা ইয়োরোপীয় কোন কবির, কিংবা কবিসংঘের কেবল অধমর্ণ বলিয়া স্থির করিলে, আমরা ঐ 'বেকুবের স্বর্গেই' অবস্থান করিতে থাকিব। অবশ্য, অসাহিত্যিকের পক্ষে এইরূপ স্বর্গবাসের দ্বারা কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু, যাঁহাদের পক্ষে সাহিত্যের পূর্ব্বাপর বিভিন্ন দায়সম্পত্তি এবং স্বোপার্জ্জনের যথাযথ পরিজ্ঞান বলিয়া পদার্থটি অপরিহার্য্য, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ নির্দ্ধারণ অপেক্ষা অধিকতর আত্ম-বঞ্চনা কিংবা ভয়াবহ ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে উহা অপেক্ষা অপ্রকৃত কথাও বেশী কিছু সম্ভব নহে। আপনারা প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব কবিগণের, তেমন অন্য কোন কবির উপার্জ্জিতসম্পত্তির বিশেষ কোনরূপ অধন্য উপচার কিংবা আত্মসাৎ-ব্যবহার দেখিতে পাইবেন না; তিনি ভাবুকতা এবং ভাব প্রকাশের রীতিবিষয়েই পূর্ব্ববর্ত্তীর পথে—উহাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া এবং স্বয়ং গ্যেঠের কথিত বেকুব নহেন বলিয়া—অন্তরাত্মার সহজাত প্রবৃত্তিবশে সাহসী হইয়া চলিয়াছেন; এবং স্বসিদ্ধ দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালী জীবনের উদ্যানজাত সংগীতকুসুম চয়নপূর্ব্বক সাহিত্যমণ্ডলীকে উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত বিচারকগণ তাঁহার পূর্ব্বঋণ যেমন দেখিবেন, তেমন স্বকীয় উপার্জ্জনের সুমহৎ ফলটুকুও না দেখিয়া পারিবেন না।

ভারতীয় ও পারশিক ধর্ম্ম লক্ষণযুক্ত ভক্তি-বাদিগণ

যেমন বৈষ্ণবের, তেমন 'ব্রহ্মসঙ্গীত' লেখকগণের অথবা হীব্রু বা সূফীগণের কবিতাকে দার্শনিকতার ক্ষেত্র হইতে মোটামোটি 'দ্বৈত'-আদর্শের, অন্ততঃ 'বিশিষ্টাদ্বৈত' আদর্শের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিলে ভুল হইবে না। তবে, এই 'দ্বৈত' শব্দকে একটি বিশেষ

দৃষ্টিসহকারে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাঁরা দৃষ্টতঃ জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ মানেন না বলিয়া, মনুষ্যের অহংতত্ত্ব বা জগৎ-তত্ত্বকে অবিদ্যা ভ্রান্তি কিংবা মিথ্যামূলক বলিয়া কোন ধারণা ইহাঁদের রচনার মধ্য হইতে আপনাকে চরমপ্রাপ্তি রূপে উপস্থিত করে না; আমাদের প্রাচীন 'অদ্বৈত'বাদিগণ হইতে ব্যবহারিকভাবে এই স্থলেই তাঁহাদের পার্থক্য! সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, তাই, ইহাঁদের সমস্ত ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধটিই আমাদের চিত্তকে মুখ্যভাবে আঘাত করে। বলিতে কি, এই 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধবোধ হইতেই মোটামুটি এই সকল কবিগণের সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস প্রকট হইয়াছে! আবার, সূফীগণ যেমন হীব্রু গীতিকবি-গণের উত্তরসম্বন্ধসূত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তেমন আমাদের বৈষ্ণব কবিগণও একদিকে প্রাচীন ভারতের 'ভক্তি'বাদী বা ভাগবৎগণের, অন্যদিকে সূফী মুসলমান কবিগণের পরবর্ত্তিতা-সূত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের এই ঋণ—মুবলমান প্রভাব-জনিত ঋণ, বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচক-গণ কেহ যথাযথ ভাবে নিরূপণ না করিয়া থাকিলেও, উহা বিশেষজ্ঞের চক্ষে সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের 'রাধা'কে সমষ্টি মনুষ্যের 'আমি' বলিয়া ধরিয়া লইলেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিচার রক্ষিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গে বৈষ্ণব-কবি-সূত্রে দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতসমূহ বা তজ্জাতীয় কবিতার মধ্যে ভারতীয় 'অদ্বৈত' আদর্শের ঝাঁঝ অপেক্ষাও বরং সূফীগণের লক্ষণটাই প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, দার্শনিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস অপেক্ষাও তাঁহার মধ্যে বরং হাফেজ জামী এবং তাঁহাদের শিষ্য নানক-কবীরের বিশেষত্বই যে সমধিক প্রবল হইয়াছে, তাহাও ধীরভাবে নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার ভাবরীতির মধ্যেও ভারতীয় লক্ষণ অপেক্ষা বরং পারসীক লক্ষণটাই যে অধিক, তাহা বিলাতী সমালোচকগণও লক্ষ্য করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি এই

'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতেই ন্যূনাধিক ধর্ম্ম এবং সাহিত্য-অধিকারের মধ্যপথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! পক্ষান্তরে, উহার ভাষা-রীতির মধ্যেও যেমন ইংরাজী বাইবেলের প্রকাশ-প্রণালী পরিস্ফুট, তেমনি উহার 'সিম্বোলিজম' টুকুও খ্রীষ্টের 'পেরেবল্' হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত পারশীক কবিগণের, অপিচ আধুনিক ইয়োরোপের 'সিম্বোলিষ্ট' কবিসংঘের প্রণালী পথেই অগ্রসর হইয়াছে। শেষোক্তের সহিত, বিশেষতঃ মৈতরলিঙ্কের সহিত রবীন্দ্রের পার্থক্যটাও বিশেষভাবে ধর্ম্মক্ষেত্রের পার্থক্য! মৈতরলিঙ্ক সংশয়ী, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী! মৈতরলিঙ্কের sightless প্রভৃতি পরিদর্শন করিলে উভয়ের এই পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

ও আধুনিক ইয়োরোপীয় 'ধর্ম্ম' লক্ষণাক্রান্ত সিম্বোলিষ্ট্ গণের সম্মিলন সুত্রে রবীন্দ্রনাথ

মৈতরলিঙ্ক যেন অন্ধের ন্যায় অজানার উদ্দেশ্যে 'হাতড়াইতেছেন'! তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত এবং আভাস বিচ্ছুরিত হইয়া হৃদয়কে আকুল করিতেছে; তীব্র বিদ্যুতের সচকিত উচ্ছাস, পরিহাসের মতই দৃষ্টিদ্বারে লীলা প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাইতেছে! মৈতরলিঙ্কের সহ-পথিক, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে সাহসী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ইঙ্গিত এবং আভাসটিই ন্যূনাধিক স্থির নিষ্ঠা এবং স্থির লক্ষ্য সাধন পূর্ব্বক পাঠকের হৃদয়কে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থির করিতে এবং সময়সময় তদ্গত করিতেও পারিতেছে! তাঁহার 'রাজা' ও 'ডাকঘরের' মধ্যে এই "মৈতরলিঙ্ক প্রণালী", অপিচ উহার সহিত তাঁহার মিল এবং পার্থক্য উভয়ই প্রবল। আমরা দেখিয়াছি, ইয়োরোপে এখন বিজ্ঞানযুগ এবং বিজ্ঞানের সংশয়বুদ্ধিই প্রবল বলিয়া মৈতরলিঙ্ক এই "আঁধার

আবৃত ঘন সংশয়ের" মধ্যে একজন পরম Lightgiver স্বরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইয়োরোপে মৈতরলিঙ্কের বর্ত্তমান প্রতিপত্তি হইতে রবীন্দ্রনাথ যে একটা পরম সাহস-ভিত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-রসিক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সংশয়ীর অপেক্ষা বিশ্বাসীর সঙ্কেত এবং ইঙ্গিত যে একটা পরম দৃঢ়তানিষ্ঠ বিশিষ্টরসে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ কি? রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা হইতে 'বুক বাঁধিয়া'ই যে গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম-সঙ্কেতময় কবিতাগুলি চয়নপূর্ব্বক ইয়োরোপের সমক্ষে ধরিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ হয় না। সুতরাং এই 'আমি-তুমির' তত্ত্ব এবং সম্বন্ধ-সঙ্কেতের সূত্রকে পূর্ব্বকথিত স্বদেশী এবং বিদেশী, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিগণের মধ্যে অনুসরণ পূর্ব্বক চলিয়া না আসিলে বুঝিতে পারিব না যে, রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকভাবে তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে কোথায় দাঁড়াইয়াছেন! এই রীতি এবং সিম্বোলিজমের ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সম্মিলিত হইয়া কিপলিং এর অপসিদ্ধান্তকে বিপ্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে! এইরূপে দেখিলেই বুঝিব যে, রবীন্দ্রের মধ্যে বরং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য-লক্ষণ অপেক্ষা —হিন্দু আর্য্যের অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাও,

রবীন্দ্রে বরং পারশীক সুফী লক্ষণের প্রাবল্য

বরং পারশিক সূফীগণের লক্ষণই প্রবল হইয়াছে; বৈষ্ণবীয় 'মধুর' ভাবের জাগ্রত এবং প্রগাঢ় সম্বন্ধ-বুদ্ধি কিংবা বস্তু-গত রসনিষ্ঠা অপেক্ষাও, বরং তাঁহার মধ্যে স্বপ্নমিলনের চঞ্চল অথচ তীক্ষ্ণ-উদ্দীপ্ত রসাভাসটুকুই সমধিক প্রবল হইয়াছে! দয়িতের সম্ভোগরসে স্থিরসন্নিবেশ বা 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের' অবস্থা অপেক্ষাও বরং উহার মধ্যে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ, আকুলতা, অথবা প্রয়াণের পিপাসা টুকুই উদগ্র হইয়া

উঠিয়াছে! শতমুখে, শতভাবে, শতচ্ছন্দে, এই মৃদু আকুলতা টুকুই সম
গ্রন্থের অন্তরঙ্গায় 'আত্মা'রূপে আমাদের অন্তরাত্মা দখল করিতেছে
এই অনুপম রসাভাস, এই অর্থাভাস, এবং এই আকুলতাই একপক্ষে
উহার প্রধান নিজত্ব এবং মাহাত্ম্য! এই বিশ্বাসী কবি জামী এবং
কবীরের পথেই নিজের বিশ্বাস লাভ পূর্ব্বক গীতাঞ্জলিতে সংক্রামিত করিয়া
ছেন! সুতরাং এই অঞ্জলির করজোড়ের প্রণালী বিশ্বমনুষ্যের নিত্যকালীন পুরাতন পদার্থ! উহার জল-টুকুন—জলের শুভ্রতা, স্বচ্ছতা উহার বালসুলভ

গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব ও নিজত্ব

সারল্য এবং তারল্য টুকুন মানবজাতির গায়ক কবি এবং ভক্তমাত্রের
সাধারণ সম্পত্তি! জলের কমনীয়কোমল রসটুকুন তাঁহার হৃদয়জাত
নিজস্ব! এই অঞ্জলির ফুলগুলিন একদিকে বঙ্গদেশের (প্রাচ্য
উদ্যানজাত; অন্যদিকে, ফুলের বিশিষ্ট বর্ণধর্ম্ম, মধু এবং গন্ধটুকুও পুনর্ব্বার
নানামতে কবির নিজস্ব! এইরূপে গীতাঞ্জলির মূল উপার্জ্জন নানাদিকে
রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব! পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের রচনা পাঠ করিয়া
গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের স্বোপার্জ্জিত বর্ণ মধু এবং গন্ধ লাভ করিলাম
বলিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা যে 'বেকুবের স্বর্গে' বসবাস করিতে থাকি
তাহা পুনঃপুনঃ আপনাদের বিচারপথবর্ত্তী না করিয়া পারিতেছি না।

এখন, বিলাতী সমালোচকগণ কোন্ দিক হইতে এই গীতাঞ্জলিকে
একটা বিশেষ প্রাপ্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? আমাদের চক্ষে ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে গুরুবাদী; জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে 'আমি ও তুমি'র সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসাহী অথবা উচ্ছ্সিত

মধ্যবর্ত্তিতাবাদী ইয়োরোপীয় সমালোচকের দৃষ্টিতে গীতাঞ্জলির অন্ত-

বঙ্গীয় প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধবাদের মাহাত্ম্য

হওয়া অপেক্ষাও, বরং খ্রীষ্টানগণের অধিকাংশ উচ্ছ্বাস কেবল পরিত্রাতা খ্রীষ্টের অভিমুখেই প্রবাহিত। ভারত-বর্ষের বা পারস্যের 'ভাগবৎ' গণের মধ্যে এই 'আমি ও তুমি'র প্রত্যক্ষসম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে-একটা ভাবোচ্ছ্বাস দেখা যায়, উহা ঐরূপ অন্তরঙ্গভাবে কেবল বাইবেলের Psalms গুলির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে। তন্মধ্যেও প্রায় সর্ব্বত্র পিতা-পুত্র সম্বন্ধের তরফ হইতেই যাহা-কিছু উচ্ছ্বাস। পারসীক বা বৈষ্ণবভাবের—এক কথায় 'মধুর ভাবে'র কোন লক্ষণ উহাতে নিতান্ত কম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জগদীশ্বরকে খ্রীষ্টান কবি 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতে জানেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের ঐদিক সময় সময় খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখাগেলেও, এই 'মধুর' রস ইয়োরোপীয় ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবল নহে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভগবান্‌কে 'রাধা'র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'নাথ' সম্বোধন করিতে হইলে, যে-জাতীয় বিশ্বাস এবং চরিত্র-প্রতিপাত্তির আবশ্যক, অনন্তনিরয়বাদী বা আদিম-পাপসূত্রবাদী খ্রীষ্ট-শিষ্যের পক্ষে তাহাও নানা দিকে অসম্ভব বলিতে হইবে। সুতরাং রবীন্দ্র নাথের গীতাঞ্জলি প্রতীচ্যের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই অপরিচিত 'মধুর' রসের বিশিষ্ট ধারা এবং কাব্য-রীতি প্রকটিত করিয়াই, প্রতীচ্যের হৃদয়দ্বারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আঘাতপূর্ব্বক সম্পূর্ণ নবীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থলে বলিতে পারি যে, কবীর কিম্বা জামীর রচনা বা বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবীর কোন রচনা নানাদিকে ভক্তি-তন্ত্রীয় ভাবুকতা বা চরমপন্থী মিষ্টিসিজম্ বিষয়ে অতুলনীয় হইলেও, উহারা বর্ত্তমান ইয়োরোপের ঐ অস্পষ্ট সঙ্কেতী এবং স্বপ্ন-সন্ধেশী 'সিম্বোলিষ্ট' কবিতার লক্ষণযুক্ত নহে বলিয়াই, ইয়োরোপের চিত্তকে—সংশয়ী ইয়োরোপের চিত্তকে—এইরূপে আঘাত

করিতে পারিত কিনা সন্দেহ—পারিত না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচ্য অথচ বহুপ্রাচীন 'আমি তুমি'র সম্বন্ধকে ধর্ম্মসংগীতের পথে—ইয়োরোপের আধুনিক 'সিম্বোলিষ্ট" কবিতার প্রণালীপথে সাধন করিয়াছ, সাফল্য এবং সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন! এই স্থানেই সাহিত্য বিচারকের চক্ষে 'গীতাঞ্জলির' অন্তরঙ্গীয় শক্তি এবং মাহাত্ম্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির সাহিত্য গুণ।

অন্যদিকে, গীতাঞ্জলির আদিম বাঙ্গালা কবিতাগুলিই যে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইবে—তাহা হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারেন না। 'কড়ি ও কোমল' বা 'মানসী' হইতে 'নৈবেদ্য" পর্য্যন্ত, পুনশ্চ 'নৈবেদ্য" হইতে 'ডাকঘর' পর্য্যন্ত, কবি রবীন্দ্রের জীবনে যে-যে যুগ গিয়াছে, উহারাই হয়ত আমাদের সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য-উপার্জ্জনের যুগ বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলিতে কি, ইংরাজী গীতাঞ্জলি এক দিকে উহাদের সংগ্রহফল হইলেও, বাঙ্গালা গীতাঞ্জলিকে কবিত্ববিষয়ে উহাদের গুণানুরূপ ফল, কিংবা শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়াও হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা গীতাঞ্জলির মধ্যে প্রকৃত সাহিত্য-অধিকারের স্থির সামর্থ্য, ঘনতা কিংবা ভাষা এবং ভাবার্থের পরিপূর্ণ সম্বন্ধসিদ্ধি না ঘটিয়া, বরঞ্চ 'প্রকাশ বেদনা', রসের তরলতা, এবং অজানা পদার্থের উদ্দেশে কবিচিত্তের ব্যাকুলতাটুকুই ফুটিয়া উঠিয়াছে—এবং উহা পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম-অধিকারের সঙ্গীত-সাহিত্যরূপেই দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগের রচনাগুলির মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং ভাবার্থের যে নিবিড় 'বাঁধুনি' পরিলক্ষিত হয়, সঙ্গীতের সুর-তালের অত্যধিক প্রাবল্য গতিকে গীতাঞ্জলির মধ্যে উহা হয় ত নানাদিকে তরলীয় হইয়া পাঠকের চিত্তকে কেবল একটা 'অজানায়' চঞ্চল করিতেই বিশেষ

সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে! অনেকে হয় ত সঙ্গীতকবির এই সমস্ত গুণকে সাহিত্য-অধিকারের 'দোষ' বলিয়াই মনে করিতে থাকিবেন। যেমন বলিয়াছি, অলঙ্কার শাস্ত্র যে সমস্ত 'অন্যায়'কে দোষ বলিয়া মনে করে, এ কালের রচনাগুলি সে সমস্ত দোষকে বরং জ্ঞান-পূর্ব্বক মানিয়া লইয়া, সময় সময় ন্যায় বাদার্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়াও কেবল সংকেত-রসিকতার সাধনাকেই উদ্দেশ্য করিতেছে। সবিশেষ, এ কালের ভাষা ও ছন্দো রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটা 'প্রত্যাবর্ত্তনের" লক্ষণই সূচিত! ছন্দ এবং ভাষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এত নির্ব্বিকার সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন যে, উহা ইচ্ছাকৃত বলিয়াই মনে হয়! একেবারে ভাষা এবং ছন্দোবন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া চিত্তকে পরিব্যাপ্ত স্বেচ্ছাচারিতায় ছাড়িয়া দেওয়া! অনেকটা বালসুলভ সরলতার দিকে—অপিচ 'শৈশব সঙ্গীত' এবং 'ভগ্নহৃদয়' প্রভৃতির ভাষা এবং ছন্দোগতির দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন! ধর্ম্মের প্রভাবে কবি-চিত্ত যেন বালসুলভ সারল্য-সাধনায় অগ্রসর! উহাকে হয়ত ধর্ম্মের দিক হইতে, মনুষ্যত্বের দিক হইতে অনেকে সবিশেষ লাভ, অপিচ উন্নতি বলিয়াও মনে করিতে পারিবেন। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গলা 'গীতাঞ্জলি' যে নৈবেদ্য কিংবা খেয়া হইতে অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেবল প্রাগুক্ত 'রীতি'র তরফ হইতে প্রাকালের অর্জ্জিত সম্পত্তিকে—মণিরত্ন এবং সোণা মোহরগুলিকে নূতন টাকশালের রূপার চাকৃতি এবং তামানিকেলের ভাঙ্তি করিয়া চালাইতে চাহিতেছে, পূর্ব্বের ঘন রসকে তরল করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়াই সাধারণ্যে সংপ্রসারিত করিতে চাহিতেছে, অভিজ্ঞ পাঠক তাহাও হয়ত বলিতে ছাড়িবেন না। অবশ্য, এই তরলতা 'দোষ' হইলেও, উহাকে একটা decadent style বলিতে পারা গেলেও, উহা মধ্যজীবনের পরবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথের! উহা তাঁহার নিজস্ব মণিরত্নের ভাঙ্তি। এই ক্ষেত্রে বঙ্গ সাহিত্যে স্বকীয় দোষে এবং গুণে তিনি চিরকাল

গরীয়ান—আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্ম-সঙ্গীত এবং নিজস্ব ভাবুকতার ক্ষেত্রে 'মহীমণ্ডলে' বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

ইংরেজী গীতাঞ্জলী,, সঙ্গীত-তন্ত্রীয় কবি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের প্রতি ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিব, তিনি একজন প্রেমতত্ত্বের গীতিকবি—সঙ্গীত কবি। তদনু-সারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল কোন্ কোঠায় খুঁজিতে হইবে, তাহা সহজেই স্থির হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভাবকে সুসঙ্গত বাক্য-চ্ছন্দে কিংবা হৃদয়গ্রাহী নামরূপে ধরিয়া রাখা এক কথা, আর তাহাকে সঙ্গীতের পথে নিজের অজানা শূন্যবিশূন্যে খুঁটিহীন এবং উধাও করিয়া ছাড়িয়া দিয়া উহার চঞ্চলগতির অস্পষ্ট রেখাসমূহের প্রতিবিম্ব মাত্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা অন্য কথা! উহা সঙ্গীতের বিশেষত্ব! সুতরাং, এই দিক হইতে, সহৃদয় মাত্রেই হয়ত 'ক্ষণিকা' 'নৈবেদ্য' এবং 'খেয়া'র সঞ্চিত সমৃদ্ধিকে—ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'কে রবীন্দ্রনাথের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ', বলিয়া মনে করিতে পারিবেন। উহার মধ্যে 'সোনার তরী' 'চিত্রা' কিংবা 'চিত্রাঙ্গদা'র সাহিত্য-সমৃদ্ধি,অথবা ভাষা ও ভাবের ঘনরস নাই; কিন্তু,কবির মৌলিক বিশেষত্বধারা এই পথে আসিয়াই নিজের চরমকে লাভ করিয়াছে; এবং ঐ অপ্রাপ্তির আকুলতা বা অপ্রাপ্তিবোধকেই কবির সম্পর্কে একটা পরম প্রাপ্তিরূপে উপস্থিত করিতেছে! উহা ভানুসিংহের চরম খণ্ড—বৈষ্ণব কবির, গায়ক কবির প্রৌঢ়-পরিণত বিকাশ। ভানুসিংহের 'রাধা'-

ইংরাজী গীতাঞ্জলির কবিতাসমূহের

চরিত্রের আকুলতাই 'রাজা' এবং ডাকঘরের 'অব্যক্ত' সম্পর্কিত কাকুতি এবং গীতাঞ্জলির 'স্বং'-

সাহিত্য-রীতি

পদের উদ্দিষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে! সাহিত্যের 'ভাব'পদার্থ টি কেবল রাগরাগিনীর উপর 'চড়াউ' হইলে, বীণাপাণি স্বয়ং পক্ষীরাজ ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া ছুটিলে, চিত্তপটে অর্থের যে ছায়া-ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে, তাহাই রীতির ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির প্রধান বিশেষত্ব। উহার মধ্যে সমাজের বা মনুষ্যজীবনের সুখদুঃখের সংঘাত, জীবনপথে ভালমন্দ বা পাপপুণ্যের কোন সমস্যা, কিংবা সমস্যাপূরণের কোন সহায়তাও পাঠক হয়ত পাইবেন না; কিন্তু একটা অচলপ্রতিষ্ঠ হৃদয়দর্পণের উপর ছায়াতপের বিচিত্রলীলা এবং পদে পদে ঊর্দ্ধের নীলিমা-অন্তরাল বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকের ঈষারা লাভে মুগ্ধ হইতে চাহিলে, এই কাব্যগ্রন্থের তুলনা বিশ্বসাহিত্যে আর মিলিবে না। উহার ঈষারা গুলিও হয়ত নানাদিকে 'একঘেয়ে'; কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহার নিজের বিশেষত্বের মধ্যে যে একটা চূড়ান্ত চরমপন্থিতা আছে, তাহাও বিশ্বের সঙ্গীতকবিতার সাহিত্যে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সঙ্গীতরীতি এবং ভাবুকতার দিক হইতেই 'গীতাঞ্জলি' প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিপত্ত প্রমাণিত করিতেছে—উহার মূল উপার্জ্জন একজন জন্মসিদ্ধ গায়ক 'ভাবুক' এবং প্রেমিক দার্শনিকের অধ্যাত্মজীবনজাত, অপিচ জগতের অজ্ঞাত পদার্থের প্রতি একোদ্দিষ্ট হইয়াও শতসহস্ররূপে উচ্ছ্বসিত, 'একহারা' উচ্ছ্বাস! কবিহৃদয় তুবরীর ন্যায় উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়া আকাশমার্গে কোমলমিষ্ট অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আলোকের ধারা-ছত্র সৃজন করিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

এসিয়ার ব্যাসবাল্মীকি রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন আর্য্যজাতির সরল শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ব এবং জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রকাণ্ড অথচ উদারগম্ভীর সঙ্গীত উপস্থিত

ইয়োরোপের বিচারে এদেশের প্রাচীন মহাকবিগণের মাহাত্ম্য।

করিয়া ইয়োরোপের হৃদয় জয় করিয়াছেন ; উঁহাদের অন্তঃস্থিত প্রাচ্যসভ্যতার বিশিষ্ট বর্ণধর্ম্ম এবং সুর, সাধারণ মানবতার ক্ষেত্র হইতেই, হোমরের দীক্ষা-শিষ্য, বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বক্ষে স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহাদের পর, কালিদাস ভবভূতির মধ্যে পরিপাটী ভাবরস এবং মার্জ্জিতনিপুণ শিল্পসাধনার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ইয়োরোপ উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিয়াছে। পারস্যের ফারদৌশী ও সাদী, বিশেষতঃ জামী এবং হাফেজও প্রেমের নানামুখী 'মীষ্টিক' কবিতার ক্ষেত্রে সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন। খণ্ড বা ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষেত্রে—গীতি কবিতার ক্ষেত্রে, আধুনিক ইয়োরোপের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন দুইজন কবি—পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য কবি ওমরখায়ম, এবং আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ। ওমরখায়ম স্বয়ং সুফী হইলেও, তাঁহার হৃদয় বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদে পরিপূর্ণ। তিনি যে

আধুনিক খণ্ড কাব্যের ক্ষেত্রে ওমরখায়ম ও রবীন্দ্র।

সমস্ত 'রুবাই'র দ্বারা orthodox বা ধর্ম্মধ্বজী সুফীসমূহের ভণ্ডতাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, উঁহারাই এখন (অবশ্য, বিশিষ্ট কবিত্বের গুণেও) সংশয়ী ইয়োরোপের সহানুভূতি আকর্ষণে তাহার সাহিত্য রসিকগণের অনাবিল প্রশংসা লাভ করিতেছে। আর এখন, অধ্যাত্মবিষয়ে পরমসংশয়ী, অথচ ভক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে পর্য্যাকুল ইয়োরোপের সমক্ষে, ভক্তিপর্য্যাকুল রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলিও অপরিচিত অর্থসংকেত এবং অধ্যাত্মতা উপস্থিত করিয়া, সেইরূপ সাধুবাদই লাভ করিতেছে ; উহা কালে ওমর খায়মের সম-প্রতিপত্তি এবং খ্যাতি-বিস্তৃতি

লাভ করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। গীতাঞ্জলির অভ্যন্তরে প্রাচীন ব্যাসবাল্মীকির জ্ঞান-বৈরাগ্য কিংবা শৌর্য্যমহত্ত্বের উদাত্ত-মহীয়ান্ উচ্ছ্বাসের স্নিগ্ধতা না থাকিলেও, কবির বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কার মধ্যে নারদের সঙ্গীতি-সূত্রে যে অপরূপ মৃদুভঙ্গতরঙ্গিণী এবং ভক্তিবিনোদিনী ব্যাকুলতা আছে, সঙ্গীত-প্রতিভার ঐ উদার পরিণতি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি মহার্ঘ প্রাপ্তি বলিয়া চিরকাল পরিগণিত থাকিবে; এবং অভিনিবিষ্ট বিচারকের চক্ষে উহার মাহাত্ম্য বরং বর্দ্ধিত হইয়াই চলিবে।

সাহিত্য-বন্ধুগণ, ইহা নিশ্চিত যে আধুনিক এসিয়ার অন্য কোন কবি এই সৌভাগ্য এবং সুবিধা লাভ করিতে পারেন নাই। অনুরূপ শক্তি কিংবা নৈপুণ্যের সংঘটনা পরের কথা, রবীন্দ্র-নাথের ন্যায় সরস্বতীর পদতলে লক্ষ্মী-মাতার সুবর্ণপদ্মাসন স্থাপন করিতে না পারিলে, 'সাত সমুদ্র তের নদীর' দূরতা, বিভিন্ন ভাষা এবং দুরাবচ্ছিন্ন আচার পার্থক্যের অশেষ অন্তরায় হইতে আপনাকে উত্তীর্ণ করিতে না পারিলে, এ-পারের গীতাঞ্জলিকে ও-পারের 'বোকে' রূপে ধরিতে না জানিলে—কোন এসিয়াবাসীর পক্ষে ইয়োরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা লাভও অসম্ভব ছিল। এতদ্দেশীয় সাহিত্যসাধকের প্রতিষ্ঠাপক্ষে ইয়োরোপের সাধুবাদে বিশেষকিছু আসে-যায়-না স্বীকার করিব—কোন প্রকৃতকবির চরমের মাহাত্ম্য বিষয়েও হয় ত বিশেষকিছু আসে-যায়-না,—কিন্তু, বঙ্গদেশ-বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গভাষার পক্ষে, আধুনিক সাহিত্য-সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি গৌরবপদবী লাভ করা একান্তই লোভনীয় ছিল; উহা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের আত্মপ্রসাদ-অর্জ্জন বিষয়েও নিতান্ত অপরিহার্য্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা ও উহার ফল ইয়োরোপে উপস্থাপন

ছিল; এদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত বিচারক বা সমালোচকের দর্শন আমরা যথেষ্টমতে পাইতেছি না বলিয়াও উহার আবশ্যক ছিল। আমরা যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথের কিংবা আমাদের কোন কবির সাহিত্য-উপার্জ্জনের দোষ বা গুণবিষয়ক প্রকৃত কোন্ সমালোচনাই এ যাবৎ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবি-হৃদয়ের সহজাত বিবেক-ধারণার উপর নির্ভর করিয়া—একরূপ অসহায় ভাবেই, এতকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। বন্ধুগণ, আমরা, বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রেই যে, এইরূপ অসুবিধা ন্যূনাধিক ভোগ করিতেছি, তাহাতে সন্দেহ কি? রবীন্দ্রনাথ যেই পদবী অর্জ্জন করিলেন, উহা তাঁহার নিজের অন্তরাত্মার পক্ষে হয় ত এখন কোন বিশেষ উপকারে আসিবে না। কিন্তু, বাঙ্গালী উহাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, বিশেষতঃ

বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর কর্ত্তব্য

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ এই উপার্জ্জনের উত্তরফললাভে যথোচিতমতে প্রয়াসী হইতে জানিলে, ব্রতধারী সাহিত্যসেবক মাত্রেই নিজনিজ জন্মসিদ্ধ প্রতিভা এবং বিশেষত্বের সহিত ভারতীয় বিশেষত্বের সঙ্গতিপূর্ব্বক জগতের সাহিত্যগঙ্গার সঙ্গে উহার স্রোত-সম্মিলন এবং সুর-সঙ্গৎ করিতে পারিলেই, আমরা যেমন-রবীন্দ্রনাথের-বিষয়ে তেমন-নিজেদের-বিষয়েও প্রধান্ কর্ত্তব্য-টুকুই সমাধা করিতে থাকিব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটী সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্ব এই যে, সাধকের ব্যক্তিত্বটুকুই সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রধান কথা! উহাই যাবতীয় সামর্থ্যের, মৌলিকতার কিংবা মাহাত্ম্যের নিদান। উহাকে লাভ না করিয়া—ভালমন্দ যাহাই হোক—কেহই প্রকৃত সাহিত্যিক কিংবা কবি হইবার দাবীটুকুও উপস্থিত করিতে পারেন না। আমরা জানি, ইহাপেক্ষা অভাবের কথাও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য কিংবা সমাজের

পরিসর মধ্যে আর দ্বিতীয়টি নাই। সাহিত্যের চরম বিচার-প্রণালী নিদারুণ নির্ম্মম এবং নিরপেক্ষ পদার্থ! অনন্ত কালপ্রবাহের স্রোতোমধ্যে সর্ব্ব প্রথমে আত্মতত্ত্বের নির্ভরে দাঁড়াইতে না পারিলে, এইরূপ বিচারলাভের যোগ্যতাটুকুও অর্জ্জন করা যায় না! আমরা দেখিয়া আসিলাম, রবীন্দ্রনাথ উক্তরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াই দাঁড়াইয়াছেন—অবশ্য, তাঁহার প্রকৃত বিচার ভবিষ্যতের হস্তে। সুতরাং, আমরা উপসংহারে কেবল বর্ত্তমানের যথাযথ পরিজ্ঞান এবং ভবিষ্যতের উদার উপলব্ধির প্রশস্তপথে অবহিত হইবার জন্য, আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াই রাখিয়া যাইতেছি। মহানাটকের প্রাচীনকবি রামভদ্রের প্রমুখাৎ যেই প্রণালীতে ভারতীয় ভাবী রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমার সকল কথার মর্ম্মকথায় আপনাদের সবিচার-দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং শেষ প্রার্থনা-নিবেদন স্বরূপে, তাঁহার ব্যঞ্জনা-বরিষ্ঠ বাক্যকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়াই বলিতেছি—

নত্বা নত্বা ভাবিনঃ শিল্পিবর্য্যান্
ভূয়োভূয়ো যাচতে শীলভদ্রঃ ॥

প্রথম খণ্ড।

ভ্রম-শুদ্ধি।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	প্রধান্য	প্রাধান্য
১৩	১৮	অদ্যাশক্তির	আদ্যাশক্তির
১৫	৩	ভক্তি	ভুক্তি
২১	২০	সন্ল্যাস	সন্ন্যাস
২৪	৬	নীতিষৰ্ম্ম	নীতিধৰ্ম্ম
২৪	২৪	উচ্ছাসের	উচ্ছ্বাসের
২৯	১৩	বাস্থবিকতা	বাস্তবিকতা
৩১	১৭	অষ্পষ্টতা	অস্পষ্ট
৩৭	৪	প্রভূর	প্রভুর
৩৯	১৯	পুরষ্কার	পুরুষকার
৪০	১৯	ছন্দোবন্দে	ছন্দোবন্ধে
৪৫	৫	বীজত্তৃত	বীজ
৪৮	২	প্রালীপ্রসন্ন	কালীপ্রসন্ন
৪৮	৬	ক্রিয়াম্বিত	ক্রিয়ান্বিত
৪৯	১২	সৌষ্টবময়	সৌষ্ঠবময়
৫৪	২০	বাসবাস	বনবাস
৫৯	৯	সন্মানের	সম্মানের
৫৯	১১	পুন্তক্ষেত্রে	পণ্যক্ষেত্রে
৬৬	১১	সংন্ন্যাসী	সংন্যাসী
৭৩	৬	স্কূর্ত্তিই	স্ফূর্ত্তিই
৭৬	৬	আধূনিক	আধুনিক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	৯	পরষ্পর	পরস্পর
৮৩	১	প্রাচীন	প্রাচীনতা
৮৬	১২	উদাসক	উপাসক
৮৯	১৮	হইতে	হইবে
৯০	৪	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
৯০	১০	উচ্চজাতীর	উচ্চজাতীয়
৯৩	২৩	নিগৃহিত	নিগ্রহীত
৯৪	১১	পন্থীতার	পন্থিতার
১০১	৯	অনুশরণ	অনুসরণ
১১৬	১৭	বলিয়াছে	চলিয়াছে
১১৯	৪	নিঝরের	নির্ঝরের
১২৩	১৬	সত্যেও	সত্ত্বেও
১২৪	২৩	অস্তরঙ্গ	অন্তরঙ্গ
১২৬	১	উন্নতিশীল	গতিশীল
১৩৪	১৬	তত্ত্বাকাঙ্খা	তত্ত্বাকাঙ্ক্ষা
১৩৫	৬	অস্পৃ শ্য	অস্পৃশ্য
১৪২	২৩	চিত্তপূরীর	চিত্তপুরীর
১৪৩	১	অস্ফ ুট	অস্ফুট
১৫১	২২	গবিষ্টতা	গরিষ্ঠতা
১৫২	২	নীলকণ্ট	নীলকণ্ঠ
১৫৬	৫	প্রতিদ্বন্ধী	প্রতিদ্বন্দ্বী
১৫৭	৪	প্রতিষ্টা	প্রতিষ্ঠা
১৫৭	৮	সুত্রে	সূত্রে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৮	৭	স্পর্শাক্রামক	স্পর্শাক্র:মক
১৬০	১৭	সাঙ্কটাবহ	সঙ্কটাবহ
১৬১	৭	ঊর্দ্ধে	"ঊর্দ্ধে"
১৬৪	৭	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
„	১৬	নিরূপন	নিরূপণ
১৬৬	১৩	এথন	এমন
১৬৭	১৭	প্রাণস্পন্দন	প্রাণস্পন্দন
১৬৯	৩	স্বল্পনিষ্ট	স্বল্পনিষ্ঠ
১৭০	৭	মূলতত্ব	মূলতত্ত্ব
১৭৫	৮	সংখ্যকেই	সংখ্যাকেই
১৭৬	৩	ভাবুকতাতে	ভাবুকতাকে
১৭৭	৪	নীতিসঙ্গতে	নীতিমতে
১৮৩	২১	কিন্তু ;	কিন্তু,
১৮৪	১২	অভ্যূন্নতি	অভ্যুন্নতি
১৮৬	১২	অনুষ্কাল	আয়ুষ্কাল
১৮৭	১১	পরিবেষ	পরিবেশ
১৮৮	২৪	বিভাষ্টৈং	বিভাবাষ্টৈঃ
১৮৯	১৯	উদ্ধুদ্ধ	উদ্বুদ্ধ
১৯৩	৭	করাই	করিয়াই
২০২	২০	গঁতিরের	গঁতিয়ের
২০৭	১	অনভীজ্ঞের	অনভিজ্ঞের
২০৭	১৫	কণায়	কাণায়
২১৪	৭	অনুরণ	অনুরণন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৪	২২	অপ্রতিদ্বন্দ্বি	অপ্রতিদ্বন্দ্বী
২২৪	২৪	পরিস্ফুট	পরিস্ফুট
২২৭.	১০	প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ
২২৮	১১	লঘিষ্ট-গরিষ্ট	লঘিষ্ঠ-গরিষ্ঠ
২৩৪	১	গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
২৩৬	৮	কথায়	কথার
২৩৬	১২	গাহিতে	গাহিতে হয়
২৩৯	৯	বলিয়া ফেলে	বলিয়া ফেলি
২৫২	১৭	টুকুর	টুপুর
২৭০	৬	পূতন	নূতন
২৮৩	পার্শ্বসূচী	উলার	উহার
২৮৪	১	মনোরাজ্য	মনোরাজ্যে

দ্বিতীয় খণ্ড।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	৮	জীবিতমণ্ডলি	জীবিতমণ্ডলী
১৮	৮	উপস্থান	উপস্থাপন
১৮	১৭	অপ্রতিদ্বন্ধী	অপ্রতিদ্বন্দ্বী
১৯	১৬	ইন্দ্রিলার	ঐন্দ্রিলার
২০	২	বীণাপানীর	বীণাপাণির
২০	৫	বজ্রছন্দ্র	বজ্রচ্ছন্দ
২৩	১১	কোণে	কোলে
২৭	৬	জ্যোতিমূর্ত্তি	জ্যোতির্মূর্ত্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	১২	আধারে	আঁধারে
৩৮	২	সূক্ষতা	সূক্ষ্মতার
৪০	১৬	স্বাভাবক	স্বাভাবিক
৪৯	৬	বাজ	বীজ
৫৬	৭	আনন্দমট	আনন্দমঠ
৬১	১০	সেক্‌সপীয়ের	সেক্‌সপীয়রের
৬১	১১	নিশিথের	নিশীথের
৬৩	২২	নিরুদ্বেশ্য	নিরুদ্দেশ্য
৬৪	১০	গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
৬৯	৮	সত্বচ্যুত	স্বত্বচ্যুত
৭২	৬	সংণ্ন্যাসাদর্শ	সংন্যাসাদর্শ
৭৪	৮	দুহৃদয়তা	দুর্হৃদয়তার
৭৬	পার্শ্বসূচী	সম্প্রদারিকতা	সাম্প্রদায়িকতা
৯১	১০	জিজ্ঞাসু, মাত্রের	জিজ্ঞাসুমাত্রের
৯৪	১৪	করুণ	করুন
৯৪	১৯	আসিতেছেন	আসিতেছে।
৯৫	পার্শ্বসূচী	ক বিত্ব	কবিত্ব
৯৭	৬	অহিফেন সেবীর	অহিফেণ সেবীর
৯৯	৬	বিষয়াভ্যুণ্নতি	বিষয়াভ্যুন্নতি
১০৪	৫	কৃষ্ণকাস্তে	কৃষ্ণকান্তের
১০৭	১৫	সৌত্বাগ্যবান্	সৌভাগ্যবান্
১০৯	২২	প্রচারিত	প্রলুণ্ঠিত
১১১	২৪	করিলে	করিতে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২১	৭	পরস্পর স্বন্দ্ব	পরস্পর দ্বন্দ্বী
,,	৮	উর্ব্বসীর	উর্ব্বশীর
১৩১	২৪	খোলা	ঘোলা
,,	২৫	সাকল্য	সাফল্য
১৩২	২০	ঐশ্বর্য্যে	ঐশ্বর্য্যের
১৪০	১২	উর্ব্বী	উর্ব্বী
১৪৯	১৪	আভাষ	আভাস
১৫৬	১২	মিয়ন্ত্রিত	নিয়ন্ত্রিত
১৫৯	১	ছন্দোবদ্ধ	ছন্দোবন্ধ

নির্ঘণ্ট। *

[দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসমূহ (২·) রূপে নির্দ্দিষ্ট।]

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন, বি, এল, কবিভাস্কর, প্রণীত গ্রন্থাবলী।

বিজয়া বলিয়াছেন—"শশাঙ্ক মোহন বঙ্গ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি"।

'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে লেখক বঙ্গসাহিত্যের অতীত-বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে যেই আদর্শে ধারণা পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন, উহার মধ্যে তাঁহার হৃদয়-গত আদর্শ যেইরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কাহারও কুতূহল জন্মিলে নিম্নলিখিত যে-কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন—

সিন্ধু সঙ্গীত—মূল্য ॥০। মানবচিত্তে 'সিন্ধু'-তত্ত্বের কর্ম্ম-প্রণোদনা এবং জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্যের অনুভূতিমূলক প্রথম কাব্য।

"কবির মৌলিকতা আছে; কল্পনার বৈচিত্র্য আছে; লিখিবার শক্তি এবং ভাবুকতাও আছে। শক্তির বিকাশ হইলে বঙ্গীয় কবি-সমাজে ইনি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।" হিতবাদী।

"অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও কবি প্রতিভার পরিচয়" কবিবর স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

"কবিতাগুলি অতি সুন্দর।" স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

"এই কবির ভিতরে মহাকবি শেলীর ন্যায় জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি এবং উধাও কল্পনা স্বাধীন ভাবে দেখিতে পাই। 'সিন্ধু' সঙ্গীতে অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ, উন্মুক্ত কল্পনা, গভীর ভাব যে কত রহিয়াছে, তাহা 'সিন্ধু

সঙ্গীত' পাঠ না করিলে বুঝা যায় না। শশাঙ্কমোহনের হৃদয় ভাব প্রবণ, যেন অতলস্পর্শী। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অভিনব কল্পনা অতি বিরল। সমস্তই অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয়। বাঙ্গালীর মনকে জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত করিবার একমাত্র ভাষা, শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু সঙ্গীত'। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন 'সিন্ধু সঙ্গীত' প্রত্যেক বাঙ্গালীর অতি আদরের বস্তু হইবে" নব্যভারত।

শৈল সঙ্গীত—মূল্য ১৲—মানবচিত্তে 'শৈল'-তত্ত্বের প্রেম স্বাধীনতা এবং ধ্যানগত অনুভূতিমূলক অপূর্ব্ব কাব্য। "সমালোচন-ব্রত গ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যখন একটি রত্ন মিলিয়া যায়, তখন সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। ইহার প্রতিটী কবিতা নিজস্ব ভাবের প্রবাহ বেগ, ছন্দের তরলতা এবং শব্দ বিন্যাসের সরস মাধুর্য্যে পূর্ণ। সকল সুন্দর কবিতা।" প্রবাসী

"একজন প্রকৃত কবি। তাঁহার সিন্ধু সঙ্গীতে প্রস্ফুট প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছি, এই পুস্তকে তাহার বিকাশসৌন্দর্য্যে আরও মোহিত হইয়াছি। **এইরূপ কবি বঙ্গদেশের গৌরব।** গ্রন্থকার প্রতিভাশালী, শিল্পসম্পদে ধনী, যাহা লেখেন তাহাই সুমিষ্ট হয়। * * সৌন্দর্য্য বোধের সহিত গ্রন্থকারের সাত্বিকভাবের পরিচয় * * এই সাত্বিক ভাব কত মধুর, কত গভীর কত প্রাণস্পর্শী। * * গ্রন্থকারের পূত হৃদয়ের পবিত্র ছায়া। ওয়ার্ড সোয়ার্থের সহিত তুলিত হইতে পারেন। **শশাঙ্কমোহন অমর হইতে পারিবেন।** শাস্ত্রী শিব নাথ ধার্ম্মিক ব্যক্তি; কিন্তু তাঁহার কবিতায় যে সাত্বিকতার পরিচয় পাই নাই, শশাঙ্কমোহনে তাহা পাইয়াছি। ধার্ম্মিক চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও রবীন্দ্র নাথের সঙ্গীত গুলিতে যে সাত্বিকতার আভাষ পাওয়া যায়, শশাঙ্ক মোহনের কবিতায় তাহারই জমাট ভাব পরিলক্ষিত। তুলনা

অসম্ভব। কিন্তু শশাঙ্ক মোহনের লেখা এ দেশের কোন কবিরই অযোগ্য নহে। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, শশাঙ্ক মোহন ওয়ার্ডসোয়ার্থের ন্যায় সাত্ত্বিক ভাবসাধনায় অমরত্ব লাভ করুন, এবং তাঁহার কবিতায় দেবআশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।" নব্যভারত।

"সুগভীর ভাবপূর্ণ; সাহিত্য ক্ষেত্রে পরমার্থজ্ঞান বিস্তার করিয়া আপনি ধন্য হউন" স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

ভাব ও ভাষা প্রাঞ্জল; উহারা 'কেবল কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে' এমন নহে, মরমে একটা ছবি রাখিয়া যায়। তোমার মোহিনী প্রতিভায় জন্মভূমির মুখ সমুজ্জ্বল হউক' কবিবর ৺ নবীনচন্দ্র সেন।

"Sasanka Mohan Sen is soon to assert the loftiest position by the unique music of his verse" সংশোধিনী।

সাবিত্রী। নাট্যকাব্য—মূল্য ১৷৷৹। ভারতবর্ষের প্রাচীন উপনিষদ্-যুগে প্রকটিত ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার পুনঃসৃষ্টি-মূলক অভিনব চিত্রপট। মানব-প্রেম যেরূপে শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্য এবং মহামৃত্যুকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজের জন্য অনন্তপদ অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার চরিত্র-চিত্র।

"ভাষার সৌষ্ঠবে ও ভাবের গৌরবে কাব্যখানি অতি উপাদেয়। সাহিত্য জগতে নিশ্চয় সমাদৃত হইবে" স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

"আপনার ভাষা ও কাব্য কলা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। কাব্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী স্ত্রীর যেই আদর্শ খাড়া করিয়াছেন, তাহাও আপনার লেখনীরই উপযুক্ত" কবিবর স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

"আপনার কবিত্ব শক্তি ও চিন্তাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বঙ্গভাষায় বোধ হয় এইরূপ উদ্যম এই প্রথম।" কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

"ভাব সৌন্দর্য্যে, ভাষা সম্পদে এবং সুরুচি-সঙ্গমে এই কবির সমকক্ষ ব্যক্তি এ দেশে বিরল। পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে এত বিহ্বল হইতে হয় যে, শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। কোনও স্থান রাখিয়া কোনও স্থান উদ্ধৃত করা যায় না। এইরূপ গ্রন্থ যেই ভাষায় রচিত হয়, সেই ভাষার গৌরবই শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। সাবিত্রী ঘরে ঘরে আদৃত হউক।" নব্যভারত।

ভাবের মৌলিকতায়, ভাষার শক্তি ও স্বচ্ছতায় শশাঙ্কমোহনের 'সিন্ধু সঙ্গীত' 'শৈল সঙ্গীত' ও 'সাবিত্রী' বাঙ্গালাসাহিত্যে কোন স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, বর্ত্তমানে নহে, ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে আধুনিক অনেক-বাক্য-বহুল স্বল্পার্থব্যঞ্জক কবিতা ভুলিয়া গিয়া সকলে শশাঙ্ক মোহনের স্বাধীন ভাবোদ্দীপক কাব্যনিচয়ের সংবর্দ্ধনা করিতেছে। * * এই হবিঃ-হোমগন্ধী 'সাবিত্রী'তে কবির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষ।"

সংশোধিনী।

"অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি। সাবিত্রী শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কাব্য হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের সমাদরের দাবী করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।" বাঁকুড়া দর্পন।

"নাটকাকারে লিখিত হইলেও ইহা আধুনিক মহাকাব্য। সাবিত্রী উপাখ্যানের তাৎপর্য্য প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রতিপাদন—উপাখ্যানের এই ভাগ অতি বিশদ ভাবে প্রতিপাদিত। সাবিত্রী শ্রেষ্ঠ কাব্য হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।" প্রতিভা।

"মৌলিকতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয়"—ভারতী।

"কবিত্বের বেশ পরিচয়"—বঙ্গবাসী।

"সাবিত্রী সাহিত্য সংসারে নিশ্চয় আদৃত হইবে।" ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র।

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রেম গাথা। নব প্রকাশিত কাব্য; মূল্য ১৲। কোন সাহিত্যরসিক পণ্ডিত বলিয়াছেন ইহা "the finest love-story in the world"। মানবপ্রেম কিরূপে জগতের অন্তরাল-স্থিত অসীম এবং অব্যক্তকে প্রেমডোরে আকর্ষণপূর্ব্বক মানবীয় মূর্ত্তিতে অবতারিত করে, ভারতের হৃদয়-গত সেই প্রাচীন অবতারবাদকে আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পের আদর্শে কমনীয় নাম-রূপে নিরূপণ করার চেষ্টা।

ব্যোম-সঙ্গীত মূল্য ১৷০; মানবচিত্তে 'মহাকাশ'-তত্ত্বের বা সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি-মূলক নানাভাব-ছন্দময় গীতিকাব্য। যন্ত্রস্থ।

বিশ্বামিত্র বা জয়-পরাজয়। নাট্যকাব্য—যন্ত্রস্থ। প্রাচীন আর্য্য জাতি-কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই ভারতের অধ্যাত্মালোকে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের বিভিন্ন আদর্শমূলক সাধনার দ্বন্দ্ব এবং 'জয়পরাজয়' কাহিনী। "একদিকে, ভারতীয় আদিম আর্য্যজাতির বিশ্ববিজয়ী, তেজোবীর্য্য-মুখর হৃদয়োচ্ছ্বাস; অন্যদিকে, তন্মধ্যেই পুনশ্চ ভারতীয় বিশেষ-আদর্শের জ্ঞান এবং বৈরাগ্যনির্ব্বাণ মূলক, ধর্ম্মাধিষ্ঠিত সমাজ-তন্ত্রের যাবতীয় ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-পরিণতির সূচনা! একদিকে, ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার আদিম গোমুখী-নির্ঝরে উহার যাবতীয় ভাবী নিয়তি-বীজের নিরূপণ; অন্যদিকে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে পরস্পর-সহায়তার এবঞ্চ স্বাধীনতার পথে, মানবাত্মা-কর্ত্তৃক নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম-শিখরে অধিরোহণের অনন্ত-অর্থময় চরিত্র-চিত্র, সূক্ষ্মদৃষ্টি-ময় সৃষ্টি, এবং শিল্পীর পরমার্থ!"

বঙ্গবাণী মূল্য ২৷৷০ ; আধুনিক সভ্যসাহিত্য সমূহের সমুন্নত আদর্শে বঙ্গসাহিত্যের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের-সমালোচনা মূলক গদ্য গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ২ পুস্তকালয় ; এলবার্ট লাইব্রেরী ঢাকা ; অথবা আমার নিকট।

শ্রীমহেন্দ্রমোহন সেন।
সদরঘাট, চট্টগ্রাম।

Albert Library, Dacca.

যতীশচন্দ্র সেন প্রণীত—

১। ব্রহ্মচারী— ॥०

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

১। আশীর্ব্বাদ— ১৲

২। প্রহ্লাদ— ॥৶০

৩। লেখা— ৸০

৪। শিশুপাঠ্য কৃত্তিবাস— ১৲

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

১। সর্ব্বানন্দ— ॥০

২। শাক্যসিংহ— ১৲

৩। দেবীমাহাত্ম্য— ।০

ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস বি, এ প্রণীত—

১। গন্ধপুষ্প— ৸০

সেক আবদুল জব্বর প্রণীত—

১। হজরতের জীবনী— ১৲

২। নূরজাহান— ৸০

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত—

১। সতী জয়মতী— বাধান ॥০ আবাধান ।৵০

বিপিনবিহারী সরকার প্রণীত—

১। চৈতন্যদেব (যন্ত্রস্থ)— ৸০

২। সতী খুল্লনা— বাধান ॥০ আবাধান ।৶০

শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল প্রণীত—

১। বঙ্গবাণী— ২৲

২। ব্যোম সঙ্গীত (যন্ত্রস্থ)—

কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—

১। ব্রহ্মপুত্র— ।০

শ্রীমতি চারুবালা দেবী প্রণীত—

মল্লিকা— ॥০

মোটা অক্ষরের পুস্তকগুলি মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও উপহারের জন্য অনুমোদিত।